বোখারী শরীফ

[বাংলা তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা]

চতুর্থ খণ্ড

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রঃ)
প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল জামেয়া কোরআনিয়ার
ফয়েজ ও বরকতে

মাওলানা আজিজুল হক সাহেব
মোহাদ্দেছ জামেয়া কোরআনিয়া লালবাগ, ঢাকা
বর্তমান শায়খুল হাদীছ, জামেয়া রহমানিয়া,
সাত মসজিদ মোহাম্মদপুর, ঢাকা কর্তৃক অনূদিত

হামিদিয়া লাইব্রেরী লিঃ
৬৫, চক সারকুলার রোড, ঢাকা-১২১১

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۰ وَالصَّلٰوةُ

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি সারা জাহানের প্রভু পরওয়ারদেগার।

وَالسَّلَامُ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ

দরূদ এবং সালাম সমস্ত নবী ও রসূলগণের প্রতি

خُصُوْصًا عَلٰى سَيِّدِهِمْ وَاَفْضَلِهِمْ نَبِيِّنَا

বিশেষত ঃ নবী ও রসূলগণের সর্বপ্রধান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যিনি– যিনি আমাদের নবী এবং

خَاتَمِ النَّبِيِّنَ ۰ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

সর্বশেষ নবী – তাঁহার প্রতি দরূদ ও সালাম এবং তাঁহার পরিবারবর্গ ও সমস্ত ছাহাবীগণের প্রতি

وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ

এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাঁহাদের যত খাটি ও পূর্ণ অনুসারী হইবেন তাঁহাদের প্রতি।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

আয় আল্লাহ! আমাদিগকে সেই অনুসারী দলভুক্ত বানাইবেন নিজ কৃপাবলে, হে দয়াময় সর্বাধিক দয়ালু!

اٰمِيْن ! اٰمِيْن !! اٰمِيْن

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

(রহমানুর রাহীম আল্লাহর নামে)

সপ্তদশ অধ্যায়

নবীদের ইতিহাস

আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াতে বহু সংখ্যক নবী পাঠাইয়াছেন। তন্মধ্যে কিছু সংখ্যক নবী আলাইহিমুস সালামের কোন কোন ঘটনা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে। যেসব নবীর উল্লেখ পবিত্র কোরআনে বিদ্যমান আছে, তাঁহাদের ভিন্ন আরও নবী যে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তৎসম্পর্কেও পবিত্র কোরআনেই উল্লেখ রহিয়াছে। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন—

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ .

"(হে মুহাম্মদ (সঃ)!) আমি আপনার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম যাঁহাদের মধ্য হইতে অনেকের বিভিন্ন ঘটনা আপনাকে জ্ঞাত করিয়াছি এবং এমনও অনেক ছিলেন যাঁহাদের সম্পর্কে আপনাকে কিছুই জ্ঞাত করি নাই।" (পারা- ২৪; রুকু- ১৩)

নবীগণের সর্বমোট সংখ্যা কত সে সম্পর্কে অবশ্য একখানা হাদীছে বর্ণিত আছে যে, রসূল ও নবীগণের সর্বমোট সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার; কিন্তু উপরোল্লিখিত আয়াতের দ্বারা স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, রসূলগণের মধ্যে কিছু সংখ্যক এইরূপও ছিলেন, যাঁহাদের বয়ান হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জ্ঞাত করান হইয়াছিল না। তাই উক্ত হাদীছখানা নবীগণের সংখ্যা নির্ধারণ ব্যাপারে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত ফয়সালাকারক অথচ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যত নবী পয়গম্বর দুনিয়াতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের বরহক ও সত্য হওয়া সম্পর্কে ঈমান রাখা ইসলামের একটি বিশেষ অঙ্গ। সুতরাং পয়গাম্বরগণের সংখ্যা নির্ধারণ না করিয়া এইরূপ ঈমান রাখিতে হইবে যে, আল্লাহ তাআলা যত পয়গাম্বর জগতে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রেরিত খাঁটি ও সত্য ধর্মবাহক, আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধিস্বরূপ মানুষ। তাঁহারা গোনাহ হইতে মুক্ত ও পাক-পবিত্র ছিলেন।

পবিত্র কোরআনে নবীগণের উল্লেখ রহিয়াছে, ইমান বোখারী (রঃ) এই অধ্যায়ে সেই নবীগণ সম্পর্কেই বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

হযরত আদম (আঃ)

নবীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম নবী, বরং মানব জাতির আদি পিতা এবং আল্লাহর কুদরতের সৃষ্ট সর্বপ্রথম মানুষ ছিলেন হযরত আদম (আঃ)। আল্লাহ তাআলা মাটি দ্বারা স্বীয় বিশেষ কুদরতবলে সর্বপ্রথম আদমকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অতপর তাঁহারই শরীরের এক অংশ দ্বারা তাঁহার জোড়া মা হাওয়াকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পিতা আদম ও মা হাওয়া হইতেই বিশ্বজোড়া মানব জাতির সৃষ্টি।

হযরত আদম (আঃ)-এর ঘটনাবলী ও আদি ইতিহাস পবিত্র কোরআনের বহু স্থানে বর্ণিত হইয়াছে; সেই সব ঘটনাবলীর ধারাবাহিক বিবরণ এবং সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র কোরআনের উদ্ধৃতি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আদম সৃষ্টির প্রাথমিক আলোচনা

আসমান-যমীন ইত্যাদি তথা বিশ্বজগতকে আল্লাহ তাআলা পূর্বেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনের বহু স্থানে রহিয়াছে। অতপর যখন আল্লাহ তাআলা আদমকে এই ভূমণ্ডলে স্বীয় খলীফা বা প্রতিনিধিরূপে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করিলেন, তখন সর্বপ্রথম তিনি তাঁহার এই ইচ্ছা ফেরেশতাগণের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন।

ফেরেশতা হইলেন নূর বা আলো দ্বারা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি ও বিশেষ পাক-পবিত্র জীব। পাপ বা নাফরমানীর প্রবৃত্তির লেশ মাত্রও তাঁহাদের মধ্যে নাই, তাঁহারা সর্বদা সৃষ্টিকর্তা প্রভু আল্লাহ তাআলার ফর্মাবরদারী, আজ্ঞা বহন এবং তাঁহার এবাদত-বন্দেগী প্রশংসা ও মহিমা জপ করিয়া থাকেন- ইহা তাঁহাদের সৃষ্টিগত স্বভাব। তাঁহারা যখন আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা জানিতে পারিলেন যে, আল্লাহ তাআলা অন্য এক জীব সৃষ্টি করিতেছেন, তখন তাঁহারা বিশেষ আসক্ত ভক্ত অনুরক্ত ভৃত্য দাসের ন্যায় নিজেদের ফেদাইয়ত বা প্রভুর সন্তুষ্টি বিধানে আত্ম-বিলীনের ঘোষণাদানপূর্বক প্রভুর দরবারে আরজ করিলেন- ওহে প্রভু! অন্য জীব সৃষ্টি হইলে তাহারা হয়ত তোমার নাফরমানীতে লিপ্ত হইবে; সদা-সর্বদা তোমার মহিমা জপের জন্য আমরাই ত প্রস্তুত রহিয়াছি।

এখানে আল্লাহ তাআলার মূল ইচ্ছা এবং ফেরেশতাদের ধারণার মধ্যে একটা ব্যবধান ছিল। আল্লাহ বলিয়াছেন খলীফা বা প্রতিনিধি সৃষ্টি করিবেন, আর ফেরেশতাগণ বলিতেছিলেন, মহিমা জপের কাজ সমাধা করিবেন। এই দুইয়ের মধ্যে যে পার্থক্য এবং ফেরেশতাদের মধ্যে যে আল্লাহ তাআলার খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা নাই- আল্লাহ তাআলা তাঁহাদের মধ্যে সেই কাজের যোগ্যতা সৃষ্টি করেন নাই, সেই দিকে ফেরেশতাগণের লক্ষ্য ছিল না; অথচ আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে ঐ বিষয়টিই ছিল প্রধান এবং সেই জন্য খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের জন্য জীব সৃষ্টি করার ইচ্ছা করিতেছিলেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাগণকে তাহাদের অজ্ঞতার কথা বলিয়া দিয়া স্বীয় বিজ্ঞপ্তির আলোচনা সাময়িকভাবে ক্ষান্ত করিয়া দিলেন। পবিত্র কোরআনে উক্ত বিষয়ের বর্ণনা এইরূপ-

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ـ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ـ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ـ قَالَ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ـ

তোমরা স্মরণ কর তখনকার ঘটনা যখন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা প্রভু ফেরেশতাগণের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, আমি দুনিয়াতে একজন খলীফা বা প্রতিনিধি সৃষ্টি করিব। তখন ফেরেশতাগণ বলিয়াছিলেন, আপনি কি দুনিয়াতে এমন জাতি সৃষ্টি করিতে চাহেন, যাহারা তথায় ফেতনা-ফাসাদ ও খুন-খারাবী করিবে? অথচ আমরাই ত আপনার মহিমা জপ ও পবিত্রতা বয়ান করিয়া থাকি। আল্লাহ তাআলা বলিলেন, আমি যেসব গোপন বিষয় অবগত আছি তোমরা তাহা অবগত নও। (পারা-১; রুকু- ৪)

আদম সৃষ্টির স্থির সিদ্ধান্ত ঘোষণা

আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের সম্মুখে আদম সৃষ্টির প্রাথমিক আলোচনা মুলতবী করিয়া দিয়া অতপর তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আদম সৃষ্টি করার স্থির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেন যে, আমি আদম সৃষ্টি করিবই। এমনকি আদম সৃষ্টি করার পর ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে ফেরেশতাগণ যে তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদনে

আদিষ্ট হইবেন এবং তাঁহাদিগকে তাহা পালন করিতে হইবে; আলেমুল গায়েব আল্লাহ তাআলা তাঁহাদিগকে সে সম্পর্কেও সতর্ক করিয়া দিলেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বিবৃতি এই-

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ـ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ـ

একটি স্মরণীয় ঘটনা- যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদের সম্মুখে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, নিশ্চয় আমি সৃষ্টি করিব একটি মানব দেহ বিকৃত দুর্গন্ধময় কর্দমে তৈয়ার খন্ খন্ শব্দাকারক শুষ্ক মাটি হইতে। যখন আমি উহা সম্পূর্ণ করিয়া সারিব এবং উহার মধ্যে আমার বিশেষ সৃষ্টি আত্মা বা রূহ প্রদান করিব, তখন (ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে আমার আদেশ আসিলে) তোমাদিগকে তাহার প্রতি সেজদা (বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন) করিতে হইবে। (সূরা হেজ্‌র পারা- ১৪; রুকু- ৩)

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ـ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ـ

স্মরণ কর, যখন ফেরেশতাগণকে লক্ষ্য করিয়া তোমার প্রভু ঘোষণা করিলেন, নিশ্চয় আমি একটি মানুষ কর্দম দ্বারা তৈয়ার করিব। আমি যখন উহাকে সম্পূর্ণ করিয়া সারিব এবং উহার মধ্যে আত্মা বা রূহ্ প্রদান করিব তখন (ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে আমার আদেশে) তোমাদিগকে তাহার প্রতি সেজদা (বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন) করিতে হইবে। (সূরা সোয়াদঃ পারা-২৩; রুকু-১৪)

হযরত আদমের সৃষ্টি

মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-এর দেহকে আল্লাহ তাআলা মাটির দ্বারা তৈয়ার করিবেন, তাহা পূর্ব বর্ণিত আয়াতদ্বয়ে স্বয়ং আল্লাহ তাআলার ঘোষণায়ই জানা গিয়াছে। এই সম্পর্কে এক হাদীছে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু অলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ তাআলা আদমকে যেই মাটিটুকু দ্বারা তৈয়ার করিয়াছেন, সেই মাটিটুকু ভূমণ্ডলের বিভিন্ন অংশ হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল (যাহার মধ্যে লাল, সাদা, কাল এবং নরম, শক্ত, মন্দ ও ভাল বিভিন্ন রকমের মাটি ছিল) যার ফলে আদম সন্তানগণ লাল, সাদা, কাল, নরম এবং শক্ত ও ভাল-মন্দে বিভক্ত হইয়াছে।-

(মেশকাত শরীফ)

ঐ মাটি সম্পর্কে আরও তথ্য এই জানা যায় যে, প্রথমে ঐ মাটিকে পচা কর্দমে পরিণত করার ব্যবস্থা করা হয়। যখন উহা (কুমারের মাটির ন্যায়) চটচটে আঠাল রূপধারণ করে, তখন উহা শুকানো হয়। ঐ মাটি যখন পূর্ণ শুষ্ক হয়, এমনকি আগুনে পোড়া মাটির তৈয়ার পাত্রের ন্যায় করাঘাতে খন্ খন্ করিয়া বাজিবার উপযোগী হয় তখন আল্লাহ তাআলার বিশেষ কুদরত বলে সেই শুষ্ক ও শক্ত মাটি দ্বারাই আদমের আকৃতি বা দেহ-কাঠামো তৈয়ার করা হয়। (বয়ানুল কোরআন)

এইসব তথ্যের ইঙ্গিত পবিত্র কোরআনেই রহিয়াছে- خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنَ

আল্লাহ তাআলা আদমকে মাটি হইতে তৈয়ার করিয়াছেন; অতপর "কুন হইয়া যাও" আদেশ করিয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে (মাটির তৈয়ার পুতুলটি) জীবন্ত হইয়া গেল। (পারা-৩; রুকু-১৪)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ـ وَالْجَانَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ـ

একটি বাস্তব তথ্য এই যে, (মানব জাতির আদি) মানুষটিকে আমি পয়দা করিয়াছিলাম খন্ খন্ বাজে এইরূপ মাটি হইতে, যাহা বিকৃত দুর্গন্ধময় কর্দমে তৈয়ার ছিল। এর পূর্বে আমি জ্বিন জাতিকে পয়দা করিয়াছিলাম। গরম বাতাসের ন্যায় ধুঁয়া-শূন্য স্বচ্ছ নির্মল আগুন হইতে। (পারা-১৪, রুকু-৩)

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ -

(মানব জাতির আদি) মানুষটিকে পয়দা করিয়াছিলেন খন্ খন্ শব্দকারক মাটি হইতে এবং জ্বিনকে পয়দা করিয়াছিলেন নির্মল অগ্নি হইতে। (পারা-২৭; রুকু-১১)

اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ -

আমি মানুষকে (তথা তাহাদের উৎপত্তির আসল গোড়াকে) সৃষ্টি করিয়াছি চটচটে আঠাল মাটি হইতে। (পা-২৩; রুকু-৫)

اَلَّذِىْ اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ - ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ -

এ সম্পর্কে আরো একটি সুস্পষ্ট আয়াত- তিনি (আল্লাহ তাআলা) স্বীয় সৃষ্ট বস্তুগুলিতে অতি সুন্দর রূপ দান করিয়াছেন এবং মানব জাতির সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন কর্দম হইতে (তথা প্রথম মানুষটিকে কর্দম দ্বারা তৈরী করিয়াছেন)। অতপর উহার নছল বা পরবর্তী বংশধরকে এক নিষ্কাশিত বস্তু তথা নিকৃষ্ট জলীয় পদার্থ (অর্থাৎ বীর্য) হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।(পারা-২১; পারা-১৪)

১৬২০। হাদীছ ঃ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ طُوْلُهٗ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهٗ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلٰى اُولٰئِكَ نَفَرٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ جُلُوْسٍ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّوْنَكَ فَاِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوْا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَزَادُوْهُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَكُلُّ مَنْ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلٰى صُوْرَةِ اٰدَمَ فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الْاٰنَ -

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ তাআলা আদম (আঃ)-কে তাঁহার নিজস্ব দৈহিক গঠন ও আকারের উপর সৃষ্টি করিয়াছিলেন- জন্মের প্রথম হইতেই) তাঁহার দৈর্ঘ বা দেহের উচ্চতা ছিল (বর্তমান সাধারণ মাপের) ষাট হাত। তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়া আল্লাহ তাআলা তথায় একত্রিত এক দল ফেরেশতার নিকটবর্তী যাইতে বলিলেন এবং তাঁহাদিগকে সালাম করিতে বলিলেন। আরও বলিলেন যে, তাঁহারা সালামের উত্তর কিরূপ প্রদান করেন তাহা আপনি লক্ষ্য করিবেন; ঐ উত্তরই আপনার এবং আপনার বংশধর, সন্তান-সন্ততির জন্য পারস্পরিক সালামের নিয়ম হইবে।

আদম (আঃ) ফেরেশতাগণের সন্নিকটে যাইয়া "আস্‌সালামু আলাইকুম" বলিলেন। ফেরেশতাগণ তদুত্তরে "ওয়াআলাইকাস্ সালামু ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ" বলিলেন। সালাম তথা শান্তির দোয়ার উত্তরে ফেরেশতাগণ সালাম তথা শান্তির দোয়া ভিন্ন বিশেষ রহমতের দোয়াও বর্ধিত করিলেন।

(হযরত সঃ বলেন,) আদম দেহের উচ্চতার আসল পরিমাপ ছিল ষাট হাত, (আদম সন্তানদের) যাহারা বেহেশতে প্রবেশ করিবেন তাঁহারাও তখন সেই আদি পরিমাপ ষাট হাত উচ্চতায়ই হইবেন। মধ্যবর্তী জাগতিক জীবনে আদম সন্তানদের দেহের দৈর্ঘ ধীরে ধীরে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া বর্তমান পরিমাপ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ আদম (আঃ) সম্পর্কে আলোচ্য হাদীছে বলা হইয়াছে যে, তাঁহাকে তাঁহার দৈহিক গঠন, পরিমাপ ও আকারের উপর সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য এই যে, সাধারণতঃ সৃষ্ট জীবসমূহের জন্ম পদ্ধতি হইল– অতিশয় ছোট ও ক্ষুদ্রাকারে জন্মলাভ করিয়া ধীরে ধীরে বড় হইতে থাকে এবং দীর্ঘকাল পর পূর্ণতা লাভ করে; কিন্তু আদম (আঃ)-এর জন্ম বৃত্তান্ত ছিল ভিন্ন রূপ। তিনি ষাট হাত দীর্ঘ ও সাত হাত প্রস্থ দৈহিক আকার লইয়া জন্ম লাভ করিয়াছিলেন; এই পার্থক্যের হেকমতও অতি সুস্পষ্ট। কারণ, সকল জীবই সঙ্কীর্ণ মাতৃগর্ভে বা ডিমের মধ্যে জন্ম লাভ করিয়া থাকে, পক্ষান্তরে আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি ছিল এইরূপে– خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ

আল্লাহ তাআলা আদম (আলাইহিস সালামের দেহ)কে মৃত্তিকা দ্বারা তৈয়ার করিয়া "কুন" (হইয়া যাও)" নির্দেশ দান করার সঙ্গে তিনি জীবন্ত রূপধারণ করিয়াছিলেন। (পারা– ৩; রুক– ১৪)

ষাট হাত দৈর্ঘ ছিল আদম জাতির আসল আকার, কিন্তু বৃক্ষের ফল-মূল যেরূপ প্রাথমিক আকারের তুলনায় ক্রমশই ক্ষুদ্র হইতে থাকে তদ্রূপ আদম সন্তানরাও ক্রমশই ক্ষুদ্রাকারে পরিণত হইয়াছে। অবশ্য আদম সন্তানগণ যখন স্বীয় আসল বাসস্থান বেহেশতে যাইবে, তখন তাহাদের দেহ আদি আকার ষাট হাত দৈর্ঘেরই হইবে।

যেসব আদম সন্তান দোযখী হইবে তাহাদের সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, দোযখের আযাব অত্যধিক পরিমাণে ভোগ করাইবার জন্য দোযখীদের দেহ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিরাট আকারের ন্যায় করিয়া দেওয়া হইবে। যেমন হাদীছে উল্লেখ আছে, তাহাদের এক একটি বিরাট দাঁত (আড়াই মাইল উঁচু মদীনার) ওহোদ পাহাড়ের ন্যায় বিরাট আকারের হইবে। উভয় স্কন্ধের মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব কয়েক মাইলের ব্যবধান হওয়া সম্পর্কেও হাদীছে উল্লেখ আছে।

সালাম সম্পর্কে শরীয়তের যে বিধান ও মুসলমানদের মধ্যে যে রীতি রেওয়াজ প্রচলিত আছে, উহার মূল উৎস এই হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য ফেরেশতাগণ আদম (আঃ)-কে সালামের উত্তরে "ওয়া আলাইকাস সালাম" বলিয়াছিলেন। عليك আলাইকা এবং عليكم আলাইকুম-এর পার্থক্য বিশেষ কোন তাৎপর্যপূর্ণ নহে। আরবী ব্যাকরণে ك কা" এবং كم কুম" একবচন ও বহুবচন; কিন্তু আরবী ব্যাকরণে ইহাও আছে যে, বহুবচনবোধক শব্দ كم কুম সম্মানার্থে একজনের জন্যও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আদম (আঃ) একজন ছিলেন, সেই সূত্রেই ফেরেশতাগণ একবচনের মূল শব্দ ك কা ব্যবহার করিয়াছিলেন; এইরূপ সালাম ও সালামের উত্তর প্রদান করা অশুদ্ধ নহে। অবশ্য প্রত্যেক মুসলমান সম্মানের পাত্র, এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক মুসলমানের সঙ্গে সর্বদাই কয়েকজন ফেরেশতা থাকেন, তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত থাকায় একজন মুসসলমানকে বহুবচন বোধক كم কুম" শব্দ দ্বারা সালাম ও সালামের উত্তর প্রদান করা শুদ্ধই বটে। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং ছাহাবাগণের মধ্যে উহার প্রচলনের আধিক্যও বিভিন্ন হাদীছে পরিলক্ষিত হয়। এই সূত্রেই كم কুম শব্দের দ্বারা সালামের উত্তরের সাধারণ রীতি প্রচলিত হইয়াছে।

ফেরেশতাগণ হযরত আদম (আঃ)-কে সালামের উত্তর وَرَحْمَةُ اللّٰهِ "ওয়ারাহমাতুল্লাহ" বাক্য অতিরিক্ত বলিয়াছেন। এ সম্পর্কে কোরআন-হাদীছেও কিছু বিবরণ বিদ্যমান আছে। কোরআন শরীফে আছে–

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوْهَا ـ

অর্থঃ "তোমাকে কেহ সালাম করিলে যে পরিমাণ ও যে দোয়ার দ্বারা তোমাকে সে সালাম করিয়াছে, তুমি তাহাকে তদপেক্ষা অধিক উত্তম দোয়ার দ্বারা বা অন্ততঃ এইরূপ দোয়ার দ্বারাই উত্তর দাও।" (পারা– ৫; রুকু– ৮)

এই আয়াতে অধিক দোয়ার দ্বারা উত্তর দেওয়াকেই উত্তম বলা হইয়াছে; ইহাতে সওয়াবও অধিক হইবে। এক হাদীছে আছে– একদা এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দরবারে আসিয়া "আচ্ছালামু আলাইকুম" বলিয়া সালাম করিল। হযরত (সঃ) তাহার সালামের উত্তর দিলেন এবং আগন্তুক হযরতের মজলিসে বসিল। হযরত (সঃ) বলিলেন, সে দশ নেকী লাভ করিয়াছে। অতপর আর এক ব্যক্তি আসিয়া "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" বলিয়া সালাম করিল। হযরত (সঃ) তাহার সম্পর্কে বলিলেন, এই ব্যক্তি বিশ নেকী লাভ করিয়াছে। অল্পক্ষণ পরেই আর এক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু" বলিয়া সালাম করিল। হযরত (সঃ) বলিলেন, এই ব্যক্তি ত্রিশ নেকী লাভ করিয়াছে। ইতিমধ্যে আর এক ব্যক্তি আসিয়া "অস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু ওয়া মাগফেরাতুহু" বলিয়া সালাম করিল। হযরত (সঃ) বলিলেন, এই ব্যক্তি চল্লিশ নেকী লাভ করিয়াছে। হযরত (সঃ) ইহাও বলিলেন, বেশী-কম নেকী লাভের তারতম্য এইরূপে হইয়া থাকে।

–(আবু দাউদ শরীফ)

নেকী লাভ করার জন্য উপরোল্লিখিত শব্দসমূহকে সালাম দানেও এবং সালামের উত্তর দানেও ব্যবহার করা যায়।

আদম (আঃ) ও ফেরেশতাদের প্রতিযোগিতা

ফেরেশতাদের সম্মুখে আদম সৃষ্টির প্রাথমিক আলোচনার সময় আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাগণকে এই বলিয়া আলোচনা ক্ষান্ত করিয়াছিলেন যে, "গোপন তথ্য যাহা আমি জানি তাহা তোমরা জান না।" সেই গোপন তথ্য এস্থলে এই যে, খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা তোমাদের নাই– তোমাদিগকে উহা দেওয়া হয় নাই; আদমের মধ্যে সেই যোগ্যতা প্রদান করা হইবে। অতএব, প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব আদমের দ্বারা সম্পন্ন হইবে, তোমাদের দ্বারা হইবে না।

আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি হওয়ার পর আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হইল আদম ও ফেরেশতা উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সেই গোপন তথ্য সর্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া দেওয়া; আল্লাহ তাআলা সেই ব্যবস্থাই করিলেন।

খেলাফত ও প্রতিনিধিত্বের জন্য দুইটি গুণের বিশেষ আবশ্যক হয়– (১) ওফাদারী ও ফর্মাবরদারী– অর্থাৎ নিষ্ঠার সহিত পূর্ণানুগত্য ও আজ্ঞা বহন। (২) দায়িত্ব পালন এবং কার্য সমাধানের যোগ্যতা ও উপযুক্ততা।

প্রথম গুণ তথা ওফাদারী ও ফর্মাবরদারী– আনুগত্য ও আজ্ঞা বহন– ইহার উৎস হইল আ'বদিয়ত বা আল্লাহর দাসত্ব; আ'বদিয়ত বা আল্লাহর দাসত্ব ফেরেশতাদের মধ্যে অতি মাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

দ্বিতীয় গুণটির উৎস হইল এলম তথা জ্ঞান বা বিদ্যা। এস্থলে যেহেতু রাব্বুল আ'লামীন– বিশ্ব জগতের পালনকর্তা আহকামুল হাকেমীন, সর্বাধিপতি বিধানকর্তা আল্লাহ তাআলার খেলাফত বা প্রতিনিধিত্ব এবং এই খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের জন্য এমন জাতি নির্বাচিত হইতে পারিবে, যে জাতি ব্যাপক এলম লাভ করিতে সক্ষম, যে জাতি বিশ্বব্যাপী সব কিছুর এলম বা জ্ঞান লাভের সামর্থ রাখে। এইরূপ জাতিই সৃষ্টি জগতের প্রতিটি জিনিসের উপর আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধিত্ব বজায় রাখিতে পারিবে।

এইরূপ ব্যাপক এলম বা জ্ঞান লাভ করার শক্তি বা সামর্থ্য সৃষ্টিগতভাবেই আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে দেন নাই। তাঁহাদের প্রত্যেকের এলম বা জ্ঞান সীমাবদ্ধ রহিয়াছে শুধু ঐ বস্তু ও কার্য সম্পর্কে, যাঁহার উপর যে বস্তু ও কার্যের ভার ন্যাস্ত করা হইয়াছে। যিনি পাহাড়ের ব্যবস্থাপক তাঁহার এলম ও জ্ঞান পাহাড় সম্পর্কে সীমাবদ্ধ, যিনি সৃষ্টির ব্যবস্থাপক বা তাঁহার জ্ঞান সৃষ্টি সম্পর্কে সীমাবদ্ধ, যিনি জীবের

মৃত্যু ঘটানো কার্যে নিয়োজিত তাঁহার এলম বা জ্ঞান সেই বিষয়েই সীমাবদ্ধ ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সীমাবদ্ধতায় তাঁহারা বাধ্য রহিয়াছেন ইচ্ছা করিলেও এই সীমা অতিক্রম করতঃ অন্য বিষয়ে এলম বা জ্ঞান লাভ করিতে তাঁহারা সক্ষম নহেন। এমনকি ঐ ধরনের এলম বা জ্ঞান তাঁহাদের সম্মুখে ছড়াইয়া দেওয়া হইলেও তাহা আয়ত্তে আনিতে তাঁহারা সক্ষমই হইবেন না। এই ক্ষমতা সামর্থ্য তাঁহাদের সৃষ্টিতেই রাখা হয় নাই। (لاَ عِلْمَ لَنَا اِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا)

পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা মানুষের সৃষ্টিতেই ব্যাপক এলম বা জ্ঞান লাভ করার এক সুপ্রশস্ত ক্ষমতা, সামর্থ্য ও গুণ রাখিয়া দিয়াছেন, যদ্দ্বারা তাহারা আকাশ হইতে পাতাল পর্যন্ত, এমনকি সুগভীর সমুদ্রের তলার মাটির নীচে কি আছে তাহার জ্ঞানও তাহারা লাভ করিয়াছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়া গিয়াছে, تحت البحر نار "সমুদ্রের তলদেশের নিম্নস্তরে অগ্নি রহিয়াছে।" তাঁহার পরবর্তী যুগের লোকগণ সমুদ্রের নীচে আগ্নেয়গিরি এবং আটলান্টিক মহাসগরের তলদেশে পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থের খনির সন্ধান লাভ করিয়াছে। সপ্ত আকাশের উর্ধ্ব দেশে কি আছে তাহার এলমও তাহারা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে হযরত (সঃ) আরশ, কুরসী, সেদরাতুল মোনতাহার খবর বাতলাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার উম্মতগণ কাশ্‌ফ ও এলহামের দ্বারা কত কিছুর খোঁজ লাভ করিয়াছেন! বিজ্ঞানের সাহায্যে উর্ধ্ব দেশীয় নিত্যনূতন স্তর ও গ্রহ-উপগ্রহ জয় করা হইতেছে।

মানুষ আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট জগতের প্রত্যেকটি জিনিসের শুধু এলম বা জ্ঞান লাভেই নহে, বরং প্রত্যেকটি বস্তুর বিস্তারিত বিবরণ দানেও সক্ষম ইয়াছে। ফেরেশতাদের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ তাহারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জ্বিন জাতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ তাহারা লিপিবদ্ধ করিয়াছে।* জল ও স্থলের, উর্ধ্ব ও নিম্নের হাতী হইতে বড় এবং পিপীলিকা হইতে ক্ষুদ্র প্রত্যেকটি জীবের শুধু পরিচয় ও বিবরণদানই নহে, বরং উহার গোশ্‌ত-পোশ্‌ত, অস্থি-মজ্জা এমনকি উহার রগ-রেশার প্রতিটি কণার বৈশিষ্ট্য এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও লিপিবদ্ধ করিয়াছে।* বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত এমনকি সমুদ্র বক্ষের প্রতিটি উদ্ভিদের খাল-বাকল, মূল-শিকড়, ফল-ফুল ইত্যাদির রং-রূপ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণও লিপিবদ্ধ করিয়াছে *। শুধু তাহাই নহে, বরং ঐ সবের দ্বারা সমস্ত জগতকে উপকৃত করত هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا "আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার সব বস্তুকে তোমাদের উপকারের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন" এর তাৎপর্যের বিকাশ সাধন করিয়াছে। আল্লাহ তাআলার এই ঘোষণা কার্যে পরিণত করার ময়দানে আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধিত্ব করিয়াছে ও করিতেছে।*

---

* "আ-কা-মুল মারজান" নামক একখানা আরবী পুস্তক এই বিষয়ে পাওয়া যায়।

* "হায়াতুল হায়ওয়ান" নামক কিতাবখানাকে এই বিষয়ে বিশ্বকোষ বলা যাইতে পারে। "আজায়েবুল মাখলুকাত" নামক আর একখানা কিতাবও এই সম্পর্কে পাওয়া যায়।

* হেকিমী কবিরাজী কিতাব ও বই-পুস্তক এই বিষয়ে অনেক বিদ্যমান রহিয়াছে।

* আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধিত্বের দুইটি বিভাগ– এক হইল জীবিকানির্বাহ ও জাগতিক আবশ্যক পূরণ বিষয়ক ব্যবস্থাপনার ব্যাপার। দ্বিতীয় হইল শরীয়ত তথা আল্লাহর নির্দেশাবলী বা আল্লাহ প্রদত্ত আইন-কানুন সারা বিশ্বে জারি করার ব্যাপার।

বলাবাহুল্য– খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের বাপারে দ্বিতীয় বিভাগটিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। দুনিয়াতে মানুষের প্রতিনিধিত্বের মধ্যেও এই শ্রেণীর বিষয়টিকেই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়া থাকে। কোন প্রতিনিধি মূল ক্ষমতাধিকারীর আদেশে অবজ্ঞা, উপেক্ষা বা অশ্রদ্ধা করিলে অথবা আদেশ বহন না করিলে বা স্বীয় মন মোতাবেক স্বেচ্ছাচারীরূপে কাজ করিলে বা অন্য কাহারও ইঙ্গিত-ইশারার পায়রবী করিলে সেই প্রতিনিধি বিদ্রোহী গণ্য হইবে এবং তাহার ভাগ্য গোরেফতারী ও জেল-হাজতে জড়াইয়া পড়িবে। আল্লাহ তাআলার সঙ্গে মানব জাতির সম্পর্কে ঠিক তদ্রূপই। অতএব, আল্লাহ তাআলার নির্দেশাবলী পালন ও তাঁহার আইন-কানুন প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে তাঁহার আসল খেলাফত বা প্রতিনিধিত্ব। অন্যথায় বিদ্রোহী প্রতিনিধি গণ্য হইয়া জেল-হাজত তথা জাহান্নামী হইতে হইবে। এই জন্যই আল্লাহর রসূল ও নায়েবেরসূলগণ এই বিভাগকেই অধিক গুরুত্ব দিয়া আসিয়াছেন।

সৃষ্টিগতভাবে মানুষের মধ্যে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক যে শক্তি সামর্থ্য রক্ষিত আছে, উল্লিখিত ব্যাপক এলম বা জ্ঞান উহারই পরিচয় ও প্রতিক্রিয়া। ফেরেশতাদের মধ্যে এই শক্তি সামর্থেরই অভাব। আল্লাহ তাআলা উভয়ের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এই ব্যবধানকে উদ্ভাসিত করারই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ব্যবস্থা এইরূপ করিয়াছিলেন যে, প্রথমতঃ আল্লাহ তাআলা সৃষ্ট জগতের সমস্ত বস্তুনিচয়ের বিস্তারিত তথ্য-জ্ঞান আদম ও ফেরেশতা উভয়ের সম্মুখে ছড়াইয়া দিলেন। আদমের মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে এই ধরনের এলম বা জ্ঞান আয়ত্তে আনিবার যে শক্তি সামর্থ্য ছিল, উহার সাহায্যে তিনি ঐ এলম বা জ্ঞানকে আহরণ ও সংরক্ষণ করিতে সক্ষম হইলেন। পক্ষান্তরে ফেরেশতাগণ সৃষ্টিগতভাবে ঐ শক্তি সামর্থ্য ক্যাপাসিটির অভাবে তাহা করিতে সক্ষম হইলেন না। তাহার পর আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাগণ ও আদমকে সমবেতভাবে উপস্থিত করিয়া ফেরেশতাগণের সম্মুখে ঐ বস্তুগুলি সব বা আংশিক রাখিলেন এবং পরীক্ষামূলকভাবে তাহাদিগকে ঐ সবের বিস্তারিত তথ্যের বিবরণ দানের আদেশ করিলেন। ফেরেশতাগণ তদুত্তরে নিজের অজ্ঞতা অক্ষমতাই তুলিয়া ধরিলেন এবং ঐ সবের কোন তথ্যই বাত্লাইতে পারিলেন না। অতপর আল্লাহ তাআলা ঐ আদেশই আদমের প্রতি করিলেন। আদম (আঃ) ব্যাপক এলম এবং জ্ঞান-গুণে আহরিত ও সঞ্চিত সমুদয় তথ্য সকলের সম্মুখে বর্ণনা করিতে সক্ষম হইলেন। তখন সর্বসমক্ষে আদমের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহ তাআলা স্বীয় পূর্ব উক্তির পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন, আমি পূর্বেই বলিয়াছিলাম, আসমান-যমীনের তথা সর্বপ্রকার গোপন যাহা তোমরা জান না, আমি সব অবগত আছি। উক্ত ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনের বর্ণনায় এইরূপ–

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ -

আর আল্লাহ তাআলা আদমকে সমস্ত বস্তুনিচয়ের এলম ও তথ্য-জ্ঞান (আয়ত্ত করার সামর্থ) দান করিলেন। অতপর তিনি ঐ বস্তুনিচয়কে ফেরেশতাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া বলিলেন, তোমরা এই সবের তথ্য বর্ণনা কর, যদি তোমরা তোমাদের ধারণা সঠিক মনে কর।

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا - اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ -

ফেরেশতাগণ বিনীত স্বরে আরজ করিলেন, হে প্রভু! তুমি পাক-পবিত্র (তোমার কার্য্যে দোষ-ত্রুটি থাকে না)" আমাদের মধ্যে যতটুকু এলম বা জ্ঞানের শক্তি-সামর্থ্য রাখিয়াছ তাহার অধিক জ্ঞান আমাদের নাই। তুমি সর্বজ্ঞ সুকৌশলী (প্রত্যেককে উহার উপযোগী শক্তি-সামর্থ দিয়া তৈয়ার করিয়াছ)।

আল্লাহ তাআলা আদমকে ঐ সবের তথ্য বিবরণ দানের আদেশ করিলেন। (আদম সব কিছুর তথ্যের বর্ণনা দিলেন।) যখন আদম বস্তুনিচয়ের তথ্য বাতলাইয়া দিলেন, তখন ফেরেশতাগণকে আল্লাহ বলিলেন, আমি কি তোমাদিগকে বলিয়াছিলাম না যে, আমি আসমান-যমীনের তথা সর্বপ্রকার গোপন তথ্য অবগত আছি এবং তোমরা যাহা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ সবই আমি জানি। (সূরা বাকারাহঃ পারা– ১ রুকু– ৪)

قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّآ اَنْبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ -

প্রতিযোগিতার ফলাফলে ফেরেশতাগণকে আদমের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের আদেশ ঃ

প্রতিযোগিতা ও পরীক্ষার মাধ্যমে আদমের যোগ্যতা প্রমাণিত ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। তিনিই আল্লাহ তাআলার খলীফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন এবং এই খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব সম্পাদনে

ফেরেশতাগণ হইবেন আদমের সহযোগী। অতএব, আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাগণকে আদমের প্রতি বিশেষ কায়দায় সালাম বা শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠানের আদেশ করিলেন। যাহাকে Guard of Honour-এর সমতুল্য বলা যাইতে পারে।

প্রকাশ থাকে যে, জ্বিন জাতীয় ইবলীস তখন ফেরেশতাদের সঙ্গে একত্রেই বসবাস করিয়া থাকিত; ফেরেশতাদের প্রতি যে আদেশ হইল, স্বাভাবিকরূপে বা বিশেষ নির্দেশবলে ইবলীসও সেই আদেশের আওতাভুক্ত হইল। এই সম্পর্কে স্পষ্ট ইঙ্গিত পারা-৮; রুকু-৯-এর مَا مَنَعَكَ اَلاَّ تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ আয়াতে রহিয়াছে, অনুবাদ সম্মুখে আসিতেছে।

আল্লাহ তাআলা তাঁহাদিগকে আদেশ করিলেন আদমকে কেবলা সাব্যস্তপূর্বক তাঁহার দিকে সেজদা করার। ফেরেশতাগণ তৎক্ষণাৎ সকলেই আল্লাহ তাআলার আদেশকৃত সেজদা আদায় করিয়া দিলেন, কিন্তু ইবলীস তাহা করিল না। ফলে সে আল্লাহ তাআলার অভিশপ্ত হইল। পবিত্র কোরআনে এই বিবরণের আলোচনা নিম্নরূপ-

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ـ

আর একটি ঘটনা- আমি যখন আদেশ করিয়াছিলাম ফেরেশতাগণকে, আদমের দিকে সেজদা কর। তাহারা সকলেই সেজদা করিয়াছিল, ইবলীস (আদিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও) অহঙ্কারে মাতিয়া সেজদা করিতে অস্বীকার করিয়াছিল এবং সে বিদ্রোহী কাফেরে পরিণত হইয়াছিল। (সূরা বাকারা ঃ পারা- ১; রুকু- ৪)

ইবলীসের পরিচয়

ইবলীস বা শয়তান সম্পর্কে পূর্বেই বলা হইয়ছে, সে মূলতঃ জ্বিন জাতি হইতে ছিল। ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে সে ফেরেশতাদের সংস্রব লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল* এবং সে একজন বিশিষ্ট আবেদ-ইবাদতকারী হইয়া তাঁহাদের মধ্যে বসবাস করিতেছিল। অবশেষে সে আদমের দিকে সেজদা করার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার আদেশ অমান্য করিয়া চিরতরে ধিকৃত কাফের বিদ্রোহী ও অভিশপ্ত হইয়া গিয়াছিল এবং চিরকাল এইরূপ থাকিবে বলিয়া আলেমুল গায়েব আল্লাহ তাআলার ঘোষণায় প্রমাণিত হইয়াছে। পবিত্র কোরআনে তাহার বিবরণ-

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ـ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلاً ـ

যখন আমি ফেরেশতাগণকে আদেশ করিয়াছিলাম, আদমের দিকে সেজদা কর, তাহারা সকলেই সেজদা করিয়াছিল, ইবলীস সেজদা করে নাই; সে ছিল জ্বিন জাতীয় (সে আগুনের তৈয়ারী হওয়ায় নিজেকে বড় মনে করিয়াছিল;) যদ্দরুন সে স্বীয় প্রভু পরওয়ারদেগারের আদেশ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল (এবং কাফের মরদুদ হইয়াছে।) হে মানব! তোমরা কি ঐরূপ মরদুদকে এবং উহার চেলাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে আমার বিনিময়ে- আমাকে ছাড়িয়া? অথচ তাহারা তোমাদের পরম শত্রু! স্বৈরাচারী জালেমদের এই বিনিময় কতই না জঘন্য। (পারা- ১৫; রুকু- ১৯)

---

*মানব জাতির পূর্বে এই ভূমন্ডলে জ্বিন জাতির সাধারণ বসবাস ছিল। নাফরমানীর আধিক্যের দরুন আল্লাহর গজবস্বরূপ ফেরেশতাদের দ্বারা তাহারা ধ্বংস এবং ভাল আবাসস্থল হইতে বন-জঙ্গলে বিতাড়িত হয়। ঐ সময় ইবলীস শিশু বয়সের ছিল; ফেরেশতাগণ তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। এইভাবে ইবলীস ফেরেশতাদের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয়।

ইবলীসের দৌরাত্ম্য ও পরওয়ারদেগারের সঙ্গে বিতর্ক

ইবলীস আদমের দিকে সেজদা করার আদেশ লঙ্ঘন করিলে অসীম ধৈর্যশীল, সহিষ্ণু দয়াময় আল্লাহ তাআলা কৈফিয়ত তলব করিলেন, আমার আদেশ সত্ত্বেও সেজদা করা হইতে বিরত থাকার জন্য তোর পক্ষে কি কারণ থাকিতে পারে? তদুত্তরে ইবলীস কারণস্বরূপ এই ব্যাখ্যা দিল যে, আমি আদমকে ঐরূপে সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদন কেন করিব? আমি ত আদম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অধিক মর্যাদাবান। আদম আমার তুলনায় নিকৃষ্ট। কারণ, আপনি আমাকে আগুন হইতে এবং আদমকে মাটি বা কর্দম হইতে তৈয়ার করিয়াছেন। আগুনের গতি ঊর্ধ্বে, মাটির গতি নিম্নে। আমার প্রতি আদমকে শ্রদ্ধা-সম্মান প্রদর্শন ও শ্রদ্ধা আদেশ অযৌক্তিক।

বলাবাহুল্য, শয়তানের এই যুক্তি ছিল অসার। কারণ মাটির উপর আগুনের শ্রেষ্ঠত্বের কোন প্রমাণ নাই। গতির ব্যবধান শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হইতে পারে না। স্বর্ণ-রৌপ্য, হিরা-জওয়াহেরাতের ন্যায় ভারী মূল্যবান বস্তুর গতি নিম্ন দিকে হইয়া থাকে এবং হালকা তুলার ন্যায় বস্তুর গতি ঊর্ধমুখী হইয়া থাকে।

ইবলীসের বক্তব্যের অযৌক্তিকতা এস্থলে ইবলীসের নিজ উক্তির মধ্যেই বিদ্যমান ছিল। তাহার উক্তিতেই স্বীকৃতি রহিয়াছে যে, তাহার সৃষ্টিকর্তা হইলেন আল্লাহ তাআলা। অতএব, আল্লাহ তাআলার আদেশ পালনের মোকাবিলায় কোন যুক্তির অবতারণাই অযৌক্তিক। আল্লাহর তরফ হইতে কৈফিয়ত তলবে **اذ امرتك** "আমার আদেশ সত্ত্বেও" বলিয়া এই বিষয়টিকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছিল। ইবলীস ভুল যুক্তির পিছনে পড়িয়া স্বীয় প্রভু আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করিল। আল্লাহ তাআলা তাহাকে স্বীয় নৈকট্য ও সন্তুষ্টিভাজনদের স্থান বেহেশত হইতে তাড়াইয়া দিলেন, সে চিরতরে ধিকৃত অভিশপ্ত হইয়া গেল।

আদমের প্রতি ইবলীসের অন্তরে ভয়ানক ক্রোধ সৃষ্টি হইল। সে প্রতিশোধ গ্রহণে উন্মাদ হইয়া গেল। কিন্তু সেও জানিত, হায়াত-মওত আল্লাহর হাতে; তিনি যদি আমাকে এই মুহূর্তে মারিয়া ফেলেন তবে প্রতিশোধ গ্রহণের বাড়াবাড়ি অবান্তর হইবে। অতএব, সে প্রথমে আল্লাহ তাআলার নিকট স্বীয় জীবন সম্পর্কে একটা গ্যারান্টি বা অবকাশ প্রার্থনা করিল, আমি যেন জগতের আয়ুর সর্বশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জীবিত থাকি। সর্বাধিপতি আল্লাহ তাআলা প্রবল প্রতাপের সহিত তাহাকে বলিয়া দিলেন, "যা- তোকে দীর্ঘ আয়ুর অবকাশ দেওয়া হইল।"

ইবলীস মৃত্যুর দিক হইতে নিশ্চিত হইয়া স্বীয় ক্রোধ প্রকাশে বলিল, যেহেতু আমি আদমের দরুন সর্বহারা হইলাম, তাই আমিও শুধু আদমকে নহে, তাহার সমুদয় নছলকে ক্ষতি ও ধ্বংসে ফেলিব, তাহাদের জন্য সঠিক পথ রুদ্ধ করিব এবং কু-পথে পরিচালিত করিবার জন্য তাহাদিগকে চতুর্দিক হইতে ঘেরাও করিব।

সর্বাধিপতি পরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলা প্রবল প্রতাপের সহিত ধিক্কার দিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন এবং ঘোষণা দিলেন যে, তুই এবং তোর অনুসারীদের দ্বারা আমি জাহান্নাম ভর্তি করিব। এই বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ-

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيْسَ ـ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ـ قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ـ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ـ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ـ

একটি বিশেষ তথ্য- আমি তোমাদের (আদি পিতা আদম)-কে তৈয়ার করিয়াছিলাম, তাঁহাকে গঠন দান করিয়াছিলাম, তারপর ফেরেশতাগণকে আদেশ করিয়াছিলাম আদমের দিকে সেজদা কর ফেরেশতাগণ সকলে

সেজদা করিয়াছিল, ইবলীস সেজদা করে নাই। আল্লাহ কৈফিয়ত তলব করিলেন, আমার আদেশ সত্ত্বেও কেন তুই সেজদা হইতে বিরত থাকিলি? সে বলিল, আমি আদম হইতে শ্রেষ্ঠ; আমাকে আগুন হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আদমকে কর্দম হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ـ قَالَ اَنْظِرْنِىْ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ـ قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ـ

আল্লাহ তাআলা তাহাকে ধিক্কারের সহিত আদেশ করিলেন, এখান হইতে তুই বাহির হইয়া যা, এখানে থাকিয়া অহঙ্কার দেখান তোর জন্য ভাল হইবে না, তুই বাহির হইয়া যা, তুই চিরতরে ধিকৃত ও অপদস্থ। ইবলীস বলিল, আমাকে অবকাশ দান করুন কেয়ামতের দিন পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকার। আল্লাহ তাআলা বলিলেন, তোকে সেই অবকাশ দেওয়া গেল।

قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ وَلَاتَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ـ

ইবলীস বলিল, আদমের দরুন আমার উপর আপনার অভিশাপ বর্তিল এবং আমি ভ্রষ্ট সাব্যস্ত হইয়া গেলাম। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি আপনার সঠিক পথ আদম ও আদম সন্তানদের জন্য রুদ্ধ করার চেষ্টা করিব। আমি তাহাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, ডান, বাম দিক হইতে ঘেরাও করিয়া তাহাদিগকে বিপথগামী করার চেষ্টা করিব এবং আপনি তাহাদের অধিকাংশকে অকৃতজ্ঞ পাইবেন।

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ـ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ ـ

আল্লাহ তাআলা প্রবল প্রতাপের সহিত তাহাকে আদেশ করিলেন, এখান হইতে তুই ধিকৃত ও অভিশপ্ত অবস্থায় বাহির হইয়া যা। ইহা আমার সুনিশ্চিত ঘোষণা যে, (যাহার ইচ্ছা সে তোর অনুসারী হউক;) নিশ্চয় আমি তোদের সকলকে দিয়া দোযখ ভর্তি করিব। (সূরা আ'রাফ পারা– ৮; রুকু– ৯)

فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ اِلَّا اِبْلِيْسَ ـ اَبٰى اَنْ يَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ـ قَالَ يَا اِبْلِيْسُ مَالَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ـ

আল্লাহর আদেশ মতে ফেরেশতাগণ সকলে সমবেতভাবে সেজদা করিল, ইবলীস তাহা করিল না; সে সেজদাকারীদের দলভুক্ত হইতে অস্বীকার করিল। আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ইবলীস! তুই কেন সেজদাকারীদের সঙ্গে সেজদা করিলি না?

قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ـ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ـ وَاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ـ

ইবলীস বলিল, আপনি পচা দুর্গন্ধময় কর্দমে তৈয়ার শুষ্ক ঠন ঠন শব্দকারক মাটি হইতে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন– তাহার দিকে সেজদা (করিয়া তাহাকে সম্মান প্রদর্শন) করিতে আমি মোটেই প্রস্তুত নহি। (তাহার এই উক্তির উপর) আল্লাহ তাআলা বলিলেন, তবে তুই এখান হইতে বাহির হইয়া যা, তোর প্রতি চিরতরে ধিক্কার এবং তোর উপর কেয়ামত পর্যন্ত অভিশাপ রহিল।

قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِىْ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ـ قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ـ اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ـ

ইবলীস বলিল হে, পরওয়ারদেগার! তবে আমাকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকার অবকাশ দিন। আল্লাহ বলিলেন, নিশ্চয় তোকে এক নির্ধারিত (তথা মহাপ্রলয়ের) দিনের তারিখ পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া গেল।

قَالَ رَبِّ بِمَا اَغْوَيْتَنِىْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ - اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ -

ইবলীস বলিল, হে পরওয়ারদেগার। যেহেতু আদমের দরুনই আমাকে ভ্রষ্ট সাব্যস্ত করিলেন, অতএব আমি আদম জাতির (ক্ষতি সাধনে লাগিলাম–) তাহাদের দৃষ্টিতে কুকর্ম ও নাফরমানীর কার্যকে চাকচিক্যময় মনোরম করিয়া দেখাইব এবং তাহাদের ভ্রষ্ট করিব। অবশ্য তাহাদের মধ্য হইতে আপনার খাঁটি বান্দাগণ বাঁচিতে পারিবেন।

قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيْمٌ اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ - وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ - لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ - لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ -

আল্লাহ তাআলা বলিলেন, আমার খাঁটি বান্দা হওয়াই একমাত্র সোজা পথ, যে পথ পথিককে আমা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়; আমার এইরূপ বান্দাদের উপর তোর কোন প্রভাব চলিবে না। অবশ্য যেসব ভ্রষ্ট তোর অনুসারী হইবে তাহাদেরই তুই ক্ষতি সাধন করিতে পারিবি। নিশ্চয় তোর অনুসারী দলের সকলের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত রহিয়াছে, যাহার সাতটি তব্কা; সাত তব্কার জন্য সাতটি গেট রহিয়াছে। তোর দলের লোকগুলি সাতটি গেটের জন্য সাত ভাগে বিভক্ত হইবে; প্রত্যেক গেটের জন্য এক ভাগ নির্দিষ্ট থাকিবে, তাহারা ঐ গেটেই প্রবেশ করিবে। (পারা– ১৪; রুকু– ৩)

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيْسَ - قَالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا - قَالَ اَرَاَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗ اِلَّا قَلِيْلًا -

তখনকার ঘটনা স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাগণকে আদেশ করিয়াছিলাম, আদমের প্রতি সেজদা কর; সেমতে তাহারা করিল, ইবলীস সেজদা করিল না। সে বলিল, আপনি যাহাকে কর্দম হইতে পয়দা করিয়াছেন, তাহার প্রতি আমি সেজদা করিব? (আল্লাহর আদেশ অমান্যে ইবলীস অভিশপ্ত হইল।) সে বলিল, দেখুন ত সেই ব্যক্তিকে যাহাকে আপনি আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন (তাহার শ্রেষ্ঠত্বের কি আছে? আচ্ছা, যাক–) যদি আপনি আমাকে কেয়ামত পর্যন্ত আয়ু দান করেন, তবে আমি এই আদমের সন্তানদের অল্প সংখ্যক ছাড়া অধিকাংশকে আয়ত্তে আনিয়া নিব।

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُوْرًا - وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ - وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا - اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ - وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا -

আল্লাহ বলিলেন, তুই বাহির হইয়া যা। আদম সন্তানদের যে কেহ তোর অনুসারী হইবে, নিশ্চয় জাহান্নাম হইবে তোর এবং তাহাদের উপযুক্ত প্রতিফল আর তোর দলীয় চেলা-বেলা, লোক-লস্কর দ্বারা এবং রাগ-রাগিনী, গান ও বাদ্য-বাজনা ইত্যাদি সুরের আকর্ষণ দ্বারা তোর শক্তি পরিমাণ আদম জাতিকে বিপথগামী করার চেষ্টা চালাইয়া যা। আর তাহাদের ধন-সম্পদ, আওলাদ-ফরজন্দকেও এই কাজে তোর সহায়ক বানাইয়া নে এবং তাহাদিগকে (আদম জাতিকে) নানা প্রলোভন দেখা (সব সুযোগাই আমি তোকে দিয়া দিলাম)। শয়তানের সব প্রলোভনই ধোঁকা ও ফাঁকি। যাহারা খাঁটিভাবে আমার বান্দা হইবে তাহাদের উপর তোর কোন শক্তিই থাকিবে না। প্রভু-পরওয়ারদেগার তাহাদের পক্ষে কার্য সমাধানকারীরূপে যথেষ্ট হইবেন। (সূরা বনী ইসরাঈলঃ পারা-১৫, রুকু-৭)

فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ - اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ - اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ -

(আল্লাহ তাআলার) আদেশ মতে ফেরেশতাগণ সকলে সমবেতভাবে সেজদা করিলেন, ইবলীস সেজদা করিল না। সে অহঙ্কার করিল এবং কাফেরে পরিণত হইল।

قَالَ يٰۤاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىْ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ

আল্লাহ কৈফিয়ত তলব করিলেন, হে ইবলীস! তোকে কিসে বাধা দিল ঐ জিনিসের দিকে সেজদা করিতে যাহাকে আমার হাতে (বিশেষ গুণ-গরিমায়) গড়িয়াছি? ইহা তোর অহঙ্কার মাত্র, না-(তোর ধারণাই এই যে,) তুই বড়?

قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ - خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ -

ইবলীস উত্তর করিল, বস্তুতঃ আমি আদম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; আমাকে আপনি অগ্নি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, আর তাহাকে কর্দম হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ - وَاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِىْۤ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ -

আল্লাহ তাআলা তাহাকে বাহির হইয়া যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং চির ধিকৃত বলিয়া ঘোষণা করিলেন। আরও ঘোষণা করিলেন, কেয়ামত পর্যন্ত তথা চিরকাল তোর উপর আমার অভিশাপ থাকিবে।

قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِىْۤ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ - قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ - اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ -

ইবলীস বলিল, হে পরওয়ারদেগার! তবে আমাকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ তাআলা বলিলেন আচ্ছা– তোকে বাঁচিয়া থাকার অবকাশ দেওয়া হইল নির্দিষ্ট দিনের তারিখ (তথা দুনিয়ার শেষ দিন) পর্যন্ত।

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ - اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ - قَالَ فَالْحَقُّ - وَالْحَقَّ اَقُوْلُ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ -

ইবলীস বলিল, হে পরওয়ারদেগার! তোমার ইজ্জতের কসম খাইয়া বলিতেছি, এই আদম জাতির সকলকে আমি পথভ্রষ্ট করিয়া ছাড়িব, অবশ্য তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা খাঁটি হইবে তাহারা ব্যতীত। আল্লাহ তাআলা বলিলেন, একটি সুনির্দিষ্ট বাস্তব ঘোষণা এবং বাস্তবই আমি বলি; নিশ্চয় আমি জাহান্নাম পূর্ণ

করিয়া দিব তোকে এবং তোর অনুসারী সকলকে দিয়া। (সূরা সোয়াদঃ পারা-২৩; রুক-১৪)

হযরত হাওয়ার সৃষ্টি

শয়তান বিতাড়িত হইল, হযরত আদম (আঃ) বেহেশতে বসবাস করিবেন, কিন্তু তথায় তাঁহার কোন নিজ জাতীয় সঙ্গী নাই; আল্লাহ তাআলা তাহার এই অভাব দূর করার ব্যবস্থা করিলেন। একদা হযরত আদম নিদ্রামগ্ন, আল্লাহ তাআলা নিজ কুদরতবলে আদমের পাঁজরের একখানা হাড় হইতে হাওয়াকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে আদমের চির সঙ্গিনী বানাইলেন, যেন আদম তাঁহার সঙ্গ লাভে শান্তি ও সুখভোগী হইতে পারেন। অন্তরের ছাউনি পাঁজরের হাড়, তাই হাওয়াকে পাঁজরের হাড় হইতে বানাইলেন যেন উভয়ের মধ্যে আন্তরিক ভালবাসা জন্মে। এই সম্পর্কে কোরআনে বিভিন্ন বিবরণ রহিয়াছে–

يَآيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَآءً -

হে মানব! তোমরা সেই মহান প্রভু পরওয়ারদেগারের ভয়-ভক্তি অবলম্বন কর, যিনি তোমাদিগকে একটি ব্যক্তি হইতে পয়দা করিয়াছেন। প্রথমে ঐ ব্যক্তি হইতেই তাহার জোড়া পয়দা করিয়াছেন, অতপর উভয় হইতে নরনারী ভূপৃষ্ঠে ছড়াইয়াছেন। (সূরা নেসাঃ পারা-৪; রুকু-১)

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا -

আল্লাহ তাআলা এত বড় শক্তিমান যে, তিনি তোমাদিগকে একজন হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহার হইতেই তাহার জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন; যেন সে স্বীয় জোড়ার সঙ্গ লাভে সুখ-শান্তি উপভোগ করিতে পারে। (পারা ৯ রুকু ১৪)

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا -

আল্লাহ তোমাদিগকে একজন হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। (তাহাকে সরাসরি কুদরতের দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন) পরে তাহার হইতেই তাহার জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন। (অতপর তাহাদের হইতে তাহাদের বংশধর সৃষ্টি করিয়াছেন।) (সূরা যুমার ঃ পারা-২৩; রুকু-১৫)

মা হাওয়া (আঃ) পাঁজরের হাড় হইতে সৃষ্টি– এই মর্মে বোখারী ও মুসলিম শরীফে হাদীছ বর্ণিত আছে। উক্ত হাদীছে এই ইঙ্গিতও রহিয়াছে যে, পাঁজরের সর্বঊর্ধ্বের হাড়টি– যাহা অধিক বাঁকা হয়, উহা হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে। তফসীরকারগণ বাম পাশের হাড়ের কথা বলিয়াছেন। পুরুষের উদরে সন্তান জন্মের অবকাশ সৃষ্টিগতভাবেই নাই, তাই আদমের হাড় হইতে উপাদান গ্রহণপূর্বক হাওয়াকে উহা দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে। পুরুষের বাম পাশে পাঁজরের একটি হাড় কম–এই কিংবদন্তী অবাস্তব; হাড় ব্যয় করা হয় নাই, তাহা হইতে উপাদান গ্রহণ করা হইয়াছে।

আদম ও হাওয়া উভয়ের বেহেশতে বসবাস

হযরত হাওয়ার সৃষ্টির দ্বারা আল্লাহ তাআলা হযরত আদমের অবশিষ্ট অভাব পূরণপূর্বক উভয়কে বলিয়া দিলেন, তোমরা সুখে-স্বচ্ছন্দে বেহেশতে বসবাস কর এবং বেহশতের ফল-ফলারি অবাধে ইচ্ছানুরূপ উপভোগ করিয়া যাও।

ইহা একটি সাধারণ কথা। বাগানে ও বাড়ীতে বিভিন্ন উদ্দেশে বিভিন্ন বৃক্ষ রাখা হয়– কোনটা ফল খাইবার জন্য, কোনটা ফুলের জন্য, কোনটা শুধু শোভার জন্য ইত্যাদি। এমনকি মাদার গাছ, জিকা গাছ, ঝাউ গাছ, নিম গাছ ইত্যাদিও বাড়ীতে, বাগানে রাখা হয়। যে গাছের ফল-ফুল শোভা-সৌন্দর্য্য কিছুই নাই বা যে গাছের শোভা আছে কিন্তু ফুলও ভাল নহে, ফলও ভাল নহে বা যে গাছের ফল আছে ফুল নাই বা যে গাছের ফুল আছে ফল নাই অথবা আছে, কিন্তু ভীষণ তিক্ত, দুর্গন্ধময়, এই ধরনের নানারূপ গাছপালাও বাড়ীতে বা বাগানে রাখা হয় বিভিন্ন উদ্দেশে।

আল্লাহ্ তাআলা আদম ও হাওয়াকে বেহেশতে থাকিতে দিয়া এক বিশেষ উদ্দেশে (যাহার বিবরণ পরে আসিবে) তথায় তখন এমন একটি গাছও রাখিয়া দিলেন, যাহার ফল ভক্ষণের তাছির বেহেশতী জিন্দেগীর পক্ষে ক্ষতিকারক, বরং বিপরীত। ঐ ফল খাইলে বেহেশতের পোশাক শরীরে থাকিবে না, ঘৃণাময় হাজতের উদ্বেগ হইবে, যাহা দূর করার ব্যবস্থা বেহেশতে নাই– যেমন পায়খানা পেশাবখানা। ঐ ফল ভক্ষণে বেহেশতী জীবন এইভাবে পর্যুদস্ত হইবে।

আল্লাহ তাআলা হযরত আদম ও হাওয়াকে বলিয়া দিলেন, তোমরা বেহেশতে অবাধে যে কোন গাছের যে কোন পরিমাণ ফল-ফলারি খাইতে পারিবে, কিন্তু ঐ বিশেষ বৃক্ষটির ধারে যাইবে না, উহার ফল খাইলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আর স্মরণ রাখিবে, শয়তান তোমাদের পরম শত্রু, সে তোমাদের ক্ষতির চেষ্টায় লাগিয়া আছে। পবিত্র কোরআনে উক্ত বিবরণী লক্ষ্য করুন–

وَقُلْنَا يَـٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ـ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

আমি বলিয়া দিয়াছিলাম, হে আদম! তুমি এবং তোমার সহধর্মিনী উভয়ে বেহেশতের মধ্যে বসবাস করিতে থাক* এবং তোমরা বেহেশতের মধ্যে অবাধে খাইতে পার নিজেদের ইচ্ছাধীন। কিন্তু ঐ বিশেষ বৃক্ষটির ধারেও যাইও না, অন্যথায় তোমরা অন্যায়কারী–নিজেদের ক্ষতিসাধনকারী সাব্যস্ত হইয়া যাইবে।

(সূরা বাকারাঃ পারা-১; রুকু-৪)

---

* হযরত আদম ও হাওয়াকে আল্লাহ তাআলা "জান্নাতে" অবস্থান করাইয়াছিলেন। "জান্নাত" বলিতে সাধারণতঃ বেহেশত বুঝায়, অবশ্য "জান্নাত" শব্দটির আভিধানিক অর্থ দৃষ্টে যেকোন উদ্যান, বাগ-বাগিচা ও কাননকেই বলা যাইতে পারে।

একদল লোক "জান্নাত" শব্দের আভিধানিক অর্থের প্রশস্ততার সুযোগ গ্রহণ করিয়া আলোচ্য ঘটনার এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, হযরত আদম ও হাওয়াকে যে জান্নাতে রাখা হইয়াছিল উহা সর্বজনবিদিত বেহেশত নহে, বরং ভূ-পৃষ্ঠস্থ কোন এক বিশেষ কানন ও সুরম্য বাগিচা ছিল। এই মতামতের উপর কোনই প্রমাণ নাই। বস্তুতঃ এই মতটি ভ্রষ্ট মো'তাযেলা ফের্কার মতামত (রুহুল মাআনী ১, ২৩৩ দ্রঃ)।

এতদ্ভিন্ন এই মতামতের আসল হইল খৃষ্ঠানদের সংকলিত ও বিকৃত বাইবেল। উহাতে আছে– "৮, আর সদাভক্ত ঈশ্বর পূর্ব দিকে এদনে এক উদ্যান প্রস্তুত করিলেন এবং সেই স্থানে আপনার নির্মিত ঐ মনুষ্যকে রাখিলেন।"

–(বাইবেল– আদি পুস্তক পৃষ্ঠা ৩)

বিশিষ্ট তফসীরকারগণের মতামত ইহাই যে, এস্থলে "জান্নাত" বলিয়া সর্বজনবিদিত বেহেশতকেই উদ্দেশ করা হইয়াছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বহু আয়াতে একটি বিশেষ প্রমাণও বিদ্যমান আছে যে, "জান্নাত" শব্দটি "আ-ল" অব্যয়ের বাহক হইয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব, এস্থানে স্বেচ্ছাধীনভাবে উহার অর্থ গ্রহণ করা অবৈধ। এস্থলে বাধ্যতামূলকভাবে জান্নাতের সর্বজবিদিত বা পূর্ব বর্ণিত অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। জান্নাতের সর্ববিদিত অর্থ বেহেশত এবং আয়াতের পূর্বে সেই সর্বজনবিদিত বেহেশতেরই উল্লেখ এবং আলোচনা হইয়াছে। ভূ-পৃষ্ঠস্থ কোন কানন বা বাগিচার উল্লেখ পূর্বে কোথাও হয় নাই।

এদদ্ভিন্ন বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত দুইটি সহীহ্ হাদীছ এ সম্পর্কে স্পষ্ট প্রমাণ। প্রথমটি হইল– বরযখী জগতে হযরত মূসা ও আদমের মধ্যে যে প্রীতি ও সৌজন্যমূলক একটা বিতর্কালাপ হইয়াছিল; সেই হাদীছে ঐ বিতর্কেরই বিবরণ রহিয়াছে। সেই হাদীছে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত মূসার যে উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে, হযরত আদম সর্বজনবিদিত বেহেশতেই অবস্থানরত ছিলেন। আল্লাহ তাআলার আদেশের বিপরীত কার্যের দরুন তথা হইতে বহিস্কৃত হইয়াছিলেন।

এই ধরনের বিবরণ সূরা আ'রাফ–৮ পারা, ১ রুকুর মধ্যেও আছে।

فَقُلْنَا يَٰٓادَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰٓ -

আমি আদমকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম যে, ইবলীস তোমার এবং তোমার জীবনসঙ্গিনীর পক্ষে পরম শত্রু। সর্বদা সতর্ক থাকিও, সে যেন চক্রান্ত করিয়া তোমাদেরকে এই বেহেশত হইতে বহিষ্কার করিতে না পারে, অন্যথায় তোমরা বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িবে।

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ - وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ -

বেহেশতে সব রকম সুব্যবস্থাই রহিয়াছে– এখানে তোমাদের ক্ষুধা পাইতে হইবে না, বস্ত্রহীন থাকিতে হইবে না* এখানে তোমরা পিপাসাতুর হইবে না, রৌদ্রের কষ্ট ভোগ করিবে না। (পারা-১৬; রুকু-১৬)

ইবলিস কর্তৃক ও হাওয়াকে প্রতারিত করার ঘটনা

হযরত আদম ও হাওয়া বেহেশতের মধ্যে পরম সুখ-শান্তির জীবন যাপন করিতে ছিলেন। আল্লাহ তাআলার আদেশ বিরোধী কাজ করার আদৌ কোন কল্পনা তাঁহাদের দেলের কোন নিভৃত কোনেও ছিল না। ইবলীস তাঁহাদের শত্রুতায় পূর্ব হইতেই লাগিয়াছিল। সে ইহাই ভবিল ও স্থির করিল যে, তাঁহাদেরকে আল্লাহর আদেশ বিরোধী কাজ করাইতে পারিলেই তাঁহারা এই সুখ-শান্তিময় বেহেশত হইতে বিতাড়িত হইবেন। ইবলীস তদবীরে লাগিয়া গেল-কিরূপে আদম ও হাওয়াকে আল্লাহর আদেশ বিরোধী কাজে লিপ্ত করান যায়।

বেহেশতের মধ্যে আদম ও হাওয়ার প্রতি এই একটি আদেশ ছিল যে, তোমরা ঐ বিশেষ বৃক্ষের ফল খাইও না– উহার কাছেও যাইও না। শয়তান এই পথেই স্বীয় মনোবাঞ্ছা পূরণের সুযোগ লাভে সচেষ্ট হইল। শয়তান বেহেশত হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল, সে তথায় বসবাস করিতে পারিত না, কিন্তু সাধারণ

দ্বিতীয় হাদীছটি তদ্রূপই বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে উল্লিখিত শাফাআ'তের হাদীছ– হাশরের ময়দানে সমস্ত লোক যখন বিচলিত অবস্থায় শাফাআ'ত বা সুপারিশের জন্য হযরত আদমের নিকট উপস্থিত হইবে, তখন আদম (আঃ) তাহদের সম্মুখে যে উক্তি করিবেন তাহার বিবরণ সেই হাদীছে আছে, উহা দ্বারাও ঐ কথাই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়।

বলিতে দুঃখ হয় যে, একজন সুপণ্ডিত তথাকথিত তফসীরুল কোরআনে আলোচ্য বিষয়বস্তুটির সমালোচনা করিতে যাইয়া, প্রথম হাদীছটি সম্পর্কে ত কিছু বলিতে সাহস করেন নাই বা উহা তিনি অবগত নহেন। কিন্তু দ্বিতীয় হাদীছটিকে তিনি ভিত্তিহীন ঠাওরাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং স্বয়ংকৃত উহার ভুল অনুবাদের পেঁচে ফেলিয়া অনভিজ্ঞ পাঠকবর্গকে বিভ্রান্ত করার ব্যবস্থা আঁটিয়াছেন। "মালাহেম" শব্দটি কঠিন একটি আরবী শব্দ। তিনি "মালাহেম" শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন "ভাবী ঘটনা সংক্রান্ত"। এই অনুবাদ সূত্রে তিনি আলোচ্য হাদীছকে মালাহেমের আওতাভুক্ত করিয়া "মালাহেম" সম্পর্কীয় হাদীছ সম্বন্ধে ইমাম আহমদ প্রমুখের একটি উক্তিকে আলোচ্য হাদীছটির উপর প্রয়োগ করিয়াছেন। কি জঘন্য কারসাজি!

পাঠকবর্গ যেকোন উপায়ে ইচ্ছা আপনারা তলাইয়া দেখিতে পারেন, "মালাহেম" শব্দের যে অর্থ পণ্ডিত সাহেব করিয়াছেন তাহা কোন ক্রমেই সত্য নহে, উহা একটি ভিত্তিহীন মিথ্যা ও ধোঁকা মাত্র ملاحم মালাহেম" শব্দের অর্থ মারামারি-কাটাকাটি, যুদ্ধ-বিগ্রহ। মারামারি-কাটাকাটি যুদ্ধ-বিগ্রহের ভাবী ঘটনাসমূহ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীস্বরূপ কোন কোন অতিরঞ্জিত কাহিনী হাদীছ নামে প্রচলিত ছিল, সেইগুলিই হইল ইমাম আহমদ প্রমুখের উক্তির উদ্দেশ্য। শাফাআ'ত সংক্রান্ত হাদীছের সঙ্গে ঐ উক্তির কোন সম্পর্কই থাকিতে পারে না। বোখারী শরীফে ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত শাফাআ'ত সংক্রান্ত একটি সর্বসম্মত সহীহ হাদীছকে প্রবঞ্চনামূলকভাবে মালাহেম তথা যুদ্ধ-বিগ্রহ সংক্রান্ত হাদীছ নামে আখ্যায়িত করিয়া উহার উপর কটাক্ষ করা দুঃখজনক বৈ নহে।

আদমের ঘটনায় "জান্নাত"কে সর্বজনবিদিত বেহেশত অর্থে লওয়া সম্পর্কে পণ্ডিত সাহেব কতকগুলি অসুবিধার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার জানা উচিত যে, মানুষ যখন কর্মফলস্বরূপ বেহেশতে প্রবেশ করিবে তখনকার কথা ভিন্ন হইবে। আদম-হাওয়া আলোচ্য ঘটনা তথায় কর্মফল ভোগ স্বরূপ ছিলেন না; বরং মেহমানস্বরূপ ছিলেন।

* খৃষ্টানদের বাইবেলে যে গর্হিত কথাবার্তা আছে, উহার একটা নমুনা বাইবেল আদি পুস্তকের চতুর্থ পৃষ্ঠয় আছে, জান্নাতে "আদম ও তাঁহার স্ত্রী উলঙ্গ থাকিতেন, তাঁহাদের লজ্জাবোধ ছিল না।" কিরূপ যুক্তিহীন কথা। যেখানে আদম-হাওয়ার এত সুখ-শান্তি, আদর-যত্ন এবং মান-মর্যাদা, সেখানে তাঁহারা উলঙ্গ থাকিবেন, ইহা কি সম্ভব? কখনও নহে, ইহা মিথ্যা মন্তব্য।

এ সম্পর্কে যুক্তিযুক্ত ও সত্য বিবরণ পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে ولا تعرى "হে আদম! বেহেশতের মধ্যে আপনি বস্ত্রহীন থাকিবেন না, সকল প্রকার মনোরম মান-মর্যাদার লেবাস-পোশাক আপনার জন্য উপস্থিত রহিয়াছে।" এতদ্ভিন্ন সূরা অ'রাফ পারা-৮; রুক-১০-এর একটি আয়াতের দ্বারাও সম্যক প্রমাণিত হয় যে, নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইবার পূর্বে তাঁহাদের উভয়ই লেবাস-পোশাক সুসজ্জিত থাকিতেন।

যাতায়াতে হয়ত খুব কড়াকড়ি ছিল না, যেরূপ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে বহিষ্কৃত কোন অপরাধীর অবস্থা হইয়া থাকে। কিম্বা বেহেশতের বাহিরে থাকিয়াই আদম ও হাওয়ার সঙ্গে কথোপকথনের বা তাঁহাদের মনের মধ্যে অছঅছা সৃষ্টির সুযোগ ছিল, যেরূপ এখনও আছে। এই ধরনের কোন সুযোগে ইবলীস, আদম ও হাওয়াকে নিম্নরূপ প্রতারণামূলক বুঝ দিল!

ইবলীস হযরত আদম ও হাওয়াকে ধোঁকা ও প্রতারণাস্বরূপ বলিল, ঐ নিষিদ্ধ বৃক্ষটির তাছির বা প্রতিক্রিয়া এই যে, উহার ফল খাইলে অমর জিন্দেগী লাভ হয় এবং আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য ফেরেশতাদের ন্যায় আশঙ্কাহীন ও অবিচ্ছেদ্যরূপে লাভ হয়। আপনাদের সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থায় এইরূপ তাছির ও প্রতিক্রিয়া বরদাশত করিয়া নেওয়ার মত শক্তি না থাকায় আল্লাহ তাআলা আপনাদিগকে ঐ বৃক্ষের ফল খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এখন আপনারা বেহেশতের মধ্যে কিছুকাল বসবাস করার দরুন আপনাদের মধ্যে সেই শক্তি সঞ্চয় হইয়াছে। অতএব, এখন ঐ বৃক্ষের ফল আপনারা খাইলে সহজেই উহার উপরোক্ত দুইটি প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল লাভ করিতে পারিবেন।

ইবলীস সর্বাধিক ধোঁকা ইহাও দিল যে, তাহার উল্লিখিত প্রবঞ্চনাময় উক্তির সত্যতা ও বাস্তবতা প্রমাণ করার জন্য আল্লাহর নামের কসম ব্যবহার করিল এবং নিজে আদম ও হাওয়ার মহা উপকারী বন্ধু হওয়ার দাবীও করিল।

অমরভাবে আল্লাহ তায়ালার অবিচ্ছেদ্য নৈকট্য লাভের লালসা স্পৃহা হযরত আদম ও হাওয়ার কি পরিমাণ থাকিতে পারে তাহা অতি সহজেই অনুমেয়। এদিকে হযরত আদম ও হাওয়া ইতিপূর্বে কখনও আর "মিথ্যা" শুনেন নাই, মিথ্যা কি জিনিস তাহা তাঁহারা জানেন না, তদুপরি আল্লাহর নামের কসম মিশ্রিত উক্তি অবাস্তব হইতে পারে এরূপ ধারণাও তাঁহাদের অন্তরে স্থান পাইল না। ফলে ঐ নিষিদ্ধ বৃক্ষের ধারে না যাইবার যে এক অনড় অটল মনোভাব তাঁহাদের ছিল তাহা শিথিল হইয়া গেল। তাঁহারা উভয়ে ঐ নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইয়া ফেলিলেন। এই বিষয়টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপে রহিয়াছে–

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَاوُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْتَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ـ وَقَاسَمَهُمَا اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ـ فَدَلّٰهُمَا بِغُرُوْرٍ ـ

অতপর শয়তান আদম ও হাওয়াকে কুমন্ত্রণা দিল; তাহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, (নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়াইয়া তাঁহাদেরকে বেহেশত হইতে বাহির করিবে এবং উপস্থিত) একজনকে অপর জনের সম্মুখে উলঙ্গ (করিয়া অপমানিত) করিবে। সে আদম ও হাওয়াকে বুঝাইল, তোমাদের প্রভু তোমাদিগকে ঐ বৃক্ষ হইতে শুধু এই জন্য বারণ করিয়াছিলেন যে, তোমরা (উহা খাইয়া) অমর ফেরেশতা ও হওয়ার) প্রতিক্রিয়ায় ভারাক্রান্ত)) না হইয়া পড়; (যাহা সহ্য করার শক্তি তখন তোমাদের ছিল না, সুতরাং ঐ নিষেধাজ্ঞা সাময়িক ছিল।) আর ইবলীস আদম-হাওয়াকে কসম খাইয়া বলিল, নিশ্চয় আমি তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী। ইবলীস এই প্রবঞ্চনাময় বুঝ-প্রবোধে আদম-হাওয়াকে প্রতারিত করিয়া তাঁহাদের শিথিল করিয়া দিল এবং তাঁহাদিগকে তাঁহাদের মর্যাদা হইতে নামাইয়া দিল। (পারা– ৮; রুকু– ৯)

فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ـ

অতঃপর শয়তান আদমকে অছঅছা– কুমন্ত্রণা দিল এই বলিয়া যে, হে আদম তোমাকে অমর হইবার এবং অবিচ্ছেদ্য বাদশাহী লাভের বৃক্ষের খোঁজ দিব কি? (সূরা তা-হা ঃ পারা–১৬; রুকু–১৬)

নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার পরিণাম

ইবলীসের প্রবঞ্চনা প্রতারণায় আদম ও হাওয়া নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইয়া ফেলিলেন। ফলে তাঁহাদের বেহেশতী লেবাস-পরিচ্ছদ ছিন্ন হইয়া গেল, তাঁহারা বিভ্রাটে পড়িয়া গেলেন। উপস্থিত কোন উপায় না পাইয়া বেহেশতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদের সতর ঢাকার চেষ্টা করিলেন। এদিকে আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে তাঁহাদের প্রতি কৈফিয়ত তলবের ডাক পড়িল। পবিত্র কোরআনে উহার বিবরণ (পারা- ৮; রুকু- ৯)

فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادٰهُمَا رَبُّهُمَا اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَا اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ -

ঐ বৃক্ষের ফল মুখে রাখার সঙ্গে সঙ্গে (বেহেশতী লেবাস পোশাক বিচ্ছিন্ন হইয়া) তাঁহাদের একের সম্মুখে অপরের গুপ্ত শরীরাংশ উন্মুক্ত হইয়া গেল এবং তাঁহারা উভয়ের বেহেশতের বৃক্ষপত্র দ্বারা আবরণ সৃষ্টি করায় সচেষ্ট হইলেন। আর প্রভু পরওয়ারদেগার তাঁহাদের ডাকিয়া বলিলেন, আমি কি তোমাদিগকে এই বৃক্ষ হইতে নিষেধ করিয়াছিলাম না এবং বলিয়াছিলাম না যে, জানিয়া রাখিও, নিশ্চয় শয়তান তোমাদের ঘোর শত্রু (তোমরা তাহার হইতে সতর্ক থাকিও)!

فَاَكَلَا مِنْهُمَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى -

আদম ও হাওয়া উভয়ে (শয়তানের প্রবঞ্চনায়) ঐ নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইল, তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের উভয়ের সম্মুখে তাঁহাদের পরস্পর গুপ্ত শরীরাংশ উন্মুক্ত হইয়া পড়িল এবং তাঁহারা উভয়ে বেহেশতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদের উপর আবরণ সৃষ্টির চেষ্টা করিলেন। আদম তাঁহার প্রভুর আদেশ বিরোধী কাজে লিপ্ত হইয়া ভুল করিয়া বসিলেন। (সূরা ত্বাহাঃ পারা- ১৬; রুকু- ১৬)

বেহেশতী পোশাক বিছিন্ন হওয়া প্রসঙ্গ

উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا বলা হইয়াছে।

بَدَتْ বাদাত" অর্থ প্রকাশ হইয়া যাওয়া-গুপ্ত না থাকা।

سَوْاٰةُ ছাওআত" শব্দের দুই অর্থ- (১) গুপ্তাঙ্গ (২) খারাপ খাসলত।

অধুনা হাল-ফ্যাশনের তফসীরকারদেরকে সাধারণত দেখা যায় তাহারা "নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ায় বস্তুতই হযরত আদম ও হাওয়ার বেহেশতী পোশাক বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল- এই প্রসঙ্গটি সরাসরিরূপে গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করে। তাহারা উল্লিখিত শব্দগুলির নানারূপ উপঅর্থের দিকে ছুটাছুটি করিয়া থাকে, অথচ এই প্রসঙ্গটি অন্য এক আয়াতে (পারা- ৮; রুকু- ১০) অতি স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে-

ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما -

"শয়তান আদম ও হাওয়াকে এমন কাজে লিপ্ত করিল, যদ্দারা সে তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্র তাঁহাদের হইতে খসাইয়া ফেলিল। ফলে উভয়ের গুপ্ত শরীরাংশ পরস্পরের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দিল- এইরূপে তাঁহাদিগকে অপমান করিল।"

বেহেশত হইতে বাহির হওয়ার আদেশ

আল্লাহ তাআলা আদম ও হাওয়াকে অভিযুক্ত করিয়া বেহেশত ত্যাগেরও নির্দেশ দিলেন। পবিত্র কোরআনে সূরা বাকারায় ও সূরা আ'রাফে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁহাদের প্রতি এই নির্দেশ জারি করিলেন- اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ "তোমরা (বেহেশত হইতে) নামিয়া যাও; তোমাদের মধ্যে শত্রুতা চলিবে।" অর্থাৎ বেহেশত হইতে নামিয়া যাওয়ার শাস্তি ত আছেই, এতদ্ভিন্ন পরস্পর স্নায়ু-দ্বন্দ্বের মানসিক দুর্ভোগও তোমাদের ভুগিতে হইবে।

এস্থলে তফসীর বিশেষজ্ঞদের মতামত দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। অধিকাংশ তফসীরকারের মত এই যে, উক্ত আদেশ অনতিবিলম্বে আদম ও হাওয়ার উপর কার্যকরী হইল। তাঁহারা ইহজগতে নিপতিত হইলেন, দুনিয়াতে নিপতিত হওয়া তাঁহাদের জন্য অপরাধের পরিণামস্বরূপ ছিল। অভিযুক্ত হওয়ার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বহু দিন পর্যন্ত কান্নাকাটার পর আল্লাহ তাআলা দয়াপরবশ হইয়া নিজেই ক্ষমা প্রার্থনার কতিপয় বাক্য তাঁহাদিগকে দান করিলেন। তাহার বদৌলতে তাঁহারা ক্ষমা প্রাপ্ত হইলেন না শুধু, বরং ভূপৃষ্ঠে আল্লাহ তাআলার খলীফা হওয়ার মর্যাদাও লাভ করিলেন। যেমন, কোন শিক্ষিত ব্যক্তি অভিযুক্ত হইয়া হাজত ভোগস্বরূপ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল, তারপর বরাতের জোরে সে তথায় জেলারের চাকুরী পাইয়া বসিল।

কোন কোন তফসীরকারের মত এই যে, অপরাধের শাস্তিস্বরূপ বেহেশত হইতে বহিষ্কৃত হইয়া দুনিয়াতে নিপতিত হওয়ার আদেশ হইয়াছিল বটে; কিন্তু সেই আদেশ কার্যকরী হওয়ার পূর্বেই দারুণ কান্নাকাটা ও স্বয়ং আল্লাহ প্রদত্ত বাক্যাবলীর মাধ্যমে তওবা-এস্তেগফারের দরুন সেই আদেশ মুলতবী হইয়া ক্ষমা প্রাপ্ত হইলেন এবং বেহশতে থাকাবস্থায় খলীফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া দুনিয়াতে পদার্পণ করিলেন।

অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা

হযরত আদম-হাওয়ার দ্বারা যখন অপরাধ সংঘটিত হইয়া গেল এবং আল্লাহ তাআলা তাঁহাদিগকে অভিযুক্ত করিলেন; তখন সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা নিজেদের অপরাধ স্বীকারপূর্বক ক্ষমার জন্য প্রভুর দরবারে নিজেদেরকে বিলীন করিয়া দিলেন। প্রভুর দরবারে করজোড়ে এমন কান্নাকাটা করিলেন যে, স্বয়ং প্রভুই তাঁহাদিগকে ক্ষমা প্রার্থনার মোনাজাত শিখাইয়া দিলেন। অবশেষে সেই মোনাজাতের বদৌলতে তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিলেন।

এখানেই একটি বিশেষ রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। তাহা হইল, ইবলীস এবং আদম-হাওয়ার মধ্যে বিরাট ব্যবধান। ইবলীস আল্লাহর আদেশ লংঘন করিয়া অভিযুক্ত হইলে পর সে আল্লার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হইয়াছিল, বাদানুবাদ ও কথা কাটাকাটি আরম্ভ করিয়াছিল, পরওয়ারদেগারে দরবারের গোড়ামি দেখাইয়াছিল- ইহাই ছিল তাহার ধ্বংসের কারণ। আর আদম ও হাওয়া আদেশ বিরোধী কাজে অভিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কান্নাকাটির সহিত ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া নিজেদেরকে প্রভুর দরবারে বিলীন করিয়া দিয়াছিলেন- ইহাই ছিল তাঁহাদের চরম উন্নতির সোপান।

এই তথ্যের দ্বারা দুইটি বিশেষ প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যায়। প্রথম প্রশ্নটি হইল, এই কেলেঙ্কারির মূল ঐ বৃক্ষটি বেহেশতে রাখা হইয়াছিল কেন? এক কথায় প্রশ্নের উত্তর হইল- পরীক্ষার জন্য রাখা হইয়াছিল। এই পরীক্ষায় হযরত আদম পাস করিয়াছিলেন কি ফেল করিয়াছিলেন? যদি বলা হয় ফেল করিয়াছিলেন তবে ভুল হইবে কারণ, মূলতঃ পরীক্ষার আসল বিষয়বস্তু শুধু এই ছিল না যে, ঐ বৃক্ষ

হইতে বিরত থাকিয়া আল্লাহ তাআলার আদেশের উপর স্থির থাকিতে পারেন কিনা? বরং পরীক্ষার মধ্যে এই বিষয়টির প্রতি অধিক দৃষ্টি ছিল যে, ভুলের কারণে যদি আল্লাহর আদেশ লংঘিত হইয়া যায় তখন আদম কি করেন ইহা প্রকাশ্যরূপে দেখিয়া নেওয়া এবং সকলকে দেখাইয়া দেওয়াই ছিল এই পরীক্ষার মূল বিষয়বস্তু। কারণ, ইবলীস এখানেই পদস্খলিত হইয়াছিল। এই দৃষ্টিতে আদম (আঃ) এই পরীক্ষায় অতি উচ্চ মানে পাস করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় প্র্যশ্নটি এই যে, হযরত আদমকে আল্লাহ তাআলা যমীনে স্বীয় খলীফা বা প্রতিনিধি বানাইবেন সেই জন্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সৃষ্টির করার পর তাঁহাকে বেহেশতে কেন রাখিলেন, এই বৃক্ষের কেলেঙ্কারিতে কেন ফেলিলেন?

শুই প্রশ্নের মীমাংসাও উক্ত তথ্য দ্বারা সহজেই বুঝে আসে যে, খস্খীফা বা প্রতিনিধিরূপে নিযুক্তির পূর্বে হযরত আদমের এই বিশেষ গুণটি সর্বসমক্ষে বিশেষতঃ আদম সৃষ্টির প্রতিবাদী গ্রুপ ফেরেশতাগণের সম্মুখে প্রকাশ করাইবার ইচ্ছায়ই আল্লাহ তাআলা বেহেশতের মধ্যে তথা ফেরেশতাদের মধ্যে আদমকে রাখিয়া এই ব্যবস্থা করিয়ছছিলেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, খলীফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত হওয়ার জন্য দুইটি গুণের বিশেষ আবশ্যক। একটি হইল- যোগ্যতা, বা উপযুক্ততা, যাহা এল্‌ম তথা জ্ঞান বিদ্যার দ্বারা সম্পন্ন হইতে {ারে; সে সম্পর্কে প্রথমে একটি পরীক্ষার মাধ্যমে হযরত আদমের শ্রেষ্ঠত্ব ফেরেশতাদের সম্মুখে প্রতিপন্ন করিয়া দেখান হইয়াছে। আর এক একটি গুণ হইল- ওয়াফাদারী ও ফর্মাবরদারী বা আনুগত্য ও আজ্ঞা বহন, যাহা আব্‌দিয়ত বা আল্লার গোলামীর দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে। হযরত আদম যে এই আবদিয়তের গুণেও উচ্চ মানের অধিকারী ছিলেন, তাহা এই পরীক্ষার মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়াছে।

ফেরেশতাগণের "আবদিয়ত" কামেল বা পূর্ণমাত্রায় ছিল; কিন্তু উহার মান এই হিসাবে নিম্ন ছিল যে, ফেরেশতাদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার নাফর্মানী করার মূল ধাতু সৃষ্টিগতভাবেই ছিল না। অতএব, ফেরেশতাগণ ত আল্লাহ তায়ালার ফরমাবরদারী বা আনুগত্যে বাধ্য। পক্ষান্তরে জ্বিন এবং মধ্যে এই ইনসানের মধ্যে আল্লাহ তাআলাসৃষ্টিগতভাবে নাফরমানীর ধাতু রাখিয়াছেন যাহার প্রতিক্রিয়া ও নমুনা ইবলীসের দ্বারা সেজদার ঘটনায় এবং আদমের দ্বারা নিষিদ্ধ বৃক্ষের ঘটনায় প্রকাশ পাইয়াছে। যেকোন কারণে নাফরমানী সংঘটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তওবা-এস্তেগফার ও কান্নাকাটা করতঃ প্রভুপানে প্রত্যাবর্তন ও প্রভুর দরবারে নিজকে বিলীন করিয়া দেওয়ার জয্‌বা স্পৃহা এবং এরূপ মনোবলও আল্লাহ তাআলা জ্বিন-ইনসানের মধ্যে রাখিয়াছেন। ইবলীস এই মনোবল ও সৎসাহস কাজে না লাগইবার দরুন বিতাড়িত ও চির অভিশপ্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে হযরত আদম ও হাওয়া এই মনোবলের সদ্ব্যবহার করিয়াই উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই কান্নাকাটি, তওবা-এস্তেগফার ও প্রভুপানে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে যে আব্‌দিয়ত, আত্ম নিবেদন, আনুগত্য ও দাসত্বের বিকাশ হইয়াছে, উহার মান অতি উচ্চ।* আদমের এই উচ্চ মানসম্পন্ন আব্‌দিয়তই এই পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতীয়মান করা হইয়াছে।

বলাবাহুল্য, ফেরেশতাদের সম্মুখে আদম ও হাওয়ার এই আবদিয়তকে প্রতিপন্ন করিয়া দেখানটা বড়ই অবস্থা উপযোগী হইয়াছে। কারণ জ্বিনদের উপর কেয়াস করিয়া বা যেকোন কারণে ফেরেশতাগণ আদম সৃষ্টির গোড়াপত্তনের আগেই আদম সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, " يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ফেতনা-ফাসাদ, মারা মারি ইত্যাদি নাফরমানীতে লিপ্ত হইবেন।"

এই পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাগণকে দেখাইয়া দিলেন- যে দোষটির প্রতি অঙ্গুলি

* ফেরেশতা ও আদম উভয়ের আব্‌দিয়তের পার্থক্যটা অতি সহজেই নজরে পড়ে; একটা সরল দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করুন যে, এক হইল পুরুষত্বহীন ব্যক্তির জেনা বা ব্যভিচার হইতে বাঁচিয়া থাকা। আর এক হইল সব রকম শক্তি-সামর্থ্য এবং সুযোগ থাকা সত্ত্বেও জেনা ব্যাভিচার হইতে সংযমী থাকা।

নির্দেশ করা হইয়াছে উহার মস্ত বড় প্রতিষেধকও যে আদমের মধ্যে হইবে তাহা তোমাদের জানা নাই أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ "তোমরা যাহা জান না তাহা আমি জানি।" সেই প্রতিষেধক হইল, নাফরমানীর সঙ্গে সঙ্গে তওবা-এস্তেফার– প্রভুপানে পুনঃ প্রত্যাবর্তন, প্রভুর দরবারে আত্ম-নিবেদন ও নিজেকে বিলীন করিয়া দেওয়া। এই প্রতিষেধকের মাধ্যমে আদম চরম উন্নতি লাভ করিবে; বস্তুতঃ তিনি তাহা লাভ করিয়াছেনও–

وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوٰى ـ ثُمَّ اجْتَبَهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ـ

"আদম স্বীয় প্রভুর আদেশ বিরোধী কাজে লিপ্ত হইয়া কসুর করিয়াছিল বটে, (কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রতিষেধক তওবা-এস্তেগফার ও পুনঃ প্রত্যাবর্তনের দরুন) পরে তাঁহার প্রভু তাঁহাকে অধিক নৈকট্য দান করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন।" (সূরা ত্বা-হাঃ পারা– ১৬; রুকু– ১৬)

এই সব নিগূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন দৃষ্টে বেহেশতে ফেরেশতাদের মধ্যে আদমের অবস্থান কতই না সমীচীন ছিল, কতই না তথ্যপূর্ণ ও রহস্যপূর্ণ ছিল! এবং আল্লাহ তাআলা যে সূচনায়ই বলিয়াছেন, اِنِّىْ اَعْلَمُ مَا لاَتَعْلَمُوْنَ "নিশ্চয় আমি ঐ সব তথ্য ও রহস্য জানি যাহা তোমরা জান না" ধাপে ধাপে এই ঘোষণারই বিকাশ হইয়াছিল। হযরত আদম ও হাওয়ার তওবা-এস্তেগফার সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বর্ণনা এই–

قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ـ

আদম হাওয়া (কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন এবং প্রভুর দরবারে করজোড়ে) বলিলেন, হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! আমরা অপরাধী; নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই করিয়াছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া যাইব।

(সূরা আ'রাফ ঃ পারা– ৮; রুকু– ৯)

فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ـ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ

(কান্না ও দোয়ার ফলে) আদম স্বীয় প্রভু হইতে কতিপয় বাক্য প্রাপ্ত হইলেন (সেই বাক্যাবলীর বদৌলতে) আল্লাহ আদমের তওবা কবুল করিলেন; আল্লাহ তাওবা কবুলকারী দয়ালু। (সূরা বাকারাঃ পারা-১, রুকু-৪)

এস্থলে দুইটি বিষয় অবগত হওয়া আবশ্যক। একটি এই যে, হযরত আদম ও হাওয়ার তওবা কবুল হইয়াছিল কোন্ সময়? অপরটি এই যে, সেই মোনাজাত বা বাক্যগুলি কি ছিল, যাহা হযরত আদম আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? উভয় বিষয় সম্পর্কে তফসীরকারগণের মতভেদ আছে।

সাধারণতঃ তফছীরকারগণের মতামত ইহাই দেখা যায় যে, হযরত আদম ও হাওয়া অভিযুক্ত হওয়ার পর কান্নাকাটা করিতে লাগিলেন, ইহজগতে নিপতিত হইয়াও কান্নাকটায় নিমগ্ন ইহলেন। ইহজগতে নিপতিত হওয়ার বহু দিন পর আল্লাহ তায়ালারই তরফ হইতে কতকগুলি বিশেষ বাক্য প্রাপ্ত হইলেন, যাহার দ্বারা মোনাজাত করার পর ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কোন কোন তফসীরকারের মত এই যে, বেহেশতে থাকাকালেই তওবা-এস্তেগফার ও আল্লাহ প্রদত্ত বাক্যাবলীর বদৌলতে ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সূরা বাকারাহ আয়াতে فَتَلَقّٰى এবং فَتَابَ শব্দদ্বয়ের ف 'ফা" অব্যয়টি দৃষ্টে এই মতামতকে অগ্রগণ্য বলিতে হয়। কারণ ف ফা" অব্যয় এই কথাই বাঝাইয়া থাকে যে, উহার পরবর্তী বিষয়টি উহার পূর্ববর্তী বিষয়ের পরে অনতিবিলম্বেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং পূর্ণ আয়াতের মর্ম হইবে এই– আদম ও হাওয়ার অপরাধ সংঘটিত হইল এবং আল্লাহ তাআলা তাঁহাদিগকে অভিযুক্ত করতঃ শাস্তিমূলকভাবে বেহেশত হইতে নামিয়া যাওয়ার আদেশ করিলেন। অতপর অনতিবিলম্বে

আদম (এবং হাওয়া) কান্নাকাটির বদৌলতে আল্লাহ প্রদত্ত বাক্যাবলী প্রাপ্ত হইয়া উহা দ্বারা তওবা করিলেন; অনতিবিলম্বে তাঁহাদের তওবা আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করিলেন, শাস্তিও রহিত হইয়া গেল। তারপর আল্লাহ তাআলা আদম ও হাওয়াকে দুনিয়াতে খলীফা বা প্রতিনিধিস্বরূপ পদার্পণের আদেশ করিলেন। এই মতাবলম্বী তফসীরকারগণের তফসীরই পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে প্রথমোক্ত আদেশ তথা অভিযুক্ত থাকাকালীন আল্লাহ তাআলা আদম ও হাওয়াকে শাস্তিমূলক যে আদেশ দিয়াছিলেন, اِهْبِطُوْا "বেহেশত হইতে নীচে নামিয়া যাও" -ঐ আদেশ কার্যকরী হইয়াছিল না।

প্রথম মতটিকে এই দৃষ্টে অগ্রগণ্য মনে করা হয় যে, এ সম্পর্কে সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আদম ও হাওয়া উভয়ে নিজেদের ভুলের জন্য দীর্ঘ দুইশ বৎসরকাল আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করিয়াছিলেন। (রুহুল মাআনী, (সূরা আ'রাফ ঃ পারা- ৮; রুকু- ৯)

এই মতাবলম্বী তফসীরকারগণই বলিয়া থাকেন (সূরা আ'রাফঃ পারা-৮; রুকু-৯) যে সম্পর্কে পূর্বেও আলোচনা হইয়াছে যে, অভিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তওবা কবুল হয় নাই, বরং আল্লাহ তাআলা তাঁহাদিগকে শাস্তিস্বরূপ বেহেশত হইতে নামাইয়া ইহজগতে নিপতিত করিয়াছিলেন এবং বহিষ্কৃত হওয়ার আদেশ কার্যকরী করিয়াছিলেন।

সে মতে এস্থলে মস্ত বড় প্রশ্ন দেখা দেয়। কারণ, সূরা বাকারার বিবরণের মধ্যে দেখা যায়, হযরত আদম ভুল করার ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁহার প্রতি اِهْبِطُوْا নীচে নামিয়া যাও" বলিয়া ইহজগতে নিপতিত হওয়ার আদেশ দিলেন এবং আলোচ্য তফসীরকারকগণের মতে এই আদেশ কার্যকরীও হইল। অতপর আল্লাহ তাআলা আদমের তওবা কবুল করিলেন। তওবা কবুল হওয়ার পরবর্তী অবস্থার বিবরণ সম্পর্কে তথায় উল্লেখ আছে যে, তারপর পুনঃ আল্লাহ তাআলা বলিলেন قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا এস্থলেও সেই اِهْبِطُوْا নীচে নামিয়া যাও" শব্দটি ব্যবহৃত হইল। এখন প্রশ্ন এই যে, তওবা কবুল হওয়ার পূর্বেও যেই আদেশ ছিল اِهْبِطُوْا "নীচে নামিয়া যাও" পরেও সেই আদেশ দেখা যায় اِهْبِطُوْا। সুতরাং তওবা কবুল হওয়ার ফলাফল কি হইল এবং প্রথম বারের আদেশ "নীচে নামিয়া যাও" কার্যকরী হইয়া ইহজগতে নিপতিত হওয়ার পর দ্বিতীয় বারের "নীচে নামিয়া যাও" আদেশের কার্যকরী হওয়ার ক্ষেত্র কোথায়?

এই প্রশ্নটির উত্তর এই যে, উভয় আদেশের শব্দ এক হইলেও অর্থ ও উদ্দেশ্যের বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে। প্রথম اهبطوا-এর অর্থ হইল "নীচে নামিয়া যাও" আর দ্বিতীয় اهبطوا-এর অর্থ হইল "নীচে থাক" এবং প্রথম আদেশটি ছিল শাস্তিমূলক, দ্বিতীয় আদেশটি খলীফা বা প্রতিনিধি নিয়োগমূলক। অর্থাৎ আদম ও হাওয়াকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ায় ফেলিলেন শাস্তিমূলকভাবে; পরে তাঁহাদের তওবা কবুল হইলে তাঁহাদিগকে দুনিয়াতে বসবাস করিতে বলিলেন- কিন্তু মনোনীত খলীফা ও প্রতিনিধিরূপে উভয় নির্দেশের ব্যবধানটা অতি সুস্পষ্ট।* এই ধাপেই আল্লাহ তাআলার হেকমতপূর্ণ সুদীর্ঘ লীলার মাধ্যমে মূল ঘটনার প্রথম কথা- আদমের খলীফা হওয়া বাস্তবে রূপায়িত হইল।

দ্বিতীয় বিষয় তথা আল্লাহ প্রদত্ত বাক্যাবলী বা মোনাজাত কি ছিল সে সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য বর্ণিত আছে। বিশিষ্ট তাবেয়ী ও মোফাস্‌সের মোজাহেদ (রঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে-

اَللّٰهُمَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ

* একটি নজির লক্ষ্য করুন। একজন সুশিক্ষিত লোককে তাহার কোন অপরাধের দরুন জেলে দেওয়া হইল এবং তথায় তাঁহাকে কারাবাসের নির্দেশ দেওয়া হইল। কারাভোগ শেষ করিয়া মুক্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে তথাকার জেল সুপারিন্টেণ্ডেন্টরূপে মনোনীত করিয়া তাহার নিয়োগ-পত্রের ঘোষণা দিয়া দেওয়া হইল এবং জেলকর্তারূপে জেলখানারই অফিসের কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হইল; উভয়ের পার্থক্য কত সুস্পষ্ট।

خَيْرُ الرَّحِمِيْنَ - اَللّٰهُمَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ -

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই– একমাত্র তুমিই মা'বুদ, তুমি পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য। আমি নরাধম (তোমার আদেশ লংঘন করিয়া) নিজেই নিজের ক্ষতি করিয়াছি (এখন কোন উপায় নাই); সুতরাং তুমিই আমাকে ক্ষমা কর, তুমি সর্বোত্তম ক্ষমাকারী। হে আল্লাহ! তুমি ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই– একমাত্র তুমিই মা'বূদ, তুমি পাক-পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য। আমি নরাধম নিজেই নিজের ক্ষতি করিয়াছি (আর কোন উপায় নাই); অতএব তুমি আমার প্রতি দয়া কর, তুমি সর্বোত্তম দয়ালু। হে আল্লাহ! তুমি ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই– একমাত্র তুমিই মা'বুদ, তুমি পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য। আমি নরাধম নিজেই নিজের ক্ষতি করিয়াছি; (আমার কোন উপায় নাই); অতএব, তুমি আমার তওবা কবুল কর, তুমিই সকলের তওবা কবুলকারী অতিশয় দয়ালু।

ইমাম বায়হাকী (রঃ) ছাহাবী আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন–

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ

অর্থ ঃ পাক-পবিত্র তুমি হে আল্লাহ! তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, অতি মহান তোমার নাম এবং অতি উচ্চ তোমার মহত্ত্ব; তুমি ভিন্ন অন্য কোন মা'বুদ নাই– তুমি একমাত্র মা'বুদ। আমি (তোমার আদেশ লংঘন করিয়া) নিজেই নিজের ক্ষতি করিয়াছি (আমার আর কোন উপায় নাই।) অতএব, তুমি আমায় ক্ষমা কর, ইহা নিশ্চিতরূপে অবধারিত যে, তুমি ভিন্ন আর কেহ মাফ করিতে পারে না–গোনাহ মাফ করার ক্ষমতা একমাত্র তোমারই।

তফসীরে রুহুল মা'আনী কিতাবে এই দোয়াটি ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, পবিত্র কোরআনে সূরা আ'রাফে হযরত আদম ও হাওয়ার বিনীত আরাধনারূপে যাহা উল্লেখ আছে উহাই সেই আল্লাহ প্রদত্ত বাক্যাবলী, যাহা এই–

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ -

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! (আমরা তোমার আদেশ লংঘন করিয়া) নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করিয়াছি। এখন তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না কর, তুমি যদি আমাদের প্রতি রহম না কর তবে নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্ত সর্বহারাদের দলভুক্ত হইয়া যাইব।

হযরত আদম ও হাওয়া এই মোনাজাতই আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে লাভ করিয়াছিলেন এবং প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এই মোনাজাত দ্বারাই কান্নাকাটি করিয়াছিলেন এবং ইহার বদৌলতেই আল্লাহ তাআলা তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন।

নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়া সম্পর্কে মা হাওয়ার ভূমিকা

পবিত্র কোরআনে ঘটনার বর্ণনায় দেখা যায় যে, নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়া, উহার জন্য অভিযুক্ত হওয়া, তদ্দরুন বেহেশত হইতে বহিষ্কারাদেশ এবং আল্লাহর দরবারে তওবা-এস্তেগফার ইত্যাদি সব ব্যাপারেই দ্বিবচনবাচক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যদ্দারা স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, এই ব্যাপারে হযরত আদম ও হাওয়া

উভয়ই সমভাবে জড়িত ছিলেন। এমনকি, শয়তান যে অছ্‌অছা কুমন্ত্রণা প্রয়োগ করিয়াছিল এবং যত রকম তয়-তদবীর ও প্রবঞ্চনামূলক বুঝ-প্রবোধ দান করিয়াছিল, ঐ সবের বিবরণ দানেও পবিত্র কোরআন আদম ও হাওয়া উভয়কে লক্ষ্য করিয়া দ্বিবচনবাচক শব্দই ব্যবহার করিয়াছে। সুতরাং ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, মূলতঃ উভয়েই শয়তানের প্রবঞ্চনায় ভুলে পতিত হইয়াছিলেন। অতএব, উভয়েই সমানভাবে অভিযোগের পাত্র হইয়াছিলেন। হাঁ এতটুকু সত্য যে, উভয়ে শয়তানের ফাঁদে পড়িয়া যাওয়ার পর মা হাওয়া প্রথমে ঐ ফল খাইয়াছিলেন এবং শয়তানের প্রবঞ্চনায় হযরত আদম যে ইচ্ছা প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইতেছিলেন মা হাওয়া উহার প্রতি অধিক আকর্ষণ যোগাইয়াছিলেন; এতটুকু বিষয়ের প্রতিই নিম্নে বর্ণিত হাদীছে ইঙ্গিত দান করা হইয়াছে। ইহাতে অপরাধ বা অভিযোগের মাত্রায় কমবেশ হওয়ার কোন কারণ থাকিতে পারে না।

বাইবেলের মধ্যে ঘটনার সমস্ত দোষ মা হাওয়ার উপর চাপান হইয়াছে, যদ্দরুন খৃস্টানদের ধর্মীয় দৃষ্টিতে মাতৃজাতি– নারীগণকে অত্যন্ত ঘৃণার পাত্র বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে– ইহা অতিরঞ্জিত ও ভুল।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لاَ بَنُوْا اِسْرَائِيْلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمَ وَلَوْلاَ حَوَاءُ لَمْ تَخُنْ اُنْثٰى زَوْجَهَا -

অর্থঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি আসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন– গোশত (ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য বেশী সময় থাকিলে) পচিয়া দুর্গন্ধময় হইয়া যায়, ইহার সূচনা বনী ইসরাঈলদের ঘটনা হইতে এবং স্ত্রী (অনেক সময়) নিজ স্বামীকে ক্ষতিকর কার্যে লিপ্ত হওয়ায় প্রভাবান্বিত করে, ইহার সূচনা মা হাওয়ার ঘটনা হইতে।

ব্যাখ্যা ঃ বনী ইসরাঈলগণ তাহাদের নিজ কৃত এক অন্যায় ও গোনাহের ফলে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত সীনা উপত্যকাস্থিত বসতিবিহীন বিশাল মরুভূমিতে দিগভ্রান্ত অবস্থায় থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল। সেই দানা-পানিবিহীন মরুভূমিতে থাকাকালেও রহমানুর রহীম আল্লাহ তাআলা তাহাদের পানাহারের ব্যবস্থা অস্বাভাবিকরূপে করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাদের জন্য আল্লাহ তাআলা তথায় দুই প্রকার বস্তু প্রচুর পরিমাণে আমদানী করিয়া দিয়াছিলেন; তন্মধ্যে একটি 'বটের' নামক এক প্রকার পাখী। এই পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে তথায় নামিয়া আসিত এবং বনী ইসরাঈলদের জন্য ইহা শিকার করা অতীব সহজসাধ্য হইত। এইসব বর্ণনা কোরআন শরীফের বিভিন্ন জায়গায় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে।

এই সময় বনী ইসরাঈলদের প্রতি আল্লাহ তাআলার নির্দেশ ছিল যে, তোমরা প্রতিদিন নিজ নিজ প্রয়োজন পরিমাণ "বটের" পাখি ধরিয়া জবাই করিয়া খাইতে পারিবে; কিন্তু সঞ্চয় করিয়া রাখার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনের বেশী জবাই করিতে পারিবে না। তাহারা সেই আদেশ অমান্য করিল এবং সঞ্চয়ের উদ্দেশে অতিরিক্ত পরিমাণে ঐ পাখি জবাই করিয়া গোশত জমা করিতে আরম্ভ করিল। আল্লাহ তাআলা তাহাদের এই কার্যের শাস্তিস্বরূপ সঞ্চিত গোশত পচাইয়া দুর্গন্ধময় করিয়া দিবার উপকরণ বাতাসের মধ্যে সৃষ্টি করিয়া দিলেন। তখন হইতেই গোশত ইত্যাদি কাচা দ্রব্য পচন ও দুর্গন্ধময় হওয়ার সূচনা হয়। এই বিষয়টির প্রতিই আলোচ্য হাদীছের প্রথমাংশে ইঙ্গিত রহিয়াছে।

হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এই তথ্য প্রকাশ করিয়া সতর্কতামূলক একটি বিশেষ উপদেশ আমাদিগকে দিয়াছেন যে, আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের আদেশ অমান্য করিলে মানুষের শুধু আখেরাতের ক্ষতিই সাধিত হয় না, বরং এই পার্থিব জীবনেও নানা প্রকারের কষ্ট বিড়ম্বনার সীমা-পরিসীমা থাকে না। আলো-বাতাস, বৃষ্টি-বাদল, আগুন, পানি ইত্যাদি তথা বিশ্বের আসমান-যমীন ও পাহাড়-পর্বতের প্রতিটি বস্তু যাহা আমাদের সর্বপ্রকারের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি হইয়াছে– এইগুলিই সৃষ্টিকর্তার নির্দেশে আমাদের ক্ষয়-ক্ষতি ও ধ্বংসের উপকরণ হইয়া দাঁড়ায়। ঝড়-তুফান, কীট-পতঙ্গ, ভূকম্পন বন্যা প্রভৃতির মাধ্যমে দেশে দেশে ধ্বংসকরী যে

প্রলয়কাণ্ড ও দুর্ভিক্ষ-মহামারী সংঘটিত হয়; অনেক সময় আল্লাহর আদেশ বিরোধী কার্যাবলীই এই সবের মূল কারণরূপে বর্তমান থাকে। এমনকি আল্লাহর আদেশের বিরোধিতার বিষময় ফল অনেক সময় স্থায়ীভাবে শিকড় গাড়িয়া বসে। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) উক্ত তথ্য প্রকাশের দ্বারা উম্মতকে এই ভয়াবহ বিষয়টি সম্পর্কেই সতর্ক করিয়াছেন। এই বিষয়টি পবিত্র কোরআনেও স্পষ্টরূপে ঘোষিত হইয়াছে-

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ ....

অর্থঃ (অনেক সময়) জলে স্থলে নানারকমের দুর্যোগ-দুর্ঘটনা মানুষের কৃত অসৎ কার্যের কুফল ভোগ করাইবার উদ্দেশে সৃষ্টি হইয়া থাকে- যেন তাহারা এই দুর্যোগ ভোগের পর (স্বীয় কু কর্ম হইতে) ফিরিয়া আসে। (পারা- ২১; রুকু- ৮)

হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীছ এবং উল্লিখিত আয়াতের সতর্কবাণী দ্বারা আমাদের একটি বড় উপদেশ এই গ্রহণ করিতে হইবে যে, দুর্যোগ, দুর্ঘটনা ও জাগতিক ক্ষয়ক্ষতি হইতে বাঁচার জন্য বাহ্যিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিকার ও প্রতিরোধের উপায় অবলম্বন করার সঙ্গে, বরং তদপেক্ষাও অধিক তৎপরতার সহিত আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের আদেশ-নিষেধাবলী পালন এবং নিজেদের কৃত ত্রুটি ও গোনাহ হইতে তওবা-এস্তেগফার করায় মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

সুফীকুল শিরোমণি দার্শনিক কবি মাওলানা রুমী এই মর্মে বলিয়াছেন-

غم چون اید زود استغفار کن # غم بامر خالق امد کار کن

"দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হইলে তৎক্ষণাৎ তওবা এস্তেগফার কর। কারণ দুঃখ-কষ্ট সৃষ্টিকর্তার আদেশ ব্যতীত আসিতে পারে না। তাই সৃষ্টিকর্তাকে রাজি করার কার্যে তৎপর হও।"

দুনিয়া দারুল আসবাব, অর্থাৎ সাধারণতঃ কার্যকারণের মাধ্যমে কার্যসমূহ সমাধা হইয়া থাকে, তাই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা দুঃখ-কষ্ট, দুর্যোগ, দুর্ঘটনা যে কারণেই সৃষ্টি করুন না কেন, তাহা সাধারণতঃ বান-তুফান, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি উপকরণের মাধ্যমেই ঘটাইয়া থাকেন। আমরা এমন বোকা যে, এইসব দুঃখ-কষ্ট, দুর্যোগ-দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য উপকরণসমূহের পিছনেই সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া থাকি। সৃষ্টিকর্তাকে রাজি করার প্রতি তৎপরতা দেখাই না। ইহাই হইল আমাদের সবচেয়ে মারাত্মক ত্রুটি। এই দিক দিয়া বিচার করিলে আমরা একটা জানোয়ার হইতেও বোকা। লক্ষ্য করুন! একটা কুকুরকে দূর হইতে একটি পাথর মারিয়া আঘাত করা হইলে যদিও বাহ্যতঃ কুকুরের শরীরে পাথরই আঘাত হানিয়াছে; কিন্তু কুকুর ঐ পাথরের প্রতি ধাবিত হইবে না; ইহা একটি বাস্তব ব্যাপার। আমরা বুদ্ধিমান জীব (Rational animal) হইয়া একটা সামান্য কুকুরের চেয়েও হীন বুদ্ধি হওয়ার পরিচয় দিয়া থাকি যে, আমরা পাথর নিক্ষেপকারীর প্রতি ধাবিত না হইয়া বরং শুধু পাথরটির প্রতি ধাবিত হইয়া থাকি।

আল্লাহ তাআলার আদেশ বিরোধী কার্যে লিপ্ত হওয়ায় গোশত পচিতে আরম্ভ করিল, গোনাহের কারণে দুর্যোগ আসে ইত্যাদি তথ্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিশ্বাস করা আপাততঃ কঠিন বোধ হইতে পারে; কিন্তু একটু গভীর অন্তরদৃষ্টি লইয়া সংস্কারমুক্ত মনে চিন্তা করিলেই বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার হইয়া পড়ে।

এ স্থলে একটি বাস্তবের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাসের সহিত লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, জাগতিক বস্তুনিচয়ের সমস্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শুধু স্বাভাবিক (Natural) নহে, বরং উহা সম্পূর্ণরূপে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার নিয়ন্ত্রণাধীনে এবং তাঁহার আদেশ-নিষেধের আওতায় পরিচালিত। যেমন আগুন আগুনের ক্রিয়া হইল জ্বালাইয়া দেওয়া, কিন্তু আগুনের এই ক্রিয়া শুধু স্বাভাবিক (Natural) নহে, বরং উহার এই ক্রিয়া সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীনে এবং তাঁহার আদেশ নিষেধের আওতায় পরিচালিত। তাই কোন কোন ঘটনায় দেখা যায় সত্যিকার আগুন আছে; কিন্তু একটি চুলের উপরও উহার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় নাই। পবিত্র কোরআনে

বর্ণিত হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের ঘটনা এবং ছহীহ হাদীছে বর্ণিত এক অত্যাচারী কাফের রাজার কাহিনীতে একটি শিশু জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া অক্ষত থাকার ঘটনা উক্ত দাবীরই প্রকৃষ্ট নমুনা।

মো'মিন ও নেচারবাদী (Naturalist)-এর মধ্যে পার্থক্য ইহাই। মুমিনের এই ঈমান বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য কর্তব্য যে, প্রত্যেকটি জিনিসের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন ও আজ্ঞাধীন রহিয়াছে।

এই দৃষ্টিতে আলোচ্য হাদীছের উপরোল্লিখিত বিষয়টি অনুধাবন করা অতি সহজ। কারণ, বাহ্যতঃ আবহাওয়া, বায়ু-বাতাসের প্রতিক্রিয়ায় পচনের সৃষ্টি হইয়া থাকে; কিন্তু বায়ু-বাতাসের এই ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা আল্লাহ তাআলার নিয়ন্ত্রণাধীন ও আজ্ঞাধীন। ইহার নমুনা পবিত্র কোরআনে তৃতীয় পারা দ্বিতীয় রুকুতে বর্ণিত হযরত 'ইউশা (আঃ) নবীর ঘটনা। সেই ঘটনায় সাধারণ পানাহারীয় পচনশীল বস্তু কোনরূপ বাহ্যিক (preservation বা Refregeration) রক্ষা ব্যবস্থা ব্যতিরেকে শুধু আল্লাহর কুদরতে দীর্ঘ একশ'ত বৎসরেও পচে নাই বলিয়া পবিত্র কোরআনেই স্পষ্ট বিবরণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ -

"বরং তুমি একশ'ত বৎসর মৃত অবস্থায় রহিয়াছ; কিন্তু তোমার খাদ্য ও পানীয় বস্তুগুলি দেখ, ঐগুলি বিকৃত হয় নাই– পচে নাই, দুর্গন্ধী হয় নাই।"

সুতরাং ইহা বিশ্বাস করা অতি সহজ যে, বায়ু-বাতাসের মধ্যে এই ক্রিয়া সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার আদেশেই সৃষ্টি হইয়াছে এবং আলোচ্য হাদীছের মর্ম এই যে, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক বায়ু-বাতাসের মধ্যে এই তেজস্ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি বনী ইসরাঈলদের উল্লিখিত ঘটনার ফলেই হইয়াছে।

আলোচ্য হাদীছের দ্বিতীয় বাক্যটি হযরত আদম ও হাওয়ার নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত।

এই ঘটনায় আদম (আঃ) কর্তৃক স্বীয় ক্ষতিকর কার্যে পতিত হওয়ার মধ্যে তাঁহার স্ত্রী হাওয়ার প্রভাবও অনেকটা অগ্রসরকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সন্তান-সন্ততি মাতা-পিতার দোষ-গুণের ধারক হওয়া স্বাভাবিক। সেই সূত্রেই মেয়েরা আদি মাতা হাওয়ার ঐ দোষটুকু এখনও বহন করিয়া থাকে। তাহারা অনেক সময় নিজ নিজ স্বামীকে প্রভাবান্বিত করিয়া তাহাকে তাহারই ক্ষতিকর কার্যে লিপ্ত করিয়া থাকে। আলোচ্য হাদীছের দ্বিতীয় অংশের তাৎপর্য ইহাই। এই তথ্য প্রকাশ করিয়া রসূল (সঃ) দুইটি উপদেশের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। প্রথম এই যে, স্ত্রী যতই জ্ঞানসম্পন্ন হউক না কেন, স্বামীকে অবশ্যই সতর্ক থাকিতে হইবে; কোন কাজেই নিজের সতর্কতার মধ্যে শিথিল হইয়া স্ত্রীর দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবে না, বরং প্রথম হইতেই সতর্ক থাকিবে। কেননা, স্বামীকে, প্রভাবান্বিত করার কলা-কৌশল, ছলনা, চাতুরী ও দক্ষতা নারীদের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় এই যে, কোন স্ত্রীর দ্বারা এরূপ কিছু সংঘটিত হইয়া গেলে তখন যথাসম্ভব এই ভাবিয়া তাহাকে ক্ষমা করিবে যে, এই স্বভাব ত আদি মাতার মীরাস।

হযরত আদমের ইতিহাস হইতে শিক্ষালাভ

ভূমিকায় বলা হইয়াছে, পবিত্র কোরআনে অনেক অনেক ঘটনার বিবরণ ও ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু উহা কিস্‌সা-কাহিনী বা শুধু ইতিহাস পর্যায়ে নহে, বরং উপদেশ প্রদান ও উপদেশ গ্রহণ পর্যায়ে। বাস্তবিকই পবিত্র কোরআনে বর্ণিত ঘটনাবলীর মাধ্যমে বহু মূল্যবান উপদেশ লাভের সুযোগ রহিয়াছে।

হযরত আদম আলাইহিস সালামের ইতিহাস একটি বিশেষ উপদেশমূলক ইতিহাস। ইহার মধ্যে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বিভিন্ন প্রকার উপদেশের বিষয়বস্তু রহিয়াছে। এস্থলে নমুনাস্বরূপ দুইটি উপদেশের

বিবরণ দান করা হইতেছে।

প্রথম উপদেশ ঃ ইবলীস শয়তানের সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সে যে আমাদের কত বড় শত্রু তাহা মনে প্রাণে উপলব্ধি করা। পবিত্র কোরআনের বহু জায়গায় ঘোষণা রহিয়াছে– শয়তান মানব জাতির পরম শত্রু। চিরজীবন তাহাকে পরম শত্রু গণ্য করিয়াই চলিবে। পরম দয়ালু আল্লাহ তাআলা মানবকে লক্ষ্য করিয়া তাহাই বলিয়াছেন, اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكَ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا "নিশ্চিতরূপে জানিয়া শুনিয়া মনে গাথিয়া লইও – শয়তান তোমাদের শত্রু। অতএব তাহাকে চিরকাল শত্রুই গণ্য করিও।"

(পারা-২২; রুকু ১৩)

শয়তানকে মিত্রের পর্যায়ে রাখা, তাহার মন্ত্রণা ও পরামর্শ গ্রহণ করা তথা আল্লাহ ও আল্লার রসূলের আদেশ বিরোধী কাজ করা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কারণ হইবে। আল্লাহ তাআলা বান্দাহদিগকে ১৫-পারা; ১৯ রুকুতে তাহাই বুঝাইয়াছেন–

اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِىْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ....

"হে মানব! তোমরা কি শয়তানকে এবং তাহার দলবল, চেলা-চামুণ্ডাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতেছ আমাকে ছাড়িয়া? অথচ শয়তান ও তাহার চেলারা তোমাদের ঘোর শত্রু। (দয়াল প্রভুর পরিবর্তে পরম শত্রু শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণকারী) জালেম স্বৈরাচারীদের এই বিনিময় গ্রহণ কতই না জঘন্য! কতই না দুর্ভাগ্যজনক!"

শয়তান আমাদের নূতন শত্রু নহে। সে আমাদের আদি পিতা-মাতা আদম ও হাওয়াকে বেহেশত হইতে বাহির করার কারণ হইয়াছিল, আমাদিগকেও সেই বেহেশত হইতে চিরবঞ্চিত করায় সচেষ্ট; সদা-সর্বদা তাহার হইতে সতর্ক থাকিতে হইবে। আল্লাহ তাআলা সেই বিষয়েই আমাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন–

يٰبَنِىْ اٰدَمَ لاَ يُفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ـ

হে আদম সন্তান! সতর্ক থাকিও, শয়তান যেন তোমাদিগকে কুপথে ফেলিয়া ক্ষতিগ্রস্ত (তথা বেহেশত হইতে বঞ্চিত) করিতে না পারে; যেরূপ সে প্রবঞ্চনা দিয়া তোমাদের আদি মাতা-পিতাকে বেহেশত হইতে বাহির করিয়াছিল, তাহাদের পরিধেয় পোশাক অপসারিত করিয়া পরস্পরের সম্মুখে তাহাদের গুপ্তাঙ্গ উন্মুক্ত করিয়াছিল।

اِنَّهٗ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ ـ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ ـ وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَا اٰبَاءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ـ

জানিয়া রাখিও, শয়তান এবং তাহার দলবল তোমাদিগকে এমন কায়দায় দেখিতে পায় (এবং প্রবঞ্চনার সুযোগ পায়) যে, তোমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাও না। আমি (পরীক্ষার্থ) ঈমান উপেক্ষাকারীদের জন্য শয়তানকে বন্ধু বানাইবার সুযোগ করিয়া দিয়াছি। আর (তাহাদের পরিচয় এই যে, যখন তাহারা ফাহেশা-নির্লজ্জ কার্যে লিপ্ত হয় তখন (সদুপদেশদাতাকে) বলিয়া থাকে, আমাদের পূর্বপুরুষদের হইতে এই রীতিই চলিয়া আসিয়াছে। এমনকি তাহারা মিথ্যারূপে এই দাবীও করে যে, আল্লাহই আমাদেরকে ইহা করিতে আদেশ করিয়াছেন।

قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ ـ قُلْ اَمَرَ رَبِّىْ

بِالْقِسْطِ وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ - كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ -

(হে মুসলমানগণ!) তোমরা বলিয়া দাও, নিশ্চয় (তোমাদের দাবী মিথ্যা), ফাহেশা নির্লজ্জ কার্যাবলী আল্লাহ তাআলার অনুমোদিত হয় না। বড়ই দঃখজনক কথা যে, তোমরা আল্লাহর উপর এমন দাবী করিতেছ যাহার কোন প্রমাণ দিতে তোমরা সক্ষম হইবে না। বলিয়া দাও, আমাদের প্রভু ন্যায়ের আদেশ করিয়াছেন এবং জীবনের প্রতি স্তরে একমাত্র তাঁহার উদ্দেশ্যে, একমাত্র তাঁহারই প্রতি মাথা নত করিবে, আর প্রভুর দায়িত্ব একনিষ্ঠতার সহিত পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করিবে– এই আদেশ করিয়াছেন। (এবং সকলকে সতর্কবাণীও শুনাইয়া দিয়াছেন যে, হিসাব-নিকাশের জন্য আমার দরবারে উপস্থিত হইতে হইবে। উহার জন্য) যেভাবে তিনি তোমাদিগকে প্রথমে সৃষ্টি করিয়াছেন তদ্রূপ (তাঁহারই কুদরতে পুনঃ) জীবিত হইয়া তাঁহার নিকট পৌছিবে।

فَرِيْقًا هَدٰى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ - اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ -

দুনিয়াতে এক শ্রেণীর লোক যাহারা (আল্লাহ ও রসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়াছে), তাহাদিগকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন। আর একদল লোক, তাহাদের উপর গোম্‌রাহীর ছাপ লাগিয়াছে– ইহারা হইল ঐ লোক যাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছে; তবুও তাহাদের ধারণা, তাহারা সঠিক পথেই আছে।

আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাগণকে তাহাদের চির শত্রু চিনাইয়া দিবার জন্য এবং তাহাদেরকে সেই শত্রু হইতে সতর্ক করিবার জন্য স্বীয় কালামে সেই শত্রু ইবলীসের বৃত্তান্ত জড়িত হযরত আদমের ঘটনা বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন।

দ্বিতীয় উপদেশ যাহা প্রত্যেকটি মানুষের পক্ষে চির জীবনের জন্য গলার মালারূপে গাঁথিয়া রাখার বস্তু– তাহা হইল এই যে, জ্বিন ও মানুষকে আল্লাহ তাআলা যেই ধাতে তৈয়ার করিয়াছেন উহা দৃষ্টে বলিতে বাধ্য হইতে হয় যে, মানুষ মাত্রই ভুল-ত্রুটি হওয়া মোটেই বিচিত্র নহে। নবীগণের দ্বারা গোনাহ অনুষ্ঠিত হইতে পারে না, তাঁহারা হইলেন মা'সুম আল্লাহ তাআলা কর্তৃক সমুদয় গোনাহ হইতে সুরক্ষিত; কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা এরূপ কাজ হইতে পারে যাহা গোনাহ ত নহে; হাঁ তাঁহারা যে নৈকট্যের অধিকারী উহা দৃষ্টে ত্রুটি বিচ্যুতি বলা যাইতে পারে; অবশ্য এইরূপ ক্ষেত্রেও তাঁহাদের সংশোধনের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তাআলা লইয়া রাখিয়াছেন।

কারও দ্বারা ভুল-ত্রুটি বা অপরাধ সংঘটিত হইলে তখন কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে এবং কোন পথ ধরিতে হইবে ইহা একটি কঠিন সমস্যা। এই ক্ষেত্রে ইবলীসের পথ ছিল তওবা এস্তেগফার না করিয়া অপরাধের উপর হটকারিতা করা। ইহাই তাহার জন্য চির ধ্বংসের কারণ হইয়াছে এবং যে কেহ এই পথে অনুসরণ করিবে সেও চির ধ্বংসে পতিত হইবে। পক্ষান্তরে হযরত আদম ও হাওয়া এই সমস্যার মুখে যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের জন্য ধ্বংস হইতে শুধু রক্ষাকবচই ছিল না, বরং চির উন্নতির সোপানও ছিল বটে।

সেই পথ হইল انابة الى الله আল্লাহর প্রতি আত্মনিবেদিত হওয়া। গোনাহ-খাতা, ভুল-ত্রুটি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রভুপানে পুন-প্রত্যাবর্তন, প্রভুর দরবারে নিজেকে বিলীন করিয়া দেওয়া; খালেস তওবা-এস্তেগফার করা। প্রত্যেক মানুষকে আদি পিতা আদমের অনুসারী হইতে হইবে, অন্যথায় ধ্বংস অনিবার্য।

বিশ্ব-মানব সকলেই আদমের বংশধর

মানব জাতির মূল বা উৎপত্তিস্থল কি? সে সম্পর্কে ইসলাম তথা কোরআন হাদীছ অর্থাৎ স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা এবং তাঁহার প্রতিনিধি রসূলের বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে স্পষ্ট উক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ সব উপেক্ষা করা বা ডারউইনের ন্যায় কোন মানুষের উক্তিকে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ও তাঁহার প্রতিনিধির উক্তির উপর প্রাধান্য দেওয়া ভ্রান্তি ও মূর্খতা ছাড়া আর কি হইতে পারে?

ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত আদম সম্পর্কে যে কয়টি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে দ্বিতীয় হাদীছটিতে على صورة ابيهم ادم বাক্যে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে, হযরত আদমই মানব জাতির আদি পিতা। দ্বিতীয় তৃতীয় হাদীছটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত হাওয়া মানব জাতির আদি মাতা। এতদ্ভিন্ন নিম্নে বর্ণিত হাদীছটি হযরত আদম বিশ্ব মানবের আদি পিতা হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ।

১৬২২। হাদীছ ঃ عَنْ اَنَسٍ يَرْفَعُهُ اَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ لِاَهْوَنِ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا لَوْ اَنَّ لَكَ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اَكُنْتَ تَفْتَدِىْ بِهٖ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ سَاَلْتُكَ مَا هُوَ اَهْوَنُ مِنْ هٰذَا وَاَنْتَ فِىْ صُلْبِ اٰدَمَ اَنْ لَّا تُشْرِكَ بِىْ فَاَبَيْتَ اِلَّا الشِّرْكَ ـ

অর্থঃ আনাছ (রাঃ) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ তাআলা দোযখবাসীদের মধ্য হইতে সর্বাধিক সহজ ও কম আযাব ভোগকারী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিবেন, দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদ যদি তোমার হাসিল হইয়া যায় তবে তুমি এই আযাব হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ঐ সব ধন-সম্পদ ব্যয় করিয়া দিতে আগ্রহান্বিত হইবে কি? সে উত্তর করিবে, হাঁ- নিশ্চয়। তখন আল্লাহ তাআলাবলিবেন, আমি এতদপেক্ষা অতি সহজ একটি বিষয়ের অঙ্গীকার তোমার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া ছিলাম, তখন তুমি আদমের পৃষ্ঠদেশে ছিলে। অঙ্গীকারটি এই যে, তুমি একমাত্র আমাকেই মাবূদরূপে গ্রহণ করিবে; আমার কোন শরীক সাব্যস্ত করিবে না; কিন্তু (পরবর্তী জীবনে) তুমি সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছ- আমার শরীক সাব্যস্ত করিয়াছ।

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীছে যে অঙ্গীকার গ্রহণ প্রসঙ্গ উল্লেখ আছে, উহা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের আয়াতও রহিয়াছে। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন-

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ ـ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى ـ شَهِدْنَا ـ

"ঐ ঘটনা স্মরণ কর যে, তোমার সৃষ্টিকর্তা যখন আদম সন্তানকে পরম্পরা তাহাদের পিতার পৃষ্ঠদেশ হইতে বাহির করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞা করাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন- "আমি কি তোমাদের মাবূদ নহি? সকলেই বলিয় ছিল, হাঁ নিশ্চয়ই- আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি (যে, আপনিই আমাদের মাবুদ)। (পারা-৯; রুকু-১২)

নাসায়ী শরীফের একটি হাদীছ দৃষ্টে পূর্বাপর আলেমগণ এই আয়াতের তফসীর ইহাই করিয়াছেন যে, হযরত আদম (আঃ) হইতে তাঁহার ঔরসে সন্তানগণকে এবং সেই সন্তানগণ হইতে তাহাদের নিজ নিজ ঔরসের সন্তানগণকে- এইরূপে বংশ পরম্পরায় সকল মানবকে আল্লাহ তাআলা অতি ক্ষুদ্র আকারে বাহির করিয়া প্রশ্নোত্তরের পর নিজ নিজ স্থানে পুনঃ রাখিয়া দিয়াছিলেন।

ঔরসের সন্তানদের বেলায় সরাসরি এবং পরবর্তীদের বেলায় পরম্পরের মাধ্যমে কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত

মানব জাতির মূল হইল হযরত আদম (আঃ)। এই সূত্রেই আলোচ্য হাদীছে উক্ত দোযখী ব্যক্তিকে আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশ হইতে বাহির করার কথা বলা হইয়াছে।

মানব জাতির আদি পিতা যে হযরত আদম (আঃ) পবিত্র কোরআনের আরও বিভিন্ন আয়াত দ্বারা এই তথ্যটি প্রমাণিত রহিয়াছে। যথা–

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ - ....

অর্থঃ হে বিশ্ব মানব! তোমরা ভয় কর তোমাদের পরওয়ারদেগারকে, তিনি তোমাদের সকলকে একটি প্রাণী হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐ প্রাণী হইতে উহার জোড়া ও পরিণীতা সৃষ্টি করিয়া তাহাদের উভয় হইতে অসংখ্য নর-নারী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং দুনিয়াতে আবাদ করিয়াছেন। (পারা– ৪; সূরা নিসা আরম্ভ)

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا -

অর্থঃ আল্লাহ তাআলাএমন নিপুণ কৌশলী ও শক্তিমান যে, তিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণী হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই প্রাণীটি হইতে উহার জোড়া– পরিণীতাকে বানাইয়াছেন, যাহাতে এই প্রাণীটি স্বীয় জোড়ার সঙ্গ লাভ করিয়া শান্তিময় জীবন যাপন করিতে পারে। (পারা–৯;রুকু–১৪)

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى ....

অর্থঃ হে বিশ্ব মানব! আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী হইতে এবং তোমাদিগকে বিভিন্ন গোত্রে ভাগ করিয়া দিয়াছি পরস্পর পরিচয়ের জন্য। (পারা– ২৬; রুকু– ১৬)

প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে نفس নফস" শব্দের অর্থ প্রাণী এবং উহার উদ্দেশ্য হযরত আদম (আঃ) زوجها যাওজাহা" শব্দের অর্থ ঐ প্রাণীর জোড়া বা স্ত্রী এবং উহার উদ্দেশ্য হাওয়া (আঃ) ইহা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগ হইতে আজ পর্যন্ত তফসীরকারগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। আলোচ্য পরিচ্ছেদের হাদীছসমূহও এই সিদ্ধান্তই প্রমাণিত করিয়াছে।

দ্বিতীয় আয়াতে যে বলা হইয়াছে لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ঐ নফস স্বীয় জোড়ার সঙ্গ লাভ করিয়া শান্তি লাভ করিবে" এই তথ্য দ্বারা نفس নফস শব্দের অর্থ যে প্রাণী এবং উহা যে কোন উপাদান, সত্তা-মূল ইত্যাদি জড় পদার্থ নহে, তাহা স্পষ্টতই প্রমাণিত হইয়া যায়। তৃতীয় আয়াতে ذكر যাকারুন একজন পুরুষ انثى উনসা" একজন স্ত্রী শব্দদ্বয়, نفس নফ্স শব্দের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়া সমুদয় বিভ্রান্তির অবসান ঘটাইয়া দিয়াছে। কারণ, পুরুষ ও স্ত্রী একমাত্র প্রাণীই হয়,উপাদান ও পদার্থ তাহা হয় না।

পারা– ৮; রুকু– ১০ সূরা আ'রাফের আয়াত–

يٰبَنِىْ اٰدَمَ لاَ يُفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ ......

এই আয়াতখানা সম্পূর্ণরূপে অনুবাদসহ ৩৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। এই আয়াতে দুইটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়–প্রথম এই যে, সমুদয় মানব সমাজকে "আদম-সন্তান" বলিয়া সম্বোধনপূর্বক আদি মাতা-পিতার ঘটনার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করায় আদম (আঃ) যে বিশ্ব মানবের আদি পিতা তাহা স্পষ্টরূপেই প্রমাণিত হয়।

দ্বিতীয় এই যে, এই আয়াতে كَمَا اَخْرَجَ اَبَوَيْكَ مِنَ الْجَنَّةِ 'যেভাবে শয়তান তোমাদের মাতা-পিতাকে বেহেশত হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছে" বলা হইয়াছে ইহা সেই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত যেই ঘটনার বিবরণ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আছে (পারা– ৮; রুকু - ৯)। উহাতে স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে যে–

(১) শয়তান আদম ও হাওয়া উভয়কে অছঅছা প্রদান করিয়াছিল।

(২) শয়তান তাঁহাদের উভয়ের নিকট কসম খাইয়া বলিয়াছিল যে, আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী।

(৩) শয়তান তাঁহাদের উভয়কে প্রবঞ্চনা দিয়া তাঁহাদের দৃঢ়তার মধ্যে থিথিলতার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল।

(৪) আদম ও হাওয়া নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের উভয়ের বেহেশতী পোশাক খসিয়া পড়িয়া গিয়াছিল এবং তাঁহারা বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজ নিজ গুপ্ত অঙ্গে আবরণ সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছিলেন।

(৫) পরওয়ারদেগার তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের উভয়কে অভিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা পরওয়ারদেগারের দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হইয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন পারা– ১৬; রুকু– ১৬ সূরা ত্বা-হার মধ্যেও এই ঘটনার বিবরণ রহিয়াছে, মূল আয়াত অনুবাদসহ ২৬ পৃষ্ঠায় দেখুন। সেই আয়াতে বিবৃতির আরম্ভ এইরূপ– আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি ফেরেশতাগণকে আদেশ করিয়াছিলাম আদমের প্রতি সেজদা করার জন্য, তাঁহারা সকলেই সেজদা করিলেন, কিন্তু ইবলীস তাহা অস্বীকার করিল। অতঃপর আমি বলিয়া দিলাম, হে আদম! এই ইবলীস তোমার এবং তোমার স্ত্রীর শত্রু, সে যেন তোমাদিগকে বেহেশত হইতে বাহির করিতে না পারে, অন্যথায় তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া যাইবে।

পাঠকবৃন্দ! এইসব তথ্য পবিত্র কোরআনে স্পষ্টরূপেই বর্ণিত হইয়াছে। এইসব তথ্যদৃষ্টে বক্ষ্যমান আয়াতে উল্লিখিত كَمَا اَخْرَجَ اَبَوَيْكُ مِنَ الْجَنَّةِ 'যেরূপ তোমাদের সকলের মাতা-পিতাকে বেহেশত হইতে বহিষ্কার করিয়াছে।" এ স্থলে اَبَوَيْكُمْ তোমাদের মাতা-পিতা" বলার একমাত্র উদ্দেশ্য যে হযরত আদম ও হাওয়া, এ সম্পর্কে কোনরূপ দ্বিমতের অবকাশ থাকিতে পারে কি?*

পবিত্র কোরআনের উল্লিখিত চারিটি আয়াত ও আলোচ্য পরিচ্ছেদের তিনটি হাদীছ ব্যতীত হযরত আদম যে মানব জাতির আদি পিতা সে সম্পর্কে অতি স্পষ্ট আরও দুইখানা হাদীছ রহিয়াছে, যাহা বোখারী শরীফেরই অন্যত্র বর্ণিত আছে এবং হাদীছের অন্যান্য গ্রন্থেও বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথম হাদীসটির অংশবিশেষ এই যে, মে'রাজ শরীফের ঘটনায় হযরত আদমের সঙ্গে প্রথম আসমানে হযরত রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। প্রত্যেক আসমানেই

বিভিন্ন নবীগণ হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাঁহার ঐ সফরে সম্বর্ধনা জানাইবার উদ্দেশে উপস্থিত ছিলেন এবং সম্বর্ধনাসূচক সম্ভাষণে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন প্রথম আসমানে পৌছিলেন, তখন তথায় হযরত আদম (আঃ) উপস্থিত ছিলেন। জিব্রাঈল (আঃ) প্রথমে হযরত আদমের সঙ্গে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরিচয় করাইতে যাইয়া যে বাক্যটি ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা বহু হাদীছে উল্লেখ আছে এবং বিশেষ লক্ষণীয় বাক্যটি এই هَذَا اَبُوكَ اٰدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ "ইনি আপনার আদি পিতা আদম, তাঁহাকে সালাম করুন।"

হযরত আদম (আঃ) সালামের উত্তর দান করতঃ স্বাগত জানাইয়া বলিলেন, مَرْحَبًا بِالْاِبْنِ الصَّالِحْ وَالنَّبِىِّ الصَّالِحِ "মহান পুত্র মহান নবীর প্রতি মারহাবা।" (বোখারী শরীফ)

দ্বিতীয় হাদীছটির অংশবিশেষ এই যে, হাশরের ময়দানে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ যখন ভয়ঙ্কর অবস্থার সম্মুখীন হইবে তখন আল্লাহ তাআলার নিকট সুপারিশ করাইবার জন্য তাহারা সমবেতভাবে সর্বপ্রথম হযরত আদম আলাইহিস্সালামের নিকট যাওয়া সাব্যস্ত করিবে এবং পরস্পর বলিবে–

اَلَا تَنْظُرُوْنَ اِلٰى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ اِلٰى رَبِّكُمْ فَيَقُوْلُ بَعْضُ النَّاسِ اَبُوْكُمْ اٰدَمُ فَيَاتُوْنَهُ

---

* ইসলামের দাবী করিয়া যাহারা পরোক্ষভাবে ডারউইনের ন্যায় অমুসলিমের মতবাদের প্রতি অধিক আগ্রহশীল, কিন্তু সর্বসাধারন সাধারণ মুসলিম সমাজের ভয়ে প্রকাশ্যে কোরআন-হাদীছ উপক্ষো করার সাহস পায় না; এই শ্রেণীর লোকগণের মুখপাত্র একজন পণ্ডিত তফসীরকার "হযরত আদম মানব জাতির আদি পিতা।" এ প্রসঙ্গটির বিরোধিতা করিবার গোপন ইচ্ছা লইয়া আলোচ্য আয়াতের যেসব বিকৃত অর্থ করিয়াছেন, উল্লিখিত তথ্যসমূহ দৃষ্টে উহার অসারতা অতি সহজেই প্রতীয়মান হয়।

فَيَقُوْلُوْنَ يَا اٰدَمُ اَنْتَ اَبُوْكَ الْبَشَرِ ـ

"কেয়ামতের মাঠে যখন সুপারিশকারী তালাশ করা হইবে, তখন বলা হইবে, সকলের আদি পিতা আদম (আঃ) এই কার্যের উপযোগী। অতপর তাহারা হযরত আদম (আঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইবে এবং বলিবে, আপনি মানব জাতির আদি পিতা। আপনাকে আল্লাহ তাআলা বিশেষ কুদরতের দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং এইরূপে আপনার মধ্যে আত্মা দান করিয়াছিলেন এবং ফেরেশতাদিগকে আপনার প্রতি সেজদার আদেশ করিয়া আপনাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন এবং বেহেশতের মধ্যে স্থান দান করিয়াছিলেন। আপনি আল্লাহ তাআলার নিকট আমাদের এই ভয়ঙ্কর অবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ করুন।

কিন্তু আদম (আঃ) নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার ব্যাপারে স্বীয় ত্রুটির উল্লেখ করিয়া নিজের সম্পর্কে আতঙ্ক ও ভীতি ও প্রকাশ করতঃ নূহ আলাইহিস্ সালামের নিকট যাইবার জন্য সকলকে পরামর্শ দিবেন। (বোখারী শরীফ)

এক হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে যে, আদি-অন্তের বিশ্ব মানব সকলেই হাশরের দিন হযরত আদমকে "মানব জাতির আদি পিতা" বলিয়া উল্লেখ করিবে এবং সম্বোধনকালে তাঁহাকে "বিশ্ব মানবের আদি পিতা" আখ্যায়িত করিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আল্লাহ তাআলার কুদরতে সৃষ্ট আদম (আঃ) মানব জাতির আদি পিতা– এই সত্যের একটি বহিঃপ্রকাশ পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তাআলা ভূপৃষ্ঠে মানবের বসতি স্থাপন এবং তথায় আদম (আঃ)-কে অবতীর্ণ করার পূর্বে ভূপৃষ্ঠের ভাবী বাসিন্দা মানবগণ হইতে আল্লাহর প্রভুত্বের স্বীকৃতি গ্রহণ পর্বের এক অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। উক্ত ঘটনা সম্পর্কে একটি হাদীছ এবং মূল ঘটনার বিবরণীর একটি আয়াত তথায় উল্লেখ হইয়াছে।

মেশকাত শরীফ ২৪ পৃষ্ঠায় এক হাদীছে সেই অনুষ্ঠানের বিবরণীতে বলা হইয়াছে, হযরত আদমের পৃষ্ঠদেশ হইতে (পুরুষ-পরম্পরারূপে) ভাবী সৃষ্ট সকল মানুষকে বাহির করা হইয়াছিল। فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا মানুষগুলিকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পিপীলিকা পরিমাণ দেহাকৃতিতে রূপায়িত করিয়া তাহাদের সমাবেশে মুখামুখিভাবে কথা বার্তার মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাহাদের হইতে স্বীয় প্রভুত্বের স্বীকৃতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে আদম পৃষ্ঠ হইতে শুধু মানবের ভাবী দেহ ক্ষুদ্র আকৃতিতে প্রকাশ করা হইয়াছিল। মানবের রূহ বা আত্মা সৃষ্টি সম্পর্কে একটি বিশেষ তথ্য নিম্নে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে.

১৬২৩। হাদীছ ঃ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْاَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ ـ

অর্থ ঃ আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, সমস্ত আত্মা (বহু পূর্ব হইতেই সৃষ্ট হইয়া এক বিশেষ এলাকায়) সমাবেশিত ছিল। তথায় যেসব আত্মার পরস্পর পরিচয় ও মিল হইয়াছিল ভূপৃষ্ঠে আসার পর তাহাদের পরস্পর আকর্ষণ জন্মে এবং পরস্পর সদ্ভাব ও মিল সৃষ্টি হয়। আর তথায় যেসব আত্মার মধ্যে পরস্পর গরমিল ছিল, ভূপৃষ্ঠে আসার পর তাহাদের মধ্যে গরমিলই হয়।

(ইহজগত ভিন্ন অন্য এক বিশেষ এলাকায় আল্লাহ তাআলা কর্তৃক আত্মাসমূহ সমাবেশিত আছে; তথা হইতেই জন্ম লাভকারী প্রত্যেক মানবের দেহে তাহার আত্মা আসে। উক্ত এলাকাকে আলমে আরওয়াহ বা আত্মা জগত বলা হয়।)

হযরত নূহ (আঃ)

হযরত আদমের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শীছ্ (আঃ) নবুয়ত প্রাপ্ত হইলেন। শীছ্ আলাইহিস সালামের উল্লেখ পবিত্র কোরআনে আসে নাই, হাদীছে এবং ইতিহাসে উল্লেখ রহিয়াছে। হযরত শীছ্ (আঃ)-এর পরে কোন নবী ছিলেন সে সম্পর্কে একটু মতভেদ আছে। কোন কোন ঐতিহাসিক হযরত ইদ্রীস (আঃ)-এর নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে হযরত শীছ (আঃ)-এর প্রপৌত্রের পৌত্র বলিয়াছেন এবং তাঁহারা নূহ (আঃ) কে ইদ্রীস (আঃ)-এর প্রপৌত্রের পুত্র বলিয়াছেন। আর কেহ কেহ নূহ (আঃ)-কে ইদ্রীছ (আঃ)-এর পৌত্র বলিয়াছেন।

অপর একদল ঐতিহাসিক বলেন যে, হযরত শীছ্ (আঃ)-এর পরবর্তী নবী হযরত নূহ (আঃ) ছিলেন। ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহে আলাইহের বর্ণনার ধারাবাহিকতায় মনে হয় তিনি এই মতামতকেই অগ্রগণ্য মনে করিয়াছিলেন।

ভূ-পৃষ্ঠের কোন্ অঞ্চলে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের আবির্ভাব হইয়াছিল, সে সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে উল্লিখিত একটি বর্ণনার দ্বারা কিঞ্চিৎ সন্ধান পাওয়া যায়। পবিত্র কোরআনে স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে যে, হযরত নূহের জাহাজ প্লাবনের পর "জুদী" পর্বতের উপর থামিয়া ছিল।

জুদী পর্বতের অবস্থান সম্পর্কে ভূগোলবিদদের বর্ণনায় যথেষ্ট মতদ্বৈধতা দেখা যায়। কেহ কেহ তাওরাতের বর্ণনা অনুসারে ইহাকে "আরারাত" পর্বতমালার একটা পর্বত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। কোন কোন ভূগোলবিদ উহাকে "কুর্দিস্তানে" বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ "ইবনে ওমর দ্বীপ" নামক দ্বীপে অবস্থিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইমাম বোখারী (রঃ)-ও লিখিয়াছেন যে, "জুদী" পর্বত একটি বিশেষ দ্বীপে অবস্থিত। কাস্তালানী নামক (বোখারী শরীফের শরাহ্) কিতাবে ঐ দ্বীপকে "ইবনে ওমর দ্বীপ" বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। কোন কোন ভূগোল বিশারদ এই পর্বতটিকে ইরাকের "মোসেল" অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিভিন্ন নাম দৃষ্টে এই সব উক্তিকে বিভিন্ন মতামত বলা যায় বটে, কিন্তু মানচিত্রে দেখা যায়, উল্লিখিত স্থানগুলি সবই প্রায় কাছাকাছি এবং "মোসেল" অঞ্চলের সীমান্তে অবস্থিত।

এশিয়ার অন্তর্গত ইরাকের উত্তরাংশে উহারই প্রদেশ "মোসেল" (বাংলা মানচিত্রে "মোসেল"—বর্তমানে তৈল সমৃদ্ধ) এলাকা। এই এলাকাটি পশ্চিমে সিরিয়া, পূর্বে ইরান, উত্তরে তুরস্ক দ্বারা বেষ্টিত। এই 'মোসেল' এলাকার উত্তর সীমান্তে "দিজ্লা" (তাইগ্রীস) ও "ফোরাত" (ইউফ্রেটিস) নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী প্রান্তে অর্থাৎ "দিজ্লা" নদীর কূলে "ইবনে ওমর দ্বীপ" অবস্থিত। ইহার অনতিদূরে "মোসেল" এলাকার উত্তর-পূর্ব সীান্তে "আরারাত" পর্বতমালা এবং উহার সীমানা সংলগ্নেই "কুর্দিস্তান" (যাহার তুরস্কস্থ "আর্মেনিয়া" এলাকার দক্ষিণ-পূর্ব সীমানায় "মোসেল" এলাকা সংলগ্ন) পার্বত্য এলাকা— এই নিকটবর্তী ও লাগালাগি বিভিন্ন নামীয় স্থানসমূহের এলাকায়ই "জুদী" পর্বত অবস্থিত।

মোট কথা, এশিয়ার অন্তর্গত ইরাকস্থিত 'মোসেল' এলাকার উত্তর সীান্তে নূহ (আঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীগণ তুফানের পর জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়ছিলেন।

পবিত্র কোরআনে নূহ আলাইহিস সালামের ঘটনা বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত আছে। সমষ্টিগতভাবে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, নূহ (আঃ)-এর জাতি ওয়াদ্দ, সুয়া, ইয়াগূস, ইয়াউক, নসর এবং আরও বিভিন্ন রকমের দেব-দবীর পূজা করিত। নূহ (আঃ) চল্লিশ বৎসর বয়সে নবুয়ত লাভে স্বীয় জাতিকে এই সব শেরকী কার্য হইতে বিরত রাখার এবং এক আল্লাহর বন্দেগী করার প্রতি আহ্বান জানাইতে লাগিলেন এবং এই কার্যে তিনি সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করিলেন। তাঁহার এই চেষ্টা দীর্ঘ নয়শ'ত পঞ্চাশ বছরকাল চলিল; এই দীর্ঘ পরিশ্রমের ফলাফলস্বরূপ সর্বোচ্চ সংখ্যার মতামত হিসাবেও শুধু মাত্র ৮০ জন পুরুষ ৮০ জন নারী— সর্বমোট ১৬০ জন লোক ঈমান আনিল; আর কেহ ঈমান আনিল না। এমনকি অন্য কাহারও ঈমান গ্রহণের আশা বা সম্ভাবনাও রহিল না।

যখন নূহ (আঃ) অকাট্যরূপে স্বয়ং আল্লাহ তাআলার অহী দ্বারা জ্ঞাত হইলেন যে, অতপর আর একজনও ঈমান আনিবে না, তখন তিনি সেই কাফেরদের প্রতি বদ দোয়া করিলেন। আল্লাহর নিকট তাহাদের ধ্বংস কামনা করিলেন।

আল্লাহ তাআলা তাহাদিগকে ধ্বংস করিবেন বলিয়া হযরত নূহকে জানাইয়া দিলেন; তাহারা পানিতে ডুবিয়া মরিবে, ইহাও নির্দিষ্টরূপে জানাইয়া দিলেন এবং তাঁহাকে একটি জলযান জাহাজ বা বড় নৌকা তৈয়ার করার আদেশ করিলেন।

হযরত নূহ (আঃ) স্বয়ং বা নিজস্ব কোন লোকের সাহায্যে আল্লাহ তাআলার বিশেষ নির্দেশাবলী মতে সেই জাহাজ তৈয়ার করিতে লাগিলেন। দেশীয় লোক জাহাজ বানাইতে দেখিয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত। হযরত নূহ তাহাদিগকে শুধু এই বলিতেন যে, এখন তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্রূপ করিতেছ, কিন্তু এমন একটি সময় আসন্ন যখন আমরা তোমাদের প্রতি বিদ্রূপ করার সুযোগ পাইব।

আল্লাহ তাআলা হযরত নূহকে পূর্বে নিষেধ করিয়া দিলেন যে, যখন কাফের বিদ্রোহীদের উপর আল্লাহর গজবের তান্ডবলীলা বহিতে থাকিবে, তখন তাহাদেরকে ক্ষমা করা সম্পর্কে আপনি কোন কথাই আমার নিকট বলিবেন না।

আল্লাহ তাআলা হযরত নূহকে আসন্ন ঘটনা উপস্থিতির নিদর্শনও জানাইয়া দিলেন। যখন মাটি ফাটিয়া পানি উথলিয়া উঠিতে দেখিবেন তখনই মনে করিবেন ভয়াবহ ঘটনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে; তৎক্ষণাৎ ঈমানদার সঙ্গীগণকে এবং পশু-পক্ষীর এক এক জোড়াকে সঙ্গে লইয়া জাহাজে আরোহণ করিবেন।

কিছু দিনের মধ্যে একদিন হঠাৎ মাটি ফাটিয়া পানি উথলিয়া উঠিল। নির্দেশ মোতাবেক পশু-পক্ষীর জোড়াগুলি জাহাজে উঠাইলেন এবং ঈমানদার সঙ্গীগণকে আল্লাহর নাম লইয়া জাহাজে আরোহণ করিতে আদেশ করিলেন। মুহূর্তের মধ্যে বিভীষিকাময় আকারে তুফান জলোচ্ছ্বাস আরম্ভ হইল। হযরত নূহের জাহাজ পানি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গমালার মধ্যে ভাসিতে লাগিল।

হযরত নূহের চারি পুত্র ছিল– হাম, সাম, ইয়াফেছ ও কেনান। প্রথম তিন জন ঈমানদার ছিলেন। তাঁহারা পিতার সঙ্গে জাহাজে আরোহণ করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ ছেলে কেনান কাফের ছিল, সে জাহাজে আরোহণ না করিয়া উঁচু পর্বতের দিকে ছুটিল। হযরত নূহ পিতৃ-সুলভ স্নেহ-মহব্বতে অভিভূত হইয়া পুত্রকে শেষবারের মত চূড়ান্ত ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করার চেষ্টাস্বরূপ জাহাজে আরোহণের জন্য ডাকিলেন; কিন্তু পূর্বকৃত কর্মের ফলাফল আজ তাহাকে ভুগিতে হইবে, তাই সে পিতার আহ্বান এই বলিয়া উপেক্ষা করিল যে, কোন উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় লইয়া জীবন রক্ষা করিব।

পিতা নূহ (আঃ) ঘটনার আগাগোড়া পূর্ণ অবহিত ছিলেন। তিনি পুত্রকে বুঝাইলেন, আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমতের স্থান আমার জাহাজ ব্যতীত কোন স্থান এই প্লাবন হইতে বাঁচাইতে পারিবে না। এই কথোপকথনের মধ্যে পাহাড় তুল্য বিরাট ঢেউ আসিয়া কেনানকে গ্রাস করিয়া নিল। নূহ (আঃ) পুত্র সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার দরবারেও অনেক কিছু বলিয়াছিলেন; কিন্তু আল্লাহ তাআলা সব কিছু প্রত্যাখ্যান করিয়া হযরত নূহকে ধমকের সুরে তাঁহার আবেদন প্রত্যাহার করার আদেশ এবং এই পুত্রকে স্বীকৃতিদানেও নিষেধ করিয়াছেন। ঈমান দৌলত না থাকিলে কোন প্রকার সম্বন্ধ ও গৌরবই কাজে আসে না– উক্ত ঘটনা ইহার প্রকৃষ্ট নজির। হযরত নূহের এক স্ত্রী কেনানের মাতাও কাফের ছিল; সেও ধ্বং হইয়াছিল। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে ২৮ পারা শেষ রুকুতে বিশেষ নজিরস্বরূপ তাহার উল্লেখও করিয়াছেন।

তওরাতের বর্ণনা দৃষ্টে সর্বনিম্ন সংখ্যা দৃষ্টে চল্লিশ দিন পর্যন্ত এই তুফান অব্যাহত রহিল। হযরত নূহের জাহাজ ভিন্ন ভূপৃষ্ঠের সমস্ত কিছু ডুবিয়া গেল, কাফের বিদ্রোহীরা নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। চল্লিশ দিন পরে তুফান থামিল। আল্লাহ তাআলা আকাশকে পানি বর্ষণে বিরত থাকার আদেশ করিলেন এবং যমীনকে উহার নিসৃত

পানি পুনঃ শোষণ করিয়া লওয়ার আদেশ করিলেন। অনতিবিলম্বেই প্লাবনের পানি হ্রাস পাইল।

হযরত নূহের জাহাজ "জুদী" পর্বতের উপর থামিল এবং আল্লাহ তাআলার আদেশে হযরত নূহ (আঃ) সঙ্গীগণকে লইয়া জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন। জনশূন্য পশু-পক্ষী গাছপালা বিহীন ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করিতে তাঁহাদের দেলে সংশয়ের সৃষ্টি হইতে পারে বিধায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা তাঁহাদিগকে সব রকমের বরকত, উন্নতি, মঙ্গল, কল্যাণ ও সুখ-শান্তির সুসংবাদের দ্বারা উৎসাহ বর্ধন করিলেন।

নূতনভাবে দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে আদম জাতের গোড়া পত্তন হইল। হযরত নূহের সঙ্গে জাহাজের মধ্যে কিছু সংখ্যক অন্যান্য লোকও ছিলেন বটে এবং তাঁহারাও এই গোড়াপত্তনের সময় দুনিয়াতে ছিলেন; কিন্তু তাহাদের বংশের ছেলছেলা চলিয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে কোনরূপ তথ্য পাওয়া যায় না। বরং ইতিহাসের সাক্ষ্যে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, দ্বিতীয়বার পৃথিবীর আবাদীর মধ্যে একমাত্র হযরত নূহের তিন পুত্র হাম, সাম ও ইয়াফেসের বংশধরগণই রহিয়াছে।

অন্যান্য মুমিন সঙ্গীগণের বংশের বিলুপ্তি ও সমাপ্তি ঘটিয়াছিল। কোরআনের স্পষ্ট ঘোষণায় ইহাই প্রমাণিত হয় وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبٰقِيْنَ "আমি শুধু নূহের বংশধরকেই বাকী রাখিয়াছিলাম!" (পারা-২৩; রুকু-৭)

এই সম্পর্কে তিরমিযী শরীফে একখানা হাদীছও বর্ণিত আছে, যাহাতে বর্তমান বিশ্ব-আবাদীর সমুদয় অঞ্চলের অধিবাসীগণকেই একমাত্র হযরত নূহের বংশে কেন্দ্রীভূতরূপে দেখান হইয়াছে। এই সূত্রেই হযরত নূহ (আঃ)-কে "আদমে ছানী" বা দ্বিতীয়। আদম বলা হয়; কেননা, বর্তমান বিশ্বের সমস্ত লোকই হযরত নূহের বংশধর।

হযরত নূহের বিবরণে কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلاَّ خَمْسِيْنَ عَامًا فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ـ

ইহা ঠিক ঘটনা যে,আমি রসূলরূপে পাঠাইয়া ছিলাম নূহকে তাঁহার জাতির প্রতি; তিনি তাহাদের মধ্যে (রসূলরূপে) পঞ্চাশ কম এক হাজার বৎসরকাল থাকিলেন।* (এত দিনের প্রচেষ্টায়ও তাহারা ঈমান আনিল না)। ফলে সর্বগ্রাসী তুফান তাহাদের ডুবাইয়া দিল; বস্তুতঃ তাহারা ছিল স্বৈরাচারী।

হযরত নূহের আবেদন ও জাতির বিরূপ উত্তর

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ـ

নিশ্চয় আমি নূহকে রসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম তাঁহার জাতির প্রতি। সেমতে তিনি বলিয়াছিলেন, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর এবাদত কর, তিনি ভিন্ন কেহ তোমাদের মা'বুদ হইতে পারেন না।

* হযরত নূহ আলাইহিস সালামের তাবলীগী কার্যকাল কোরআনের অকাট্য ঘোষণা দ্বারা প্রমাণিত হইল ৯৫০ বৎসর। তিনি ৪০ বৎসর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং জাহাজ হইতে অবতরণের পর ৬০ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন বলিয়া ছাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে (রূহুল মা'আনী) এবং তওরাতের বর্ণিত সর্বনিম্ন সংখ্যা দৃষ্টে তুফান ৪০ দিন স্থায়ী হয়িয়াছিল। এই সূত্রে হযরত নূহের সর্বমোট বয়স ৪০+৬০+৯৫০=১০৫০ বৎসর ১ মাস ২০ দিন।

বাইবেলের মধ্যে যাহা লিখা আছে যে, "সবসুদ্ধ নূহের নয়শ'ত পঞ্চাশ বৎসর হইলে তাঁহার মৃত্যু হইল", (বাইবেল; আদি পুস্তক পৃষ্ঠা-২১) ইহা ভুল।

(ব্যাতিক্রম করিলে) নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর ভয়ঙ্কর দিনের আযাবের আশঙ্কা করিতেছি।

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهٖٓ اِنَّا لَنَرٰكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۔

তাঁহার জাতির প্রধানরা বলিল, (তুমি যে আমাদিগকে এক আল্লাহর এবাদত করিতে বল এবং অন্যথায় আযাবের ভয় দেখাও, এ সম্বন্ধে) আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, তুমি স্পষ্টতর বিভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়া আছ। قَالَ

يٰقَوْمِ لَيْسَ بِىْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔

নূহ (আঃ) বলিলেন, হে আমার জাতি! আমার মধ্যে বিভ্রান্তির লেশমাত্রও নাই– অবশ্যই আমি বিশ্ব স্রষ্টার রসূল বা প্রতিনিধি (তিনি আমাকে যাহা বলিতে আদেশ করেন আমি তাহাই বলি)।

اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ ۔ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۔

পরওয়ারদেগারের বাণী ও আদেশ–নিষেধসমূহই আমি তোমাদের পৌঁছাই এবং আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। আমি আল্লাহর তরফ হইতে এমন তথ্য জ্ঞাত হই, যাহা তোমরা জ্ঞাত নও।

اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۔

তোমরা কি আশ্চর্যান্বিত যে, তোমাদেরই ন্যায় একজন মানুষ মারফত তোমাদের পরওয়ারদেগার হইতে উপদেশ বাণী আসিল তোমাদেরে সতর্ক করার জন্য, যেন তোমরা সংযত হও এবং তোমরা আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হও? (অর্থাৎ ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।)

فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِى الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ ۔

এত বুঝ-প্রবোধদানেও তাহারা নূহকে অমান্য করিল, তাহাকে মিথ্যাবাদী ঠাওরাইল। ফলে (তাহাদের উপর তুফানরূপে আযাব আসিল।) আমি নূহকে এবং তাহার সঙ্গীগণকে জাহাজে রাখিয়া বাঁচাইলাম। আর যাহারা আমার আয়াতসূহকে মিথ্যা বলিয়াছিল, অমান্য করিয়াছিল, তাহাদের পানিতে ডুবাইয়া মারিলাম; নিশ্চয় তাহারা ছিল একেবারে অন্ধের দল। (সূরা আ'রাফ ঃ পারা– ৮; রুকু– ১৫)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ

নিশ্চয় আমি নূহকে তাঁহার জাতির প্রতি রসূলরূপে পাঠাইয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, হে আমার জাতি! তোমরা এক আল্লাহর এবাদত– গোলামী কর, আল্লাহ ভিন্ন তোমাদের কোন মাবুদ নাই, তোমরা সংযত হও না কেন?

فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ۔ مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِىْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ۔ اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌۢ بِهٖ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ ۔

তাঁহার জাতির কাফের প্রধানরা সর্বসাধারণকে বলিয়া বেড়াইল যে, এই লোকটি তোমাদেরই মত একজন মানুষ; (সে রসূল-নবী কিছুই নহে; কিন্তু রসূল হওয়ার দাবী দ্বারা) সে তোমাদের মধ্যে স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। আল্লাহ তাআলা যদি রসূল বা প্রতিনিধি পাঠাইতে ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় কোন একজন ফেরেশতা পাঠাইতেন। (মানুষ আল্লাহর রসূল হইয়া আসিবে) এইরূপ উদ্ভট কথা ত বাপ-দাদা চৌদ্দ পুরুষের মধ্যেও আমরা শুনি নাই। এই লোকটা পাগল ভিন্ন কিছুই নহে। তোরা কিছু দিন অপেক্ষা কর– (এর মধ্যেই তাহার বিলুপ্তি ঘটিবে)।

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ بِمَا كَذَّبُوْنَ ـ فَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَاِذَا جَاۤءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ فَاسْلُكْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِىْ فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ـ اِنَّهُمْ مُغْرَقُوْنَ ـ

নূহ (আঃ) আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমাকে সাহায্য করুন, তাহারা ত আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়াছে। (আল্লাহ পাক বলেন,) তখন আমি তাহার নিকট অহী মারফত সংবাদ পাঠাইলাম যে, আমার তত্ত্বাবধানে এবং আদেশ মতে আপনি একটি জাহাজ নির্মাণ করুন (বিদ্রোহীদের ধ্বংসের জন্য তুফানরূপে আযাব আসিবে)। যখন আমার আযাব আরম্ভের সময় হইবে এবং (উহার নিদর্শন এই যে,) যমীন বিদীর্ণ হইয়া পানি উৎক্ষিপ্তরূপে উঠিতে আরম্ভ করিবে; তখন প্রত্যেক শ্রেণীর জীবের এক এক জোড়া এবং আপনার পরিজনকে জাহাজে উঠাইয়া লইবেন, অবশ্য তাহাদের মধ্যে (যে আমার বিদ্রোহী) যাহার ধ্বংস হওয়া সম্পর্কে আমার আদেশ হইয়া গিয়াছে, সে উঠিতে পারিবে না। আর একটি কথা– যাহারা অন্যায়কারী বিদ্রোহী তাহাদের সম্পর্কে আপনি আমার নিকট কোন অনুরোধ করিবেন না, তাহাদিগকে অবশ্য অবশ্যই ডুবাইয়া মারা হইবে।

فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ

যখন আপনি সঙ্গীগণসহ জাহাজে শান্তিতে বসিয়া যাইবেন, তখন বলিবেন, সকল কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদিগকে জালেমদের কবল হইতে মুক্তি দান করিলেন।

(সূরা মোমেনুনঃ পারা–১৮; রুকু–২)

হযরত নূহ আলাইহিস সালামের উপর অন্যায়কারীদের একটি অভিযোগ ইহাও ছিল যে, আপনি গরীব ও নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে স্থান দিয়া থাকেন। তাহারা সেই গরীব লোকদের অপসারণ দাবী জানাইল। নূহ (আঃ) তাহাদের দাবী প্রত্যাখ্যান করিলেন। ফলে তাহারা বিরোধিতায় কঠোর মনোভাব অবলম্বন করতঃ নূহ (আঃ)-কে ভীতি প্রদর্শন করিল। নূহ (আঃ) আল্লাহ তাআলার নিকট সাহায্য প্রার্থী হইলেন। এই সম্পর্কে কোরআনের বিবৃতি এই–

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ نِ الْمُرْسَلِيْنَ ـ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ـ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ـ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنَ ـ وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنَ ـ

নূহ পয়গম্বরের কওম (নূহের আদর্শকে মিথ্যা বলিয়া শুধু নূহকেই মিথ্যুক বলে নাই,) সমস্ত রসূলগণের আদর্শকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল! যখন তাহাদেরই বংশধর নূহ তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা কি সংযত

হইবে না? আমি তোমাদের কল্যাণার্থ বিশ্বস্ত রসূলরূপে আসিয়াছি। অতএব, তোমরা আল্লাহর প্রতি ভয় ভক্তি পোষণ কর ও সংযত হও এবং আমার কথা মানিয়া চল। আমি তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান প্রার্থী হইব না। সারা জাহানের পরওয়ারদেগার যিনি, একমাত্র তাঁহারই নিকট আমার প্রতিদান রহিয়াছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর প্রতি ভয়-ভক্তি ও সংযম অবলম্বন কর এবং আমার কথা মানিয়া চল।

قَالُوْا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ ـ قَالَ وَمَا عِلْمِىْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ اِنْ حِسَابُهُمْ اِلاَّ عَلٰى رَبِّىْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ـ وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ اِنْ اَنَا اِلاَّ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ـ

তাহারা বলিল, আমরা কি আপনার তাবেদারী করিতে পারি এই অবস্থায় যে, নিম্ন শ্রেণীর লোকগুলি আপনার অনুগামী হইয়া বসিয়া আছে? নূহ (আঃ) বলিলেন, তোমরা যাহাদিগকে নিম্ন শ্রেণীর বলিতেছ, তাহারা কি কাজ করে না করে (যদ্বারা নিম্ন বা উচ্চ শ্রেণীর বিচার হয়) তাহা আমি খবর রাখিতে যাইব কেন? তাহাদের হিসাব ত আমার পরওয়ারদেগারের নিকট হইবে। তোমরা এই বাস্তবকে বুঝিলে এইরূপ বলিতে না। যাহারা ঈমান আনিয়াছে (নিম্ন হউক বা উচ্চ) তাহাদিগকে আমি তাড়াইয়া দিতে পারি না। আমি সতর্ককারী বই নহি (উঁচু নীচুর পার্থক্য কেন করিব।)

قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ـ

তাহারা ভীতি প্রদর্শনে বলিল, হে নূহ! তুমি যদি (তোমার কার্যাবলী হইতে) নিবৃত্তি না হও, তবে নিশ্চয় তুমি প্রস্তরাঘাতের শিকার হইবে।

قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِىْ كَذَّبُوْنَ ـ فَافْتَحْ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِىْ وَمَنْ مَّعِىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

নূহ (আঃ) ফরিয়াদ করিয়া বলিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমার জাতি ত আমাকে অবিশ্বাস করিয়াছে। সুতরাং আপনি আমার ও তাহাদের মধ্যে একটা শেষ ফয়সালা করিয়া দিন এবং আমাকে ও আমার সঙ্গী মুমিনগণকে তাহাদের কবল হইতে মুক্তি দিন।

فَاَنْجَيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ـ ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِيْنَ ـ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً

সেমতে আমি তাঁহাকে তাঁহার সঙ্গীগণকে জাহাজে উঠাইয়া উদ্ধার করিলাম। অবশিষ্ট সকলকেই ডুবাইয়া মারিলাম। নিশ্চয় এই ঘটনায় বিশ্ববাসীর জন্য কুদরতের নির্দশন ও উপদেশ রহিয়াছে।

(পারা-১২; রুকু-১০)

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِىْ وَتَذْكِيْرِىْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْا اِلَىَّ وَلَا تُنْظِرُوْنَ ـ

বিশ্ববাসীকে নূহের ঘটনা পাঠ করিয়া শুনান; যখন তিনি স্বীয় জাতিকে বলিয়াছিলেন, হে আমার জাতি! তোমাদের মধ্যে আমার অবস্থান এবং আল্লাহর আয়াতগুলি দ্বারা উপদেশদান যদি তোমাদের পক্ষে অসহনীয় হইয়া পড়িয়া থাকে, তবে আমি আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করিয়া আছি। তোমরা নিজেদের গর্হিত মাবুদ সহ তোমাদের সমুদয় চেষ্টা একত্রিত কর, অতপর সমবেতভাবে নিশ্চিন্ত চিত্তে সেইসব চেষ্টা আমার বিরুদ্ধে চালাইয়া দাও, আমাকে একটুও অবকাশ দিও না। (পারা- ১১; রুকু- ১৩)

পয়গম্বরের মনোবল, সাহস ও আল্লাহ তাআলার উপর তাঁহার ভরসা হয় অতি প্রবল ও মজবুত। হযরত নূহ (আঃ) কাফেরদের ভয়-ভীতির প্রতি উত্তরে তাহাই প্রকাশ করিলেন। পবিত্র কোরআনে তাহারও বিবরণ রহিয়াছে–

নূহ আলাইহিস সালামের ঘটনার আরও বিবরণ নিম্নের আয়াতে রহিয়াছে–

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖۤ اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ـ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ـ

নিশ্চয় আমি নূহকে তাঁহার জাতির প্রতি রসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম। তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা আল্লাহ ভিন্ন কাহারাও গোলামী অবলম্বন করিও না, অন্যথায় আমি তোমাদের উপর ভীষণ দুঃখ-যাতনাময় দিনের আযাব আসিবার আশঙ্কা করিতেছি।

فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِىَ الرَّاْىِ وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍۢ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ ـ

তাহাদের সর্দার শ্রেণীর কাফেররা বলিল, হে নূহ! আমরা তোমাকে আমাদের মতই একজন মানুষ দেখি; (তুমি আল্লাহর রসূল কিরূপে হইতে পার?) এবং তোমার তাবেদার এমন ব্যক্তিগণকেই দেখিতেছি, যাহারা নগণ্য নিম্ন শ্রেণীর; (তাহাদের জ্ঞানও) ভাসা ভাসা রকমের, অধিকন্তু তোমাদের মধ্যে আমাদের অপেক্ষা কোন বৈশিষ্ট্য দেখিতেছি না। (তুমি রসূল নও,) বরং তোমাদিগকে আমরা মিথ্যাবাদীই মনে করি।

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰنِىْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ ـ

নূহ (আঃ) বলিলেন, হে আমার জাতি! বল ত দেখি, যদি আমি স্বীয় পরওয়ারদেগার প্রদত্ত দলীলের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি এবং তিনি আমাকে তাঁহার বিশেষ রহমতের (নবুয়তের) ভাগী করিয়াছেন, কিন্তু; (ঐসব দলীল এবং আমার নব্যুয়ত হইতে) তোমাদের চক্ষু অন্ধ হইয়া থাকে; এমতাবস্থায় আমি কি জবরদস্তি উহা তোমাদের গলায় ঠাসিয়া দিতে পারি কি? অথচ তোমরা উহা বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক।

وَيٰقَوْمِ لَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَاۤ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّىْۤ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ـ

হে আমার জাতি! আমি তোমাদের নিকট আমার কার্যের বিনিময়ে টাকা-পয়সা চাই না, আমার প্রতিদান একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকট জমা থাকিবে। (নূহ (আঃ) আরও বলিলেন– তোমাদের অবাঞ্ছিত দাবী পূরণার্থ) আমি এই সকল লোককে তাড়াইতে পারিব না, যাহারা ঈমান আনিয়াছে। (যদিও তোমরা তাহাদিগকে হেয় মনে কর); কিন্তু তাহারা (ঈমানের বদৌলতে সম্মানে ও আদর-যত্নে) স্বীয় পরওয়ারদেগারের দরবারে পৌছিবে। (বস্তুতঃ তাহারা হেয় নহে,) কিন্তু আমি দেখিতেছি, তোমরা জ্ঞানান্ধের দল (তাই তোমরা ঐরূপ মনে করিয়া থাক)।

وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِىْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ـ

হে আমার জাতি! আমি যদি এই লোকদিগকে তাড়াইয়া দেই তবে আল্লাহর ক্রোধানল হইতে আমাকে কে রক্ষা করিতে পারিবে? তোমরা কি বুঝ না?

وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ اِنِّىْ مَلَكٌ وَّلَآ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِىْٓ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ اِنِّىْٓ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ -

(তোমরা আমার প্রতি যে বিস্ময় প্রকাশ কর তাহা বোকামি; আমি ত বিস্ময়কর কোন দাবী করি না); আমি ত দাবী করি না যে, (আমি খোদায়ী শক্তির মালিক–) আমার হস্তে আল্লাহর সর্বস্ব। আমি এই দাবীও করি না যে, (আল্লাহর ন্যায়) সমস্ত ভূত-ভবিষ্যতের আমি খবর রাখি। আমি এই দাবীও করি নাই যে, আমি ফেরেশতা। আর তোমরা যেসব মুমিনকে হেয় মনে করিয়া থাক, তোমাদের ন্যায় আমিও তাহাদের সম্পর্কে বলিব যে, আল্লাহ তাহাদিগকে কল্যাণ দান করিবেন না– আমি এইরূপ বলিতে পারিব না। তাহাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা আল্লাহ জ্ঞাত আছেন, তদনুপাতে তিনি তাহাদের সঙ্গে ব্যবহার করিবেন। এমতাবস্থায় আমি যদি ঐরূপ কথা বলি, তবে আমিও তোমাদের ন্যায় অন্যায়কারীদের একজন হইয়া যাইব।

قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ -

(কাফেররা বলিল,) হে নূহ! তুমি তর্কে লিপ্ত হইয়াছ এবং অধিক তর্ক করিতেছ। সত্যবাদী হইলে তর্ক ছাড়িয়া যে আযাবের ভয় দেখাইতেছ উহা আমাদের উপর নিয়া আস।

قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ - وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِىْٓ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ -

নূহ (আঃ) বলিলেন, আযাব নিয়া আসিতে পারেন একমাত্র আল্লাহ তাআলা যদি তাঁহার মর্জি হয় এবং উহাকে ঠেকাইবার শক্তি তোমাদের নাই। (নূহ (আঃ) তাহাদের প্রতি আক্ষেপ-অনুতাপ প্রকাশে) আরও বলিলেন, তোমাদের জন্য আমি যতই কল্যাণ কামনা করি, আমার কল্যাণ কামনা তোমাদের পক্ষে ফলদায়ক হইবে না, যদি আল্লাহ তোমাদিগকে গোমরাহীর মধ্যে থাকিতে দেন। (অর্থাৎ তোমরা স্বেচ্ছায় গোমরাহীর উপর থাকিতে বদ্ধপরিকর হও– সে অবস্থায় সাধারণতঃ আল্লাহ তাআলা বল প্রয়োগ করিবেন না।) তিনি তোমাদের পরওয়ারদেগার, মালিক। তাঁহারই নিকট তোমরা (হিসাব দেওয়ার জন্য) ফিরিয়া যাইবে (তিনি হিসাব নিকাশ লইবেন।)

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ - قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَعَلَىَّ اِجْرَامِىْ وَاَنَا بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ -

(হে মুহাম্মদ (সঃ)! নূহের কওমের ন্যায় মক্কার কোরায়শরাও মিথ্যায় লিপ্ত।) কি আশ্চর্য যে, তাহারা বলিতেছে, মুহাম্মদ কোরআন নিজেই গড়িয়াছে। আপনি বলিয়া দিন, যদি আমি গড়িয়া থাকি তবে আমার অপরাধের শাস্তি আমাকে ভুগিতে হইবে। আর (তোমরা যে মিথ্যা বল সেই পাপ তোমরা ভুগিবে,) আমি তোমাদের পাপের দায়ী হইব না।

وَاُوْحِىَ اِلٰى نُوْحٍ اَنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ -

(নূহের কওম সীমা অতিক্রম করিলে আযাব ঘনাইয়া আসিল।) এবং নূহকে অহী মারফত জ্ঞাত করান হইল যে, এ পর্যন্ত যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা ব্যতীত আপনার কওমের আর কেহ ঈমান আনিবে না। সুতরাং তাহাদের কার্য কলাপে আপনি দুঃখিত হইবেন না। (আশার বিপরীত অবস্থা দেখিলে দুঃখ হয়; আশা না থাকিলে দুঃখ হইবে না।)

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِى فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ -

আপনি আমার তত্ত্বাবধানে এবং আদেশানুসারে একটি জাহাজ নির্মাণ করুন। জালেমদের সম্পর্কে আমার নিকট মুখও খুলিবেন না; তাহারা অবশ্যই ডুবিয়া মরিবে।

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاَّ مِّنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا مِنْهُ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ -

নূহ (আঃ) জাহাজ তৈয়ার আরম্ভ করিলেন, তাঁহার কওমের সর্দার লোকেরা যখনই জাহাজের নিকট দিয়া গমন করিত, উহা সম্পর্কে নানারূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত। নূহ (আঃ) বলিতেন, তোমরা যদি আমাদের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ (ভালবাস তবে) কর; একদিন আমরাও তোমাদের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিব, যেরূপ তোমরা করিতেছ।

فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ يَاتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ - حَتّٰى اِذَا جَاۤءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ وَمَا اٰمَنَ مَعَهٗ اِلاَّ قَلِيْلٌ -

অচিরেই উপলব্ধি করিবে, কাহার উপর আসে অপদস্থকারী আযাব এবং কাহার উপর পতিত হয় স্থায়ী আযাব। অবশেষে যখন আমার (আযাবের) আদেশ হইল এবং মাটি ফাটিয়া পানি উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, তখন আমি নূহ (আঃ)-কে বলিলাম, প্রতিটি বস্তু জোড়ায় জোড়ায় জাহাজে উঠাইয়া লউন এবং এমন ব্যক্তি, যাহার সম্পর্কে (কুফরীর দরুন) পূর্বাহ্নেই (ধ্বংসের) আদেশ রহিয়াছে, সে ব্যতীত আপনার পরিবারবর্গ এবং অন্যান্য ঈমানদারগণকে উঠাইয়া লউন। নূহ (আঃ)-এর সঙ্গে অল্প সংখ্যকই ঈমানদার ছিল।

وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

নূহ (আঃ) সঙ্গীদেরকে বলিলেন, জাহাজে আরোহণ কর (আশঙ্কা নাই), আল্লাহর নামেই ইহার গতি ও স্থিতি। (তিনি হেফাযত করিবেন। গোনাহের দরুন আশঙ্কা হয়, কিন্তু নিশ্চয়) আমার পরওয়ারদেগার দয়াবান ও ক্ষমাকারী।

وَهِىَ تَجْرِىْ بِهِمْ فِىْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ - وَنَادٰى نُوْحُ نِ ابْنَهٗ وَكَانَ فِىْ مَعْزِلٍ يّٰبُنَىَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلاَ تَكُنْ مَعَ الْكٰفِرِيْنَ -

জাহাজ তাঁহাদেরকে লইয়া চলিতে লাগিল পাহাড় সমতুল্য ঢেউয়ের মধ্যে। নূহের এক পুত্র জাহাজ হইতে দূরে ছিল। নূহ (আঃ) তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, হে স্নেহের পুত্র! আমাদের সঙ্গে আস; কাফেরদের সঙ্গে থাকিও না।

قَالَ سَاٰوِىْ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِىْ مِنَ الْمَاۤءِ قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلاَّ مَنْ رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ -

পুত্র উত্তর করিল, এখনই আমি পাহাড়ে আশ্রয় লইতেছি, পাহাড় আমাকে প্লাবন হইতে রক্ষা করিবে। নূহ (আঃ) বলিলেন, আজ আল্লাহর আযাব হইতে কেহই রক্ষা পাইবে না, অবশ্য যাহাকে আল্লাহ রক্ষা করিবেন। ইতিমধ্যেই একটি বিরাট তরঙ্গ আসিয়া উভয়ের মধ্যে অন্তরায় হইল, পুত্র ডুবিয়া গেল।

وَقِيلَ يٰٓاَرْضُ ابْلَعِي مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِي وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ

(কাফেররা ডুবিয়া মরিল) এবং (আল্লাহর তরফ হইতে) আদেশ হইল, হে যমীন! শোষণ করিয়া লও তোমার উদগত পানি এবং হে আকাশ! বর্ষণ বন্ধ কর। পানি কমিল এবং দুর্যোগের অবসান হইল; জাহাজ "জুদী" পর্বতের উপর থামিল। আল্লাহর আদেশ ছিল, স্বৈরাচারীর দল চিরতরে ধ্বংস হউক (তাহাই ঘটিয়া গেল)।

وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ـ

নূহ (আঃ) (পুত্রের ধ্বংস নিকটবর্তী দেখাকালে) স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট ফরিয়াদ করিলেন, হে প্রভু! আমার ছেলে ত আমার পরিবারেরই একজন এবং আপনার ওয়াদা একান্ত সত্য; আপনি সর্বশক্তিমান, সর্বোপরি এখতিয়ারের মালিক (আমার ছেলেকে রক্ষার ব্যবস্থা আপনি করিতে পারেন)।

قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ـ فَلَا تَسْئَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ اِنِّيْ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ـ

আল্লাহ বলিলেন, হে নূহ! নিশ্চয় সে তোমার পরিবারভুক্ত নহে। নিশ্চয় সে তোমার আদর্শের বিপরীত– অসৎ কর্মপরায়ণ (সে ধ্বংস হইবেই)। অতএব, যে বিষয় তুমি অবগত নও সে বিষয়ে আমার নিকট দরখাস্ত করিও না। আমি তোমাকে নসীহত করি, অজ্ঞ লোকদের ন্যায় কার্য করিও না।

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ وَاِلَّا تَغْفِرْلِيْ وَتَرْحَمْنِيْ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ـ

নূহ (আঃ) বলিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, আর যেন আপনার নিকট দরখাস্ত না জানাই যে বিষয়ে আমি অজ্ঞ এবং (অতীতের ত্রুটি) যদি আপনি আমাকে মার্জনা না করেন, আমার প্রতি দয়া না করেন তবে আমি ধ্বংসপ্রাপ্তদের একজন হইয়া যাইব।

قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

(অবশেষে) অনুমতি আসিল– হে নূহ! অবতরণ করুন শান্তি হউক এবং সর্বপ্রকার কল্যাণ হউক– আপনার উপর এবং আপনার সঙ্গীদলের উপর। পক্ষান্তরে (পরবর্তীদের মধ্যে) একটি এমন দলও হইবে যাহাদিগকে আমি উপস্থিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ দান করিব, অতপর তাহাদের উপর আমার তরফ হইতে পৌঁছিবে ভীষণ কষ্টদায়ক আযাব। (পারা– ১২; রুকু– ৩-৪)

নূহ আলাইহিস সালামের কওম– যাহারা আল্লাহদ্রোহী কাফের ছিল, তাহারা সকলেই প্লাবনে হালাক হইল। একমাত্র হযরত নূহ (আঃ) ও এক স্ত্রী, এক পুত্র ব্যতীত তাঁহার পরিবার এবং তাঁহার নগণ্য সংখ্যক সঙ্গী মোমেনগণই জাহাজের মধ্যে থাকিয়া আল্লাহর রহমতে নাজাত পাইলেন। আল্লাহ তাআলা সে সম্পর্কে ফরমাইয়াছেন– وَلَقَدْ نَادٰنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ـ وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ

নূহ আমার নিকট ফরিয়াদ করিয়াছিলেন; আমি উত্তম সাড়া দিয়াছিলাম। (বিদ্রোহীদের হালাক করিয়া)

তাঁহাকে এবং তাঁহার (মো'মিন) পরিবারবর্গকে (আযাবের) ভয়াবহতা হইতে রক্ষা করিয়াছিলাম।

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبٰقِيْنَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِىْ الْاٰخِرِيْنَ - سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ - وَاِنَّا كَذٰالِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ -

এরপর একমাত্র তাঁহার বংশধরকেই ধরাপৃষ্ঠে বাকী রাখিয়াছি এবং তাঁহার জন্য পরবর্তীদের মধ্যে এই কথা রাখিয়া দিলাম–"সালাম নূহের প্রতি বিশ্ব মানবের মধ্যে।" আমি নেক বান্দাদেরকে এইরূপেই পুরস্কৃত করি। (পারা– ২৩; রুকু– ৭)

নূহ আলাইহিস সালামের তুফান সমগ্র বিশ্বে হইয়াছিল না শুধুমাত্র তাঁহাদের এলাকায় হইয়াছিল; এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। অবশ্য ইহাও সুস্পষ্ট যে, তখন দুনিয়ার প্রাথমিক জীবন; নূহ আলাইহিস সালামের অঞ্চল ব্যতীত কোথাও জন-মানবের বসবাস ছিল না বলিয়াই বিশ্বাস। অতএব, তৎকালীন ভূ পৃষ্ঠের সমস্ত কাফেরই যে সেই তুফানে হালাক হইয়াছিল ইহা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। হযরত নূহের যে বদ দোয়ার ফলে এই তুফান আসিয়াছিল, পবিত্র কোরআনে সেই বদ দোয়া সকল কাফের সম্পর্কে ব্যাপক আকারেই বর্ণনা করা হইয়াছে– وَقَالَ نُوْحٌ رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا

"নূহ (আঃ) ফরিয়াদ করিলেন– হে পরওয়ারদেগার! ভূপৃষ্ঠে কাফেরদের মধ্য হইতে কাহাকেও বাঁচিয়া থাকিতে দিবেন না। (সূরা নূহ ঃ পারা– ২৯)

নূহ (আঃ) ও তাঁহার উম্মতের অবস্থা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে "সূরা নূহ" নামে একটি বিশেষ সূরা রহিয়াছে। উহার শুধু অনুবাদ পেশ করা হইল

তর্জমা সূরা নূহ

(আল্লাহ তাআলা বলেন,) আমি নূহকে তাঁহার জাতির প্রতি রসূলরূপে পাঠাইয়াছিলাম। (তাঁহাকে আমি আদেশ করিয়াছিলাম,) আপনি আপনার জাতিকে (কর্মফলের দরুন) তাহাদের উপর ভয়াবহ আযাব আসিয়া পড়ার পূর্বেই সতর্ক করিয়া দিন। সে মতে নূহ (আঃ) জাতিকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করিয়া বলিতেছি, তোমরা এক আল্লাহর এবাদত কর (দেব-দেবীর পূজা ছাড়িয়া দাও) এবং আল্লাহর ভয়-ভক্তি সর্বদা দেলে জাগরূক রাখ আর আমার কথা মানিয়া চল; আল্লাহ তোমাদের গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন এবং নির্দিষ্ট সময় তথা আয়ুষ্কাল পর্যন্ত (শান্তিতে) দিন কাটাইতে দিবেন। নিশ্চয় জানিয়া রাখ, মৃত্যুর জন্য আল্লাহর নির্ধারিত সময় উপস্থিত হইলে (মৃত্যু আসিতে) একটুও বিলম্ব হইবে না। এই সব বিষয় যদি তোমরা ভালরূপে উপলব্ধি করিয়া লও তবে তোমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে।

(দীর্ঘ দিন এইরূপ আহ্বানের পর) নূহ (আঃ) আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমি আমার জাতিকে দিবারাত্র সৎপথের দিকে আহ্বান জানাইলাম, কিন্তু আমার আহ্বান তাহাদের পক্ষে অধিক দূরে সরিয়া পড়ার কারণই হইয়াছে। এমনকি যখনই আমি তাহাদিগকে তাহাদের গোনাহ মাফ হওয়ার ব্যবস্থা তথা ঈমানের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছি তখন তাহারা নিজেদের কুর্ণ কুহরে আঙ্গুল ঠাসিয়া রাখিয়াছে (আমার কথা শোনে নাই) এবং কাপড় দ্বারা নিজেদেরকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে (আমি যেন তাহাদের নজরেও না পড়ি) এবং নিজেদের রীতি-নীতির উপর অধিক বদ্ধপরিকর হইয়াছে অহঙ্কার গোঁড়ামিতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এতদসত্ত্বেও আমি তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান জানাইয়াছি প্রকাশ্যভাবে, পুনঃ পুনঃ আহ্বান জানাইয়াছি গোপনে গোপনে। আমি তাহাদিগকে এতদূর বুঝাইয়াছি যে, তোমরা স্বীয় প্রভু-পরওয়ারদেগারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; নিশ্চয়ই তিনি অতি বড় ক্ষমাশীল। (তোমরা গোনাহ হইতে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করিলে পরওয়াবদেগার তোমাদের গোনাহ মাফ করিবেন এবং তোমাদের

অভাব-অভিযোগ দূর করিয়া দিবেন। সব দিক দিয়া তোমাদের উন্নতি দান করিবেন-) তোমাদের দেশে তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা ও নদী-নালার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ তাআলার পূর্ণ ভক্তি ও মহত্ত্ব মহিমার উপর দৃঢ় আস্থা অন্তরে গাঁথিয়া লও না? অথচ তিনিই (হইতেছেন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা হিসাব গ্রহীতা; তিনি) তোমাদিগকে বিভিন্ন পর্যায়ের ভিতর দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। (খাদ্য-দ্রব্যের রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে বীর্য্য, বীর্য হইতে রক্তপিণ্ড, রক্তপিণ্ড হইতে মাংসপিণ্ড ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করিয়া মানুষরূপে তাঁহার কুদরতে তোমরা জন্ম নিয়াছ। তিনি অতি মহান সর্বশক্তিমান;) তোমরা কি দেখ না যে, কি আশ্চর্যজনকরূপে আল্লাহ তাআলা সাত তবক আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার উহার মধ্যে চন্দ্রকে আলো স্বরূপ বানাইয়া দিয়াছেন এবং সূর্যকে প্রদীপস্বরূপ বানাইয়া দিয়াছেন! আরও দেখ, আল্লাহ তাআলা তোমাদিগকে মাটি হইতে (তথা উহার উদ্ভূত খাদ্য দ্রব্য হইতে) এক বিশেষ উপায়ে সৃষ্টি করিয়াছেন, আবার সেই মাটির মধ্যে তোমাদিগকে ফিরাইয়া আনিবেন, তারপর সেই মাটি হইতেই পুনঃজীবিত করিয়া উঠাইবেন (এবং তোমাদের হইতে পুঙ্খনুপুঙ্খরূপে হিসাব নিকাশ লইবেন।)

আল্লাহ (কত মেহেরবান! তিনি) তোমাদের সুবিধার্থ ভূপৃষ্ঠকে সমতল রূপ দিয়াছেন যেন তোমরা উহার সুপ্রশস্ত রাস্তা ঘাটসমূহে চলাফেরা করিতে পার।

(এত বুঝান সত্ত্বেও যখন তাহারা সত্য গ্রহণ করিল না তখন) নূহ (আঃ) প্রভুর দরবারে আরজি পেশ করিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমার জাতি আমার কথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়াছে এবং তাহারা এমন লোকদের কথায় সাড়া দিতেছে যাহাদের ধনবল জনবলের অহঙ্কার খোদাভীরুতা হইতে দূরে সরাইয়া তাহাদিগকে শুধু ধ্বংসের পথেই অগ্রসর করিয়াছে। তাহারা (তাহাদের আল্লাহদ্রোহী নীতি জারি রাখার জন্য) বড় বড় ব্যবস্থা ও তদবীর অবলম্বন করিয়াছে। তাহারা দেশবাসীকে এই বুঝাইয়াছে যে, তোমরা কিছুইতেই তোমাদের দেব-দেবী ওয়াদ্দ, সুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক এবং নসরকে ছাড়িও না। আরও অনেক প্রকারে তাহারা দেশবাসীকে বিপথগামী করিয়াছে। (তাহারা সৎপথে আসার সব রকম সম্ভাবনাই শেষ করিয়া দিয়াছে; অতএব) তাহাদের গোমরাহী তুমি (ক্ষমার ব্যবস্থা না করিয়া) বাড়াইয়া দাও। পরিণামে যেন তাহারা গজবে ধ্বংস হয় এবং সৎ লোকদের পথের কাঁটা দূরীভূত হইয়া যায়।)

(আল্লাহ তাআলা বলেন,) তাহাদের এইসব গোনাহের কারণে (ইহজগতে) তাহাদিগকে ভয়াবহ প্লাবনে ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং পরজীবনের জন্য দোযখের আগুনে পতিত হওয়া সাব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। (তাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া দেব-দেবীর পূজা-করিয়াছিল, কিন্তু যখন গজব আসিয়াছে তখন) আল্লাহ তাআলা ভিন্ন তাহাদের দেব-দেবীদের কোন সাহায্যই তাহারা পায় নাই।

(তাহাদের হেদায়াত ও সৎপথ অবলম্বনে নিরাশ হইয়া) নূহ (আঃ) দরখাস্ত করিলেন, হে পরওয়ারদেগার! এই সব কাফেরদের আর যমীনের উপর থাকিবার সুযোগ দিবেন না; তাহাদিগকে দুনিয়াতে থাকিতে দিলে তাহারা আপনার বান্দাদিগকে বিপথেই পরিচালিত করিবে। (তাহাদের সমবেত আল্লাহদ্রোহিতা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়-) তাহাদের বংশের মধ্যেও বদকার কাফের ভিন্ন ভাল লোক সৃষ্টি হওয়ার কোন আশা নাই।

হে পরওয়ারদেগার! আমার গোনাহ-খাতা মাফ করিয়া দিন, আমার মাতা-পিতাকে, আমার পরিবারে যাহারা ঈমানদার আছে তাহাদেরকে এবং সমস্ত মো'মিন নর-নারীকে ক্ষমা করুন। আর স্বৈরাচারী জালেমদের জন্য ধ্বংসই বর্ধিত করুন। (যেন তাহারা দেশবাসীকে বিপথগামী করার সুযোগ আর না পায়।)

হযরত নূহের ইতিহাসে শিক্ষণীয় বিষয়

নূহ আলাইহিস সালামের ইতিহাসে দুইটি উপদেশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রথম এই যে, আল্লাদ্রোহিতা, আল্লাহর নাফরমানী অনেক সময় দুর্যোগ-দুর্গতি, ঝড়-তুফান ইত্যাদি দেশ বিধ্বংসী বিপর্যয় ঘটিবার মূল কারণ হইয়া থাকে। অতএব, এই ধরনের বিপর্যয় প্রতিরোধকল্পে সর্বাগ্রে

দেশব্যাপী তওবা-এস্তেগফার, সমস্ত রকম শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপের মূলোচ্ছেদ এবং আল্লাহ ও রসূলের তাবেদারীর ব্যবস্থা করা আবশ্যক। শুধু বাহ্যিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা বা রক্ষা ব্যবস্থার পরিণাম অনেক সময় হযরত নূহের পুত্র কেনানের মতই হইয়া থাকে। কেনান বাহ্যিক রক্ষা ব্যবস্থা তথা প্লাবন হইতে বাঁচিবার জন্য উঁচু পাহাড়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিল যাহা বাহ্যিক দৃষ্টিতে যথেষ্ট মনে হয়, কিন্তু যেহেতু সে বিপর্যয়ের মূল কারণ তথা আল্লাহদ্রোহিতায় নিমগ্ন ছিল, তাই তাহার অবলম্বিত রক্ষা ব্যবস্থা নিষ্ফল হইয়াছে। পক্ষান্তরে নূহ (আঃ) এবং তাঁহার দলবলের রক্ষা ব্যবস্থা তথা জাহাজে আরোহণ ফলদায়ক হইয়াছিল। কারণ, তাঁহারা বিপর্যয়ের মূল কারণের ব্যবস্থাকারী ছিলেন। অবশ্য মূল কারণের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যিক প্রতিরোধ এবং বাহ্যিক রক্ষা ব্যবস্থাও করিতে হইবে, যেরূপ নূহ (আঃ) জাহাজ তৈয়ার করিয়াছিলেন এবং ঘটনার সময় মোমিনগণ জাহাজে আরোহণ করিয়াছিলেন; ইহাও আল্লাহ তাআলারই নির্দেশ ছিল। সাধারণত ইহজগতের সব কিছুই কার্যকারণের মাধ্যমে সংঘটিত হয়– ইহাই আল্লাহ তাআলার সাধারণ নিয়ম-নীতি।

দ্বিতীয় শিক্ষা এই যে, মানুষ স্বয়ং নিজে ঈমানদার সৎকর্মী না হইলে যত বড় সম্বন্ধই তাহার হাসিল থাকুক না কেন, উহা তাহার জন্য নাজাতদানকারী হইতে পারে না। হযরত নূহের পুত্র কেনানের পরিণাম উহারই একটি প্রকৃষ্ট নমুনা। তদ্রূপ কেনানের মাতা নিজেই ঈমানদার ছিল না, ফলে নূহ (আঃ)-এর ন্যায় একজন পয়গাম্বরের স্ত্রী হইয়াও সে নাজাত পাইল না– দুনিয়াতেও না, আখেরাতেও না। পবিত্র কোরআনে এই কেনান-মাতা হযরত নূহের স্ত্রীর প্রসঙ্গ সারা বিশ্বের কাফেরদের জন্য একটি বিশেষ নজির স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে–

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَامْرَاَتَ لُوْطٍ ـ

"আল্লাহ তাআলা কাফেরদের জন্য উপদেশমূলক ঘটনারূপে হযরত নূহের স্ত্রী এবং হযরত লুতের স্ত্রীর ঘটনা বর্ণনা করেন। উভয় নারী আমার অতি বিশিষ্ট বান্দাদের মধ্য হইতে দুই জন বান্দাহর স্ত্রী ছিল; কিন্তু উক্ত নারীদ্বয় তাহাদের চেষ্টা ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কার্যে লিপ্ত ছিল, ফলে তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও ঐ নারীদ্বয়ের পক্ষে আল্লাহর আযাবের মোকাবিলায় কোনই সাহায্য করিল না এবং (দুনিয়ায় ধ্বংস হওয়ার পর) তাহাদের সম্পর্কে এই আদেশই জারি করা হইবে যে, দোযখীদের দলভুক্ত হইয়া তোমরাও দোযখে প্রবেশকারী।" (পারা– ২৮; রুকু– ২০)

কেয়ামতের দিন হযরত নূহের পক্ষে আমাদের সাক্ষ্য

১৬২৪। হাদীছ ঃ আবু সায়ী'দ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, (কেয়ামতের দিন) নূহ (আঃ) এবং তাঁহার উম্মতগণ আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিত হইবেন। আল্লাহ তাআলা নূহ (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনি (আপনার উম্মতকে) খাঁটি ধর্মের ডাক পৌঁছাইয়াছিলেন কি? তিনি উত্তর করিবেন, হ্যাঁ– ইয়া পরওয়ারদেগার! অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁহার উম্মতকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমাদিগকে নূহ খাঁটি ধর্ম পৌঁছাইয়াছিলেন কি? তাহারা বলিবে, না না– আমাদের নিকট কখনও কোন নবী আসেনই নাই। আল্লাহ তাআলা নূহ (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে কে? নূহ (আঃ) বলিবেন— মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁহার উম্মত।

হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন– তখন আমরা সাক্ষ্য দিব যে, হাঁ– নূহ তবলীগ করিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর ঘটনাই পবিত্র কোরআনের আয়াতের তাৎপর্য–

وَكَذَالِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ـ

('হে উম্মতে মুহাম্মদী! পূর্ববর্ণিত নেয়ামতসমূহ ও সম্মান যেরূপে তোমাদিগকে দান করা হইয়াছে,) তদ্রূপ

তোমাদিগকে এই বিশেষ সম্মানও প্রদান করা হইয়াছে যে, আমি তোমাদিগকে সর্বোত্তম উম্মতরূপে গঠিত করিয়াছি, যেন তোমরা অন্য সকল উম্মতগণের উপর (উপযুক্ত) সাক্ষী হইতে পার। (পারা-২; রুকু-১)

ব্যাখ্যা ঃ উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত সাক্ষ্যদানের বিষয় সম্পর্কে অন্যান্য হাদীছে বিস্তারিত বিবরণ আছে রসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন— কেয়ামতের দিন দেখা যাইবে, কোন নবীর উম্মত শুধু একজন, কোন নবীর উম্মত দুই জন, আবার কোন নবীর উম্মত অনেক বেশী। প্রত্যেক নবীর সময়কার লোকদেরকে আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিত করা হইবে এবং জিজ্ঞাসা করা হইবে, এই নবী তোমাদিগকে সত্য ও খাঁটি ধর্ম পৌঁছাইয়াছিলেন কি? তাহারা বলিবে, না। আমাদিগকে সত্য ধর্ম পৌঁছান নাই। তখন নবীকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, আপনি সত্য ধর্ম পৌঁছাইয়াছিলেন কি? নবী বলিবেন হ্যাঁ- আমি সত্য ধর্ম পৌঁছাইয়াছিলাম। তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, আপনার পক্ষে সাক্ষী কে আছে? নবী বলিবেন, আমার পক্ষে সাক্ষী মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁহার উম্মত। তখন মুহাম্মদ (সঃ) তাঁহার উম্মতকে উপস্থিত করা হইবে এবং জিজ্ঞাসা করা হইবে, এই নবী তাঁহার সময়কার লোকদেরকে সত্য ধর্ম পৌঁছাইয়াছিলেন কি? মুহাম্মদী উম্মতগণ বলিবেন, হ্যাঁ- সত্য ধর্ম পৌঁছাইয়াছিলেন। বিপক্ষ লোকেরা প্রশ্ন উত্থাপন করিবে যে, মুহাম্মদী উম্মত! আমাদের পরে জন্ম লাভ করিয়া আমাদের ঘটনা সম্পর্কে কিরূপে সাক্ষ্য দিতে পারে? তখন মুহাম্মদী উম্মতকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমরা তাহাদের ঘটনা কি সূত্রে জ্ঞাত হইয়াছ? তাহারা বলিবে, আমাদের নবী মুহাম্মদ (সঃ) পবিত্র কিতাব কোরআনের মাধ্যমে আমাদিগকে এ বিষয় জ্ঞাত করিয়াছিলেন যে, নবীগণ প্রত্যেকেই সত্য ধর্ম পৌঁছাইয়াছিলেন। তখন মুহাম্মদ (সঃ)-কে এই সম্পর্কে বিজ্ঞাসা করা হইবে এবং তিনি স্বীয় উম্মতের উক্তির সত্যতার সাক্ষ্য দান করিবেন।

কেয়ামতের দিনের আরেকটি ঘটনা

হাশরের ময়দানে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হইয়া সুপারিশের জন্য হযরত আদম আলাইহিস সালামের পরামর্শে লোকগণ হযরত নূহ আলাইহিস সালামের নিকট উপস্থিত হইবে। নূহ (আঃ) সুপারিশে অক্ষমতা জানাইয়া নিজের ব্যাপারে ভয়-ভীতি ও আতঙ্ক প্রকাশ করিবেন এবং স্বীয় দুইটি কার্যের উল্লেখ করিবেন।

প্রথম- আল্লাহর আযাব তুফান ও জলোচ্ছ্বাসে ডুবিয়া তাঁহার পুত্র "কেনান" মরিবার সময় তিনি আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করিয়াছিলেন, "হে পরওয়ারদেগার! আমার পুত্র আমারই পরিবারের; আর (আমার পরিবারবর্গকে রক্ষা করা সম্পর্কে) আপনার ওয়াদা (যাহার আশ্বাস আপনি দিয়াছিলেন, তাহা ত) অখণ্ডনীয়- আপনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।" উত্তরে আল্লাহ বলিয়াছিলেন-

"হে নূহ! এই পুত্র তোমার পরিবারভুক্ত নহে, সে তোমার আদর্শের বিপরীত কাজে লিপ্ত ছিল, যে বিষয় তুমি পূর্ণ অবগত নও সে বিষয়ে আমার নিকট পীড়াপীড়ি করিও না- আমি তোমাকে নসীহত করি, অজ্ঞদের দলভুক্ত হইও না।"

দ্বিতীয়- নূহ (আঃ) অমান্যকারীদের ধ্বংসের বদ দোয়া করিয়াছিলেন-

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ۔

"হে পরওয়ারদেগার! ভূ পৃষ্ঠে কাফের গোষ্ঠীর একটি প্রাণীকেও বাকী থাকিতে দিবেন না যে, চলাফেরা করিতে পারে।"

নূহ (আঃ) হাশরের দিন এই বিষয়দ্বয় উল্লেখ করিয়া আল্লাহর অসন্তুষ্টির আশঙ্কা প্রকাশপূর্বক বলিবেন, তোমরা ইব্রাহীম খলীলুল্লাহর নিকট যাও। -(বোখারী শরীফ)

হযরত ইলয়াস (আঃ)

হযরত ইল্‌য়াস (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের কতিপয় আয়াতে বর্ণনা রহিয়াছে। অবশ্য তাঁহার সম্পর্কে কোন বিশেষ বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র কোরআনে উল্লেখ নাই। শুধু এটুকু আছে যে, তাঁহার এলাকাবাসী بَعْل "বা'ল্" নামক দেবতা বা দেবীর পূজা করিয়া থাকিত। ইল্‌য়াস (আঃ) তাহাদিগকে সতর্ক করতঃ এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান করিতেন। তিনি তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিতেন, সকলের সৃষ্টিকর্তা, তোমাদের বাপ-দাদা পূর্বপুরুষদের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তাকে ছাড়িয়া তোমরা বা'লের পূজা করিতেছ! ইহা কত বড় অন্যায় অপরাধ! কিন্তু তাহারা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে নাই; আল্লাহ তাআলা তাহাদের সম্পর্কে বলিয়াছেন, فَاِنَّهُمْ مُحْضَرُوْنَ ـ তাহারা সকলেই আমার নিকট হিসাবদানে উপস্থিত হইবে।

ইল্‌য়াস আলাইহিস সালামের পরিচয় সম্পর্কে অধিকাংশ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন– তিনি হযরত মূসা (আঃ)-এর ভ্রাতা হযরত হারুন (আঃ)-এর বংশধর পৌত্রের পুত্র বা পৌত্রের পৌত্র ছিলেন। তিনি বনী ইস্রাঈলদের নবী ছিলেন।* তাঁহার আবির্ভাবস্থল ছিল তৎকালীন সিরিয়ার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ শহর "বা'লা-বাক্কা"। আরবী মানচিত্রে এই শহরকে "বা'লা-বাক্কা" নামে লেখা হয় যাহা বর্তমান লেবানন প্রজাতন্ত্রের একটি মহকুমাস্বরূপ। ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী বৈরুত ও তারাব্লাসের মধ্যস্থল বরাবর প্রায় একশ'ত মাইল পূর্বে অবস্থিত।

এই শহর এলাকার আদি অধিবাসীদের দেবতা "বা'ল" এবং এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ "বাক্কা"– এই উভয় নামের সংমিশ্রণে শহরটির নাম "বা'লা-বাক্কা" হইয়াছিল। পবিত্র কোরআনে হযরত ইল্‌য়াসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই–

وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ـ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اَلاَ تَتَّقُوْنَ ـ اَتَدْعُوْنَ بَعْلاً وَّ تَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ـ اَللّٰهُ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَائِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ـ فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ـ اِلاَّ عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ـ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ سَلٰمٌ عَلٰى اِلْ يَاسِيْنَ ـ

নিশ্চয় ইল্‌য়াস রসূল ছিলেন। স্মরণ কর, যখন তিনি স্বীয় দেশবাসীকে বলিয়াছিলেন, তোমরা কি (সর্বশক্তিমান আল্লাহকে) ভয় কর না? তোমরা "বা'ল" দেবতার পূজা কর আর সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা মাবুদ বরহক আল্লাহ যিনি তোমাদের এবং তোমাদের বাপ-দাদা পূর্বপুরুষদের সৃষ্টিকর্তা তাঁহাকে জানিয়া বুঝিয়া উপেক্ষা করিতেছ? (ইল্‌য়াস আঃ) এইরূপে বুঝাইলেন;) তাহারা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিল। (আল্লাহ বলেন,) এইসব লোককে আমার নিকট অপরাধীরূপে উপস্থিত করা হইবে। অবশ্য আল্লাহর খাঁটি বান্দাগণ (সসম্মানে আমার নিকট আসিবেন।) ইল্‌য়াসের পক্ষে চিরকালের জন্য আমার ঘোষণা, ইল্‌য়াসের প্রতি সালাম।" (পারা– ২৩; রুকু– ৮)

হযরত ইল্‌য়াসের দীর্ঘায়ু লাভ এবং ইহজগতে থাকিয়া অদৃশ্য থাকা সম্পর্কে অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে; ঐ সব কাহিনী নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত নহে।

---

* এই হিসাবে হযরত ইল্‌য়াসের আবির্ভাব হযরত মূসার অনেক পরে ছিল, কিন্তু এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকের মতে হযরত ইদ্রীসের অপর নাম ইল্‌য়াস। হয়ত এই জন্যই বোখারী (রঃ) হযরত ইল্‌য়াসের বর্ণনা হযরত ইদ্রীসের সংলগ্নে করিয়াছেন; কিন্তু প্রথম মতামতই অগ্রগণ্য।

হযরত ইদ্রীস (আঃ)

ইদ্রীস (আঃ) নবী হওয়া সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা রহিয়াছে–

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ - اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا -

"পবিত্র কিতাবে ইদ্রীস সম্পর্কে জ্ঞাত হও, তিনি খাঁটি ও সত্য নবী ছিলেন।"

মে'রাজ শরীফের ভ্রমণে চতুর্থ আসমানে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাত হইয়াছিল। ফেরেশতা জিব্রাঈল (আঃ) কর্তৃক পরিচয় করাইয়া দেওয়ার পর হযরত (সঃ) তাঁহাকে সালাম করিলেন। তিনি সালামের জবাবদনপূর্বক এই বলিয়া সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন–

مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ -

"উপযুক্ত ও সম্মানিত ভ্রাতা এবং উপযুক্ত ও সম্মানিত নবীকে মোবারকবাদ।"

হযরত হুদ (আঃ)

"আ'দ" নামক এক জাতির প্রতি হুদ (আঃ) নবীরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। হযরত নূহ (আঃ)-এর এক পৌত্রের পুত্র তাহার নাম ছিল "আ'দ"; তাহার হইতে যে নছল বা বংশধারার উৎপত্তি তাহারাই "আ'দ জাতি" নামে পরিচিত।

নূহ আলাইহিস সালামের তুফানে সব কাফের-মোশরেক ধ্বংস হইয়া নূতনভাবে দুনিয়া আবাদ হওয়ার পর এই আ'দ জাতিই প্রথম পুনঃ কুফ্‌রী ও শিরেকীতে পতিত হয়। তাহারা মূর্তি পূজা ও দেব-দেবীর উপাসনা করিত। হুদ (আঃ)-কে আল্লাহ তাআলা তাহাদের হেদায়াতের জন্য নবীরূপে পাঠাইয়াছিলেন।

আ'দ জাতির পিতা "আ'দ" হযরত নূহের পৌত্রের পুত্র ছিল এবং এই আ'দের পৌত্রের পৌত্র ছিলেন হযরত হুদ (আঃ)। আ'দ জাতির দেশ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের নিম্ন বর্ণিত আয়াতে একটু খোঁজ পাওয়া যায়– وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ

"বিশ্ববাসীকে স্মরণ করাইয়া দিন আ'দ জাতির নবীর ঘটনা, তিনি সতর্ক করিয়াছিলেন স্বীয় জাতিকে যাহারা "আহ্'কাফে" বসবাস করিত।"

"আহ্'কফ" শব্দটি বহুবচন, ইহার একবচন হইল 'হে'কফ" যাহার অর্থ মরু অঞ্চলের বালুকাস্তূপ। ঐ অঞ্চলে বালুকাস্তূপের আধিক্য ছিল; এই সূত্রে সেই অঞ্চলকে "আহ্'কাফ" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অধিকন্ত এইরূপ সম্ভাবনাও আছে যে, উক্ত সূত্রে এই অঞ্চলটি "আহ্''কাফ" নামেই পরিচিত ছিল। বর্তমানেও আরবী মানচিত্রে এই এলাকা "আহ্'কাফ" নামেই উল্লেখ হইয়াছে। অনেকের মতে এই এলাকা বস্তুতঃ বালুকাময় মরুভূমি ছিল না। আল্লাহর গজবে দেশবাসী ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে এই দেশও ধ্বংস হইয়া ঘন ঘন বালুকাস্তূপবিশিষ্ট মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। এই পরিবর্তিত অবস্থাদৃষ্টেই উহাকে আহ্‌কাফ বলা হইয়াছে।

আরব সাগরের উত্তর পারে অবস্থিত উপকূল এলাকা "হাজরামাওত" এবং আরব সাগর হইতে লোহিত সাগরের উৎপত্তিস্থলে ত্রিভুজ আকৃতির ভূখণ্ডের কোণে– লোহিত সাগরের পূর্ব পারে অবস্থিত "ইয়ামান" এবং সউদী আরব রাষ্ট্রের "নজ্‌দ" প্রদেশ এবং ওমান উপসাগরের পশ্চিম উপকূলবর্তী (ছোট ছোট রাজ্যের একটি রাজ্য) "ওমান–" এই এলাকাসমূহের মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি বিরাট মরু এলাকা আছে, যাহাকে বর্তমানে আরবী মানচিত্রে الربع الخالى (রবউলখালী) "জন শূন্য ভূখণ্ড" বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। যাহার উত্তরে "নজ্‌দ" দক্ষিণে "হাজরামাওত", পশ্চিমে "ইয়ামান" পূর্বে ওমান রাজ্য।

বর্তমান এই মরু ভূখণ্ডের মধ্যেই আ'দ জাতির বসবাস ছিল। একদল ঐতিহাসিকের মতে, এই অঞ্চলটি পূর্ব হইতেই মরু অঞ্চল হইলেও পূর্বকালে উহার কোন কোন অংশ বিশেষতঃ "হাজরামাওত" ও "ইয়ামান" এলাকা সংলগ্ন অংশসমূহ যথেষ্ট উর্বর ছিল। আ'দ জাতির আবাদী সেখানেই ছিল। কতিপয় বিশিষ্ট তফসীরকার ইহাও লিখিয়াছেন যে, উক্ত সম্পূর্ণ মরু অঞ্চলটি আদি আমলে সবুজ বাগানরূপী উর্বর শস্য-শ্যামল ছিল, উহার কোন অংশই মরুভূমি ছিল না। আদ জাতির উপর আল্লাহ তাআলার গযব নাজিল হওয়ার পর তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের দেশও ধ্বংস হইয়া মরু অঞ্চলে পরিণত হইয়া গিয়াছে। আজও উহা জনহীন মরু প্রান্তররূপেই বিদ্যমান আছে, এমনকি মানচিত্রেও সেই এলাকা "আহ্‌কাফ বা রবউল-খালী"– জনশূন্য মরু প্রান্তর নামেই পরিচিত রহিয়াছে।

আ'দ জাতির ইতিহাস পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত আছে। হযরত হুদ (আঃ) তাহাদিপকে আল্লাহ তাআলার প্রতি আহ্বান জানাইয়াছিলেন তাহারা নাফরমানী করিয়াছিল, ফলে আল্লাহ তাআলার আযাবে তাহারা ধ্বংস হইয়াছিল। এই সবের বর্ণনায় আল্লাহ তাআলা ফরমাইয়াছেন–

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ـ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ـ

আ'দ জাতির প্রতি তাহাদেরই বংশধর হুদকে পাঠাইয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, হে আমার জাতি এক আল্লাহর এবাদত কর, তোমাদের মা'বুদ বা উপাস্য অন্য কেহ হইতে পারে না। তোমাদের অন্তরে কি ভয় আসে না?

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ اِنَّا لَنَرٰكَ فِىْ سَفَاهَةٍ وَّاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ـ

কাফের নেতারা হুদকে বলিল, আমরা তোমার মধ্যে বুদ্ধিহীনতা দেখিতেছি– (একা সকলের বিরুদ্ধে চলিতেছ।) তদুপরি আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। (তুমি যে, তোমার এই সব উক্তিকে ধর্মের নাম দিতেছ, আযাবের ভয় দেখাইতেছ– ইহা মিথ্যা।)

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِىْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ ـ

হুদ (আঃ) বলিলেন, হে আমার জাতি! আমি নির্বোধ নহি। আমি সারা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তার প্রেরিত রসূল (বার্তাবহ দূত)। আমি স্বীয় পরওয়ারদেগারের কথা বহন করিয়া তোমাদেরকে পৌছাই এবং আমি নিতান্ত খাঁটিভাবেই তোমাদের কল্যাণ মঙ্গল কামনা করিয়া থাকি।

اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَاۤءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ـ وَاذْكُرُوْۤا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاۤءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوْۤا اٰلَاۤءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

তোমাদেরই স্বজাতীয় একজন মানুষ মারফত তোমাদের পরওয়ারদেগারের আদেশ-নিষেধসমূহ তোমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে তোমাদের সতর্ক করিতে– ইহাতে তোমরা আশ্চর্যান্বিত হইতেছ (এবং অমান্য করিতেছ)। স্বরণ কর, নূহ পয়গাম্বরের উম্মতকে– আল্লাহ কিরূপে তাহাদেরকে ধ্বংস করিয়া তোমাদেকে তাহাদের পরে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং তোমাদেরকে দৈহিক আকৃতিতে বর্ধিত ও বল-বীর্যে উন্নত করিয়াছেন। আল্লাহর এইসব নেয়ামত স্মরণে তাহার হক আদায় কর; ইহাতেই তোমাদের সাফল্য নিহিত।

قَالُوْۤا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاۤؤُنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ـ

তাহারা বলিল, তুমি কি আমাদেরকে এই শিক্ষা দিতে আসিয়াছ, যেন আমরা এক আল্লাহর বন্দেগী করি এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের মা'বুদগণকে ছাড়িয়া দেই? (আমরা তাহা করিব না।) তুমি আমাদেরকে যে আযাবের ভয় দেখাও ঐ আযাব নিয়া আস যদি সত্যবাদী হও।

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ ـ اَتُجَادِلُوْنَنِيْ فِيْ اَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاٰبَائُكُمْ مَا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ـ فَانْتَظِرُوْا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ـ

হুদ বলিলেন, তোমাদের উপর তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ হইতে ক্রোধানল ও আযাব আসন্ন। তোমরা আমার সঙ্গে বিবাদ করিতেছ এরূপ উপাস্য দেবতাদের সম্পর্কে– যাহাদের (আদৌ বাস্তবতা নাই;) আছে কেবল নাম; যেই নামগুলি তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা গড়িয়া লইয়াছ। তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহর তরফ হইতে কোন প্রমাণ আসে নাই। সুতরাং তোমরা আল্লাহর আযাবের অপেক্ষা কর; আমিও তোমাদের সাথে তোমাদের উপর আযাব আসার অপেক্ষায় রহিলাম।

فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ـ

আল্লাহ বলেন, অতঃপর হুদ ও তাঁহার সঙ্গীদের নাজাত দিলাম আমার করুণায়। আর যাহারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলিয়াছিল এবং ঈমান আনে নাই, তাহাদের সমূলে ধ্বংস করিয়া দিলাম।

(পারা–৮ রুকু–১৬)

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ مُفْتَرُوْنَ ـ

আ'দ জাতির প্রতি তাহাদের বংশধর হুদকে পাঠাইয়াছিলাম। তিনি এই আহ্বান জানাইলেন, হে আমার জাতি! তোমরা এক আল্লাহর বন্দেগী কর; তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন মাবুদ নাই। ইহার বিপরীত তোমরা যাহা বল সবই মিথ্যা।

يٰقَوْمِ لاَ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِنْ اَجْرِيَ اِلاَّ عَلَى الَّذِيْ فَطَرَنِيْ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ ـ

হে আমার জাতি। এই আহ্বানকার্যে আমি তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাই না। যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার নিকট প্রতিদান পাইব। তোমরা আমার বক্তব্য অনুধাবন কর না কেন?

وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَّ يَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ـ

হে আমার জাতি! তোমরা স্বীয় প্রভু-পরওয়ারদেগারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাঁহর প্রতি রুজু হও; দেশে অনাবৃষ্টির দরুন দুর্ভিক্ষ দূর করিয়া তিনি তোমাদের দেশে পর্যাপ্ত বৃষ্টি দিবেন এবং তোমাদেরকে অধিখ উন্নতি ও শক্তি দান করিবেন। আমার কথা অমান্য অগ্রাহ্য করিয়া অপরাধী সাব্যস্ত হইও না।

قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ـ

সেই লোকেরা বলিল, হে হুদ! তুমি আমাদের সম্মুখে কোন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করিতে পার নাই। শুধু তোমার কথায় আমরা নিজেদের দেব-দেবীকে পরিত্যাগ করিব না; আমরা তোমার কথা মানিব না।

اِنْ نَّقُوْلُ اِلاَّ اعْتَرٰكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْءٍ ـ

তোমার সম্পর্কে আমাদের ধারণা– আমাদের কোন দেবতা তোমাকে অভিশাপ দিয়াছে (ফলে তুমি মাথাখারাপ হইয়া আবোল-তাবোল বলিতেছ)।

قَالَ اِنِّىْ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْا اَنِّىْ بَرِئٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ـ مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِىْ جَمِيْعًا ثُمَّ لاَتُنْظِرُوْنَ ـ

হুদ (আঃ) বলিলেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী বানাইয়া বলি এবং তোমরাও সাক্ষী থাকিও, তোমরা যেসব জিনিসকে আল্লাহর শরীক বানাইতেছ, সেইসব হইতে আমি সম্পর্কহীন। (এই দেবতারা কোন ক্ষতি বা উপকার করিতে পারে সেই ধারণা আমার নাই।) আল্লাহ ছাড়া তোমরা একত্রে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না।

اِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلاَّ هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ـ اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ

আমি আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা রাখি, যিনি আমার এবং তোমাদের সকলের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা; দুনিয়ার সমস্ত জীবন তাঁহারই করতলগত। সত্য ও সোজা পথেই আমার পরওয়ারদেগারকে পাওয়া যায়।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّا اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلَيْكُمْ ـ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّىْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوْنَهٗ شَيْئًا اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَفِيْظٌ ـ

তোমরা যদি আমাকে অমান্য কর তবে তোমরাই অপরাধী হইবে; আমি কর্তব্য পালন করিয়াছি– তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়াছি যাহা পৌঁছাইবার জন্য আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত। (সংশোধন না হইলে তোমরা ধ্বংস হইবে) এবং আমার প্রভু তোমাদের পরিবর্তে ভিন্ন জাতি সৃষ্টি করিবেন। তোমরা তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। আমার প্রভু সব কিছু নিরীক্ষণ করিতেছেন। (আল্লাহ বলেন–)

وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ـ

যখন আমার গজবের আদেশ তাহাদের উপর আসিল, তখন হুদ ও তাঁহার সঙ্গী মোমেনগণকে আমার রহমতের দ্বারা রক্ষা করিলাম এবং আমি তাঁহাদিগকে আখেরাতের ভীষণ আযাব হইতেও বাঁচাইলাম।

وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهٗ وَاتَّبَعُوْا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ـ

এই আদ জাতি স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিদর্শনসমূহ অমান্য করিয়াছিল, তাঁহার প্রেরিত রসূলগণের নাফরমানী করিয়াছিল এবং আল্লাহ ও রসূলের প্রতি অবজ্ঞাকারী বিদ্রোহীদের কথায় সাড়া দিয়াছিল।

وَاُتْبِعُوْا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَلاَ اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ اَلاَ بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ ـ

তার ফলে তাহাদের জন্য নির্ধারিত রহিল লানত অভিশাপ এই দুনিয়ার জীবনে এবং আখেরাতে। বাস্তবিকই আ'দ জাতি স্বীয় সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তার বিরোধিতা করিয়াছিল, ফলে হুদ আলাইহিস সালামের বংশ– সেই আ'দ জাতি ধ্বংস কবলিত নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। (সূরা হুদ ঃ পারা– ১২ রুকু– ৫)

كَذَّبَتْ عَادُ نِ الْمُرْسَلِيْنَ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلاَ تَتَّقُوْنَ ـ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ـ فَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنَ ـ وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

আ'দ জাতি রসূলগণ কর্তৃক প্রচারিত সত্যকে মিথ্যা বলিয়াছিল। যখন তাহাদের স্বজাতীয় নবী হুদ তাহাদেরকে বলিয়াছিলেন, তোমরা কি খোদাকে ভয় কর না? আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ প্রেরিত খাঁটি ও শুভাকাঙ্ক্ষী রসূল; তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মানিয়া চল। আমি তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না। একমাত্র আমার পরওয়ারদেগারের নিকটই আমার প্রতিদান গচ্ছিত রহিয়াছে।

اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ـ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ـ وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ـ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُونَ وَاتَّقُوا الَّذِىْ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ ـ اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ ـ وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ـ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ـ

(খোদাভীরুতা তোমাদের নাই; আছে শুধু ভোগ-বিলাস, বৃথা দম্ভ ও ক্ষমতার উন্মত্ততা, তাই) অপব্যয় করতঃ সুউচ্চ স্থানে ইমারত বানাইয়া থাক (নামের জন্য– প্রয়োজন ছাড়া। এবং এরূপ দালান-কোঠা তৈয়ার কর যে,) মনে হয় তোমরা দুনিয়ায় চিরস্থায়ী। আর কাহারও প্রতি ক্ষমতা দেখাইতে ভয়ঙ্কর কঠোরতা অবলম্বন কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মানিয়া চল। ভয়-ভক্তি কর সেই আল্লাহকে, যিনি তোমাদেরকে বহু উন্নতি দিয়াছেন। যাহা তোমরা অবগত আছ (–ধনে-জনে, মানে সম্ভ্রমে)। আরও উন্নতি দিয়াছেন তোমাদিগকে পশুপালের ও প্রবাহমান ঝরণাসমূহের দ্বারা; আমি আশঙ্কা করি তোমাদের উপর এক ভীষণ দিনের আযাবের।

قَالُوْا سَوَآءٌ عَلَيْنَا اَوَعَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوَاعِظِيْنَ ـ اِنْ هٰذَا اِلاَّ خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ ـ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ـ فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ـ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

তাহারা বলিল, তোমার ওয়াজ-নসীহত করা না করা উভয় আমাদের কাছে সমান। (আমরা তোমার কথায় প্রভাবিত হইব না। তুমি যে নবী হওয়ার দাবী কর এবং ওয়াজ শুনাও,) পুরাতন লোকদের ইহা চিরাচরিত স্বভাব। বস্তুতঃ আমাদের উপর কোন আযাব আসিবে না। ফলকথা, তাহারা হুদকে মিথ্যাবাদী বলিল, পরিণামে তাহাদেরকে ধ্বংস করিলাম। নিশ্চয় এই ঘটনায় বড় শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে। এতদসত্ত্বেও (মক্কাবাসীদের) অধিকাংশই ঈমান আনিতেছে না। (সূরা শোআরা– পারা–১৯; রুকু– ১১)

আ'দ জাতির ধ্বংস

হুদ (আঃ) আ'দ জাতিকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিবার জন্য দীর্ঘকাল আহ্বান জানাইলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহার বিরোধিতাই করিল, যাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ উল্লিখিত আয়াতসমূহে রহিয়াছে। ফলে তাহাদের উপর আল্লাহ তাআলার আযাব ও গজব আসিল, যাহাতে সমগ্র আ'দ জাতি ভূপৃষ্ঠ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল এবং তাহাদের সমগ্র দেশ জনশূন্য বালুকাময় মরু অঞ্চলে পরিণত হইয়া গেল। এমনকি আজও

তাহা সেই অবস্থায়ই পতিত রহিয়াছে।

আ'দ জাতির উপর যে আযাব আসিয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, প্রথমতঃ দীর্ঘকাল তাহারা অনাবৃষ্টির দরুন দুর্ভিক্ষের কষ্ট ভোগ করিতে থাকে। অতঃপর একদিন তাহারা তাহাদের বস্তির দিকে ঘন কাল মেঘপুঞ্জ উড়িয়া আসিতে দেখিয়া তাহারা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহারা ভাবিল, এই ত আমাদের দেশের প্রতি মেঘমালা উড়িয়া আসিতেছে; এখনই আমাদের বস্তিতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইবে। কিন্তু বস্তুতঃ উহা পানিবাহক মেঘমালা ছিল না, বরং ছিল তাহাদের জন্য সর্ববিধ্বংসী ভয়াবহ ঝঞ্ঝা ও ঘূর্ণিবাত্যার পূর্বাভাস। তথায় সাত রাত আট দিন পর্যন্ত ঘূর্ণিবাত্যার ধ্বংসলীলা চলিল। সেই ঘূর্ণিবাত্যা আ'দ জাতির প্রতিটি প্রাণীকে পাহাড়-পর্বতের গায়ে আছড়াইয়া এবং উর্ধ্ব হইতে নিম্নে ভীষণভাবে নিক্ষিপ্ত করিয়া ধ্বংস করিয়া দিল।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আ'দ জাতির মানুষ ও পশুগুলি ঘূর্ণিবাত্যার সহিত ভূমি হইতে উর্ধ্বে খড় কুটার ন্যায় বাতাসের সহিত উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল। ফলে সেই মানুষ ও পশুগুলির একটি প্রাণীও বাঁচিল না। একমাত্র হুদ (আঃ) এবং তাঁহার সঙ্গী মোমিনগণ (যাহাদের সর্বশেষ সংখ্যা চারি হাজার ছিল;) আল্লাহ তাআলার রহতে রক্ষা পাইলেন। তাঁহারা সকলে এক স্থানে একত্রিত হইয়া নির্বিঘ্নে রহিলেন। ঘূর্ণিবাত্যার ধ্বংসলীলা সেখানে পৌঁছিল না। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে এই আযাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রহিয়াছে–

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرْ اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسْتَمِرْ تَنْزِعُ النَّاسَ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ـ

আ'দ জাতি নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল, ফলে তাহাদের উপর কিরূপ হইয়াছিল আমার আযাব ও সতর্কীকরণের ফল? আমি তাহাদের উপর পাঠাইয়াছিলাম প্রবল বেগের ঝঞ্ঝা বায়ু, ঘূর্ণবাত্যা এক অশুভ অবস্থার দিনে– যাহার প্রতিক্রিয়া তাহাদের উপর চিরস্থায়ী হইয়া গেল। সেই ঘূর্ণিবাত্যা মানুষগুলিকে উপরে উঠাইয়া ভীষণ জোরে নিক্ষেপ করিল; (ফলে আ'দ জাতির লোকদের দীর্ঘদেহী লাশগুলি বিক্ষিপ্তাকারে পড়িয়া রহিল) যেন তাহারা সমূলে উৎপাটিত খের্জূর বৃক্ষের কাণ্ডগুলি। (সূরা কামার ঃ পারা– ২৭; রুকু– ৮)

وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ـ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُوْمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةً ـ فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْ بَّاقِيَةٍ ـ

আর আ'দ জাতির বিনাশ ঘটিয়াছিল সীমা অতিক্রমকারী প্রবল বেগের প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা দ্বারা। সেই ঘূর্ণিবাত্যাকে আল্লাহ তাআলা তাহাদের উপর নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন সাত রাত আট দিন অবিচ্ছিন্নভাবে। ফলে সেই বংশধরদের অবস্থা এমন হইয়া গেল যে, তাহারা যেন বিধ্বস্ত খেজুর গাছের কাণ্ড। তাহাদের কেহ অবশিষ্ট থাকিল কি? (পারা– ২৯; রুকু– ৫)

وَفِىْ عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ ـ مَا تَذَرُ مِنْ شَىٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ ـ

তোমাদের জন্য বিরাট শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে আ'দ জাতির ঘটনার মধ্যে– আমি পাঠাইয়াছিলাম তাহাদের উপর এক (বিধ্বস্তকারী) মঙ্গলবিহীন ঝঞ্ঝা; উহা যেকোন বস্তুর উপর বহিল উহাকে বিধ্বস্ত করিয়া দিল। (সূরা আহকাফঃ পারা– ২৬; রুকু– ২)

وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اللّٰهَ - اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ -

আ'দ বংশের নবীর ঘটনা লক্ষ্য কর– যখন তিনি স্বীয় জাতিকে সতর্ক করিয়াছিলেন যাহারা আহ্কাফ অঞ্চলে বাস করিত। পূর্বাপর আরও অনেক সতর্ককরীর আবির্ভাব হইয়াছিল সেই গোত্রে। (তাহাদের প্রতি সকলের এই কথাই ছিল,) যে, তোমরা এক আল্লাহরই বন্দেগী কর (অন্যথায়) তোমাদের উপর আমি ভয়ঙ্কর দিনের আযাবের আশঙ্কা করিতেছি।

قَالُوْا اَجِئْتَنَا لِتَافِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ -

তাহারা বলিল, তুমি কি আসিয়াছ আমাদিগকে আমাদের পূজনীয় মাবূদ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে? (তোমার কথা মানি না;) তুমি যে আযাবের ভয় দেখাও উহা আমাদের উপর নিয়া আস; যদি তুমি সত্যবাদী হও।

قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاُبَلِّغُكُمْ مَّا اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّىْ اَرٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ -

নবী বলিলেন, (আযাব আসিবে নিশ্চয়; তাহার সময়) একমাত্র আল্লাহই জানেন। আমি ত তোমাদেরকে ঐ বিষয়ই পৌঁছাই যাহার বাহকরূপে আমাকে প্রেরণ করা হইয়াছে; কিন্তু দেখিতেছি, তোমরা অজ্ঞতারই পরিচয় দিতেছ।

فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

অতঃপর যখন তাহারা দেখিল, একখণ্ড মেঘ তাহাদের বস্তির প্রতি অগ্রসর হইতেছে, তখন তাহারা বলিল, এই ত মেঘমালা আসিতেছে, আমাদিগকে বৃষ্টি দিবে। (আল্লাহ বলেন, না, না-) বরং ইহা হইতেছে সেই আযাব যাহার দ্রুত আগমন তোমরা কামনা করিতে, ইহা হইতেছে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিবাত্যা, যাহা অত্যন্ত কষ্টদায়ক আযাবে পরিপূর্ণ।

تُدَمِّرُ كُلَّ شَىْءٍۢ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا لَا يُرٰۤى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ -

সেই ঘূর্ণিবাত্যা সব কিছু বিধ্বস্ত করিবে প্রভুর আদেশে। ফলে আ'দ জাতি এরূপ ধ্বংস হইল যে, তাহাদের পাকা-পোক্তা ঘর বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ ব্যতীত কোন (প্রাণীর) চিহ্নও বাকী রহিল না। এই ধরনের অপরাধীগণকে আমি এমন শাস্তিই দিয়া থাকি। (পারা– ২৬ ; রুকু– ৩)

আ'দ জাতির ইতিহাস হইতে শিক্ষা গ্রহণ

৩নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন, তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে "আ'দ জাতির" ঘটনার মধ্যে । ৪ নম্বরে বর্ণিত আয়াতসমূহের পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তাআলা সংক্ষেপে সেই শিক্ষণীয় বিষয়ের ইঙ্গিতে বলেন-

وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَا اِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّاَبْصَارًا وَّاَفْئِدَةً فَمَا اَغْنٰى

عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ -

"আদ জাতিকে (ধনবল, জনবল, বাহুবল, দৈহিক বিক্রম ও বিশালতাপূর্ণ) যেরূপ সমর্থ আমি দিয়াছিলাম, তোমাদিগকে সেরূপ দেই নাই এবং তাহাদিগকে কান, চোখ, বিবেক-বুদ্ধি সবই দিয়াছিলাম। যেহেতু তাহারা আল্লাহর কথায় কর্ণপাত করিত না, তাই তাহদের কান, চোখ ও বিবেক বুদ্ধি কোনটারই কিছুমাত্র সাহায্য তাহারা পাইল না এবং যেই আযাবের সংবাদে তাহারা বিদ্রূপ করিয়া থাকিত, সেই আযাব তাহাদিগকে ঘিরিয়া ধরিল। (শ্রবণ-শক্তির দ্বারা সরাসরি বা যন্ত্রের সাহায্যে সংকেত শুনিয়া অথবা দর্শন-শক্তির দ্বারা সরাসরি বা যন্ত্রের সাহায্যে পূর্বাভাস দেখিয়া কিম্বা বুদ্ধির সাহায্যে বৈজ্ঞানিক উপায় ও কৌশল অবলম্বনে আযাব ঠেকাইবার কোন ব্যবস্থা তাহারা করিতে পারিল না।)

(আ'দ জাতির এলাকাকে ধ্বংস করার ন্যায়) তোমাদের পার্শ্ববর্তী আরও অনেক এলাকা আমি ধ্বংস করিয়াছি; তাহাদেরকে বিভিন্ন প্রকারে পুনঃ পুনঃ আমার কুদরতের নিদর্শন দেখাইয়াছিলাম যেন তাহারা (আল্লাহ বিরোধী গতি হইতে) ফিরিয়া আসে।

হযরত সালেহ (আঃ)

"সামুদ" জাতির বংশে হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের জন্ম এবং তিনি সেই জাতির প্রতিই পয়গম্বর নিয়োজিত হইয়াছিলেন।

সামুদ জাতির বাসস্থান সম্পর্কে কোরআন ও হাদীছে স্পষ্টরূপে উল্লেখ রহিয়াছে। সূরা ফাজরে উল্লেখ আছে, وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ " এবং (কি ভয়ঙ্কররূপে ধ্বংস করিয়াছেন আল্লাহ তাআলা) সামুদ জাতিকে, যাহারা নিজ বসবাসের জন্য "ওয়াদিল কুরা" নামক এলাকায় (পাহাড়-পর্বতের ভিতরে ও গায়ে) পাথর কাটিয়া (সুরম্য অট্টালিকাদি তৈয়ার করিয়া) ছিল।

উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সামুদ জাতির আবাসস্থল "ওয়াদি" ছিল। তফসীরকারগণ ইহাকে "ওয়াদিল কুরা" বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। আরব ভূখণ্ডের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে আকাবা উপসাগরের পূর্ব উপকূল হইতে পূর্ব-দক্ষিণে হেজায এবং সিরিয়ার মধ্যস্থলে উক্ত এলাকা অবস্থিত।

এই এলাকারই একটি প্রধান শহর তথা রাজধানীর নাম ছিল حجر "হে'জর"। এই সূত্রেই পবিত্র কোরআনে সামুদ জাতিকে اصحاب الحجر আসহাবুল হেজ্‌র– হেজ্‌রবাসী বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে।

বর্তমানে আরবী মানচিত্রে এই এলাকাকে مداين صالح 'মাদায়েনে সালেহ' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহার অর্থ "সালেহ-এর বস্তিসমূহ" প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে এই নামটির সঙ্গতি সুস্পষ্ট।

এই এলাকাটি হেজায ও সিরিয়ার মধ্যে মদীনা মোনাওয়ারা হইতে উত্তর দিকে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার তথা ১৮০ ইংরেজী মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। হেজায্ হইতে সিরিয়ার দিকে সাধারণ পথ এই এলাকা দিয়াই অগ্রসর হইয়াছে।

সিরিয়ার পথে আগন্তুক আক্রমণকারী এক শত্রু দলকে বাধা প্রদানের উদ্দেশে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) সিরিয়াস্থিত "তবুক" নামক স্থান পর্যন্ত পৌছিয়াছিলেন; সেই অভিযান ইতিহাসে "তবুক অভিযান" নামে অভিহিত এবং সেই তবুক "মদীনা" হইতে প্রায় ৭০০ কিলোমিটার ইংরেজী ৪৩০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) সেই অভিযান পথে এই সামুদ জাতির এলাকা হেজর অঞ্চল দিয়াই পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন। ঐ এলাকা অতিক্রম করার কালে হযরত (সঃ) স্বীয় সঙ্গীগণকে বিশেষভাবে নির্দেশ দান

করিয়াছিলেন, এই এলাকার একটি কুপ ব্যতীত অন্য কূপের পানি কেহ ব্যবহার করিবে না, ঐরূপ পানি দ্বারা ভিজান রুটি তৈয়ারীর আটা ফেলিয়া দিবে, ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া দ্রুতবেগে এই এলাকা অতিক্রম করিয়া যাইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সম্পর্কে কতিপয় হাদীছ বাংলা বোখারী শরীফ তৃতীয় খণ্ডে তবুকের বয়ানে বর্ণিত হইয়াছে।

"সামুদ" জাতির উৎপত্তি "সামুদ" নামক এক ব্যক্তি হইতে। এই লোকটির বংশ তালিকায় ঐতিহাসিকগণের মতভেদ আছে। একদল ঐতিহাসিক বলেন, সামুদ পিতা– আবের পিতা– এরাম পিতা– সাম পিতা নূহ (আঃ)। অপর দল বলেন, সামুদ পিতা– আ'দ, পিতা– আছ, পিতা– এরাম, পিতা- সাম, পিতা– নূহ (আঃ)।

প্রথম মতে আ'দ এবং সামুদ ভিন্ন ভিন্ন দুইটি জাতি, অবশ্য উভয় জাতির সংযোগস্থল হযরত নূহের পৌত্র "এরাম"। এরামের এক পুত্র ছিল "আছ", তাহার পুত্র আ'দ, সে-ই হইল আ'দ জাতির আদি পিতা। এরামের আর এক পুত্র ছিল "আবের", তাহার পুত্র "সামুদ", সেই হইল সামুদ জাতির পিতা।

(তফসীরে বয়ানুল কোরআন– সূরা ওয়াল ফাজ্‌র দ্রষ্টব্য)

দ্বিতীয় মত হিসাবে সামুদ জাতি আ'দ জাতিরই শাখা এমনকি, এই মতের পক্ষপাতী ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, আ'দ জাতি যখন আল্লাহ তাআলার গজবে ধ্বংস হইয়াছিল তখন তাহাদের নবী হযরত হুদ (আঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীয় মোমেনগণ পূর্ণরূপে রক্ষা পাইয়াছিলেন। আ'দ জাতির রক্ষাপ্রাপ্ত সেই মুষ্টিমেয় অবশিষ্টাংশই কালে সামুদ জাতিতে পরিণত হইয়াছিল।

কালের পরিবর্তনে যখন সামুদ জাতি পৌত্তলিকতায় এবং এক খোদার বন্দেগী তথা তৌহীদ ত্যাগ করতঃ মূর্তি পূজায় লিপ্ত হইল, তখন হযরত সালেহ্ (আঃ) তাহাদের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিলেন এবং আল্লাহ তাআলার পয়গম্বর মনোনীত হইলেন। জাতি তাঁহার ডাকে সাড়া দিল না, তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না, ফলে তাহাদের উপর আল্লাহ তাআলার গজব আসিল। ভয়ঙ্কর বজ্রপাত, ভীষণ ভূকম্পন ও বিকট গর্জনে সমস্ত জাতি ধ্বংস হইয়া গেল। রক্ষা পাইলেন শুধু হযরত সালেহ্ (আঃ) এবং তাঁহার সঙ্গী মোমেন দল।

সামুদ জতির ধ্বংসের কাহিনী

সামুদ বংশীয় লোকগণ যখন স্বীয় পয়গম্বর হযরত সালেহ্ আলাইহিস সালামের প্রতি অবজ্ঞা ও বিরোধিতায় লিপ্ত থাকিল; তাহাদের সংশোধনের আশা রহিল না, তখন তাহাদের উপর আল্লাহ তাআলার গজব আসন্ন হইয়া উঠিল।

তাহারা একদিন হযরত সালেহ (আঃ)-কে বলিল, আপনি যদি এই পাড়াড়ের পাথর হইতে একটি উট বাহির করিয়া দেখাইতে পারেন তবে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনিব। হযরত সালেহ (আঃ) তাহাদের ঈমানের প্রতি অত্যধিক অনুরাগী ছিলেন: তিনি তাহাদের এই স্বীকারোক্তিকে বিশেষ সুযোগ মনে করিয়া আল্লাহ তাআলার দরবারে হাত উঠাইলেন এবং তাহাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী পাহাড়ের পাথর হইতে একটি উট বাহির করিয়া দেখাইবার দোয়া করিলেন। দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হইল। তৎক্ষণাত জনসমক্ষে পাহাড়ের একটি পাথরে কম্পন দৃষ্ট হইল এবং উহা ফাটিয়া একটি গর্ভবতী উষ্ট্রী বাহির হইয়া আসিল, অনতিবিলম্বেই উহার একটি বাচ্চা প্রসব হইল।

কিন্তু দুষ্ট কাফেররা নিজেদের স্বীকারোক্তি হইতে ফিরিয়া গেল, বস্তুতঃ ঐ স্বীকারোক্তি শুধু তাহাদের মৌখিক মুনাফেকী ছিল, অন্তরে তাহার কোন স্থান ছিল না। তাহারা ভাবিয়াছিল, দাবী পূরণও করিতে পারিবে না, আমাদের ঈমানও আনিতে হইবে না। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার ধৈর্য তাহাদিগকে বাঁচাইয়া নিতে লাগিল। এখনও গযব নাযিল হইল না, কিন্তু সেই উটটি ছিল অসাধারণ দেহবিশিষ্ট এবং

উহার পানাহারও ছিল অসাধারণ। মাঠের সমস্ত ঘাস, কূপের সমস্ত পানি সে একাই গ্রাস করিয়া ফেলিত। দেশের পশুপাল ইহাকে দেখিলেই ছুটিয়া পালাইত। এইসব কারণে দেশবাসী অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল এবং নানারূপ অসদুপায় অবলম্বনের পরামর্শ করিতে লাগিল। এখনও আল্লাহ তাআলার ধৈর্য তাহাদের পক্ষে রক্ষাকবচের কাজ করিতেছিল। হযরত সালেহ (আঃ) তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, এই উটটি তোমাদের বাঁচন-মরণ পরীক্ষার বস্তু। খবরদার! তোমরা ইহার কোন অনিষ্ট করিও না, অন্যথায় আল্লাহ তাআলার গযব নামিয়া আসিবে। হযরত সালেহ (আঃ) আল্লাহ তাআলার নির্দেশক্রমে তাহাদিগকে একটি সুপন্থা বাতলাইয়া দিলেন যে, পালাক্রমে একদিন আল্লাহ তাআলার উটটিকে আবদ্ধ রাখা হইবে। ঐ দিন তোমাদের পশুপাল অবাধে চলিয়া পানাহার করিবে। আর একদিন তোমরা তোমাদের পশুপালের ব্যবস্থা নিজ নিজ গৃহে করিয়া নিবে। ঐ দিন এই উটটি একা পানাহার করিয়া বেড়াইবে এইরূপে উভয় পক্ষের কার্য সমাধা করা হউক।

তাহারা নিজেরাই যে জিনিস চাহিয়া লইয়াছিল, কষ্ট-ক্লেশ হইলেও উহার বোঝা বহন করা তাহাদের কর্তব্য ছিল; কিন্তু যাহারা স্বীয় প্রভু আল্লাহ ও তাঁহার প্রতিনিধি রসূলেরই কোন ধার ধারে না, তাহারা ন্যায়-অন্যায়ের ও বুদ্ধি-বিবেকের ধার কি ধারিবে? তাহারা ঐ ব্যবস্থায়ও সন্তুষ্ট হইল না। তাহারা নিজেদের গোমরাহ দিকভ্রষ্ট বিবেকের দ্বারাই পরিচালিত হইল। সকলের পরামর্শে তাহারা উটটিকে উহার বাচ্চাসহ জবাই করিয়া খাইয়া ফেলিল।

তাহাদের অপরাধ শুধু এতটুকুই ছিল না বরং তাহারা সালেহ (আঃ)-কে সপরিবারে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, আল্লাহ তাহাদিগকে সেই অবকাশ দিলেন না; তৎপূর্বেই ভীষণ ভূকম্পন এবং জিব্রাঈল ফেরেশতার এক কলিজা বিদীর্ণকারী প্রচণ্ড গর্জন দ্বারা তাহাদিগকে ধ্বংস করিলেন। মুহূর্তে সারা দেশ নীরব নিস্তব্ধ জনশূন্য হইয়া গেল। সালেহ (আঃ) মোমেনগণসহ রক্ষা পাইলেন। তিনি দেশবাসীর পরিণতিতে অনুতপ্ত হইলেন এবং ঐ দেশ ত্যাগ করত: সিরিয়ায় বা মক্কা নগরীতে চলিয়া আসিলেন। পবিত্র কোরআনে সামুদ জাতির ইতিহাস নিম্নরূপ–

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ـ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ـ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِىْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

সামুদ জাতির প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাদেরই স্বজাতি সালেহকে। তিনি তাহাদেরকে বলিয়াছিলেন, হে আমার জাতি! তোমরা এক আল্লাহর এবাদত-বন্দেগী কর; তিনি ভিন্ন কোন মাবুদ তোমাদের নাই। আমি তাঁহার পয়গম্বর; আমার সত্যতা প্রমাণে তোমাদের সেই প্রভুর তরফ হইতে উজ্জ্বল নিদর্শন তোমাদের নিকট আসিয়া গিয়াছে– এই নাও (তোমাদেরই ফরমায়েশ অনুযায়ী) আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত উষ্ট্রী; আমার সত্যতার নিদর্শন। ইহাকে আল্লাহর যমীনে মুক্তভাবে চরিয়া বেড়াইতে দিও, কোন অনিষ্টের উদ্দেশে ইহাকে ছুঁইবাও না, অন্যথায় ভীষণ আযাব তোমাদিগকে ঘিরিয়া ধরিবে।

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ـ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ـ

সালেহ (আঃ) আরও বলিলেন, তোমরা স্মরণ কর, আল্লাহ আ'দ জাতিকে ধ্বংস করিয়া তাহাদের পরে তোমাদিগকে ভূপৃষ্ঠে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তেমরা নরম যমীনের উপর সুরম্য অট্টালিকাদি তৈয়ারী করিতেছ

এবং পাহাড় চাঁছিয়া-ছিলিয়া গৃহও নির্মাণ করিতেছ। আল্লাহর এত নেয়ামত স্মরণ রাখিয়া হক আদায় করিয়া) চল এবং দেশে বিপর্যয় ঘটাইয়া বেড়াইও না।

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ـ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ـ

তাহাদের মধ্যকার অহঙ্কার ও গর্বে গর্বিত সর্দার দল উৎপীড়িত (ধনে-জনে) দুর্বল মোমেনদিগকে বলিল, তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, সালেহ তাঁহার প্রভুর তরফ হইতে রসূল হইয়া আসিয়াছে? মোমেনগণ বলিলেন, হাঁ, নিশ্চয় আমরা তাঁহাকে যেসব আদর্শ দেওয়া হইয়াছে উহার প্রতি ঈমান স্থাপন করিয়া নিয়াছি।

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا بِالَّذِيْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ـ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ـ

সেই অহঙ্কারী সর্দারগণ বলিল, তোমরা যাহা বিশ্বাস করিয়াছ উহা আমরা মোটেই বিশ্বাস করি না। অতঃপর তাহারা ঐ উটটিকে মারিয়া ফেলিল এবং ঔদ্ধত্য দেখাইয়া বলিল, হে সালেহ! আমাদের যেই আযাবের ভয় দেখাও উহা আমাদের উপর নিয়া আস যাদি বস্তুতই তুমি রসূল হইয়া থাক।

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ـ

ফলে ভীষণ ভূকম্পন তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিল এবং তাহারা নিজ নিজ গৃহে অধঃমুখে মরা অবস্থায় পড়িয়া রহিল।

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ـ

(সালেহ আঃ) এবং মোমেনগণ রক্ষা পাইলেন, কিন্তু তাঁহারা ঐ দেশ ত্যাগ করিলেন।) দেশ ত্যাগকালে সালেহ (আঃ) আক্ষেপপূর্বক বলিলেন, হে আমার জাতি! আমি তোমাদের আমার প্রভুর প্রেরিত সব কিছু পৌঁছাইয়াছিলাম এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা মঙ্গলকামী দলকে পছন্দই কর নাই। (সূরা আ'রাফঃ পারা– ৮;রুকু–১৭)

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ـ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ـ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ـ اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ـ

সামুদ জাতির প্রতি তাহাদেরই বংশীয় সালেহকে পাঠাইয়াছিলাম। তিনি তাহাদেরকে বলিয়াছিলেন, হে আমার জাতি! এক আল্লাহর বন্দেগী কর, তিনি ব্যতীত কেহই তোমাদের মাবুদ হইতে পারে না। তিনিই তোমাদেরকে মাটি হইতে পয়দা করিয়াছেন এবং তাহাতে আবাদ করিয়াছেন; (তাঁহাকে ছাড়িয়া মহাপাপ করিয়াছ;) অতএব তাঁহার দরবারে ক্ষমা চাও এবং তাঁহার প্রতি ফিরিয়া আস। নিশ্চয় আমার প্রভু দূরে নহেন, তিনি প্রার্থনা কবুল করিবেন।

قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَآ ـ اَتَنْهٰنَآ اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا وَاِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ـ

তাহারা বলিল, হে সালেহ! তোমার দ্বারা ত আমরা দেশের উন্নতি আশা করিতেছিলাম; তুমি দেখি আমাদিগকে আমাদের পূর্বপুরুষদের মাবুদগণের পূজা করিতে নিষেধ কর (এবং নূতন ধর্মের আহবান জানাইতেছ)! তুমি যেই মতবাদের প্রতি ডাকিতেছ উহার প্রতি আমাদের বিশ্বাস মোটেই নাই। (তুমি আমাদের মতবাদে চলিয়া আস।)

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰنِىْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُنِىْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ ـ فَمَا تَزِيْدُوْنَنِىْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ ـ

সালেহ বলিলেন, হে আমার জাতি! বল দেখি, আমি যদি আমার পরওয়ারদেগার প্রদত্ত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকি এবং তিনি যদি আমাকে স্বীয় রহমত ভাজন করিয়া থাকেন, এমতাবস্থায় যদি আমি পরওয়ারদেগারের নাফরমানী করি তবে আমাকে আল্লাহর আযাব হইতে কে রক্ষা করিতে পারিবে? সুতরাং তোমাদের পরামর্শ আমার ক্ষতিই বৃদ্ধি করিবে।

وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِىْ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَاتَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ـ

হে আমার জাতি! আল্লাহ প্রদত্ত উষ্ট্রীটি তোমাদের জন্য আমার সত্যতার প্রমাণ। অতএব ইহাকে আল্লাহর যমীনে (গোচারণ ভূমিতে) অবাধে চরিতে দাও। খবরদার! অনিষ্টের ইচ্ছায় উহাকে স্পর্শও করিও না, অন্যথায় আশু আযাবে তোমরা আক্রান্ত হইবে।

فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِىْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ـ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ ـ

তাহারা (এই কথায় কর্ণপাত করিল না-) উষ্ট্রীকে মারিয়া ফেলিল। সালেহ (আঃ) বলিলেন, তোমরা মাত্র তিন দিন নিজ নিজ গৃহে ভোগ-বিলাস করিয়া নাও (চতুর্থ দিনই তোমাদের উপর আযাব আসিবে) এই নির্ধারণের ব্যতিক্রম ঘটিবে না।

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْىِ يَوْمِئِذٍ ـ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِىُّ الْعَزِيْزُ ـ

অতপর যখন উপস্থিত হইল আমার আযাবের নির্দেশ, তখন সালেহ এবং তাঁহার সঙ্গী মোমেনগণকে বাঁচাইয়া নিলাম নিজ রহমতের দ্বারা এবং সেই দিনের জিল্লতী হইতে রক্ষা করিলাম। নিশ্চয় তোমার প্রভুই একমাত্র সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী।

وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ـ كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ـ

আর প্রচণ্ড গর্জন আক্রমণ করিল স্বৈরাচারীদেরকে, ফলে তাহারা অধঃমুখে পতিত হইয়া মরিয়া রহিল। মুহূর্তে সারা দেশ নীরব-নিস্তব্ধ হইয়া গেল; যেন ঐ দেশে তাহাদের বসবাস ছিলই না।

اَلَا اِنَّ ثَمُوْدَا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ ـ

হে বিশ্বাসী। জানিয়া রাখ- সামুদ জাতি তাহাদের পরওয়ারদেগারের কুফরী (তথা আদেশ অমান্য) করিয়াছিল। জানিয়া রাখ -(ইহারই ফলে) তাহারা ধ্বংস হইয়াছে। (পারা- ১২; রুকু- ৬)

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ـ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ـ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ـ

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنَ ـ وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

সামুদ জাতি রসূলগণের আদর্শকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল। যখন তাহাদেরই বংশীয় সালেহ (আঃ) তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করিয়া সংযত হইবে না? আমি তোমাদের প্রতি সত্য রসূলরূপে আসিয়াছি। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান। আমি তোমাদের নিকট সত্য প্রচারের আজুরা চাই না, আমার আজুরা একমাত্র সারা জাহানের প্রভুর নিকট।

اَتُتْرَكُوْنَ فِىْ مَا هٰهُنَا اٰمِنِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ـ وَّزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ـ وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ ـ

তোমাদেরকে কি চিরস্থায়ীরূপে ভোগ-বিলাসে ছাড়িয়া রাখা হইবে এই বাগ-বাগিচায় এবং প্রবাহমান ঝরণাসমূহে, মনোরম শস্য-শ্যামল পরিবেশে এবং ঘন গুচ্ছবিশিষ্ট খেজুর বাগানের মধ্যে, আর পাহাড় কাটিয়া কাটিয়া তোমরা বানাইতে থাকিবে প্রাসাদ-অট্টালিকা অহংকার ও গর্বে মাতিয়া? (এই আরাম-আয়েশ, গর্ব-অহঙ্কার অচিরেই শেষ হইয়া যাইবে।)

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ـ وَلاَ تُطِيْعُوْاۤ اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ـ الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُوْنَ ـ

তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আমার কথা মান। আর যেসব সীমালঙ্ঘনকারী লোক দুনিয়ায় বিপর্যয় বিশৃঙ্খলা ঘটাইতে অভ্যস্ত যাহাদের দ্বারা কোন সংস্কার ও গঠনমূলক কাজ হয় না, তাহাদের কথায় সাড়া দিও না।

قَالُوْۤا اِنَّمَاۤ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ـ مَاۤ اَنْتَ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا ـ فَأْتِ بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ـ

তাহারা বলিল, আর কিছু নহে তোমার উপর কেহ জাদু চালাইয়াছে ; (সেই আছরে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে, তাই তুমি রসূল হইবার দাবী কর; নতুবা) তুমি ত আমাদেরই মত একজন মানুষ। আচ্ছা, যদি তুমি সত্যবাদী হও তবে প্রমাণ পেশ কর।

قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ وَلاَ تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ـ

সালেহ (আঃ) বলিলেন, এই নাও তোমাদের ফরমায়েশ মোতাবেক উট– ইহার জন্য কূপের পানি একদিন থাকিবে, আর তোমাদের পশুর জন্য নির্ধারিত একদিন থাকিবে। খবরদার! অনিষ্ট সাধনে ইহাকে স্পর্শও করিও না, নতুবা কঠিন দিনের আযাব তোমাদেরকে গ্রাস করিবে।

فَعَقَرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ ـ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ـ

অতঃপর তাহারা ঐ উটকে মারিয়া ফেলিল। পরে ভয়ে অনুতপ্তও হইল, কিন্তু আযাব তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া নিল। নিশ্চয় এই ঘটনায়। উপদেশের বড় নিদর্শন রহিয়াছে। (পারা– ১৯; রুকু– ১২)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَاهُمْ فَرِيْقَانِ يَخْتَصِمُوْنَ ـ

সামুদ জাতির প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাদের ভ্রাতা সালেহকে এই নির্দেশ দিয়া যে, তোমরা এক

আল্লাহর এবাদত কর। তাহারা এই আহবানে সাড়া দিল না দুই দলে বিভক্ত হইয়া, (অমান্যকারীরা মান্যকারীদের বিরুদ্ধে) ঝগড়া বাঁধাইয়া দিল। (অমান্যকারীরা এইরূপও বলিল যে, তোমরা সত্যবাদী হইলে বিপক্ষদের উপর আযাব আন)

قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ـ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ـ

সালেহ (আঃ) বলিলেন, হে আমার জাতি! কল্যাণ চাহিবার আগেই অকল্যাণের জন্য তাড়াহুড়া করিতেছ কেন? (ইহাতে আশ্চর্যের বিষয়) তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও না কেন যাহাতে রহমত লাভ করিবে।

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ـ قَالَ طٰئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ـ

তাহারা বলিল, আমরা তোমাকে এবং তোমার সঙ্গীগণকে অশুভ গণ্য করি (তোমাদের দরুন দেশে অনৈক্য আসিয়াছে)। সালেহ (আঃ) বলিলেন, অশুভের কারণ (কাহারা তাহা) আল্লাহ তাআলার জানা আছে। (তোমাদের কার্যের ফল শুধু অনৈক্য অশুভেরই নহে,) বরং এর দরুন তোমরা আযাবে আক্রান্ত হইবে।

وَكَانَ فِى الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ـ قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ـ

ঐ দেশে নয় জন লোক ছিল যাহারা কেবল ফেত্‌না-ফাছাদ ঘটাইত কোন ভাল কাজ করিত না। তাহারা সালেহ (আঃ)-কে তাঁহার পরিবারবর্গসহ হত্যা করার ষড়যন্ত্র করিয়া পরস্পর স্থির করিল যে, আস আমরা সকলে আল্লাহর নামে কসম খাই যে, রাত্রিবেলা আমরা সালেহ এবং তাহার পরিবারবর্গকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিব। তারপর তাহার দাবীদারকে বলিয়া দিব, আমরা তোমার লোকের হত্যায় উপস্থিত ছিলাম না। আমরা সত্যই বলিতেছি।

وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ـ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ـ

(আল্লাহ তাআলা বলেন,) সালেহ ও তাঁহার দলকে ধ্বংস করার একটা ষড়যন্ত্র তাহারা করিল; আমিও ঐ ষড়যন্ত্র বানচালের গোপন কৌশল করিলাম, তাহারা তাহা উপলব্ধি করিতেছিল না। চোখ খুলিয়া দেখ, তাহাদের ষড়যন্ত্রের পরিণাম কি হইয়াছিল! নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে এবং তাহাদের জাতিকে এক সঙ্গে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলাম।

فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوْا ـ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ـ وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ـ

বিশ্ববাসীর দৃষ্টিগোচরে রহিয়াছে সেই সামুদ জাতির ঘর-বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ যেসব তাহাদের স্বৈরাচারিতার দরুন ধ্বংস হইয়াছিল। নিশ্চয় এই ঘটনায় উপদেশের নিদর্শন আছে বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন লোকদের জন্য। আর এই ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়াছিলাম ঐ দলকে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল ও আল্লাহকে ভয় করিয়া সংযত হইয়া চলিত। (পারা-১৯; রুকু-১৯)

وَأَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى فَأَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ـ وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ـ

আর "সামুদ" জাতি, যাহারা ছিল এক প্রগতিশীল ও উন্নয়নশীল জাতি, তাহাদিগকে আমি সৎপথ দেখাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা সৎপথে চলার পরিবর্তে ইহা হইতে চক্ষু বন্ধ রাখার এবং অসৎ পথে চলার রীতি অবলম্বন করিল। ফলে জিল্লতীর আযাবের ভীষণ গর্জন তাহাদের ধ্বংস করিয়া দিল তাহাদেরই কর্মদোষে। পক্ষান্তরে যাহারা আল্লাহর ভয়-ভক্তি ও ঈমান অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলাম। (পারা- ২৪; রুকু- ১৬)

وَفِىْ ثَمُوْدَ اِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا حَتّٰى حِيْنٍ ـ فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ـ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامٍ وَّمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ ـ

হে বিশ্ববাসী! সামুদ জাতির ইতিহাসে তোমাদের জন্য বড় উপদেশ রহিয়াছে। যখন তাহাদিগকে (ভীতি প্রদর্শনে) বলা হইল, মাত্র কয়েকটি দিন ভোগ-বিলাস করিয়া নাও, (তোমাদের দুষ্কর্মে তোমাদের ধ্বংস আসন্ন)। তাহারা সংযত হইল না স্বীয় প্রভুর নির্দেশাবলী হইতে ঘাড় মুড়িয়া নিল, উহার ধ্বংসলীলা তাহারা দেখিতেছিল, কিন্তু পালাইবার সামর্থ তাহাদের হইল না এবং কাহারও সাহায্যও তাহারা পাইল না।
(পারা- ২৭; রুকু-১)

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ ـ فَقَالُوْا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗ اِنَّا اِذًا لَّفِىْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ـ ءَاُلْقِىَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ ـ

সামুদ জাতি সব সতর্ককারীকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল, এমনকি তাহাদের নবী সম্পর্কে বলিয়াছিল, আমাদের মধ্যকারই একজন মানুষ, আমরা তাহার তাবেদারী করিব? তাহা হইলে ত আমরা বিভ্রান্ত ও মস্তিষ্ক বিকৃত সাব্যস্ত হইব। আমাদের সকলকে বাদ দিয়া একমাত্র ঐ লোকটার প্রতিই অহী আসিল? (বস্তুতঃ অহী আসে নাই,) বরং সে মহা মিথ্যুক, নিজকে বড় বানাইতে চায়।

سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ ـ اِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ـ وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ـ

(আল্লাহ বলেন,) অচিরেই তাহারা উপলব্ধি করিবে কে মিথ্যাবাদী আত্মম্ভরী। আমি তাহাদের পরীক্ষার জন্য একটি উষ্ট্রী পাঠাইলাম। হে সালেহ! আপনি ধৈর্য ধরুন, তাহাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে থাকুন এবং তাহাদের বলিয়া দিন, কূপের পানি তাহাদের পশুপাল ও এই উষ্ট্রীর মধ্যে পালাক্রমে বণ্টিত হইবে। প্রত্যেক পক্ষ নিজ পালার দিন পানি পানে উপস্থিত হইবে।

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ ـ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ـ اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ ـ

কিন্তু তাহারা (ঐ বণ্টনে সন্তুষ্ট হইল না এবং সব নির্দেশ ও সতর্কবাণীর বিরুদ্ধে "কোদার" নামক) নিজেদের লোকটিকে ডাকিল। সে উষ্ট্রীটির উপর হাত চালাইল এবং উহাকে মারিয়া ফেলিল। ফলে আমার আযাব ও সতর্কবাণীর বাস্তবতা তাহাদের পক্ষে কী ভীষণ হইল? আমি তাহাদের উপর পাঠাইয়া দিলাম এক

প্রচণ্ড নিনাদ; যাহার ফলে মুহূর্তে তাহারা শুষ্ক ডালার চূর্ণ-বিচূর্ণ পত্রাবশেষের মত ধ্বংস হইল।

(পারা-২৭; রুকু- ৯)

اَلْحَاقَةُ مَا الْحَاقَةُ ـ وَمَا اَدْرٰكَ مَا الْحَاقَةُ ـ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَاد بِالْقَارِعَةْ ـ فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ـ

অবশ্যম্ভাবী বস্তু, কি ভীষণ হইবে সেই অবশ্যম্ভাবী বস্তু! সেই অবশ্যম্ভাবী বস্তু (তথা মহাপ্রলয় কেয়ামতের বিভীষিকা) তোমারা উপলব্ধি করিতে পার না। (কিন্তু খবরদার! উহা অবিশ্বাস করিও না; উহা অবিশ্বাস করার পরিণাম ভয়াবহ।) সামুদ জাতি এবং আ'দ জাতি কর্ণ বিদীর্ণকারী কেয়ামতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল, ফলে সামুদকে ধ্বংস করা হইয়াছে সহন-সীমা অতিক্রমকারী প্রচণ্ড নিনাদের দ্বারা।

(পারা- ২৯; রুকু- ৯)

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰهَا ـ اِذِ انْبَعَثَ اَشْقٰهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوّٰهَا ـ وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ـ

সামুদ জাতি ঔদ্ধত্যবশে নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল– বিশেষতঃ যখন তাহাদের সর্বাধিক দুর্ভাগা হতভাগা লোকটি (মোজেযার উষ্ট্রীটি মারিবার জন্য) প্রস্তুত হইল; এবং আল্লাহর রসূল তাহাদিগকে বলিলেন, ইহা তোমাদের পরীক্ষার জন্য আল্লাহর প্রেরিত বিশেষ উষ্ট্রী; উহা সম্পর্কে ও উহার পানি পান সম্পর্কে সতর্ক থাকিও, উহার অনিষ্ট করিও না। তাহারা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিল এবং উষ্ট্রীটিকে মারিয়া ফেলিল। তাহাদের পাপের ফলে পরওয়ারদেগার তাহাদের উপর সর্বগ্রাসী আযাব নাযিল করিলেন। তাঁহার ত পরিণামের কোন ভয় করিতে হয় না। (সূরাা শামছ পারা-৩০)

যুল-ক্বারনাইন্

"যুল-কার্নাইন" একটি উপাধি; দুইটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত– 'যুল' অর্থ অধিকারী এবং 'কারনাইন' ইহা কারনুন-এর দ্বিবচন, যাহার অর্থ দিক। বিশ্বের স্থল ভাগের দুই দিক– পূর্ব ও পশ্চিম, এই উভয় দিকের শেষ সীমা পর্যন্ত এই লোকটি ভ্রমণ করায় তিনি এই উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

এই লোকটি কে ছিলেন? তাঁহার নাম কি ছিল? কোন্ যুগে ছিলেন? এই সব সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মতদ্বৈততা অনেক বেশী। পূর্ব হইতে বিশিষ্ট তথ্যবিদগণ যাহা বলিয়াছেন তাহা এই যে, তাঁহার নাম ছিল 'এস্কান্দার'। দুনিয়াতে বহু লোকই এস্কান্দার নামে আসিয়াছেন; এমনকি আমাদের হযরত রসূলুল্লাহর যুগের প্রায় নয়শ'ত বৎসর পূর্বে এক প্রতাপশালী বাদশাহ ছিল– তাহার নামও ছিল এস্কান্দার এবং তাহার উপাধিও ছিল যুল-কারনাইন। কোন কোন ঐতিহাসিক এই বাদশাহকেই পবিত্র কোরআনের যুল-কারনাইন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তহা ভুল। কারণ, ঐতিহাসিকগণের বর্ণনায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই বাদশাহ কাফের এবং ভীষণ অত্যাচারী ছিল– অথচ পবিত্র কোরআনে উল্লিখিত যুল-কারনাইন সম্পর্কিত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি একজন খোদাভক্ত ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিরেন। এমনকি তাঁহার প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ বাণীও আসিয়াছিল বলিয়া পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রহিয়াছে। এই বাণী অহী মারফত ছিল বলিয়া সাব্যস্ত করতঃ কোন কোন তথ্যবিদ তাঁহাকে নবী বলিয়াও গণ্য করিয়াছেন। ইমাম বোখারী (রঃ) সেই সূত্রেই যুল-কারনাইনের বর্ণনা নবীগণের বর্ণনার শামিল করিয়া দিয়াছেন। অবশ্য বিশিষ্ট আলেমগণের মত ইহাই যে, আল্লাহ তাআলার বাণী তাঁহার প্রতি এল্‌হামস্বরূপ আসিয়াছিল এবং তিনি একজন অতি মহান ও আল্লাহ তাআলার পেয়ারা, খোদা-ভক্ত, ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন– নবী ছিলেন না।

এতদ্দৃষ্টে ইহা অবধারিত যে, সেই কাফের অত্যাচারী বাদশাহ পবিত্র কোরআনে বর্ণিত যুল-কারনাইন নামীয় ব্যক্তি নহে।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগের প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের সময় এস্কান্দার নামে এক বাদশাহ ছিলেন। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত গুণাবলী তাঁহার ছিল, তাই তঁহাকেই আলোচ্য যুল-কারনাইনরূপে স্থির করা হয়। বোখারী (রঃ) যুল-কারনাইনের বর্ণনা ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের বর্ণনা সংলগ্নে উল্লেখ করিয়াছেন।

পবিত্র কোরআনের পারা– ১৬; রুকু– ২-তে জুল-কারনাইনের বর্ণনা রহিয়াছে। কাফেররা পরীক্ষাস্বরূপ হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে যুল-কারনাইন সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে তদুত্তরেই পবিত্র কোরআনের এই সুদীর্ঘ বয়ান নাযিল হয়।

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ـ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ـ اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِى الْاَرْضِ وَاٰتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَىٍ سَبَبًا ـ

কাফেররা যুল-কারনাইন সম্বন্ধে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে। বলিয়া দিন, তাঁহার সম্পর্কে কিছু বিবরণ তোমাদের (কোরআনের মাধ্যমে) তেলাওয়াত করিয়া শুনাইতেছি– আল্লাহ বলেন, আমি যুল-কারনাইনকে জগতে শক্তিশালীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম, তাহাকে বহু উপায় উপকরণের সংস্থান করিয়া দিয়াছিলাম।

فَاَتْبَعَ سَبَبًا ـ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِىْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ـ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ ـ اِمَّا اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّا اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ـ

সেমতে সে (এক ভ্রমণ অভিযানে) একটা পথ ধরিয়া চলিল। সে যখন পশ্চিম দিকের বসতি এলাকার শেষ প্রান্তে পৌঁছিল তখন দেখিতে পাইল– সূর্য (যেন) কালো কাদাময় জলাশয়ে অস্ত যাইতেছে এবং তথায় একটি বিশেষ জাতির সাক্ষাত পাইল। (সে তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া তথায় অধিকার প্রতিষ্ঠা করিল।) আমি তাহাকে বলিলাম, (তুমি ত তাহাদিগকে পরাভূত করিয়াছ; এখন) তাহাদের উপর হয়ত নির্যাতন চালাইবে কিম্বা তাহাদের প্রতি সুব্যবহার ও সুব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। (অবশ্য তুমি যে নীতি অবলম্বন করিবে ফলও তেমনই পাইবে।)

قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا ـ وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَاۤءَ نِ الْحُسْنٰى وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ـ

যুল-কারনাইন বলিল, (আমার নীতি হইবে–) যে অন্যায়কারী তথা কাফের থাকিবে আমরা তাহাকে (ইহজগতের) শাস্তি দিব। অতঃপর স্বীয় প্রভুর নিকট তাহার উপস্থিতি হইবে; তিনি তাহাকে কঠোর শাস্তি দিবেন। পক্ষান্তরে যে ঈমান আনিবে এবং নেক আমল করিবে, তাহার জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে (পরকালে) উত্তম প্রতিদান এবং আমরাও তাহার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেক ব্যাপারে মোলায়েম কথাই বলিব এবং উত্তম ব্যবহারই করিব।

ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ـ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا ـ

অতঃপর সে আর এক পথে অভিযান চালাইল। যখন পূর্ব দিকের আবাদীর শেষ প্রান্তে পৌঁছিল তখন দেখিল, সূর্য তথায় এমন মানবগোষ্ঠীর উপর উদিত হয় যাহাদের জন্য সূর্যের নীচে আচ্ছাদনের ব্যবস্থা আমি (শিক্ষা) দেই নাই। (তাহারা উন্মুক্ত ভুপৃষ্ঠে বাস করে।)

كَذٰلِكَ ـ وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ـ

এই ঘটনা এইরূপই ছিল; (আমার বর্ণনা ও বাস্তব ঘটনা একই।) যুল-ক্বারনাইনের সব সংবাদই আমার নিকট সম্যকরূপে বিদ্যমান আছে।

ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ـ حَتّٰى اِذاَ بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا لاَيَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلاً ـ

অতপর সে আর এক পথে অভিযান চালাইল। এই অভিযানে যখন সে দুইটি পর্বত-প্রাচীরের মধ্যস্থ এক স্থানে পৌছিল তখন সেই পর্বতদ্বয়ের পাদদেশে এক মানব সমাজ পাইল, যাহারা তাহার ভাষা মোটেই বুঝে না।

قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَّكَ خَرجًا عَلٰى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًا ـ

(দোভাষী মারফত কথাবার্তায়) তাহারা বলিল, হে যুল-কারনাইন্। (এই পর্বতমালার প্রাচীরদ্বয়ের মধ্য দিয়ে সময় সময়) "ইয়াজুজ-মাজুজ" আমাদের অঞ্চলে আসিয়া ভীষণ ক্ষয়ক্ষতি ঘটায়। আমরা কি অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিব; যেন আপনি আমাদের ও তাহাদের মধ্যে একটি প্রাচীর তৈরি করিয়া দেন?

قَالَ مَا مَكَّنِىْ فِيْهِ رَبِّى خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رِدْمًا ـ

জুল-কারনাইন্ বলিল, আমার পরওয়াদেগার আমাকে ধন-দৌলতের যে সামর্থ্য দিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট; তোমরা শুধু শ্রমশক্তি দ্বারা আমাকে সাহায্য কর; তোমাদের ও উহাদের মধ্যে মজবুত প্রাচীর তৈয়ার করিয়া দেই।

اٰتُوْنِىْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ ـ حَتّٰى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ـ حَتّٰى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا قَالَ اٰتُوْنِىْ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ـ

তোমরা বড় বড় লৌহ চাদরগুলি আমার নিকট পৌছাও। পর্বতদ্বয়ের মধ্যকার গিরিপথটি যখন (লৌহ-পাতে) ভরাট করিয়া পর্বত সমান করিল তখন সে ঐ লৌহগুলিকে (তপ্ত করার উদ্দেশে) আগুন জ্বালাইতে আদেশ করিল। যখন উহা অগ্নিতুল্য তপ্ত করিয়া দিল তখন আদেশ করিল, গলিত তাম্র আমার নিকট উপস্থিত কর; এই তপ্ত লৌহগুলির উপর ঢালিয়া দিব।

فَمَا اسْطَاعُوْا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ـ قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّىْ فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّىْ جَعَلَهٗ دَكَّاءَ ـ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّىْ حَقًّا ـ

(লৌহ-তাম্রে জমাট বাঁধা পর্বত সমান প্রাচীর তৈরী হইল, উহা অতি উঁচু, মসৃণ, কঠিন ও সুদৃঢ় ছিল।) অতএব ইয়াজুজ-মাজুজদের পক্ষে উপরে চড়িয়া উহা অতিক্রম করাও সম্ভব হইবে না; ভাঙ্গিয়া পথ সৃষ্টি করাও সম্ভব হইবে না। যুল-কারনাইন্ ইহাও বলি এই প্রাচীর আমার পরওয়াদেগারের বিশেষ দান– একমাত্র তাঁহার অনুগ্রহেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। যখন তাঁহারই নির্ধারিত সময় (কেয়ামত নিকটবর্তী) আসিবে, তখন তিনি ইহা ধূলিসাৎ করিয়া দিবেন। আমার পারওয়ারদেগারের নির্ধারণ বাস্তব ও অবশ্যম্ভাবী।

যুল-কারনাইন সম্পর্কে ইহা অপেক্ষা অধিক আর কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এই ঘটনার ইতিহাস স্বভাবতই অন্য দুইটি বস্তুর তথ্য অবগত হওয়ার প্রতি আকৃষ্ট করে। একটি হইল ইয়াজুজ-মাজুজ, দ্বিতীয়টি

হইল উল্লিখিত বিশেষ প্রাচীর। তাই ইমাম বোখারী (রঃ) এই সম্পর্কে ইঙ্গিত দান করতঃ পবিত্র কোরআনের আয়াত ও কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করিতেছেন।

ইয়াজুজ-মাজুজ

ইহাদের আকৃতি-প্রকৃতি এবং আবাসস্থল সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মতদ্বৈধতা অনেক বেশী। যে মতকে সাধারণতঃ প্রামাণিক মনে করা হয় তাহা এই যে– ইহারা আদম সন্তানেরই একটি বিশেষ সম্প্রদায়। সাধারণ মানব জাতির ন্যায় ইহারাও নূহ আলাইহিস সালামের মাধ্যমে আদি পিতা আদম (আঃ) ও আদি মাতা হাওয়া (আঃ) উভয়ের ঔরসজাত বংশধর। ইহারা সাধারণ মানুষ অপেক্ষা বেশী দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। ঈমানদার ইহাদের মধ্যে কেহই নাই– সকলেই দোযখী; ইহারা সংখ্যায় অনেক বেশী। তাহারা দুই গোত্রে বিভক্ত; একটির নাম "ইয়াজুজ" অপরটির নাম "মাজুজ, তাই তাহাদের সমষ্টি ইয়াজুজ-মাজুজ নামে প্রসিদ্ধ। সাধারণ মানুষের আবাদী হইতে ভিন্ন স্থানে তাহাদের নিবাস। যুল-কারনাইন কর্তৃক প্রাচীর তৈয়ার হওয়ার পর সাধারণ মানুষের বসবাস স্থলে আসিবার পথ তাহাদের জন্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়ে কেয়ামতের নিকটবর্তিতার নিদর্শনস্বরূপ এই প্রাচীরে আল্লাহর কুদরতে এক ইঞ্চি পরিমাণ বা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র একটি ছিদ্র হইয়াছে। কেয়ামত যখন অতি ঘনাইয়া আসিবে তখন এই প্রাচীর ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে এবং ইয়াজুজ-মাজুজের দল প্রবল স্রোতের ন্যায় চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে। অতপর তাহারা আল্লাহ তাআলার বিশেষ গজবে ধ্বংস হইবে। তাহাদের এইসব ঘটনা কেয়ামতের অতি নিকটবর্তিতার একটি বিশেষ আলামত। এই সূত্রেই ইমাম বোখারী (রঃ)ও অন্যান্য মোহাদ্দেছগণের ন্যায় ইয়াজুজ-মাজুজের বর্ণনা কেয়ামতের আলামত অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন। এ স্থলে ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) কর্তৃক উদ্ধৃত একটি আয়াত এই–

اِنَّ هٰذِهٖ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ـ وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنَ ـ وَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ـ كُلٌّ اِلَيْنَا رَاجِعُوْنَ ـ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ـ وَاِنَّا لَهٗ كَاتِبُوْنَ ـ

সমস্ত নবীগণের ধর্মের মূল একই যে, একমাত্র আমিই তোমাদের প্রভু– তোমরা আমারই এবাদত করিবে। মানব সমাজ (শয়তানের ধোকায়) দ্বীন-ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া আছে; (হিসাব-নিকাশের জন্য) তাহারা সকলেই আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। যাহারা ঈমান গ্রহণ ও নেক আমলসমূহ সম্পাদন করিবে তাহাদের চেষ্টা বিফল যাইবে না। আমি তাহাদের ঈমান ও নেক আমল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি।

وَحَرَامٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ـ

(সেই হিসাব-নিকাশ এই জগতে অনুষ্ঠিত হইবে না; কারণ) যেকোন বস্তির অধিবাসীকে আমি মৃত্যুর কবলে পতিত করি, তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ রহিয়াছে– তাহারা পুনঃ এই জগতে ফিরিয়া আসিবে না। (হিসাব-নিকাশের জন্য নির্ধারিত সময় রহিয়াছে।)

حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ـ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِىَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ـ يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِىْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ

যখন (সেই নির্ধারিত সময়ের বিশেষ নিদর্শন প্রকাশ পাইবে যে,) ইয়াজুজ-মাজুজের পথ খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং (তাহারা প্রবল স্রোতের ন্যায় ছড়াইয়া পড়িবে, এমনকি) প্রত্যেক পাহাড়-পর্বত, টিলা-ভিটা হইতে তাহাদিগকেই লাফাইয়া নামিয়া আসিতে দেখা যাইবে। (এই নিদর্শন প্রকাশেই) নিকটবর্তী হইয়া

আসিবে সেই নির্ধারিত সময় যাহা বাস্তব ও নিশ্চিত। উক্ত সময়ের উপস্থিতিতে অবিশ্বাসীদের চোখে অকস্মাৎ চমক লাগিয়া যাইবে। (তখন তাহারা আক্ষেপে জর্জরিত হইয়া নিজকে ভর্ৎসনাপূর্বক বলিবে,) আমাদের চরম দুর্ভাগ্য ছিল যে, আমরা এই নির্ধারিত সময় সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন ছিলাম, বরং আমরা অন্যায়কারী ৮৮ছিলাম। (পারা– ১৭ ; রুকু–৭)

ইয়াজুজ-মাজুজের ছড়াইয়া পড়া কেয়ামতের নিকটবর্তিতার নিদর্শন– সে সম্পর্কে অনেক হাদীছও আছে। মুসলিম শরীফের এক হাদীছে কেয়ামতের পূর্বক্ষণে বিশেষ দশটি নিদর্শন প্রকাশ হওয়ার উল্লেখ আছে; তন্মধ্যে ইয়াজুজ-মাজুজও রহিয়াছে।

মুস্‌লিম শরীফে আরও একখানা হাদীছ রহিয়াছে। সেই হাদীছটির মধ্যে কেয়ামতের নিকটবর্তী বহু ঘটনার ফিরিস্তি বর্ণিত আছে। সেই হাদীছে দজ্জালের বিবরণ ও হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আসমান হইতে অবতরণ এবং ঈসা (আঃ) কর্তৃক দজ্জাল বধ করার ঘটনা বর্ণনার পর উল্লেখ করা হইয়াছে–

اذ اوحى الله على عيسى انى قد اخرجت عبادا لى لايدان لاحد بقتالهم فحرز عبادى الى الطور ويبعث الله ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر اوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر اخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ماء ثم يسيرون حتى ينتهون الى جبل الجمر وهو جبل بيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من فى الارض هلم فلنقتل من فى السماء -

অর্থঃ ঈসা (আঃ) কর্তৃক দজ্জাল নিহত হওয়ার পর তৎকালীন অবশিষ্ট ঈমানদার দল ঈসা (আঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে আদর-যত্ন করতঃ বেহেশতে তাহারা যে উচ্চাসন লাভ করিবেন তাহা শুনাইয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিবেন। এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ একদা আল্লাহ তাআলা অহী মারফত ঈসা (আঃ)-কে সংবাদ জানাইবেন যে, আমি আমার এক শ্রেণীর সৃষ্ট মানুষের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছি। অর্থাৎ আমারই আদেশক্রমে তাহারা ভূপৃষ্ঠে ছড়াইয়া পড়িবে। তাহারা এতই দুর্ধর্ষ যে, তাহাদের মোকাবিলা করার ক্ষমতা কাহারও নাই। আপনি আমার মোমেন বান্দাহগণসহ পাহাড়ের উপর যাইয়া লুকাইয়া থাকুন। অতপর আল্লাহ তাআলা ইয়াজুজ-মাজুজ জাতিকে তাদের আবদ্ধ এলাকার বাহিরে আসিবার পথ খুলিয়া দিবেন। তাহারা সংখ্যায় অনেক বেশী হওয়ায় চতুর্দিকের পাহাড়-পর্বত, টিলা ইত্যাদি হইতে তাহাদিগকেই লাফাইয়া নামিয়া আসিতে দেখা যাইবে। তাহাদের প্রথম দলটি পথিমধ্যে (ইরাকের ওয়াসেত অঞ্চলে) তবরিয়া এলাকাস্থিত একটি (দশ মাইল প্রশস্ত) হ্রদের পানি পান করিতে যাইয়া শুষ্ক করিয়া ফেলিবে। এমনকি তাহাদের আর একটি দল তথায় উপস্থিত হইয়া একটুও পানি পাইবে না, শুধু এতটুকু ধারণা করিতে পারিবে যে, এ স্থানে পূর্বে পানি ছিল। অতপর তাহারা জেরুজালেমস্থিত একটি পর্বতের নিকট উপস্থিত হইবে এবং বলাবলি করিবে যে, ভূপৃষ্ঠে ত কাহাকেও বাকী রাখি নাই, সবাকেই শেষ করিয়াছি এখন উপরওয়ালাকে হত্যা করিব– এই বলিয়া তাহারা উপরের দিকে তীর নিক্ষেপ করিবে। (তাহাদের অহঙ্কার বৃদ্ধির পরীক্ষাস্বরূপ) আল্লাহ তাআলার কুদরতে তাহাদের তীরগুলি রক্ত রঞ্জিতরূপ রঙ্গিন অবস্থায় তাহাদের প্রতি ফিরিয়া আসিবে।

ঈসা (আঃ) ও তাঁহার সঙ্গীগণ– যাহারা দীর্ঘ দিন পাহাড়ে আবদ্ধ জীবন কাটাইতেছিলেন, তাঁহারা আল্লাহ তাআলার নিকট বিপদ দূরীভূত হওয়ার দোয়া করিবেন। আল্লাহ তাআলা ইয়াজুজ-মাজুজের উপর গজব নাযিল করিবেন যে, তাহাদের গর্দানের উপর (ঘা হইয়া উহাতে) এক প্রকার পোকা হইবে; তাহাতে তাহারা সব ধ্বংস হইবে। অতপর ঈসা (আঃ) সঙ্গীগণসহ পাহাড় হইতে অবতরণ করিবেন। তাঁহারা সেই এলাকায় সমস্ত যমীনই ইয়াজুজ-মাজুজের গলিত লাশে পরিপূর্ণ দেখিতে পাইবেন। তখন তাঁহারা আল্লাহ তাআলার

নিকট এই বিষয়ে দোয়া করিবেন। আল্লাহ তাআলা উটের ন্যায় লম্বা গর্দানবিশিষ্ট পাখী পাঠাইবেন। উহারা সব মৃতদেহ আল্লাহ তায়ালার আদিষ্ট স্থানে ফেলিয়া দিবে। তারপর প্রবল বৃষ্টিপাতে ভূপৃষ্ঠ ধৌত হইয়া যাইবে। ইয়াজুজ-মাজুজের সংখ্যাধিক্য সম্বন্ধে বোখারী শরীফের হাদীছে–

১৬২৫। হাদীছ ঃ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا ادَمُ فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِىْ يَدَيْكَ فَيَقُوْلُ اَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ اَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ فَعِنْدَهُ يَشِيْبُ الصَّغِيْرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارٰى وَمَا هُمْ بِسُكَارٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ - قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاَيُّنَا ذٰلِكَ الْوَاحِدُ؟ قَالَ اَبْشِرُوْا فَاِنَّ مِنْكُمْ رَجُلٌ وَمِنْ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ اَلْفٌ - ثُمَّ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنِّىْ اَرْجُوْا اَنْ تَكُوْنُوْا رُبُعَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا - فَقَالَ اَرْجُوْا اَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا - فَقَالَ اَرْجُوْا اَنْ تَكُوْنُوْا نِصْفَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا - فَقَالَ مَا اَنْتُمْ فِى النَّاسِ اِلاَّ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِىْ جِلْدِ ثَوْرٍ اَبْيَضَ اَوْ كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ فِىْ جِلْدِ ثَوْرٍ اَسْوَدَ -

অর্থ ঃ আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হাশরের দিন আল্লাহ তাআলা আদম (আঃ)-কে ডাকিবেন। আদম (আঃ) ভক্তি ও আনুগত্যের সহিত নিজের উপস্থিতি আরজ করিবেন। আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে নির্দেশ দিবেন, আদম সন্তান হইতে চির দোযখী দলকে ভিন্ন করিয়া দাও। আদম (আঃ) জিজ্ঞাসা করিবেন, চির দোযখী দলের সংখ্যা কিরূপ? আল্লাহ তাআলা ফরমাইবেন, প্রতি হাজারে নয় শত নিরানব্বই জন।

(হযরত (সঃ) বলেন,) এই ঘোষণার সময়েই মানুষ ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িবে। এই ভীতি সম্পর্কেই পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রহিয়াছে যে, এই ধরনের ভয়ে বালক বৃদ্ধ হইয়া যায়, গর্ভবতীর গর্ভপাত হইয়া যায়। আল্লাহ তাআলার এই আদেশ শ্রবণে সমস্ত মানুষ অচৈতন্য দেখা যাইবে। বস্তুতঃ তাহারা অচৈতন্য হইবে না, কিন্তু (দোযখে) আল্লাহর আযাব ভীষণ ও ভয়ঙ্কর, যাহার ভয়ে ঐ ঘোষণা শুনিয়া সমস্ত লোক আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িবে।

এই বর্ণনায় ছাহাবীগণ (কাঁদিতে লাগিলেন এবং নৈরাশ্যজনক সুরে) আরজ করিলেন, (হাজারের মধ্যে বেহেশতবাসী মাত্র একজন! হায়–) সেই একজন আমাদের মধ্যে কে হইবে? রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, তোমরা শান্ত হও। (একমাত্র মুসলমানই বেহেশত লাভ করিবে; ইসলাম ধর্মাবলম্বী ব্যতীত সকলেই দোযখী। আর মুসলমান ও মুসলিম এই দুই দলের সংখ্যার অনুপাত এইরূপ–) তোমরা (তথা পূর্বাপর বিশ্ব মোসলেম সারা বিশ্বের মানব গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতি হাজারে) একজন এবং হাজারের বাকী সংখ্যা (৯৯৯ জন সকলেই) ইয়াজুজ-মাজুজ (ও তাহাদের ন্যায় অন্যান্য কাফের অমুসলিমগণ) হইবে।* (পাপী মুসলমান অনকেই

---

* অর্থাৎ হাজারের মধ্যে একজন বেহেশতী ইহার অর্থ এই নয় যে, খাঁটী মুসলমানদের প্রতি হাজারে একজন বেহেশতী
যাইবে, বরং সারা বিশ্ব মানব তথা ইয়াজুজ-মাজুজসহ সকলের সমষ্টির প্রতি হাজারে একজন বেহেশ্তী , ৯৯৯ জন দোযখী হইবে।
বস্তুতঃ খাঁটী মুসলমানের সংখ্যাই অতি নগণ্য । অঁখাটী তথা শুধু ইসলামের দাবীদার ঈমানহীন মুনাফেক, প্রকাশ্য
অমুসলিম এবং ইয়াজুজ-মাজুজ যাহারা সকলই অমুসলিম– এই সবের সমষ্টির সঙ্গে খাঁটী মুসলমানদেরকে হিসাব করা হইলে
তাঁহাদের মূল সংখ্যা হাজারের মধ্যে একজনই দাঁড়াইবে এবং প্রত্যেক খাঁটী মুসলমান প্রথম বারেই অথবা শেষ পর্যন্ত বেহেশ্তে
যাবে। খাঁটী মুসলমান একজনও চিরজাহান্নামী হইবে না! সুতরাং হাজারের মধ্যে একজনমাত্র বেহেশত লাভ করিবে" এই ঘোষণা
খাঁটী মুসলমান কাহারও পক্ষে ভয়ের কারণ নহে।

এস্থলে একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এখানে ইয়াজুজ-মাজুজ বলিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর কাফের মোনাফেক মানুষ ও জ্বিনসহ সকল প্রকার অমুসলমানকেই উদ্দেশ করা হইয়াছে। কারণ অমুসলমান দলে ইয়াজুজ-মাজুজেরই আধিক্য।

দোযখে যাইবে। কিন্তু তাহারা চির-জাহান্নামী হইবে না, সাময়িক জাহান্নামী হইবে– তাহাদের উল্লিখিত সংখ্যায় শামিল করা হয় নাই। নতুবা জাহান্নামীর সংখ্যা আরও অধিক বলা হইত। অতঃপর হযরত (সঃ) শপথ করিয়া ঘোষণা করিলেন, আমি আশা করি তোমরা (উম্মতে মুহাম্মদী) সমস্ত বেহেশতবাসীগণের এক চতুর্থাংশ হইবে। এই সুসংবাদ শ্রবণে ছাহাবীগণ তকবীর ধ্বনি দিয়া উঠিলেন।

অতপর হযরত বলিলেন, আমি আশা করি তোমরা এক তৃতীয়াংশ হইবে, ছাহাবীগণ, পুনঃ তকবীর-ধ্বনি দিলেন। অতপর হযরত (সঃ) বলিলেন, আশা করি অর্ধাংশই তোমরা হইবে, এইবারও ছাহাবীগণ তকবীর ধ্বনি দিলেন।*

হযরত (সঃ) আরও বলিলেন, (জগতে) অমুসলিমদের তুলনায় তোমরা (মুসলমানদের সংখ্যাল্পতা) এইরূপ, যেরূপ সাদা বলদের গায়ে কতিপয় কাল লোম বা কাল বলদের গায়ে কতিপয় সাদা লোম। (এই অধিক সংখ্যার অমুসলিম সকলেই দোযখী, অতএব, দোযখীদের আধিক্য শুনিয়া নিরাশ হইবে না। অবশ্য ইসলাম রত্নের মূল্যবোধে খাঁটী মুসলমান হওয়ায় সচেষ্ট হইবে।)

ব্যাখ্যা ঃ ইয়াজুজ-মাজুজের সংখ্যাধিক্যের কারণও হাদীছে বর্ণিত আছে যে, একদিকে তাহাদের যৌন স্পৃহা ও শক্তি অত্যধিক। অপর দিকে তাহারা বয়সও অনেক বেশী পায়। এমনকি সাধারণতঃ তাহাদের এক জনের এক এক হাজার সন্তান-সন্ততি হওয়ার পূর্বে মৃত্যু ঘটে না। (ফতহুল বারী)

যুল-কারনাইন– এস্কান্দর বা সেকান্দরের প্রাচীর

এই প্রাচীরের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বিশেষতঃ ইহার স্থান সম্পর্কে ভূগোলবিদদের অনেক গবেষণাই চলিয়াছে। বিশ্বের মধ্যে ৩৪টি প্রাচীন প্রাচীরের খোঁজ পাওয়া যায়; উহার প্রত্যেকটিই অতি প্রাচীন ও আশ্চর্য ধরনের, এমনকি "চীনের প্রাচীর" ত বিশ্বের সপ্ত আশ্চর্যের মধ্যে একটি। অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্ব সীমান্তে সমুদ্রোপকূলে এক প্রাচীন প্রাচীর আছে– এক হাজার মাইলের অধিক লম্বা, বার মাইল চওড়া, এক হাজার ফুট উঁচু; উহার উপর বহু রকম জীবের অবস্থান রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ এখনও উহার তথ্যানুসন্ধান চালাইতেছেন।

আমাদের আলোচ্য প্রাচীর সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসের দ্বারা কতিপয় গুণাগুণ প্রমাণিত হয়–(১) এই প্রাচীরের নির্মাতা যুল-কারনাইন নামক খোদাভক্ত বাদশাহ ছিলেন। (২) এই প্রাচীর সাধারণ ধরনের ইট-পাথরের তৈয়ার নহে, লৌহ ও তাম্রে নির্মিত। (৩) উহা দুইটি পাহাড়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং উহার উভয় দিক পাহাড়ের সঙ্গে গাঁথা। (৪) এই প্রাচীরের অপর পার্শ্বে ইয়াজুজ-মাজুজের বংশধর অবস্থিত, যাহাদের অবস্থা সাধারণ মানুষ হইতে ভিন্ন। (৫) তিরমিযী শরীফ, ইবনে মাজা শরীফ এবং আরও অনেক কিতাবে উল্লিখিত একটি হাদীছে ইহাও বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) ফরমাইয়াছেন, ইয়াজুজ-মাজুজ দল প্রতিদিন এই প্রাচীর খনন করে। সারা দিন খননে যখন ইহা ভেদ করার নিকটবর্তী হইয়া আসে তখন দলপতির আদেশে কার্য স্থগিত রাখিয়া তাহারা এই বলিয়া চলিয়া যায় যে, আগামীকল্য আসিয়া ইহা ভেদ করিয়া ফেলিব; কিন্তু আল্লাহ তাআলার কুদরতে খননকৃত স্থান অধিক শক্তরূপে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। প্রতিদিন তাহাদের কার্য এইরূপই চলিয়া আসিয়াছে, এমনকি যখন কেয়ামত আসন্ন হইবে এবং কোরআন- হাদীছের ঘোষণা– ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাদুর্ভাব বাস্তবায়িত হওয়ার সময় উপস্থিত হইবে তখন একদিন খনন কার্য হইতে বিরতিকালে তাহাদের দলপতি এইরূপ বলিবে, "ইনশা আল্লাহ– আগামীকাল ইহা ভেদ করিয়া

* তিরমিযী শরীফের এক হাদীছের হিসাব মতে বেহেশতীগণের দুই তৃতীয়াংশ এই উম্মত হইবে। উক্ত হাদীছে বর্ণনা আছে যে, বেহেশতীগণের ১২০ কাতার হইবে। তন্মধ্যে ৮০ কাতার হইবে এই উম্মত এবং অন্য সব উম্মতের সমষ্টি হইবে ৪০ কাতার। (২–২৭ পৃঃ)

নবী (সঃ) সুসংবাদটি ধাপে ধাপে জ্ঞাত করিয়াছেন; হয়ত আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে নবী (সঃ) কেও এইরূপেই জ্ঞাত করা হইয়াছে।

ফেলিব।" (ইনশা- আল্লাহর বদৌলতে) এইবার খননকৃত স্থান পূর্ণ হইবে না; পর দিন তাহারা অতি সহজেই অবশিষ্ট খনন কার্য সমাধা করিয়া উহা ভেদ করতঃ প্রবল স্রোতের ন্যায় বাহির হইতে থাকিবে এবং সম্পূর্ণ প্রাচীর ধূলিসাৎ হইয়া কোরআনের এই ঘোষণা বাস্তবে পরিণত হইবে فاذا جاء وعد ربى جعله دكاء "যখন পরওয়ারদেগারের নির্ধারিত সময় উপস্থিত হইবে তখন তিনি এই প্রাচীরকে ধূলিসাৎ করিয়া দিবেন।"

উল্লিখিত অবস্থা ও গুণাবলী দৃষ্টে বলিতে হয় যে, ভূগোলবিদগণ কতৃক আবিষ্কৃত প্রাচীর সমূহের কোনটিই কোরআনের আলোচ্য প্রাচীর নহে এবং অদ্যাবধি এই প্রাচীর অনাবিষ্কৃতই রহিয়াছে। অধুনা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিরাট উন্নতির প্রভাবে এই মতবাদকে নাক সিটকানোর দৃষ্টিতে দেখা বোকামির পরিচায়ক হইবে। কারণ পাঁচশত বৎসর পূর্বে আমেরিকার ন্যায় মহাদেশ বৈজ্ঞানিকদের খোঁজের বাহিরে ছিল। ইতিপূর্বেও বিশাল "আণ্টার্কটিকা" মহাদেশ বৈজ্ঞানিকদের আওতার বাহিরে ছিল, আজও সেই মহাদেশের সমূদয় এলাকা ও অবস্থাই বৈজ্ঞানিকদের আওতার বাহিরে। এই ধরনের আরও কত জিনিসের জ্ঞান হইতে বৈজ্ঞানিকগণ বঞ্চিত। অতএব এই প্রাচীরের তথ্যও যে তাহাদের অজ্ঞাত ইহাতে বৈচিত্র্যের কি আছে? ইয়াজুজ-মাজুজের অবস্থানস্থলও তো সকলের অজ্ঞাত রহিয়াছে।

আল্লাহ তাআলার কুদরত বৈচিত্র্যপূর্ণ, একদিকে বর্তমান যুগের বিরাট সফলতাপূর্ণ বিজ্ঞানের অনুসন্ধানকে তিনি এই প্রাচীর পর্যন্ত পৌছিতে দিলেন না, অপর দিকে স্বীয় স্বাধীন ইচ্ছা ও কুদরতের নিদর্শনস্বরূপ একজন সাধারণ লোককে এই পর্যন্ত পৌছাইয়াছেন। ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন–

قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ السَّدَّ مِثْلَ الْبُرْدِ الْمُحَبَّرِ قَالَ رَأَيْتَهُ ـ

অর্থঃ একদা এক ছাহাবী নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খেদমতে আসিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি (ইয়াজুজ-মাজুজের) প্রাচীর দেখিয়াছি। (বিবরণদানে) ঐ ব্যক্তি ইহাও বলিলেন যে, তাহা ডোরাবিশিষ্ট চাদরের ন্যায় দেখিয়াছি। হযরত (সঃ) তাহার উক্তি সমর্থনপূর্বক বলিলেন, বাস্তবিকই তুমি তাহা দেখিয়াছ।

ব্যাখ্যা– সাধারণ দৃষ্টি এই প্রাচীর আবিষ্কার করিতে অক্ষম থাকা সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যমানায় একজন লোকের দৃষ্টি উহাকে জয় করা বৈচিত্র্যপূর্ণ বটে, কিন্তু অসম্ভব ও অস্বীকারযোগ্য নহে। এই ধরনের ঘটনার নজির আরও প্রমাণিত আছে। মুসলিম শরীফের এক হাদীছে "দজ্জাল" সম্পর্কে এই ধরনের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। কেয়ামত নিকটবর্তী হইলে দজ্জালের আবির্ভাব হইবে; দজ্জালের জন্ম বহু পূর্বেই হইয়াছে। কিন্তু তাহাকে সাধারণ দৃষ্টি আবিষ্কার করিতে পারে নাই। তামীমে দারী (রাঃ) নামক একজন ছাহাবী তাহাকে দেখিয়াছিলেন যাহার আশ্চর্যজনক ঘটনা ইনশাআল্লাহ ষষ্ঠ খণ্ডে বর্ণিত হইবে। তামীমে দারী (রাঃ) কর্তৃক পূর্ণ ঘটনা হযরতের খেদমতে বর্ণিত হইলে হযরত (সঃ) এই বিবরণকে শুধু সমর্থনই করিলেন না, বরং স্বীয় মসজিদে নামাযের জামাতে উপস্থিত হওয়ার জন্য সকল মুসলমানকে বিশেষরূপে আহ্বান করিয়া সকলকে একত্রিত করার ব্যবস্থা করিলেন এবং নামাযান্তে প্রত্যেককে নিজ নিজ স্থানে বসিয়া থাকিবার আদেশ করিলেন। অতপর হযরত (সঃ) ভাষণদানে বলিলেন, আমি তোমাদিগকে কোন সুসংবাদ বা আতঙ্কের সংবাদ শুনাইবার জন্য একত্র করি নাই, বরং এই জন্য একত্র করিয়াছি যে, তামীমে দারী নামক একজন মুসলমান নিজ চক্ষে দজ্জালকে দেখিয়া আসিয়াছে– যে দজ্জাল সম্পর্কে বিভিন্ন বিবরণ আমি তোমাদিগকে শুনাইয়া থাকিতাম। তাহারই বর্ণিত বিস্তারিত ঘটনা শুনাইবার জন্য আমি তোমাদিগকে একত্র করিয়াছি। এই বলিয়া হযরত (সঃ) পূর্ণ ঘটনা ব্যক্ত করিলেন*

* এইরূপে শাদ্দাদ কর্তৃক নির্মিত বেহেশত যাহা আল্লাহ তাআলার কুদরতে সাধারণ দৃষ্টি হইতে লুক্কায়িত রহিয়াছে, কিন্তু তাহা সম্পর্কে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, আমার উম্মতের একজন লোক স্বীয় উট হারাইয়া তালাশ করিতে করিতে অকস্মাৎ শাদ্দাদের বেহেশত দেখিতে পাইবে। মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনকালে সেই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হইয়াছিল। (তফসীরে আজীজী, ছুরা ফাজর)। অপর পৃঃ দ্রঃ–

১৬২৬। হাদীছ ঃ عن زينب ان النبى صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُوْلُ
لاَ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِاقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ مِثْلَ هٰذِهِ
وَحَلَّقَ بِاصْبَعَيْهِ الْاِبْهَامَ وَالَّتِىْ تَلِيْهَا فَقَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتَ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ
اَنُهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ قَالَ نَعَمْ اِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ ـ

অর্থ ঃ উম্মুল মোমেনীন যয়নব (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার গৃহে তশরীফ আনিলেন বিচলিত অবস্থায় এবং ভীত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন– লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু! আরবের লোকদের আসন্ন আপদ-বিপদ দৃষ্টে মস্ত বড় ভয় ও আশঙ্কা। অদ্য ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে এই পরিমাণ ছিদ্র হইয়া গিয়াছে– ইহা বলিবার সময় হযরত (সঃ) স্বীয় শাহাদত অঙ্গুলিক বৃদ্ধাঙ্গুলির সঙ্গে মিলাইয়া গোলাকৃতি (circle) করতঃ ছিদ্রের পরিমাণ দেখাইলেন।

উম্মুল-মোমেনীন যয়নব (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাদের মধ্যে নেককার ব্যক্তিদের বর্তমানেও আমরা ধ্বংস হইব কি? হযরত (সঃ) বলিলেন হাঁ যখন অন্যায়-অত্যাচার, ব্যভিচার ও গোনাহের মাত্রা বাড়িয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা ঃ "আরব" মুসলমানদের কেন্দ্রস্থল এবং কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়– যখন মুসলমানদের জন্য অশান্তি বিশৃঙ্খলা ও আপদ-বিপদ দেখা দেওয়ার সময় তখন সমস্ত জগত কুফ্‌রী–ফাসেকীতে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে; মুসলমান শুধু আরবেই থাকিবে। এতদ্ভিন্ন কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ের আপদ-বিপদের স্রোতের মোকাবিলায় আরবগণই দাঁড়াইবেন এবং বিপদের সম্মুখীন হইবেন, তাই এ স্থলে আরবগণকে বিশেষরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীরে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হওয়া তাহাদের বাহির হইয়া ছড়াইয়া পড়ার নিকটবর্তিতার নিদর্শন এবং তাহাদের বাহির হওয়াই হইল আসন্ন কেয়ামতের আলামত। আর কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে মুসলমানগণ আপদ-বিপদের সম্মুখীন হইবে, তাই সেই প্রাচীরে ভাঙ্গন সৃষ্টি হওয়ার দরুন নবী (সঃ) স্বীয় উম্মতের উপর আসন্ন আপদ-বিপদের স্মরণে বিচলিত হইয়াছিলেন।

অনেক সময় নেক লোকদের বদৌলতে আল্লাহ তাআলার আযাব এবং আপদ-বিপদ দূরে সরিয়া যায়। তাই উম্মুল মোমেনীন যয়নব (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! যে সঙ্কটময় সময়ের কথা স্মরণ করিয়া আপনি বিচলিত হইতেছেন, তখন কি মুসলমানদের মধ্যে অনেক লোক থাকিবেই না, না নেক লোক থাকা সত্ত্বেও জাতির ধ্বংস আসিবে?

হযরত (সঃ) ফরমাইলেন, 'মুসলমানদের মধ্যে তখনও নেক লোক থাকিবে সত্য, কিন্তু অতি নগণ্য সংখ্যায়। কুফরী–ফাসেকী, অন্যায়-অত্যাচার ও ব্যভিচারের প্রাদুর্ভাব অতি মাত্রায় বাড়িয়া যাইবে, ফলে আল্লাহর আযাব ও ধ্বংস নামিয়া আসিবে।" অর্থাৎ নগণ্য সংখ্যক নেক লোকদের খাতিরে আযাব এবং গজবের গতি রোধ করা হইবে না, বরং স্বাভাবিকরূপে এই নেক লোকদেরও সেই আযাব ও ধ্বংসের স্রোতে মৃত্যু হইতে পারে, কিন্তু কেয়ামতের দিন তাঁহারা আল্লাহ তাআলার প্রিয়রূপেই উঠিবেন এবং আপদ-বিপদ দুঃখ-যাতনার বিনিময়ে বিশেষ সওয়াবের অধিকারী হইবেন। পক্ষান্তরে কাফের-ফাসেকরা দুনিয়াতে ধ্বংস হইয়া আখেরাতেও চিরকালের জন্য সকল কষ্টের কেন্দ্র দোযখবাসী হইবে।

উল্লিখিত প্রাচীর দেখার এবং শাদ্দাদের বেহেশত দেখার ঘটনার– উভয় ঘটনা ব্যক্তিদ্বয়ের জন্য হয়ত রহস্যময় কুদরতে জ্বিনদের দ্বারা অকস্মাৎ ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। জ্বিনদের দ্বারা কোন মানুষের এইরূপ অনাবিষ্কৃত এলাকার ভ্রমণ অনেক ক্ষেত্রেই হইয়া থাকে।

কোন দেশ বা জাতির মধ্যে যখন অন্যায়-অত্যাচার, ব্যভিচার ও আল্লাহদ্রোহিতা দেখা দেয় তখন সেই দেশ ও জাতির নেক লোকগণ যদি সেই সব নাফরমানীর যথাসাধ্য মোকাবিলা না করে– সাধ্যানুযায়ী বাধা প্রদান না করে, তবে নেককার বদকার উভয় দলই আল্লাহ তাআলার নিজট অপরাধী গণ্য হয়। যখন আল্লাহর গজব আসে তখন সকলেই গজবের আওতাভুক্ত হয়; এমনকি যাহাদিগকে নেককার বলা হইত তাহারাও গজবে পতিত হইবে, যেহেতু তাহারা আল্লাহদ্রোহিতায় বাধা প্রদান না করিয়া অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছে।

আর যদি নেককার ভাল লোকগণ যথাসাধ্য বাধা প্রদানের কর্তব্য পালন করিয়া য"যাইতে থাকেন, কিন্তু এতদসত্ত্বেও অপরাধ ও আল্লাহদ্রোহিতা বাড়িয়া যাইতে থাকে, এমনকি অপরাধী বিদ্রোহীদেরই প্রাবল্য ও প্রাধান্য হইয়া যায়, তবে নেককার লোকগণ আল্লাহ তাআলার প্রিয় থাকেন বটে, কিন্তু আ'দতুল্লাহ– আল্লাহ তাআলার সাধারণ রীতি অনুযায়ী তখন এই নগণ্য সংখ্যক প্রিয় লোকদের খাতিরে গজব এবং আযাবের গতি রোধ করা হয় না। আল্লাহর গজব আসে এবং উহার ধ্বংসলীলার স্রোতে সাধারণতঃ নেককার লোকগণও মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু সেই গজব অপরাধীদের পক্ষে গজব হয়, আর নেক লোকদের পক্ষে আল্লাহর রহমতের কারণ হয়; তাঁহারা শাহাদতের মর্তবা লাভ করিয়া থাকেন।

১৬২৭। হাদীছ ঃ عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَتَحَ اللّٰهُ مِنْ رَدْمِ يَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ مِثْلَ هٰذَا وَعَقَدَ بِيَدِهٖ تِسْعِيْنَ ـ

অর্থ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (সঃ) ফরমাইয়াছেন– ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ছিদ্র সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ তাআলার কুদরতে উহার মধ্যে যে ছিদ্র হইয়াছে উহা এই পরিমাণ– এই বলিয়া হযরত (সঃ) স্বীয় শাহাদত অঙ্গুলির মাথা বৃদ্ধাঙ্গুলির গোড়ায় লাগাইয়া ছিদ্রের পরিমাণ দেখাইলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য–আলোচ্য প্রাচীর সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে –

فَمَا اسْطَاعُوْا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا

"ইয়াজুজ-মাজুজরা এই প্রাচীর অতিক্রম করার জন্য উহার উপর চড়িতেও সক্ষম হইবে না এবং উহার মধ্যে ছিদ্রও সৃষ্টি করিতে পারিবে না (যতদিন পর্যন্ত না নির্ধারিত সময় উপস্থিত হয়)। অবশ্য যখন নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হইবে তখন আল্লাহ তাআলা প্রাচীরকে ধূলিসাৎ করিয়া দিবেন।"

উক্ত আয়াত দ্বারা আলোচ্য প্রাচীর সম্পর্কে তিনটি বিষয় স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়– (১) ইয়াজুজ-মাজুজগণ এই প্রাচীর ডিঙ্গাইতে সক্ষম হইবে না। (২) ইয়াজুজ-মাজুজগণ এই প্রাচীরে কোন প্রকার ছিদ্র সৃষ্টি করিতে পারিবে না। (৩) নির্ধারিত সময় উপস্থিত তথা কেয়ামতের সময় নিকটবর্তী হইলে আল্লাহ তাআলা এই প্রাচীর ধূলিসাৎ করিয়া দিবেন।

পাঠকবর্গ! দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে এই কথা ভালভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, উল্লিখিত আয়াত দ্বারা শুধু এতটুকু প্রমাণিত হয় যে, স্বয়ং ইয়াজুজ-মাজুজ কর্তৃক ঐ প্রাচীরে কোন ছিদ্র সৃষ্টি সম্ভব হইবে না, কিন্তু ইহাতে প্রমাণিত হয় না যে, প্রাচীরে অন্য কোন কারণে ছিদ্র সৃষ্টি হইতে পারিবে না বা ইয়াজুজ-মাজুজ কর্তৃক উহাতে ছিদ্র ও ভাঙ্গন সৃষ্টি করার চেষ্টাও চলিতে পারিবে না।

অতএব উপরোল্লিখিত উম্মুল মোমেনীন যয়নব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার হাদীছ এবং আবু হোরায়রা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাদীছ যেই হাদীছদ্বয়ের মধ্যে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যামানায় এই প্রাচীরে একটি ছিদ্র সৃষ্টি হইয়াছে– এই হাদীছদ্বয় উক্ত আয়াতের বিরোধী কখনও নহে। এই হাদীছদ্বয়কে উক্ত আয়াতের বিরোধী মনে করা বোকামি বৈ নহে। কারণ আয়াতের মর্ম শুধু এই যে, এই প্রাচীরে ইয়াজুজ-মাজুজ কর্তৃক ছিদ্র হইতে পারিবে না, আর হাদীছদ্বয়ের মর্ম এই যে, হযরতের যমানায় আল্লাহ তাআলার বিশেষ কুদরতে ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীরে ছিদ্র সৃষ্টি হইয়াছে। হাদীছদ্বয়ের মধ্যে

কোথাও এইরূপ শব্দ নাই যদ্দ্বারা বুঝা যাইতে পারে যে, এই ছিদ্র ইয়াজুজ-মাজুজ কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, বরং আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে যে- فتح الله من ردم ياجوج وماجوج "ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে আল্লাহ তাআলা ছিদ্র সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন।"

বোখারী শরীফে বর্ণিত যয়নব (রাঃ) ও আবু হোরায়রা (রাঃ) বণিত হাদীছদ্বয় ঐকমত্যপূর্ণ সহীহ্। কেহই এই হাদীছদ্বয়ে কোন সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই।

ইবনে মাজা শরীফ ও তিরমিযী শরীফে আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত অন্য একখানা হাদীছ- পূর্বে উল্লেখ হইয়াছে, যাহার বিষয়বস্তু এই যে, ইয়াজুজ-মাজুজ প্রতিদিন এই প্রাচীরে ভাঙ্গন সৃষ্টি করার চেষ্টা করে এবং ভেদ করার নিকটবর্তী হইয়া পর দিনের জন্য মুলতবী রাখে, ইত্যবসরে উহা পূর্ণ হইয়া যায়- তাহারা এইরূপই করিয়া চলিয়াছে। যখন কেয়ামত নিকটবর্তী হইবে এবং তাহাদের বাহির হইয়া পড়ার সময় উপস্থিত হইবে, তখন তাহারা "ইনশা আল্লাহ" এর বদৌলতে পরদিন উহাতে ভাঙ্গন সৃষ্টি করিতে কৃতকার্য হইবে, এমনকি উহা ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে এবং তাহারা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে।

এই হাদীছখানা সম্পর্কে ইবনে কাসীর (রঃ) একটু সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই হাদীছে বর্ণিত ঘটনা আবু হোরায়রা (রাঃ) কর্তৃক নবী (সঃ) হইতে শ্রুত, না পরবর্তী কোন লোক ভুলবশতঃ এই ঘটনা আবু হোরায়রার মাধ্যমে নবী (সঃ)-হইতে বর্ণিত বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন? ইবনে কাসীর (রঃ) সন্দেহটা অতি হালকাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বক্তব্যের প্রথমে বলিয়াছেন لعل হয়ত এইরূপও হইতে পারে" এবং বক্তব্যের শেষে বলিয়াছেন, والله اعلم অর্থাৎ উক্ত ঘটনা আবু হোরায়রা (রাঃ) কর্তৃক নবী (সঃ) হইতে শ্রুত কি না সেই সন্দেহ সম্পর্কে আমি সঠিক কিছু বলিতে পারি না; প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই জানেন।

পাঠকবর্গ! হাফেয ইবনে কাছীর (রঃ) কর্তৃক উক্ত হাদীছে এই মামুলী সন্দেহটুকুও পোষণ করার কারণ তিনি নিজেই বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন যে, এই হাদীছে বর্ণিত ঘটনাকে তিনি وما استطاعوا له نقبا ইয়াজুজ-মাজুজগণ এই প্রাচীরে (নির্ধারিত সময়ের পূর্বে) ছিদ্র সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবে না"- কোরআনের এই আয়াত বিরোধী মনে করিয়াছেন। হাদীছটির সনদে কোন দোষ নাই। (তফসীর ইবনে কাসীর দ্রষ্টব্য)।

হাফেজ ইবনে কাসীর সাহেবের এই ধারণা যে, শুধুমাত্র মানবীয় দুর্বলতা তাহা সুস্পষ্ট। কারণ উল্লিখিত আয়াতের মর্ম শুধু এতটুকু যে, ইয়াজুজ-মাজুজ উক্ত প্রাচীরে ছিদ্র করিতে পারিবে না; ছিদ্র করার চেষ্টাও করিতে পারিবে না- আয়াতে এই কথার ইঙ্গিত-ইশারাও নাই, বরং আয়াতের মর্মের স্বাভাবিক তাৎপর্য ইহাই বলিতে হয় যে, তাহারা ছিদ্র করার চেষ্টা করিবে। তাই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে যে, ছিদ্র করিতে সক্ষম হইবে না। আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত উক্ত হাদীছে ইহাই বলা হইয়াছে যে, ইয়াজুজ-মাজুজরা প্রতিদিনই প্রাচীরে ছিদ্র করার চেষ্টা করে, কিন্তু প্রাচীর ভেদ করতঃ ছিদ্র সৃষ্টি সম্পন্ন করার পূর্বেই পরবর্তী দিনের জন্য কার্য মুলতবী রাখিয়া চলিয়া যায়, পর দিন আসিয়া দেখে যে, প্রাচীর পূর্বের ন্যায় অক্ষত হইয়া রহিয়াছে (ইহা আল্লাহ তাআলার কুদরত)। হাদীছের বর্ণনা যে কত সুস্পষ্ট তাহা লক্ষ্য করুন-

يحفرونه كل يوم حتى اذا كادوا يخرقونه قال الذى عليه ارجعوا فستخرقونه

غدا قال فيعيده الله كامثل ماكان حتى اذا بلغ

"ইয়াজুজ-মাজুজ প্রতিদিন আসিয়া প্রাচীর খনন করিতে থাকে, যখন ভেদ করার নিকটবর্তী হয় (অর্থাৎ এখনও ভেদ হয় নাই), তখন তাহাদের দলপতি আদেশ দেয়, তোমরা এখন বাড়ী চল; আগামী কাল আসিয়া ভেদ করিয়া ফেলিব, কিন্তু (তাহাদের যাওয়ার পর) আল্লাহ তাআলা উহাকে পূর্বাপেক্ষা মজবুতরূপে সম্পূর্ণ ও অক্ষত করিয়া দেন। এই অবস্থাই চলিতে থাকিবে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত- যেই সময় আল্লাহ তাআলা তাহাদের বাহির করিবার ইচ্ছা করিবেন।" এই হাদীছের বিষয়বস্তু এবং উক্ত আয়াতে কোন প্রকার বিরোধ বা গরমিল মোটেই নাই।

হাদীছখানার এই অংশ যে, حتى اذا بلغ مدتهم واراد الله ان يبعثهم على الناس অর্থাৎ যখন ইয়াজুজ-মাজুজ বাহির হওয়ার নির্ধারিত সময় আসিয়া যাইবে এবং আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হইবে তাহাদের সাধারণ মানুষের অঞ্চলে বাহির করিয়া দিবার, তখন তাহাদের দলপতি আল্লাহর উপর নির্ভরপূর্বক বলিবে, ইনশা আল্লাহ– আল্লাহ চাহে ত আগামীকাল ইহা ভেদ করিয়া ফেলিব। এই দিন আল্লাহ তাআলা উহা পূর্বের ন্যায় সম্পূর্ণ ও অক্ষত করিবেন না, ফলে তাহাদের হস্তেই উহাতে ভাঙ্গন সৃষ্টি হইবে এবং তাহারা বাহির হইয়া পড়িবে। এই বিবরণ ত কোরআনেরই স্পষ্ট উক্তি–فاذا جاء وعد ربى جعله دكاء "যখন পরওয়ারদেগার কর্তৃক নির্ধারিত সময় আসিবে তখন তিনি উহাকে ধুলিসাৎ করিয়া দিবেন।" প্রতিদিন আল্লাহ তাআলা স্বীয় কুদরত দ্বারা ইয়াজুজ-মাজুজের খনন চেষ্টা ব্যাহত করিতেছেন এবং ভাঙ্গন সৃষ্টি প্রতিরোধ করিতেছেন। নির্ধারিত দিন উপস্থিত হইলে আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যবস্থা করিবেন না, ফলে ইয়াজুজ-মাজুজের হস্তে উহাতে ভাঙ্গন সৃষ্টি হইবে– যাহা একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছায়ই হইবে এমনকি আল্লাহর নামের উপর নির্ভরের বদৌলতেই তাহাদের পক্ষে তাহা সম্ভব হইবে। অতএব, বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাঙ্গন সৃষ্টি ইয়াজুজ-মাজুজের হস্তে হইলেও মূলতঃ ইহা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হইতেই।

পাঠকবর্গ! হাফেয ইবনে কাসীর সাহেব ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে ছিদ্র সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে বোখারী শরীফের পূর্বোল্লিখিত হাদীছদ্বয় সম্পর্কে কোন সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। বরং তিনি স্বীয় তফসীরে যয়নব (রাঃ) বর্ণিত হাদীছখানা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, এই হাদীছ এমন ছহীহ যে, ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়েই ইহাকে সহীহরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বোখারী শরীফে উল্লিখিত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছখানাও তদ্রূপই; ইহাকেও ইমাম বোখারী ও মুসলিম উভয়েই সহীহ্রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব এই হাদীছ দুইটি সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণের অবকাশ নাই।

আবু হোরায়রা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর অন্য আর একটি হাদীছ; যে হাদীছটি বোখারী-মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয় নাই; ইবনে মাজা ও তিরমিযী শরীফে বর্নিত হইয়াছে সেই হাদীছটি সম্পর্কে হাফেয ইবনে কাসীর সাহেব একটু দ্বিধাবোধ করিয়াছেন। কিন্তু যেই ধারণার ভিত্তিতে তাহা করিয়াছেন সেই ধারণা নিছক অবাস্তব। হাফেয ইবনে কাসীর সাহেবও সেই দ্বিধার অবকাশ সম্পর্কে নিজেই সঙ্কোচিত, যদ্দরুন তিনি তাঁহার বক্তব্য শেষে والله اعلم প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই জানেন" বলিয়া দ্বিধাবোধের দায়িত্ব এড়াইয়াছেন।*

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)

ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের আবির্ভাবকাল খৃষ্টপূব ২১০০ বা ২২০০ সন। (আরজুল কোরআন ২–৩)। তওরাতে বর্ণিত বিবরণ অনুসারে দেখা যায়, নূহ আলাইহিস সালামের পুত্র "সাম"-এর বংশে "সাম"-এর আট পুরুষ পর হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের

---

* হালের জনৈক বাংলাভাষার পণ্ডিত, শুধু পাণ্ডিত্যের জোরে লেখনীর বলে তফসীরকার সাজিয়া তফসীরুল কোরআন নামে সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। কোরআন -হাদীছ সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞানের স্বল্পতা পূর্বেও কয়েক স্থানে দেখান হইয়াছে। তিনি স্বীয় তফসীরে ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে ছিদ্র হওয়া সম্পর্কিত হাদীছ কয়টি সম্বন্ধে যেসব বেআদবী করিয়াছেন তাহা মুসলমানের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নহে। বোখারী-মুসলিম নহে, অন্য কিতাবের একটি মাত্র হাদীছ সম্পর্কে হাফেয ইবনে কাসীর সাহেবের সামান্য সন্দেহের সঙ্কোচপূর্ণ উক্তিকে খুব ফলাও করিয়া উদ্ধৃত করতঃ তিলকে তাল বানাইয়া উহার আড়ালে এই বিষয় সম্পর্কিত সমুদয় হাদীছ তিনি এন্কার করিয়াছেন। তাঁহার বাচালতা এতদূর পর্যন্ত গড়াইয়াছে যে, উম্মুল মোমেনীন যয়নব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার বর্ণিত রসূলুল্লাহ(সঃ)-এর একটি সতর্কবাণী সম্বলিত হাদীছকে ইঙ্গিত করিয়া লিখিয়াছেন যে, "এই সব রেওয়ায়েত কতকগুলি স্ত্রীলোকের খোশগল্প।" এতদ্ভিন্ন আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিমসহ বিশ্ব জগতের সমস্ত মোহাদ্দেসগণের ঐকমত্য পূর্ণ ছহীহ হাদীছ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তিনি লিখিয়াছেন যে, "এই রেওয়ায়াতগুলির উপর কোন মতেই আস্থা স্থাপন করা যায় না" তাহার এই সকল প্রলাপের সমর্থনে হাফেয ইবনে কাসীরের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়া সরল প্রাণ মুসলমানদিগকে ধোকা দেওয়ার অপচেষ্টা করিয়াছেন।, তাই মুসলমানদের দ্বীন-ঈমান রক্ষার্থে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইল।

জন্ম ঃ ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের পিতার নাম তওরাতে উল্লেখ আছে "তারেখ", কিন্তু কোরআন মজীদে "আযর্" উল্লেখ রহিয়াছে। এ সম্পর্কে নানারূপ মতভেদ হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশের মত এই যে, "তারেখ" আসল নাম এবং "আযর্" ডাক নাম; উভয় নামের ব্যক্তি একজনই।

এশিয়ার অন্তর্গত ইরাকের ইতিহাস প্রসিদ্ধ "বাবেল" (বেবিলন) নামক অঞ্চলে "ফাদ্দানে আরাম" এলাকায় "ওর" নামক বস্তিতে ইব্রাহীম (আঃ) জন্ম লাভ করেন।

হযরত ইব্রাহীমের দেশবাসী বিভিন্ন দেব-দেবীর এবং চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্রের পূজা করিত। এতদ্ভিন্ন তাহারা তাহাদের রাজাকে মাবুদ ও উপাস্য গণ্য করিত। ইব্রাহীম (আঃ) প্রথমতঃ স্বীয় পিতাকেই মূর্তি পূজা বর্জন ও এক আল্লাহর বন্দেগী গ্রহণের আহ্বান জানাইলেন। অতঃপর সমস্ত দেশবাসীকেও এই দিকে আহ্বান করিলেন এবং তাহাদিগকে সত্য বুঝাইবার বিভিন্ন কৌশলও করিয়া ছিলেন। তৎকালীন অতি প্রতাপশালী বাবেল সিংহাসনের অধিপতি, দেশবাসীর উপাস্য ও মাবুদ পরিগণিত রাজা নমরূদকেও তিনি তবলীগ করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইব্রাহীম (আঃ) নমরূদের খোদায়ী দাবীর বিরুদ্ধে এবং মাবুদে বরহকের পরিচয় দিতে নমরূদের মোকাবিলায় বিতর্ক-বাহাসও করিয়াছিলেন। এত চেষ্টা সত্ত্বেও দেশবাসী হযরত ইব্রাহীমের আহ্বানে সাড়া দিল না, অবশেষে সকলের সাথে একমত হইয়া রাজা নমরূদ তাঁহাকে পোড়াইয়া মারিবার জন্য অগ্নিকুণ্ডে ফেলিল, আল্লাহ তাআলার কুদরতে তিনি অক্ষত রহিলেন।

দেশবাসীর আচরণে নিরাশ হইয়া ইব্রাহীম (আঃ) দেশত্যাগে হিজরত করিলেন এবং ফিলিস্তীনে কিছুকাল থাকিলেন। অতঃপর সত্য ধর্মের তবলীগ করিতে করিতে আরও পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া মিসরে পৌঁছিলেন। পুনরায় মিসর হইতে ফিলিস্তীন আসিয়া তথায় স্থায়ী নিবাস করিয়াছিলেন, এমনকি এই দেশেই তিনি ইন্তেকাল করেন এবং তথায় তিনি সমাহিত আছেন।

ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের বহু ঘটনা কোরআন-হাদীছে বর্ণিত আছে। মে'রাজের রাত্রে ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের সঙ্গে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাক্ষাৎ হইয়াছিল ষষ্ঠ ও সপ্তম আসমানে। নবী (সঃ) তাঁহাকে সালাম করিলে তিনি স্বাগত জানাইয়া বলিয়াছিলেন– مرحبا بك من ابنى ونبى বিশিষ্ট পয়গম্বর এবং আমার (বংশধর) পুত্র! আপনাকে জানাই মোবারকবাদ।

হাশরের মাঠে যখন সমস্ত মানুষ কষ্ট-যাতনায় অধীর হইবে এবং আল্লাহ তাআলার নিকট সুপারিশ করার প্রার্থনা লইয়া বড় বড় নবীগণের দ্বারে উপস্থিত হইবে তখন আদম (আঃ) সকলকে নূহ (আঃ)-এর নিকট যাইবার পরামর্শ দিবেন। নূহ (আঃ) পরামর্শ দিবেন যে, ايتوا خليل الرحمن তোমরা আল্লাহ তাআলার খলীল বা প্রিয় পাত্র হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের নিকট যাও।

১৬২৮। হাদীছ ঃ عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قَالَ اِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً ثُمَّ قَرَا " كَمَا بَدَاْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهٗ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ ـ" وَاَوَّلُ مَنْ يُّكْسٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِبْرَاهِيْمَ وَاِنَّ نَاسًا مِّنْ اَصْحَابِىْ يُوْخَذُبِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَاَقُوْلُ اُصَيْحَابِىْ اُصَيْحَابِىْ فَيَقُوْلُ اِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوْا مُرْتَدِّيْنَ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتُمْ فَاَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ "وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَادُمْتُ ...... الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ"

অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, সমস্ত মানুষকে হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশের জন্য পুনর্জীবিত করা হইবে এই অবস্থায় যে, তাহারা নগ্ন পা, উলঙ্গ শরীর এবং খাত্‌নাবিহীন হইবে। নবী (সঃ) স্বীয় উক্তির সমর্থনে কোরআনের

আয়াত তেলাওয়াত করিলেন–

كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ ـ

"আমি তোমাদিগকে প্রথমে যে অবস্থায় সৃষ্টি ও ভূমিষ্ঠ করিয়াছিলাম সেই অবস্থায়ই পুনর্জীবিত করিব– ইহা আমার অটল সিদ্ধান্ত, ইহা আমি করিবই।' (পারা– ১৭; রুকু– ৭)

(হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) ইহাও বলিয়াছেন–) কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাঁহাকে কাপড় পরান হইবে, তিনি হইবেন (হযরত) ইব্রাহীম (আঃ)।

(হযরত (সঃ) আরও ফরমাইলেন,) একদল লোক– যাহারা আমার দলীয় মনে হইবে, কিন্তু তাহাদিগকে বাম দিকের তথা দোযখের পথে লইয়া যাওয়া হইবে। তখন আমি বলিতে থাকিব, "উসায়হাবী, উসায়হাবী– তাহারা ত আমার দলের, তাহারা ত আমার দলের।" তখন উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলিবেন, ইহারা (প্রকাশ্যে আপনার দলীয় তথা মুসলমান হওয়ার দাবীদার ছিল, কিন্তু বস্তুত ইহারা) আপনার পরে সদা আপনার বিরোধী পথের যাত্রী ছিল। এতদশ্রবণে আমি খোদার প্রিয় বান্দা ঈসা আলাইহিস সালামের ন্যায় এই বলিয়া ক্ষান্ত থাকিব–

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ـ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ ....

অর্থঃ যাবত আমি এই লোকদের মধ্যে অবস্থানরত ছিলাম তাবত তাহাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়াছি। অতঃপর যখন আপনি (হে আল্লাহ!) আমাকে তাহাদের মধ্য হইতে উঠাইয়া নিয়া আসিয়াছেন তখন হইতে (পরবর্তী অবস্থা পর্যবেক্ষণের সুযোগ আমার থাকে নাই); একমাত্র আপনিই তাহাদের সব কিছুর পর্যবেক্ষণকারী ছিলেন; আপনি ত সব কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খোঁজ রাখেন। ইহাদিগকে যদি আপনি শাস্তি দেন তবে (বাধা দিবার ক্ষমতা কাহারও নাই); তাহারা আপনারই সৃষ্ট দাস। আর যদি তাহাদের ক্ষমা করেন তবে (কৈফিয়ত চাওয়ার কেহ নাই;) আপনি সর্বাধিপতি, হেকমতওয়ালা। (পারা– ৭ ; রুকু– ৫)

ব্যাখ্যাঃ কেয়ামতের দিন সকল মানুষ উলঙ্গ অবস্থায় একত্রিত হওয়া সম্পর্কে উম্মুল মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, الرجال والنساء নারী-পুরুষ সকলে উলঙ্গ অবস্থায় একত্রিত হইবে? তদুত্তরে হযরত (সঃ) বলিয়াছিলেন, সেই সময়ের অবস্থা এতই গুরুতর ও ভয়ঙ্কর হইবে যে, এই দিকে কোন খেয়াল করার বা পরস্পর লক্ষ্য করার সুযোগ ও চেতনা কাহারও মোটেই থাকিবে না।

কেয়ামতের দিন ইব্রাহীম (আঃ) সর্বাগ্রে পরিধেয় পাইবেন। আল্লাহ তাআলার জন্য তিনি খোদাদ্রোহীগণ কর্তৃক উলঙ্গ অবস্থায় অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন; হয়ত উহার প্রতিদানে আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে এই সম্মান দান করিবেন।

যাহারা শুধু বাহ্যিকরূপে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উম্মত তথা মুসলমান দলভুক্ত; কার্যত তাঁহার আদর্শের পরিপন্থী জীবন যাপন করিতে থাকে, এই হাদীছ শ্রবণে তাহদের বিশেষরূপে সতর্ক হওয়া কর্তব্য। এই অবস্থায় মৃত্যু হইলে হিসাব-নিকাশের দিন তাহারা দোযখের পথে যাইতে বাধ্য হইবে এবং হযরতের শাফাআ'ত হইতে বঞ্চিত থাকিবে। নাউযু বিল্লাহি মিন যালিকা– এই অবস্থা হইতে আমরা আল্লাহ তাআলার আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

১৬২৯। হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বয়ান করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় পিতা "আযর"-কে এই অবস্থায় দেখিতে পাইবেন যে, (ভীষণ কষ্ট-যাতনা ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনার দরুন) তাহার মুখ বিবর্ণ কাল হইয়া রহিয়াছে চেহারা যেন

ছাই-মাটিতে মাখা। তখন ইব্রাহীম (আঃ) তাহাকে বলিবেন, আমি (দুনিয়ায়) তোমাকে বলিয়াছিলাম না যে, আমার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না! (কিন্তু তুমি তখন ঈমান হইতে ফিরিয়া রহিয়াছিলে, তাই আজ তোমার এই অবস্থা।) তখন "আযর" বলিবে, আজ হইতে আর তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিব না। (কিন্তু তখনকার এই কথায় কোন ফল হইবে না।)

অতপর ইব্রাহীম (আঃ) পিতার অবস্থায় মর্মাহত হইয়া আল্লাহ তাআলার নিকট ফরিয়াদ করিবেন, হে পরওয়ারদেগার! আপনি আমাকে আশা দিয়াছিলেন, পুনরুত্থানের তথা কেয়ামতের দিন আমাকে লজ্জিত করিবেন না। আমার পিতা, আপনার রহমত হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে আমার জন্য তদপেক্ষা অধিক অপমান আর কি হইতে পারে? আল্লাহ তাআলা ইব্রাহীম (আঃ)-কে প্রবোধদানে বলিবেন, انى حرمت الجنة على الكافرين "আমি কাফেরদের জন্য চিরতরে বেহেশত হারাম করিয়া রাখিয়াছি।" (ঈমানহীন ব্যক্তি বেহেশত পাইবে না, চিরকাল সে দোযখের আযাব ভোগ করিবে। হযরত ইব্রাহীমের পিতা যেহেতু ঈমানহীন কাফের, তাই সেও চিরকাল আযাব ভোগ করিবে, নাজাত পাইবে না। অবশ্য ইব্রাহীম (আঃ)-কে অপমান হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হইবে যে,) অতঃপর বলা হইবে, হে ইব্রাহীম! নীচের দিকে দৃষ্টি করুন ত! ইব্রাহীম (আঃ) নীচের দিকে দৃষ্টি করিবেন এবং (পিতার স্থলে) সর্বশরীরে গলীজ মাখা একটি মুর্দারখোর জানোয়ার "হায়েনা" দেখিতে পাইবেন; উহার চার পা বাঁধিয়া দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে।

সারকথা, ইব্রাহীম (আঃ)-কে অপমান হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা এই করিবেন যে, তাঁহার পিতা "আযর"-কে দোযখে নিক্ষেপ করার সময় একটি জানোয়ারের আকৃতিতে রূপান্তরিত করিয়া দেওয়া হইবে; কেহ যেন তাহাকে হযরত ইব্রাহীমের পিতা বলিয়া পরিচয় পাইতে না পারে।

বিশেষ শিক্ষা ঃ ঈমান না থাকিলে কোন সম্বন্ধই মানুষের কাজে আসিবে না, উল্লিখিত ঘটনা উহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের ন্যায় বিশিষ্ট নবী– যাঁহাকে আল্লাহ তাআলা "খলীলুল্লাহ– আল্লাহর দোস্ত" আখ্যা দিয়াছেন; "আযর" এইরূপ নবীর পিতা হইয়াও ঈমান না থাকায় নাজাত পাইল না। ইব্রাহীম (আঃ) পরওয়ারদেগারের নিকট ফরিয়াদ করিয়া এবং স্বীয় মান-ইজ্জতের দোহাই দিয়াও তাহাকে দোযখ হইতে বাঁচাইতে পারিলেন না। আল্লাহ তাআলা ইব্রাহীম (আঃ)-কে অপমান হইতে রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু "আযর'-কে দোযখ হইতে রেহাই দিলেন না; ইহা ঈমান না থাকার পরিণতি।

এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে আরও দুই জনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ আছে–

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا امْرَاَةَ نُوْحٍ وَّامْرَاَةَ لُوْطٍ ـ

অর্থ ঃ কাফের ও ঈমানহীন থাকার পরিণতি যে কিরূপ তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ আল্লাহ তাআলা নূহ আলাইহিস সালাম ও লুত আলাইহিস সালামের স্ত্রীর ঘটনা লোকদিগকে শুনাইয়াছেন। তাহারা উভয়ে আমার বিশিষ্ট দুই জন বান্দার (নবীর) স্ত্রী ছিল, কিন্তু তাহারা সেই বান্দাদের খেয়ানত করিয়াছে– তাঁহাদের আদেশ মতে চলে নাই, ফলে তাহাদের স্বামী বিশিষ্ট নবী হইয়াও তাহাদিগকে আল্লাহ তাআলার আযাব হইতে বিন্দুমাত্র বাঁচাইতে পারেন নাই; তাহাদের উভয়ের জন্য আল্লাহ তাআলার আদেশই প্রবর্তিত রহিয়াছে যে, অন্যান্য ঈমানহীনদের সঙ্গে তোমরাও দোযখে প্রবেশ কর।

পক্ষান্তরে (নিজে ভাল হইতে চাহিলে কোন শক্তিই যে তাহাকে রুখিতে পারে না উহার দৃষ্টান্তস্বরূপ আল্লাহ তাআলা ফেরআউনের স্ত্রী বিবি আছিয়ার ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন– (কি করুণ দৃশ্য ছিল) যখন তিনি (ফেরআউনের ন্যায় খোদায়ী দাবীদার স্বামীর অত্যাচারে জর্জরিত হইতেছিলেন, কিন্তু স্বীয় ঈমান দৃঢ়রূপে আঁকড়াইয়া রাখিতেছিলেন এবং) ফরিয়াদ করিতেছিলেন, হে প্রভু পরওয়ারদেগার! আপনার নৈকট্য লাভের স্থান বেহেশতের মধ্যে আমার জন্য একটি ঘর তৈয়ার করিয়া রাখুন। (সেই ঘরে যাইয়া আপনার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভে আমি যেন চির শান্তি উপভোগ করিতে পারি।) হে পরওয়ারদেগার। আমাকে বাঁচাইয়া রাখুন

ফেরআউন হইতে (সে যেন আমার ঈমান নষ্ট করিতে না পারে) ও তাহার কার্য কলাপ হইতে (উহার দ্বারা যেন আমি প্রভাবান্বিত হইয়া ঈমান হইতে বঞ্চিত না হই) এবং (ফেরআউনের ন্যায়) সমস্ত স্বৈরাচারীদের হাত হইতে আমাকে রক্ষা করুন। (পারা-২৮ শেষ)

ফেরআউন স্বীয় স্ত্রী আছিয়ার ঈমানের সংবাদে ভীষণ ক্রোধান্বিত হইল এবং তাঁহার উপর কঠোর শাস্তির আদেশ দিল। তাঁহাকে প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত যমীনে ঊর্ধ্বমুখী শোয়াইয়া হাতে-পায়ে লোহার খিল দিয়া আটকাইয়া দেওয়া হইল। বিবি আছিয়া (রাঃ) সেই পৈশাচিক অত্যাচারে থাকিয়াও ঈমান রত্ন আঁকড়াইয়া রাখিতেছিলেন এবং সেই দুর্যোগের মধ্যেই এই দোয়া করিতেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলা তাঁহার দোয়া কবুল হওয়ার কিছু নমুনা খোলা চোখে দেখাইয়াছিলেন- বিবি আছিয়া সেই অবস্থায়ই বেহেশতের মধ্যে তাঁহার জন্য নির্মিত বালাখানা স্বচক্ষে দেখিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। (বয়ানুল কোরআন)

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ "আযর" সম্পর্কে যাহা উল্লেখ হইয়াছে যে, কেয়ামতের দিন তাহার চেহারা ছাই-মাটিতে মাখান অবস্থায় দেখা যাইবে- আল্লাহ তাআলার নাফরমানদের এই অবস্থাই হইবে। তাহারা হাশর ময়দানের ভীষণ অবস্থা ও সম্মুখস্থ দোযখের ভীষণ তর্জন-গর্জনে ভীত-সন্ত্রস্ত আতঙ্কিত হওয়ার জিল্লতী ও অপমানে তাহাদের চেহারা এইরূপ হইয়া যাইবে।

পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলার ফর্মাবরদার মোমেন বান্দাগণ আনন্দোৎফুল্লিত হইবেন, তাঁহাদের চেহারায় আনন্দ-উল্লাসের আভা দেখা যাইবে। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন স্থানে এই বিষয়ের বর্ণনা দান করিয়াছেন। যথা-

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ -

অর্থ ঃ সেই দিন (অর্থাৎ হিসাব-নিকাশ, হাশরের ময়দান ও কেয়ামতের দিন- যেদিন মানুষ স্বীয় ভাই-বন্ধু, মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র হইতে দুরে সরিয়া থাকিবে এবং নিজ নিজ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিবে- সেই দিন) অনেকের চেহারা উজ্জ্বল, হর্ষোৎফুল্ল হইবে। পক্ষান্তরে অনেকের চেহারা উহার বিপরীত বিশ্রী বিবর্ণ ও কুৎসিৎ ছাই-মাটি মাখা হইবে এবং সমস্ত মুখমণ্ডল ভাবনা-চিন্তায় ও আতঙ্কে ভারাক্রান্ত হইবে। এই লোকগুলি ঐ সব মানুষ যাহারা আল্লাহদ্রোহী, আল্লাহর নবীর আদর্শ বিরোধী ছিল।

(পারা- ৩০; সূরা আ'বাছা)

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً ...... وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ -

"সেই (কেয়ামতের) দিন অনেকের চেহারা বিমর্ষ ভীষণ ক্লান্তিপূর্ণ দুঃখ-যাতনায় জর্জরিত হইবে; পরিশেষে ভীষণ অগ্নিতে প্রবেশ করিবে। আর অনেকের চেহারা ঐ দিন উল্লাসভরা, আনন্দোৎফুল্ল, স্বীয় কৃত-কর্মের প্রতি সন্তুষ্ট হইবে, অতি উচ্চ মর্তবায় বেহেশতে স্থান লাভ করিবে।" (৩০ পাঃ ছুরা গাশিয়া)

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ ....

অর্থঃ রসূল ও কিতাব মারফত আল্লাহর দ্বীন পৌছিবার পরও যাহারা সেই দ্বীন গ্রহণ করে নাই, তাহাদিগকে ভীষণ আযাব ভোগ করিতে হইবে সেই দিন- যেদিন অনেকের চেহারা উজ্জ্বল হইবে এবং অনেকের চেহারা কাল বিবর্ণ হইবে। বিবর্ণ কাল চেহারাওয়ালাদের দলকে ভর্ৎসনাপূর্বক বলা হইবে, তোমরাই না ঈমান লাভের সুযোগপ্রাপ্তির পরও কুফরী করিয়াছ? এখন সেই কুফরীর দরুন আযাব ভোগ কর। পক্ষান্তরে যাহাদের চেহারা উজ্জ্বল হইবে তাহারা আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমতে (তথা বেহেশতে স্থান লাভ করিবেন এবং তাহারা তথায় চিরকাল বসবাস করিবেন। (পারা- ৫; রুকু- ২)

ইব্রাহীম (আঃ) পিতার দুরবস্থাদৃষ্টে মর্মাহত হইয়া তাহাকেই তাহার অবস্থার জন্য দায়ী করিবেন এবং বলিবেন, "আমি কি তোমাকে বলিয়াছিলাম না যে, আমার বিরুদ্ধাচারণ করিবে না।" ইব্রাহীম (আঃ) পিতাকে এবং জাতিকে যেভাবে সত্য পথের দিকে ডাকিয়াছিলেন তাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে।

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمَ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ـ اِنِّىْ اَرٰكَ وَقَوْمَكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ـ

(একটি স্মরণীয় ঘটনা)- যখন ইব্রাহীম স্বীয় পিতা "আযর"কে বলিয়াছিলেন, তুমি কি কতকগুলি প্রতিমাকে মাবুদ বানাইয়াছ? আমি ত দেখিতেছি, তুমি এবং তোমার জাতি স্পষ্ট বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতায় পতিত।

وَكَذٰلِكَ نُرِىْ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ـ

(এইভাবে আমি ইব্রাহীমকে দেবদেবী পূজার জঘন্যতা ও কদর্যতার উপলব্ধি দিয়াছিলাম, যদ্দ্বারা তিনি স্বীয় জাতির সংস্কারে অগ্রসর হইয়াছিলেন।) আর এইরূপে নিম্ন জগতের ও সৌর জগতের (সর্বত্র যে একমাত্র আমারই সার্বভৌম আধিপত্য রহিয়াছে তাহার নিদর্শনরূপে উভয় জগতের) সৃষ্ট বস্তুনিচয়কে জ্ঞান ও মা'রেফতের দৃষ্টিতে দেখিবার শক্তি ইব্রাহীমকে আমি দান করিয়াছিলাম- আমার মা'রেফত বা পরিচয় যেন তাহার দৃষ্টিতে অতি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়) এবং যেন চোখে দেখিয়া বিশ্বাসী হইতে পারেন এই উদ্দেশে।

সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন অবস্থার দ্বারা বাস্তব মাবুদের সন্ধান লাভ এবং গর্হিত মা'বুদ হইতে পরিত্রাণ লাভ হইতে পারে মারেফতের দৃষ্টির মাধ্যমে। মা'রেফত অর্থ মহান আল্লাহর গুণাবলীর সম্যক জ্ঞান- সেই মা'রেফত হাসিল করিয়া ইব্রাহীম (আঃ) নিজেও মহান আল্লাহর সম্পর্কে অধিক দৃঢ়তা লাভ করিবেন এবং নক্ষত্রপূজক জাতিকেও দক্ষতার সহিত বুঝাইতে পারিবেন।

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰكَوْكَبًا قَالَ هٰذَا رَبِّىْ ـ فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَااُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ـ

সেমতে একদা রাত্রির গভীর অন্ধকারে তিনি একটি নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং (সৃষ্ট বস্তু হইতে খোদার মা'রেফত লাভের সবক দানে নক্ষত্রপূজক জাতিকে) বলিলেন, (তোমাদের বিশ্বাসে) এই নক্ষত্রটি আমার এক মা'বুদ। অতঃপর যখন নক্ষত্রটি অস্তমিত হইয়া গেল তখন তিনি (তাহাদেরকে) বলিলেন, যে বস্তু অস্তমিত হইয়া যায় (উহা মা'বুদ হইতে পারে না,) আমি তাহাকে ভালবাসিতে পারি না।

فَلَمَّا رَاٰ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّىْ فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِىْ رَبِّىْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ـ

অতঃপর যখন চন্দ্রকে দেখিলেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে তখন তিনি (ঐরূপে) বলিলেন, ইহা আমার আর এক মা'বুদ হইবে। যখন চন্দ্র অস্তমিত হইয়া গেল তিনি বলিলেন, (এই অস্তগামী বস্তুও আমার মা'বুদ হইতে পারে না। এই বাস্তব জ্ঞান আল্লাহর বিশেষ দান)। আমার প্রভু যদি আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন না করেন তবে আমি বিভ্রান্তদের দলভুক্ত হইয়া যাইব।

فَلَمَّا رَاٰ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّىْ هٰذَا اَكْبَرُ ـ فَلَمَّا اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّىْ بَرِئٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ـ

অতপর সূর্যকে দেখিলেন দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে, তখন তিনি (ঐরূপেই) বলিলেন, ইহা আমার আর এক মা'বুদ হইবে- ইহা ত পূর্বের সবগুলি হইতে বড়। কিন্তু যখন সূর্য অস্তমিত হইল তখন তিনি স্বীয় জাতিকে বিশেষরূপে বলিলেন, তোমাদের গর্হিত মা'বুদগুলির সঙ্গে আমার কোন সংস্রব নাই।

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

আমি ত সব কিছু ত্যাগপূবক আমার লক্ষ্য নিবদ্ধ করিয়াছি একমাত্র সেই মাবুদের প্রতি, যিনি আকাশ-পাতাল সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা; কাহাকেও আমি তাঁহার শরীক গণ্য করি না।

وَحَاجَّهٗ قَوْمُهٗ ـ قَالَ اَتُحَاجُّوْنِّىْ فِى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنِ وَلَاۤ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ رَبِّىْ شَيْـًٔا وَسِعَ رَبِّىْ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ـ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ـ

(চোখে দেখা অবস্থায় ভুল ধরাইবার পরও) তাঁহার জাতি তাঁহার সঙ্গে হঠকারিতাপূর্ণ তর্কে লিপ্ত হইল। (তাহাদের মাবুদগণ ইব্রাহীমের ক্ষতি করিবে ভয় দেখাইলে) ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে আমার সঙ্গে তর্ক কর? অথচ আল্লাহ আমাকে সঠিক পথ দেখার তওফিক দিয়াছেন। তোমরা তোমাদের গর্হিত মাবুদদের ভয় দেখাও; আমি এই সব ভয় করি না। অবশ্য যাহার মাবুদ হওয়া আমি প্রচার করি, তিনি ইচ্ছা করিলে সব কিছু করিতে পারেন। আমার মাবুদ সব কিছু জ্ঞাত আছেন। তোমরা এই বাস্তবতা উপলব্ধি করিতেছ না কেন? (পারা– ৭; রুকু– ১৫)

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ـ

এই কিতাবের মাধ্যমে আপনি (জগদ্বাসীর নিকট) ইব্রাহীমের ঘটনা উল্লেখ করুন। তিনি ছিলেন খাঁটি ও সত্যের প্রতীকবিশিষ্ট নবী।

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِىْ عَنْكَ شَيْـًٔا ـ

একটি ঘটনা– যখন তিনি বলিয়াছিলেন নিজ পিতাকে, হে আমার পিতা! কেন এমন সব জড় বস্তুর পূজা করিতেছ যাহারা না পারে শুনিতে, না পারে দেখিতে, না পারে তোমার কোন উপকার করিতে?

يٰۤاَبَتِ اِنِّىْ قَدْ جَآءَنِىْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِىْۤ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ـ

হে আমার পিতা! এমন জ্ঞান আমি লাভ করিয়াছি যাহা তোমার লাভ হয় নাই, অতএব তুমি আমার অনুসরণে চল, আমি তোমাকে সরল সত্য পথ দেখাইব।

يٰۤاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ـ

হে আমার পিতা! তুমি শয়তানের গোলামী করিও না, নিশ্চয় শয়তান দয়াময় আল্লার নাফরমান।

يٰۤاَبَتِ اِنِّىْۤ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ـ

হে আমার পিতা! আমার আশঙ্কা হইতেছে, দয়াময় আল্লাহর তরফ হইতে আযাব তোমাকে ধরিয়া ফেলিবে, ফলে তুমি (আযাব ভোগেও) শয়তানের সাথী হইয়া পড়িবে।

قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِىْ يٰۤاِبْرٰهِيْمُ ـ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِىْ مَلِيًّا ـ

পিতা বলিল, ইব্রাহীম। তুমি কি আমার পূজ্য মাবুদগুলি হইতে মুখ ফিরাইতেছ? এই কার্য হইতে নিবৃত্ত না হইলে নিশ্চয় তোমাকে প্রস্তরাঘাতে মারিয়া ফেলিব; দূর হও তুমি আমার নিকট হইতে চিরদিনের জন্য।

قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىْ اِنَّهٗ كَانَ بِىْ حَفِيًّا ـ

ইব্রাহীম বলিলেন, তোমায় আমি সালাম করি; (আর কিছু বলিব না। অবশ্য তোমার জন্য চেষ্টা করিব–) আমি আমার পরওয়ারদেগারের নিকট তোমার ক্ষমা মাগফেরাতের (ব্যবস্থা তথা ঈমানের) জন্য দরখাস্ত করিব, নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি মেহেরবান। (পারা– ১৬; রুকু–৬)।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرَاهِيْمَ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُوْنَ ـ

হে রসূল! বিশ্ববাসীকে ইব্রাহীমের ঐ সময়ের ঘটনা শুনান– যখন তিনি স্বীয় পিতা ও জাতিকে বলিয়াছিলেন, তোমরা কিসের পূজা করিয়া থাক?

قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ ـ

তাহারা বলিল, আমরা কতিপয় মূর্তির পূজা করিয়া থাকি এবং উহাদের তপস্যায় আমরা বসিয়া থাকি।

قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ ـ

ইব্রাহীম বলিল, যখন তোমরা এইগুলিকে ডাক তখন কি তাহারা তোমাদের ডাক শুনে অথবা তোমাদের কি কোন লাভ-লোকসান পৌঁছাইতে পারে?

قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَا اٰبَاۤءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ـ

তাহারা বলিল (এইরূপ কোন শক্তি তাহাদের নাই), বরং আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এইরূপ করিতে (তথা উহাদের পূজা করায় লিপ্ত) পাইয়াছি।

قَالَ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ـ اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ ـ فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيْ اِلاَّ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, তোমরা চিন্তা করিতেছ কি? যাহাদের পূজা করিয়াছ তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃ-পুরুষরা; নিশ্চয় ইহারা আমার (তোমাদের প্রত্যেকের) শত্রু (ইহাদের উপাসনা সকলকে জাহান্নামে পৌঁছাইবে)। অবশ্য সারা জাহানের পরওয়ারদেগার যিনি (তাঁহার এবাদত-উপাসনা স্বর্গের অধিকারী করে এবং তিনি সর্বোপকারী।)

اَلَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ ـ وَالَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِ ـ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ـ وَالَّذِيْ يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ ـ وَالَّذِيْ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَلِيْ خَطِيْئَتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ ـ

যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন অতঃপর আমাকে সঠিক পথ দেখাইয়া থাকেন– যিনি সদা আমার পানাহার যোগাইয়া থাকেন, আমি রোগাক্রান্ত হইলে তিনিই আমাকে নিরাময় করেন। যিনি আমার মৃত্যু ঘটাইবেন অতঃপর পুনজীবিত করিবেন এবং যাহার প্রতি আমি এই আশা পোষণ করিয়া থাকি যে, প্রতিফলের দিন তিনি আমার দোষ-ত্রুটি মাফ করিয়া দিবেন।

رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ـ وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ ـ وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ـ

হে পরওয়ারদেগার! আমাকে হেকমত (মা'রেফতের গভীর জ্ঞান) দান করুন এবং আপনার বিশিষ্ট

বান্দাদের দলভুক্ত রাখুন এবং আমাকে এইরূপ কার্যের তওফীক দিন যদ্দারা পরবর্তীদের মধ্যে আমার নেক্‌নামী থাকে এবং আমাকে নেয়ামতময় বেহেশতের অধিকারী করুন।

وَاغْفِرْ لِاَبِىْ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّالِّيْنَ - وَلَا تُخْزِنِىْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ - يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ - اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ -

পরওয়ারদেগার! (ঈমানের তওফীকদানে আমার পিতার মাগফেরাত (ক্ষমার ব্যবস্থা) করিয়া দিন; সে ত গোমরাহদের দলভুক্ত রহিয়াছে। আর আমাকে পুনরুত্থানের দিন অপমানিত করিবেন না; যেদিন ধন-সম্পদ, আল-আওলাদ কাহারও (নাজাতের) কাজে আসিবে না; অবশ্য যে (কুফরী শেরেকী হইতে) পবিত্র অন্তর লইয়া আল্লাহর দরবারে পৌঁছিবে তাহার জন্যই নাজাত। (পারা– ১৯; রুকু– ৯)

এই আয়াতে হযরত ইব্রাহীমের একটি দোয়ার উল্লেখ রহিয়াছে যে, তিনি পিতার অবস্থায় নিরাশ হইয়া কেয়ামতের দিন তাহার আযাব ও শাস্তির আশঙ্কা করিলেন এবং পিতার দুরবস্থা পুত্রের পক্ষে অপমানের কারণ হয়, তাই দোয়া করিলেন হে খোদা! তুমি কেয়ামতের দিন আমাকে অপমানিত করিও না।

ইব্রাহীম (আঃ) বিশিষ্ট নবী, আল্লাহর খলীল বা দোস্ত; অতএব তাঁহাদের দোয়া আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল হওয়া সুনিশ্চিত। সেইরূপ দৃঢ় আশার সূত্রেই পূর্বে বর্ণিত হাদীছে হযরত ইব্রাহীমের ফরিয়াদে তাঁহার এই উক্তির উল্লেখ রহিয়াছেন যে, "হে পরওয়ারদেগার! আমাকে আশা দিয়াছিলেন পুনরুত্থানের দিন আপনি আমাকে লজ্জিত ও অপমানিত করিবেন না।"

১৬৩০। হাদীছ ঃ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِخْتَتَنَ اِبْرَاهِيْمُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ اِبْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً بِالْقَدُوْمِ -

অর্থ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বয়ান করিয়াছেন, আল্লাহর নবী ইব্রাহীম (আঃ) নিজ হস্তে নিজের খতনা করিয়াছিলেন আশি বৎসর বয়সকালে কুঠারের সাহায্যে।

ব্যাখ্যা ঃ ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের পূর্বে খতনা করার নিয়ম ছিল না। সর্বপ্রথম তিনি ইহার জন্য আদিষ্ট হন। যখন আল্লাহ তাআলার এই আদেশ তাঁহার নিকট পৌঁছিল তখন তাঁহার বয়স ছিল আশি বৎসর। তিনি আল্লাহ তাআলার হুকুম পালনে কতদূর ফর্মাবরদার ও উদগ্রীব ছিলেন তাহা উপলব্দি করার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, আশি বৎসরের বৃদ্ধ বয়সে খতনা করার ন্যায় কঠিন কাজ আল্লাহ তাআলার আদেশে অতি তৎপরতার সহিত সম্পন্ন করিলেন। এমনকি আদেশ প্রাপ্তির সময় তাঁহার নিকট কাষ্ঠ কাটার কুঠার ছিল, আর কোন অস্ত্র ছিল না; আল্লাহ তাআলার আদেশ পালনে বিলম্ব হয় এই আশঙ্কায় আদেশ পৌঁছার সাথে সাথে কুঠারের সাহায্যেই তৎক্ষণাৎ নিজ হাতে নিজের খতনা কার্য সম্পন্ন করিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) হাবীবুল্লাহ– আল্লার প্রিয় বন্ধু উপাধিতে ভূষিত ছিলেন, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। তিনি ভিন্ন একমাত্র ইব্রাহীম (আঃ) "খলীলুল্লাহ– আল্লাহর দোস্ত" এই উপাধি পাইয়াছিলেন।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ভীষণ কঠিন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছিলেন; তিনি সেই সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি গভীর মহব্বত ও পূর্ণ আনুগত্যের পরিচয় দানে সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। যাহাতে তিনি "খলীলুল্লাহ" উপাধি লাভ করেন। তিনি যে কঠিন কঠিন পরীক্ষার

সম্মুখীন হইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, পবিত্র কোরআনেই তাহার উল্লেখ রহিয়াছে (পারা-১; রুকু-১৫)

وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرَاهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قَالَ اِنِّىْ ....

যখন ইব্রাহীমের পরওয়ারদেগার তাঁহাকে পরীক্ষা করিলেন কতিপয় বিষয়ের দ্বারা এবং তিনি সব বিষয়ে পূর্ণ সাফল্য অর্জন করিলেন; তখন আল্লাহ তাআলা বলিলেন, আমি আপনাকে লোকদের ইমাম বানাইব এবং আদর্শ হওয়ার মর্যাদা দান করিব।"

আল্লাহ তাআলা ইব্রাহীম (আঃ)-কে যেসব কঠিন পরীক্ষা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত খাতনার ঘটনা একটি। তদপেক্ষা কঠিন ঘটনারও সম্মুখীন তিনি হইয়াছিলেন। যথা- অতি আদরের দুগ্ধ পোষ্য শিশু ইসমাঈলকে তাঁহার মাতাসহ জনশূন্য এলাকায় আল্লাহর হুকুমে ছাড়িয়া যাওয়া- যাহা বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া এবং পুত্রকে আল্লাহর নামে কোরবানী করার ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য; যাহার বর্ণনা পবিত্র কোরআনে আছে। আরও একটি ঘটনা- স্ত্রী ছারা (রাঃ)-কে নিয়া জালেম রাজার বিপদে পড়া।

অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার বিবরণ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اِبْرَاهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ـ

আমি ইব্রাহীমকে প্রথম হইতে সুবুদ্ধি দিয়াছিলাম এবং আমি তাঁহার প্রতিভা যোগ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলাম।

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِىْ اَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُوْنَ ـ قَالُوْا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ـ

একটি স্মরণীয় ঘটনা- যখন তিনি স্বীয় পিতা ও জাতিকে বলিয়াছিলেন, যেসব প্রতিমা মূর্তিগুলির উপাসনায় তোমরা জমায়েত হও সেইগুলি কি? (এইগুলি কি উপাসনার যোগ্য) তাহারা বলিল, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এই সবের পূজা করিতে পাইয়াছি।

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ـ قَالُوْا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ ـ

ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, তোমাদের বাপ-দাদা স্পষ্টতর গোমরাহীর মধ্যেই ছিল এবং তোমরাও তাহাতে আছ। তাহারা বলিল, ইব্রাহীম! তোমার এই উক্তি কি তোমার ধারণা বিশ্বাস, না হাসিঠাট্টা করিতেছ?

قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِىْ فَطَرَهُنَّ وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ

ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, (বাস্তবিকই এই সব উপাস্য বা মাবুদ নহে;) বরং উপাস্য, মাবুদ তোমাদের আমাদের সকলের প্রভু-পরওয়ারদেগার তিনিই, যিনি সমস্ত আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা। এই উক্তি আমি সর্ব সমক্ষে ঘোষণারূপে প্রকাশ করিতেছি।

وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ـ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ـ

খোদার কসম– তোমরা এখান হইতে যাওয়ার পর তোমাদের এই প্রতিমা মূর্তিগুলির একটা ব্যবস্থা করিবই। সেমতে তিনি একদা সেইগুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন, শুধু বড় একটা মূর্তি বাকী রাখিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য– লোকগণ এই ঘটনা দেখিলেই সকলে তাঁহার নিকট আসিবে (এবং তাহাদের তিনি এইগুলির অক্ষমতা চাক্ষুষ দেখাইয়া দিবেন)।

قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗ اِبْرَاهِيْمُ ـ

তাহারা (পূজাশালার অবস্থাদৃষ্টে) খোঁজ করিতে লাগিল, আমাদের উপাস্য দেবতাদের সঙ্গে এই ব্যবহার কে করিল? যে করিয়াছে সে নিশ্চয় বড় অন্যায়কারী অপরাধী। কিছু লোক বলিল, একটা যুবককে শুনিয়াছি– সে এই সব উপাস্য দেবতাদের সমালোচনা করিয়া থাকে– তাহার নাম "ইব্রাহীম।"

قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ـ قَالُوْا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰاِبْرَاهِيْمُ ـ

সকলে বলিল, সেই যুবককে সর্বসমক্ষে উপস্থিত কর, সকলে তাহাকে দেখুক। (উপস্থিতির পর) জিজ্ঞাসিল, হে ইব্রাহীম! তুমি কি আমাদের দেবতাদের সঙ্গে এই ব্যবহার করিয়াছ?

قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْئَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ـ

ইব্রাহীম বলিলেন, বরং (আমি বলি,) এই বড় প্রতিমাটি এই কাজ করিয়াছে;* (এখন) ইহাদেরকেই জিজ্ঞাসা কর না– যদি ইহাদের কথা বলিবার শক্তি থাকে।

فَرَجَعُوْا اِلٰى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ـ ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَاهٰؤُلَاۤءِ يَنْطِقُوْنَ ـ

(ইব্রাহীম (আঃ) ইঙ্গিত করিলেন, ঘটনার বিবরণ উপাস্যদেরকেই জিজ্ঞাসা কর! এরা যদি এমনই নিষ্ক্রিয় হয় যে, কিছু বলার সামর্থ্য তাহাদের নাই, তবে ইহারা উপাস্য হইতে পারে কিরূপে? এই তথ্যের ইঙ্গিতে তিনি উপস্থিত লোকগণকে প্রভাবান্বিত করিয়া ফেলিলেন; শেষ পর্যন্ত তাহাদের উত্তেজনা হ্রাস পাইল।) এমনকি তাহারা নিজ নিজ অন্তরে চিন্তা করিয়া পরস্পর বলাবলি করিল, বাস্তবিকই তোমরা না-হক অন্যায়ের পথে আছ। অতঃপর তাহারা মাথা হেঁট করিয়া বলিল, ইব্রাহীম! তুমি ত বুঝই যে, এই সব প্রতিমাগুলি কথা বলিতে পারে না।

قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّلَايَضُرُّكُمْ اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ـ

(এই স্বীকারোক্তির সুযোগে) ইব্রাহীম (আঃ) তাহাদেরকে বলিলেন, তোমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ছাড়িয়া এমন (নিষ্ক্রিয় অক্ষম জড়) বস্তুর এবাদত উপাসনা কর, যাহারা তোমাদের কোন হিত অহিত করিবার ক্ষমতা রাখে না। (তাহারা নিজেদের আত্মরক্ষা বা তৎসম্পর্কে কিছু বলিবার পর্যন্ত শক্তি রাখে না।) ধিক তোমাদের উপর এবং তোমাদের মন গড়া মাবুদগুলির উপর। তোমরা কি অবুঝ এতটুকুও বুঝ না?

* হযরত ইব্রাহীমের এই কথার তাৎপর্য পরবর্তী ১৬৩৪ হাদীছের ব্যাখ্যায় দেখুন।

قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ۔

(তাহারা নিরুত্তর হইল, কিন্তু গোঁয়ার্তুমির নীতিতে) সকলে বলিয়া উঠিল, ইব্রাহীমকে আগুনে পোড়াও এবং স্বীয় মাবুদগণের পক্ষে সমর্থন প্রকাশ কর, যদি তোমাদের কিছু করিতে ইচ্ছা হয়।

قُلْنَا يٰنَارُكُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ ۔ وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ۔

আমি (সেই আগুনকে) আদেশ করিলাম, হে আগুন! ইব্রাহীমের পক্ষে শীতল ও শান্তিদায়ক হইয়া যাও। তাহারা ইব্রাহীমের ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করিয়াছিল; আমি তাহাদিগকেই অকৃতকার্য ক্ষতিগ্রস্ত করিলাম।

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ ۔ اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ ۔ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔

(ইব্রাহীমের একটি স্মরণীয় ঘটনা–) যখন তিনি স্বীয় পিতা ও জাতিকে বলিয়াছিলেন, তোমরা কি সব বস্তুর উপাসনা কর? আল্লাহকে ছাড়িয়া এই সব গর্হিত মাবুদকে চাহিতেছ? তাহা হইলে সারা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি?

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النُّجُوْمِ ۔ فَقَالَ اِنِّىْ سَقِيْمٌ ۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ ۔ فَرَاغَ اِلٰى اٰلِهَتِهِمْ فَقَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ۔ مَالَكُمْ لَاتَنْطِقُوْنَ ۔ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ ۔

(এক দিনের ঘটনা– দেশবাসী মেলায় যাইবে; ইব্রাহীম (আঃ)-কেও যাইতে বলিল)। ইব্রাহীম (আঃ) নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে তাকাইলেন ও বলিলেন, আমি অসুস্থ। সেমতে তাহারা তাঁহাকে বাড়ীতেই ছাড়িয়া চলিয়া গেল। তখন তিনি তাহাদের মূর্তিগুলির নিকটে গেলেন এবং (উহাদের সম্মুখে মিঠাই-মণ্ডার ভেট দেখিয়া উপহাস ব্যঙ্গ করতঃ) বলিলেন, কি হে! তোমরা খাও না কেন? তোমরা নিরুত্তর রহিয়াছ কেন? এই বলিয়া সেইগুলিকে জোরে আঘাত করিলেন (ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।)

فَاَقْبَلُوْا اِلَيْهِ يَزِفُّوْنَ ۔ قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ ۔ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ۔ قَالُوْا ابْنُوْا لَهٗ بُنْيَانًا فَاَلْقُوْهُ فِى الْجَحِيْمِ ۔

অতঃপর সমস্ত লোক তাঁহার প্রতি ছুটিয়া আসিল। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, নিজ হাতে চাঁছিয়া-ছিলিয়া যেসকল প্রতিমা মূর্তি বানাও সেইগুলিকেই মাবুদরূপে গ্রহণ কর তোমরা? অথচ তোমাদিগকে এবং তোমাদের কৃত সমুদয় আমলকে সৃষ্টি করেন আল্লাহ (ইহা কত বড় অন্যায়! তখন তাহারা (দলীল প্রমানে অক্ষম গোঁয়ারের ন্যায়) সিদ্ধান্ত করিল যে, ইব্রাহীমের (শাস্তির) জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড তৈয়ার কর, অতঃপর তাহাকে উহাতে নিক্ষেপ কর। فَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ

সেমতে তাহারা ইব্রাহীমের ক্ষতি সাধনের ষড়যন্ত্র করিল, কিন্তু আমি তাহাদিগকেই অধঃপাত করিলাম।

১৬৩১। হাদীছঃ عَنْ اُمِّ شَرِيْكٍ رضى الله تعالى عنها اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَقَالَ كَانَ يَنْفَخُ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۔

অর্থ উম্মে শরীক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গিরগিট মারিবার আদেশ করিয়াছেন এবং হযরত (সঃ) ফরমাইয়াছেন, ইব্রাহীম (আঃ) যখন কাফেরগণ কর্তৃক অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত

হইয়াছিলেন তখন এই গিরগিটি অগি অধিক প্রজ্বলিত করার জন্য ফুঁক দিয়াছিল।

ব্যাখ্যা ঃ ইহাকে বলে "বোগ্‌জ ফিল্লাহ্– আল্লাহর মহব্বতে ঘৃণা বিদ্বেষ পোষণ করা। ইহার বিপরীত হইল, হোব্ব ফিল্লাহ– আল্লাহর মহব্বতে মহব্বত রাখা। উভয়টি খাঁটি ঈমানের আলামত এবং উহার তাৎপর্য এই যে, আল্লাহর প্রতি এত অনুরাগী থাকা যে, স্বভাবত আল্লাহ এবং আল্লাহর দোস্তদারদের বিরুদ্ধাচরণকারী ও শত্রুতা পোষণকারীদের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষভাব ফুটিয়া উঠে এবং আল্লাহর পছন্দনীয় বস্তু ও ব্যক্তির প্রতি মহব্বত আকর্ষণ সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ তাআলার প্রতি কত অধিক ও গভীর অনুরাগের ফলে এই স্বভাবের উদয় হইতে পারে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই অনুধাবন করিতে পারেন; এই জন্য এই ভাবকে ঈমানের বিশেষ আলামত ও শাখা বলা হইয়াছে।

কাফেররা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে আগুনে পোড়াইয়া মারার চেষ্টা করিল, কিন্তু তিনি আল্লাহ তাআলার কুদরতে রক্ষা পাইলেন। এই ঘটনার পর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় জাতি ও দেশবাসী হইতে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া দেশ ত্যাগপূর্বক হিজরতের সঙ্কল্প করিলেন–وقال انى ذاهب الى ربى سيهدين "ইব্রাহীম (আঃ) সঙ্কল্প করিলেন যে, আমি আমার প্রভু-পরওয়ারদেগারের রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িব, তিনি আমাকে কোন (ভাল) স্থানে পৌছাইবেন।"

এই বলিয়া তিনি ইরাক হইতে হিজরত পূর্বক সিরিয়ায় পৌছিলেন। কিছু দিন পর তথা হইতে মিশরে পৌছিলেন। আল্লাহ তাআলার নিকট পুত্র লাভের এই দো'য়া করিলেন, رب هب لى من الصلحين "হে পরওয়ারদেগার! আমাকে নেক ফরজন্দ দান করুন।" তাঁহার দোয়া কবুল হইল فبشرنه بغلم حليم "তাঁহাকে বিশেষ ধৈর্যশীল একটি পুত্রের সুসংবাদ দান করিলাম।"

ইব্রাহীম (আঃ) পুত্র লাভ করিলেন, তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল, কিন্তু সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত পুত্র সম্পর্কেও তিনি এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইলেন।

পুত্র কোরবানীর ঘটনা

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يٰبُنَىَّ اِنِّىْ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ـ

সেই পুত্র যখন পিতা ইব্রাহীমের সঙ্গে চলাফেরা করিতে পারে– (যে বয়সে পুত্রের স্নেহ-মমতা পূর্ণরূপে পিতাকে দখল করে; এই অবস্থাতে ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে সেই পুত্রকে কোরবানী করার আদেশ অর্থে স্বপ্ন দেখিয়া)। বলিলেন, হে বৎস! স্বপ্নে দেখিয়াছি, আমি তোমাকে জবাই করিতেছি। তুমি ভাবিয়া দেখ, তোমার মতামত কি?

قَالَ يٰاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ـ

পুত্র উত্তর করিল, হে পিতা! আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হইয়াছেন তাহা সম্পন্ন করুন; ইনাশাআল্লাহ আমাকে ধৈর্যশীল পাইবেন। (নবীর স্বপ্ন অহী, তাই তাহা আল্লাহর আদেশ অর্থে অকাট্য; উহার বাস্তবায়ন আবশ্যক।)

فَلَمَّا اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰاِبْرَاهِيْمُ ـ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ـ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ـ

অতঃপর যখন পিতা-পুত্র উভয়ে আল্লাহর হুকুম পালনে পূর্ণ অনুগত হইলেন এবং পিতা পুত্রকে

(কোরবানী করিতে) অধঃমুখী শায়িত করিলেন এবং আমি পিতাকে এই বলিয়া ডাকিলাম– হে ইব্রাহীম! নিশ্চয় তুমি স্বপ্ন বাস্তবায়িত করিয়াছ (তখনকার সেই দৃশ্য! বড়ই আশ্চর্যজনক ছিল।) এইরূপ (সৎসাহস ও উদার) প্রতিদান আমি নিষ্ঠাবান সৎকর্মশীল সমস্ত ব্যক্তিকেই দান করিয়া থাকি।

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُ الْمُبِيْنُ - وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ - وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ - سَلٰمٌ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ -

নিশ্চয় তাহা একটি বড় কঠিন পরীক্ষা ছিল; (পিতা-পুত্র উভয়ই ইহাতে উত্তীর্ণ হইলেন, আমি তাঁহাদিগকে প্রতিফল দান করিলাম) এবং (আল্লাহর নামে কোরবানী করার উপস্থিত মনস্পৃহা পূরণার্থ) কোরবানীর যোগ্য একটি পশু (দুম্বা) পুত্রের বদলে দান করিলাম। আর পরবর্তী লোকদের মধ্যে তাঁহার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করিলাম যে, সকলেই বলিবে– "ইব্রাহীমের প্রতি সালাম।"

(সূরা সাফ্‌ফাত– পারা– ২৩;রুকু–৭)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা পরবর্তী লোকদের মধ্যে ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের বিশেষ মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকরণে বলিয়াছেন– সকলেই বলিবে, "ইব্রাহীমের প্রতি সালাম।" এই সালামের বাস্তবায়ন সাধারণত এইভাবে ত হয়ই– যে, তাঁহার নামের সঙ্গে "আলাইহিস সালাম– তাঁহার প্রতি সালাম" সচরাচরই বলা হয়; যাহা প্রত্যেক নবীর নামের সঙ্গেই হয়। তদুপরি ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের এই বৈশিষ্ট্যও আছে যে, নামাযের শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পরে নির্ধারিত দরূদ পড়ার বিধান আছে; সেই দরূদে ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের প্রতি দরূদ বিজড়িত রহিয়াছে। নিম্নের হাদীছে তাহাই লক্ষ্য করুন। দরূদ ও সালাম উভয়টিই পাশাপাশি সম্মানসূচক দোয়া।

১৬৩২। হাদীছ ঃ আবু হোমায়দ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন ইয়া রসূল্লাল্লাহ! আপনার প্রতি দরূদ কিরূপ হইবে? রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আইলাইহি অসাল্লাম বলিলেন, তোমরা এইরূপ বলিবে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

১৬৩৩। হাদীছ (৯৪০ পৃঃ) ঃ আবু ছায়ীদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আমরা আরজ করিলাম ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি সালামের রূপ ত আমরা (আত্তাহিয়্যাতের মধ্যে) শিখিয়াছি; আপনার প্রতি দরূদের রূপ কি হইবে? হযরত (সঃ) বলিলেন, তোমরা এইরূপ বলিবে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ -

ব্যাখ্যা ঃ সকলের সুবিধার্থ সংক্ষেপ ও দীর্ঘতার ব্যবধানে হযরত (সঃ) ছাহাবীগণকে বিভিন্ন দরূদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। বোখারী শরীফে সেইরূপ তিনটি হাদীছে তিনটি দরূদ বর্ণিত আছে। দুইটি উপরোল্লিখিত এবং আর একটি যাহা এই দুইটি অপেক্ষা দীর্ঘ; ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর মাজহাবে তাহাই অগ্রগণ্য– প্রথম খণ্ডে "নামাযের বিভিন্ন মাসআলা" পরিচ্ছেদে পূর্ণ তরজমা ও ব্যাখ্যার সহিত তাহা বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি দরূদেই "সালাত" তথা রহমত ও "বরকত" মঙ্গল ও কল্যাণের দোয়ায় রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লামের নামের সহিত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের নামও বিজড়িত আছে, যাহা কেয়ামত পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে এক একজন মুসলমানের মুখে প্রতিদিন ১০, ২০ বার উচ্চারিত হইতে থাকিবে। পূর্ববর্তী নবীগণের শরীয়তেও ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের জন্য এইরূপ কোন বৈশিষ্ট্য থাকা বিচিত্র নহে।

কাফের রাজা ও বিবি ছারার ঘটনা ঃ

১৩৩৪। হাদীছ ঃ عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال (قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لَمْ يَكْذِبْ اِبْرَاهِيْمَ اِلاَّ ثَلٰثَ كَذِبَاتٍ ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِىْ ذَاتِ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ قَوْلُهُ اِنِّىْ سَقِيْمٌ وَقَوْلُهُ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا وَقَالَ بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ اِذْ اَتٰى عَلٰى جَبَّارٍ مِّنَ الْجَبَابِرَةِ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّ هٰذَا رَجُلٌ مَعَهُ امْرَاَةٌ مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ فَسَاَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ قَالَ اُخْتِىْ فَاَتٰى سَارَةَ قَالَ يَاسَارَةُ لَيْسَ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِىْ وَغَيْرِكِ وَاِنَّ هٰذَا سَاَلَنِىْ فَاَخْبَرْتُهُ اَنَّكِ اُخْتِىْ فَلاَ تُكَذِّبِيْنِىْ فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهٖ فَاُخِذَ فَقَالَ اُدْعِىَ اللّٰهَ لِىْ وَلاَ اَضُرُّكِ فَدَعَتِ اللّٰهَ ثُمَّ تَنَاوَلَهَا الثَّانِيَةَ فَاُخِذَ مِثْلَهَا اَوْ اَشَدَّ فَقَالَ اُدْعِىَ اللّٰهَ لِىْ وَلاَ اَضُرُّكِ فَدَعَتْ فَاُطْلِقَ فَدَعَا بَعْضَ حَجَبَتِهٖ فَقَالَ اِنَّكُمْ لَمْ تَاْتُوْنِىْ بِاِنْسَانٍ اِنَّمَا اَتَيْتُمُوْنِىْ بِشَيْطَانٍ فَاَخْدَمَهَا هَاجَرَ فَاَتَتْهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّىْ فَاَوْمَا بِيَدِهٖ مَهْيَمْ قَالَتْ رَدَّ اللّٰهُ كَيْدَ الْكَافِرِ فِىْ نَحْرِهٖ وَاَخْدَمَ هَاجَرَ - قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ تِلْكَ اُمُّكُمْ يَابَنِىْ مَاءِ السَّمَاءِ -

অর্থঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) (রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহ অসাল্লাম হইতে) বর্ণনা করিয়াছেন, ইব্রাহীম (আঃ) (সুদীর্ঘ জীবনের শত শত সঙ্কটপূর্ণ আপদ-বিপদেও সত্য নির্ভীকভাবে প্রকাশ করিয়াছেন; তিনি) কখনও মিথ্যার আশ্রয় নেন নাই। হাঁ– তিনটি ঘটনায় (মহৎ উদ্দেশ্য লাভের খাতিরে নিজ ভাবার্থে বাস্তব, বাহ্যিক দৃষ্টিতে) অবাস্তব উক্তি তিনি করিয়াছেন। (ঐরূপ কৌশল অবলম্বনে একটি ঘটনায় ভাসা নজরে তাঁহার নিজের উপকার লাভের কিছুটা সম্পর্ক দেখা যায়, কিন্তু) উহার দুইটি ঘটনাই (এমন ছিল যে, উহাতে নিজ স্বার্থের লেশমাত্র ছিল না), নিছক আল্লাহর (দ্বীন প্রচার ও বুঝাইবার) জন্য ছিল।

এই দুইটির একটি হইল– (স্বীয় পৌত্তলিক জাতিকে পৌত্তলিকতার অসারতা বুঝাইবার বিশেষ কৌশল অবলম্বন করার উদ্দেশে তিনি দেব-দেবীর মুর্তিগুলি ভাঙ্গিয়া চুরমার করার সুযোগ সন্ধানে ছিলেন। একদা যখন দেশবাসী মেলায় যাইবার সময় তাঁহাকে সঙ্গে যাইতে বলিল, তখন এই সুযোগে তাহাদের পেছনে থাকিয়া যাইবার জন্য) তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি রুগ্ন"।

আর একটি হইল– (এই ঘটনায়ই যখন তাহারা আসিয়া দেব-দেবীগুলি ভাঙ্গা দেখিল এবং ইব্রাহীম (আঃ)-কে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিল তখন এই দেব-দেবীগুলির অসারতা ও অক্ষমতার চাক্ষষ দৃশ্য তাহাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিবার ভূমিকারূপে একটি সাময়িক দাবীস্বরূপ) তিনি বলিয়াছিলেন; "বরং (আমি বলি,) ইহাদের মধ্যকার এই বড় মূর্তিটা এই কাজ করিয়াছে।"

(প্রথম ঘটনা–) রসূলুল্লাহ (সঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্রাহীম (আঃ) যখন স্বীয় স্ত্রী "ছারাহ্" (আঃ) কে সঙ্গে লইয়া হিজরতের সফর করিলেন তখন (মিসরের অন্তর্গত) এক এলাকায় পৌঁছিলেন। তথাকার শাসনকর্তা ছিল এক পরাক্রমশালী জালেম রাজা। সেই রাজাকে (ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁহার সহধর্মিনী সম্পর্কে) খবর দেওয়া হইল যে, এই এলাকায় এক বিদেশী লোক আসিয়াছে, তাহার সঙ্গে এক পরমা সুন্দরী রমণী আছে। রাজা তৎক্ষণাৎ ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের নিকট পেয়াদা পাঠাইয়া দিল এবং তাঁহার সঙ্গে

রমণী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিল যে, উভয়ের সম্পর্ক কি? ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন,আমার ভগ্নী* এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে ছারাহ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নিকট আসিয়া "ভগ্নী" বলিবার তাৎপর্য এবং সত্য ব্যাখ্যা বুঝাইয়া বলিলেন যে– হে ছারাহ্! বর্তমানে ভূপৃষ্ঠে একমাত্র মোমেন তুমি ও আমি; (আর মোমেনগণ পরস্পর ভাই-ভগ্নী; সেই সূত্রে)। আমি এই জালেম রাজার জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিয়াছি, তুমি আমার ভগ্নী (উক্ত সূত্রে এই উক্তি সত্য) অতএব তুমি আমার উক্তি অসত্য বলিও না। অতঃপর ইব্রাহীম (আঃ) অযু করিয়া নামাযে দাঁড়াইলেন।

এদিকে ঐ রাজা ছারাহ্ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নিকট লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে আনয়ন করিল। (ছারাহ্ (রাঃ) রাজ মহলে পৌঁছিয়া অযু করিয়া নামাযে দাঁড়াইলেন।) যখন রাজা আসিয়া তাঁহার প্রতি হাত বাড়াইল তখনই সে আল্লাহর গজবে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া পড়িল। (এমনকি ধরাশায়ী হইয়া পড়িয়া গেল এবং ছট্ফট্ করিতে লাগিল।) তখন সে (ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া) বলিল, আমার জন্য দোয়া করুন; আমি আপনাকে কোনরূপ কষ্ট দিব না। ছারাহ্ (রাঃ) দোয়া করিলেন, (সে ভাল হইল কিন্তু ওয়াদা ভঙ্গ করিল) এবং পুনঃ তাঁহার প্রতি হাত বাড়াইল। তৎক্ষণাৎ পূর্বরূপ, বরং আরও কঠিন অবস্থায় পতিত হইল; এইবারও সে দোয়ার দরখাস্ত করিল এবং ওয়াদা করিল, তাঁহাকে কষ্ট দিবে না। ছারাহ্ (রাঃ) দোয়া করিলেন, সে রেহাই পাইল এবং একজন দারোয়ানকে ডাকিয়া বলিল, তোমরা যাহাকে আনিয়াছিলে (তাহাকে পৌঁছাইয়া আস); সে মানুষ বলিয়া মনে হয় না, মনে হয় জ্বিন-পরী হইবে। (কিন্তু ছারাহ্ (রাঃ) সম্পর্কে তাহার অন্তরে যে ভয়-ভক্তি জন্মিয়াছিল সেমতে) তাঁহার খেদমতের জন্য "হাজেরা" নাম্নী একজন রমণী উপঢৌকন পেশ করিল।

ছারাহ্ (রাঃ) ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের নিকট পৌঁছিলেন, তখনও তিনি নামাযে ছিলেন, হাতের ইশারায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ঘটিয়াছে। ছারাহ্ (রাঃ) বলিলেন, কাফের রাজার সমস্ত কূটকৌশলকে আল্লাহ তাআলা তাহারই বিপদ বানাইয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছেন এবং রাজা "হাজেরা"কে আমার খেদমতের জন্য দিয়াছে।

উক্ত হাদীছ বর্ণনান্তে আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিলেন, হে আরববাসীগণ! এই "হাজেরা (রাঃ)-ই তোমাদের গোষ্ঠীর মাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আনাছ (রাঃ) ,হাম্মাম ইবনে মোনাব্বেহ্ (রাঃ), আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ), আবু হোরায়রা (রাঃ)– এই বিশিষ্ট চারি জন ছাহাবীর বর্ণিত হাদীছসমূহে (ফতহুল বারী একাদশ খণ্ড, ৩৬৬ পৃষ্ঠায়) এই তথ্য উল্লেখ আছে যে, কঠিন হাশরের ময়দানে সমস্ত মানুষ ভীষণ উত্তাপের মধ্যে কষ্ট যাতনায় অতিষ্ঠ হইয়া শাফাআতের জন্য হযরত আদম (আঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া বিশিষ্ট বিশিষ্ট নবীগণের নিকট হাজির হইতে থাকিবে। তখন নবীগণ প্রত্যেকে নিজ নিজ এক একটি ক্রটির ঘটনা উল্লেখপূর্বক আতঙ্কিত অবস্থায় স্বীয় অক্ষমতা প্রকাশ করিতে থাকিবেন। এই বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত সুদীর্ঘ হাদীছ ইনশাআল্লাহু তাআলা সপ্তম খণ্ডে বর্ণিত হইবে।

উক্ত হাদীছে আছে যে, লোকগণ ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের নিকট উপস্থিত হইলে তিনিও বলিবেন, لست هناكم "এই কাজের (অর্থাৎ আজ আল্লার দরবারে শাফাআত করিবার) সাহস আমার নাই" ويذكر خطيته এবং তিনি স্বীয় ক্রটি উল্লেখ করিবেন" انى كذبت ثلث كذبات "আমি তিনটি ক্ষেত্রে মিথ্যা বলিয়াছিলাম।" স্বয়ং হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম কর্তৃক মিথ্যা বলার উক্তির তাৎপর্য এই যে, ইহা একটি বাস্তব সত্য যে, قربان رابيش بود حيرانى "আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভে যে যতদূর অগ্রাধিকারী হয় সে ততদূর অধিক ভয়-ভক্তির প্রভাবে পতিত থাকে।" কারণ, নৈকট্যের দরুন অধিক মা'রেফত লাভ হইতে থাকে এবং যত মা'রেফত তত ভয়-ভক্তি।

---

* ঐ রাজার প্রসিদ্ধ রীতি ছিল যে, তাহার অভিলাস্য রমণীর সঙ্গে স্বামী থাকিলে প্রথমে স্বামী হত্যা করিত। সুতরাং ইব্রাহীম (আঃ) নিজকে স্বামী বলিয়া প্রকাশ করিলেন না।

হাশরের দিন– যেদিন আল্লাহ তাআলার জ্বালাল কাহ্হারিয়াত তথা পরাক্রমশীলতা সর্বাধিক বিস্তার লাভ করিবে; সেই হাশরের দিন নবীগণ উল্লিখিত ভয় ভক্তির প্রভাবে লাচার হইয়া পড়িবেন। এমনকি যাহার যে ত্রুটি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বারংবার ক্ষমার ঘোষণা দিয়াছেন, তিনিও সেই ত্রুটি স্মরণ করিয়া ভীত সন্ত্রস্ত হইবেন। যেমন– আদম (আঃ) বেহেশতে বাসকালে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার ত্রুটি সম্পর্কে বহু তওবা ও কান্নাকাটি করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার তওবা গৃহীত হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ঘোষণাও দিয়াছেন, এতদসত্ত্বেও তিনি সেই ত্রুটির ভয়েই জড়সড় হইয়া বলিবেন, انه نهانى عن الشجرة فعصيته نفسى نفسى اذهبوا الى غيرى "আমি নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইয়াছিলাম; নফ্সী নফ্সী নফ্সী–নিজের চিন্তায় আমি ব্যস্ত, নিজের চিন্তায় আমি ব্যস্ত, নিজের চিন্তায় আমি ব্যস্ত; তোমরা অন্য কাহারও নিকট যাও।"

তদ্রূপ যেসব বিষয় অন্যের পক্ষে মোটেই ত্রুটি নহে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় নবীগণও তাহা ত্রুটি মনে করিয়াছিলেন না, কিন্তু সেই দিন ভয়-ভীতির দরুন সেই বিষয়টিও বড় ত্রুটি মনে করিবেন, এমনকি ত্রুটিরূপে প্রকাশও করিবেন এবং ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িবেন। ইহা একটি মানবীয় স্বভাব প্রবৃত্তি।

ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের উল্লিখিত উক্তিটি এই প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ায়ই সৃষ্ট। তাঁহার যে তিনটি উক্তিকে তিনি "মিথ্যা" বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন, বস্তুত তাঁহার মনোগত তাৎপর্য ও উদ্দেশ্যদৃষ্টে উহা সম্পূর্ণ সত্য ছিল, মিথ্যা মোটেই ছিল না। অবশ্য উক্তিগুলি এরূপ ছিল যাহা উদ্দিষ্ট অর্থ ছাড়া সাধারণ অর্থে অবাস্তব মনে হয়। সাধারণ শ্রোতা সেই অর্থ বুঝিবে; যদ্দরুন এই উক্তিগুলিকে অবাস্তব তথা মিথ্যার আওতাভুক্ত বলা যায় (অর্থদ্বয়ের বিবরণ সম্মুখে আসিতেছে)। এই সূত্রেই ইব্রাহীম (আঃ) সেই উক্তিগুলিকে "মিথ্যা" নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন এবং ত্রুটি গণ্য করিয়া ভীত সন্ত্রস্ত হইয়াছেন। নতুবা তাঁহার উদ্দিষ্ট অর্থ সূত্রে উহা সম্পূর্ণ সত্য ছিল। এইরূপ বিভিন্নমুখী অর্থজনক উক্তি আত্মরক্ষার জন্য বা অন্য কাহারও ক্ষতি না করিয়া কোন মহৎ উদ্দেশ্য লাভের জন্য শুধু জায়েয ও সমর্থনীয় নহে, বরং উত্তম।

যেভাবেই হউক ইব্রাহীম (আঃ) স্বয়ং বলিবেন, "আমি তিনটি মিথ্যা বলিয়াছিলাম।" এই উক্তির সংবাদ জ্ঞাত হইয়া লোকদের মনে সংশয়ের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক যে, নবী ত মা'সূম নিষ্পাপ হন। হযরত ইব্রাহীমের ন্যায় সত্যের প্রতীক বিশিষ্ট নবী মিথ্যার ন্যায় জঘন্য পাপ কিরূপে করিতে পারেন? অথচ ইহা ত তাঁহার নিজের উক্তি।

এইরূপ সংশয় ও অছ্অছা দূরীভূত করার জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ) আলোচ্য হাদীছখানা বিস্তারিত বিবরণ স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং প্রথমেই বলিয়াছেন, لن يكذب ابراهيم "ইব্রাহীম (আঃ) জীবনে কখনও মিথ্যা বলেন নাই।"*

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, স্বয়ং ইব্রাহীম (আঃ) যে বলিবেন, "আমি তিনটি মিথ্যা বলিয়াছিলাম" এই উক্তি উক্ত ঘোষণার বিপরীত। এই প্রশ্নের অবসানেই রসূল (সঃ) الا فى ثلث অবশ্য তিনটি ঘটনায়" বলিয়া হযরত ইব্রাহীমের ইঙ্গিত প্রদত্ত তিনটি ঘটনার বিষয়গুলি ব্যক্ত করিয়াছেন, যেগুলির তথ্য সংগ্রহের দ্বারা এই প্রশ্নের অবসান হয়। কোন কোন রেওয়ায়াত অনুসারে একটি বাক্যের দ্বারা হযরত (সঃ) এইগুলির তাৎপর্যের প্রতি ইঙ্গিতও করিয়াছেন যে, ما حل بها عن دين الله ইব্রাহীম (আঃ) এই সব ঘটনার উক্তিসমূহ আল্লাহর দ্বীনের জন্য সূক্ষ্ম কৌশলরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। একটি ঘটনার উক্তি সম্পর্কে সেই সূক্ষ্ম কৌশলের বিবরণত স্বয়ং ইব্রাহীম (আঃ) হইতে রসূল (সঃ) উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্ত্রীকে স্বীয় ভগ্নী বলার ব্যাখ্যায় ইব্রাহীম (আঃ) বলিয়াছেন, আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই মোমেন এবং মোমেনগণ পরস্পর ভাই-ভগ্নী

---

* আরবী ভাষার ব্যাকরণ তথা এলমে-নাহু সম্বন্ধে যাহাদের পূর্ণ জ্ঞান আছে তাহারা জানেন যে, جملة استثنائية -এর মধ্যে مستثنى منه ই আসল উদ্দেশ্য হয়; প্রসঙ্গক্রমে কোন প্রশ্নোদয়ের পরিস্থিতির অবসানের জন্য استثناء কে আনা হয়। অতএব আলোচ্য হাদীছের বিষয়বস্তুর মূল উদ্দেশ্য হইল হযরত ইব্রাহীমের মিথ্যা না বলার ঘোষণা।

অতএব স্ত্রীকে দ্বীনী ভগ্নী ও স্বামীকে দ্বীনী ভ্রাতা বলিলে তাহা মিথ্যা নহে। ইব্রাহীম (আঃ) নিজের স্ত্রী ছারার নিকট ভগ্নী বলার এই ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। এই সূক্ষ্ম কৌশল দ্বারা আত্মরক্ষাপূর্বক ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর দ্বীন প্রচারে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন। ইব্রাহীম (আঃ) স্ত্রীকে স্বীয়ভগ্নী বলিয়া দ্বীনী-ভগ্নী উদ্দেশ্য করিয়াছিলেন, সেমতে তাঁহার উক্তি সম্পূর্ণ সত্য ছিল, তাহাতে মিথ্যার লেশমাত্র ছিল না, কিন্তু শ্রোতা ভগ্নী শব্দ এই অর্থে বুঝে না; যেহেতু "ভগ্নী" বলিলে সাধারণতঃ অন্য অর্থ বুঝা যায়, তাই ইব্রাহীম (আঃ) হাশরের দিনের ভয়-ভীতির সময়ে এই উক্তিকে মিথ্যা গণ্য করিয়া সন্ত্রস্ত হইবেন। অপর দুইটি ঘটনা সম্পর্কীয় কথাও এই ধরনেরই একাধিক অর্থবোধক এবং ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের উদ্দেশ্য ও মনোগত তাৎপর্য অনুসারে তাহা মোটেই অসত্য নহে। বিস্তারিত বিবরণ এই–

আলোচ্য উক্তিদ্বয়ের একটি হইল انى سقيم ইন্নী সাক্বীম– আমি পীড়িত। এই ঘটনার উল্লেখ পবিত্র কোরআনেও আছে; এ সম্পর্কীয় আয়াতের তরজমা ১৬৩১ নং হাদীছের পূর্বে রহিয়াছে। মূল ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় জাতি ও দেশবাসীকে তাহাদের উপাস্য প্রতিমাগুলির বাস্তব জ্ঞান দান সম্পর্কে একটি

সূক্ষ্ম পরিকল্পনা স্থির করিলেন। সেই পরিকল্পনার মধ্যে সেই প্রতিমাগুলি প্রথমে ভাঙ্গিয়া চুরমার করার প্রয়োজন ছিল। এই কার্য সমাধার জন্য তিনি প্রতিমা ঘরে ঢুকার জন্য নির্জনতার সুযোগ সন্ধানে ছিলেন। দেশীয় রীতি অনুযায়ী এক উৎসবে তাহাদের একটি মেলা জমিয়াছিল। দেশবাসী সকলেই সে মেলায় গেলে সম্পূর্ণ বস্তি কিছু সময়ের জন্য জনশূন্য হইবে; ইব্রাহীম (আঃ) এই সুযোগকেই স্বীয় প্রয়োজনের জন্য নির্বাচিত করিলেন, কিন্তু দেশবাসী মেলায় যাওয়াকালে তাঁহাকেও মেলায় যোগদান করিতে বলিল। ইব্রাহীম (আঃ) সংকটে পড়িলেন, তাহাদের সঙ্গে গেলে সুযোগ নষ্ট হয়, না যাইয়া বা নিস্তার কিরূপে? তিনি আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে তাকাইয়া একটু চিন্তা করিলেন যে, এখন তাহাদের হইতে নিস্তার পাওয়ার জন্য কি উত্তর দেওয়া যায়। মানুষ কোন বিষয় চিন্তা করাকালে সম্মুখস্থ যেকোন বস্তুর প্রতি তাকাইয়া একাগ্রতা লাভের জন্য দৃষ্টি তাহার প্রতি নিবদ্ধ করিয়া চিন্তা করে। এই ক্ষেত্রে নক্ষত্ররাজির প্রতি ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের দৃষ্টি করাও সেই ধরনের ছিল। অথবা তিনি ভান করারূপে নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতি তাকাইয়াছিলেন। তাঁহার জাতি রাশিচক্রে তথা ভাল-মন্দের উপর গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব এবং তাহার গণনায় অর্থাৎ ভূত-ভবিষ্যতের শুভাশুভ ইত্যাদি নক্ষত্ররাজির আবর্তন দ্বারা নিরূপণ করায় বিশ্বাসী ছিল। সেমতে নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতি দৃষ্টিদানপূর্বক কোন কথা বলিলে তাহারা সহজেই উহা গ্রহণ করিয়া নিবে– পীড়াপীড়ি করিবে না, তাহাদের হইতে রেহাই পাওয়া যাইবে। তাই তিনি নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, "ইন্নী সাক্বীম– আমি পীড়িত"। এই বাক্যটির দুই অর্থ হইতে পারে– শারীরিক ও দৈহিক পীড়িত বা মানসিক ও আত্মিক পীড়িত; যেরূপ বলা হয় যে, আমার তবিয়ত ভাল না বা মন-মেজাজ ভাল না। ইব্রাহীম (আঃ) দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য করিতেছিলেন এবং এই অর্থ অনুসারে এই উক্তিটি খাঁটি বাস্তব ও সম্পূর্ণ সত্য ছিল। কারণ, স্বীয় জাতি ও দেশবাসী বিশেষতঃ নিজ আত্মীয়-কুটুম্ব এমনকি স্বীয় পিতা পর্যন্ত সব জড় পদার্থ প্রতিমা মর্তিগুলির প্রতি যে সব আকিদা ও বিশ্বাস জন্মাইয়া রাখিয়াছিল এবং উহার প্রেক্ষিতে যেসব কার্যকলাপ করিয়া থাকিত, তাহা দৃষ্টে ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের ন্যায় ব্যক্তির মনের অবস্থা যে কিরূপ হইতে পারে এবং তাঁহার অস্থিরতা যে কতদূর চরমে পৌঁছিতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। অতএব ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের উদ্দিষ্ট অর্থ অনুসারে তাঁহার এই উক্তি সত্য ছিল কিন্তু শ্রোতা তাঁহার উক্তিকে প্রথম অর্থে বুঝিয়াছিল; যেই কারণে তাহারা উচ্চবাচ্য না করিয়া তাঁহাকে বাড়ীতে ছাড়িয়া গিয়াছে। এই অর্থ অনুসারে ইহা সত্য নহে, তাই ইব্রাহীম (আঃ) হাশর ময়দানের ভয়-ভীতির সময় ইহাকে মিথ্যা গণ্য করিয়া সন্ত্রস্ত হইবেন।

মূল আলোচনার দ্বিতীয় উক্তিটি হইল– بل فعله كبيرهم هذا বরং তাহাদের প্রধানটাই এই কাজ করিয়াছে।" এই ঘটনার উল্লেখ পবিত্র কোরআনে আছে। অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ঘটনার আয়াতে ইহার তরজমা রহিয়াছে। ঘটনার বিবরণ এই যে, পূর্বোল্লিখিত মেলা উপলক্ষ্যে দেশবাসী সকলেই চলিয়া গেল। এই

সুযোগে ইব্রাহীম (আঃ) পূজা ঘরে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, প্রতিমাগুলির সম্মুখে দুধ, কলা, মিঠাই-মণ্ডা ইত্যাদি ভেঁটস্বরূপ রাখা আছে। ইব্রাহীম (আঃ) এই সকল কার্যে এবং এই কার্য বিশ্বাসীদের ব্যঙ্গপূর্বক প্রতিমাগুলিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, কি হে! তোমরা খাও না কেন? নিরুত্তর রহিয়াছ কেন? ইহা বলিতে বলিতে তিনি সেইগুলিকে কুঠারাঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং দেশবাসীকে মূল বিষয় বুঝাইবার পরিকল্পিত যুক্তি-তর্কের ভূমিকা দাঁড় করার জন্য শুধু বড় প্রতিমাটিকে বাকী রাখিয়া কুঠারখানা উহার কাঁধেই ঝুলাইয়া রাখিলেন।

দেশবাসী মেলা হইতে আসিয়া এই অবস্থা দেখিতে পাইল; অবশেষে তাহারা ইব্রাহীম (আঃ)-কে ডাকিয়া আনিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, হে ইব্রাহীম! আমাদের মাবুদগুলির সঙ্গে এই ব্যবহার তুমি করিয়াছ কি? তদুত্তরে ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন بل فعله كبيرهم هذا "বরং (আমি বলি,) উহাদের এই বড়টাই এই কাণ্ড করিয়াছে।" এই উক্তিটির তাৎপর্য দুই রকম হইতে পারে। একটি এই যে, নিজে নির্দোষ-নিরপরাধ হওয়ার জন্য অভিযোগ খণ্ডন করিতে যাইয়া অবাস্তবরূপে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া দেওয়া। আর একটি এই যে, অভিযোগ খণ্ডন উদ্দেশ্য নহে, বরং উদ্দেশ্য হইল একটি বিশেষ বাস্তব সত্য শ্রোতৃবৃন্দকে সহজে উপলব্ধি করাইবার ও গ্রহণ করাইবার নিমিত্ত ভূমিকা ও কৌশলস্বরূপ একটি সাময়িক দাবী শুধুমাত্র সম্ভাব্য পরিকল্পিত আকারে কথার কথারূপে দাঁড় করানো– যাহাতে উহার উপর অন্য একটি বিষয় উপস্থাপনপূর্বক তাহা দ্বারা মূল উদ্দেশ্য সত্যটাকে সহজে প্রমাণিত করা যায়।

এই স্থলে দ্বিতীয় তাৎপর্যটিই হযরত ইব্রাহীমের উদ্দেশ্য। তিনি দেশবাসীর গর্হিত মাবুদ– প্রতিমাগুলির জড়তা ও অক্ষমতা তাহাদের চোখে দেখাইয়া দিয়া স্পষ্টরূপে প্রমাণিত করিতে চাহিয়াছেন যে, এই শ্রেণীর অক্ষম জড় বস্তুগুলি মাবুদ ও উপাস্য হইতে পারে না। এই উদ্দেশ্য শ্রোতৃবর্গকে সহজে স্বীকার করায় বাধ্য করিবার জন্য ইব্রাহীম (আঃ) কৌশলরূপে সাময়িকভাবে এই দাবী দাঁড় করিলেন। এই সূত্রে আলোচ্য উক্তির মর্ম এই যে, যখন দেশবাসী ইব্রাহীম (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি এই কাণ্ড করিয়াছ হে ইব্রাহীম!" তখন ইব্রাহীম (আঃ) উক্ত প্রশ্নের উত্তর না দিয়া আসল উদ্দেশের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং ভূমিকাস্বরূপ সাময়িকভাবে সম্ভাব্য একটি পরিকল্পিত দাবী তাহাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন যে, মনে কর– আমি এরূপ দাবী করিতেছি যে, "আমি করি নাই বরং এই বড়টাই করিয়াছে।"

এই সাময়িক দাবীর উপর তিনি আর একটি বিষয় উপস্থাপনপূর্বক বলিলেন, فسئلوهم ان كانوا ينطقون এখন তোমরা তোমাদের এই মাবুদগণকে জিজ্ঞাসা কর (আমার এই দাবী মিথ্যা হইলে তাহারাই আমাকে দোষী প্রমাণ করিবে); যদি তাহাদের (অন্তত) কথা বলিবার শক্তি থাকে।

অর্থাৎ সাধারণ দৃষ্টিতেও দেখা যায়, বড় মাছে ছোট মাছ খায়, বড় রাজা ছোট রাজাকে ধ্বংস করে। তদ্রূপ এখানেও সম্ভবত বড় মাবুদটাই ছোট মাবুদগুলিকে ধ্বংস করিয়াছে। মনে কর– আমি এই সম্ভব দাবীটাই তোমাদের সম্মুখে পেশ করিতেছি; এখন যদি আমার দাবী মিথ্যা হয় তবে তাহারাই মূল ঘটনা ব্যক্ত করুক যদি তাহাদের কথা বলার শক্তি থাকে। আর যদি তাহাদের কথা বলিবার শক্তিও নাই, এমনকি তাহাদের উপর মিথ্যা দোষারোপ করা হইলেও নিজেদের নির্দোষ হওয়া প্রমাণ করিবার পর্যন্ত ক্ষমতাটুকু তাহাদের নাই, তবে তাহারা মাবুদ– উপাস্য তথা খোদা কিরূপে হইতে পারে?

ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের এই যুক্তি তাহাদের বিবেকের উপর এত গভীর রেখাপাত করিল যে, উহার প্রতিক্রিয়ায় তাহাদের অন্তরে সত্যের প্রবল স্রোত বহিতে লাগিল, যাহাকে প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া কিছু সময়ের জন্য তাহারা তাহাতে মগ্ন হইয়া নিজেদের দোষের স্বীকৃতি দিতে লাগিল। কোরআনের বর্ণনায় রহিয়াছে-

فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظلمون . ثم نكسوا ....

"ফলে তাহারা নিজেরাই মনে মনে চিন্তা করিল এবং পরস্পর বলাবলি করিল, বস্তুতঃ তোমরাই অন্যায়কারী। (ইব্রাহীম ঠিকই বলিতেছে; অক্ষম জড় পদার্থগুলি মাবুদ হয় কিরূপে?) অতঃপর লজ্জায় তাহাদের মাথা হেট হইয়া গেল এবং নিজেরাই ইব্রাহীম (আঃ)-কে বলিল, তুমি ত জানই, ইহারা কথা বলিতে পারে না।" (পারা- ১৭; রুকু- ৫)

ইব্রাহীম (আঃ) যখন দেখিলেন, তাঁহার যুক্তি তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তখন তিনি মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করায় পরম প্রতাপের সহিত তাহাদের ভর্ৎসনা করিলেন-

قال افتعبدون من دون الله مالا ينفعكم شيئا ولايضركم -

"ইব্রাহীম (আঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, এই সবগুলির জড়তা ও অক্ষমতা চাক্ষুষ দেখিবার পরও তোমরা পূজা উপাসনা করিতেছ সর্বশক্তিমান আল্লাহ ব্যতীত এমন কতগুলি জড় বস্তুর, যেগুলি তোমাদের কোন প্রকার উপকার বা অপকার করিতে পারে না। (অর্থাৎ একেবারেই অক্ষম অচেতন।) ধিক্ তোমাদের উপর এবং ঐ সব মনগড়া মাবুদগুলির উপর, যেগুলিকে উপাস্য বানাইয়া রাখিয়াছ আল্লাহর স্থলে। তোমরা কি জ্ঞানহারা বোধ-বুদ্ধিহীন গর্দভ?"

পাঠকবর্গ! লক্ষ্য করিয়াছেন কি? ইব্রাহীম (আঃ) بل فعله كبيرهم هذا "তাহাদের বড়টাই এই কাণ্ড করিয়াছে"- এই সাময়িক দাবীর উপর ভিত্তি করিয়া মূল সত্যকে কি সুন্দর ও সহজরূপে প্রকাশ করিতে পারিলেন এবং শ্রোতাদের ভ্রান্তি ধরাইয়া দিতে প্রয়াস পাইলেন।* ইহাকে মিথ্যা বলা হয় না; ইহাকে বলা হয় فرض المحال لتبكيت الخصم বিপক্ষকে সহজে নিরুত্তর ও কাবু করিবার উদ্দেশে সাময়িক পরিকল্পিত দাবী।" ইহা তর্কশাস্ত্রের একটি বিশেষ কৌশল।

অবশ্য ইহার বাহ্যিক অর্থ যেহেতু অবাস্তব, তাই ইব্রাহীম (আঃ) হাশর ময়দানের ভয়-ভীতির সময় ইহাকে মিথ্যা গণ্য করিয়া আতঙ্কিত হইবেন।

বিবি হাজেরার বনবাস ও মক্কা নগরীর গোড়াপত্তন

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ পূর্বেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, আলোচ্য হাদীছের অর্থ ও উদ্দেশ্য ইহা প্রতিপন্ন করা নহে যে, ইব্রাহীম (আঃ) তিনটি ঘটনায় মিথ্যা বলিয়াছেন। "নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা", বরং এই হাদীছের তাৎপর্য হইল- ইব্রাহীম (আঃ) হাশরের দিন এই বলিয়া শংকা প্রকাশ করিবেন যে, "আমি তিনটি মিথ্যা বলিয়াছিলাম" সেই তিনটি বিষয়ের উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা দ্বারা প্রতিপন্ন করা যে, এই বিষয় তিনটিও বস্তুতঃ মিথ্যা ছিল না, অতএব এই ঘোষণা দেওয়া নিতান্তই সত্য ও বাস্তব যে, ইব্রাহীম (আঃ) জীবনে কখনও মিথ্যা বলেন নাই।

---

* পূর্ব বর্ণিত জনৈক বাঙ্গালী পণ্ডিত হাদীছখানার তাৎপর্য বিপরীত বুঝিয়া তথাকথিত "তফসীরুল কোরআনে" এই হাদীছখানার সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি নিজের স্বল্প জ্ঞানহেতু ভুলে পতিত হইয়া নানারূপ প্রলাপোক্তি করিয়াছেন- হাদীছকে এনকার করিয়াছেন, হাদীছ বর্ণনাকারীদের প্রতি ক্ষেপিয়াছেন। এমনকি চরম ধৃষ্টতায় বিশিষ্ট সাহাবী আবু হোরায়রা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি বেআদবী করতঃ বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, এইটা আবু হোরায়রার গর্হিত বয়ান এবং বোখারী-মুসলিম শরীফে উল্লেখ হইয়া থাকিলেও পণ্ডিত মিয়া ইহাকে হাদীছ বলিয়া গ্রহণ করিবেন না।

এই সকল প্রলাপোক্তির একমাত্র কারণ হইল, হাদীছখানার মূল তাৎপর্য পৌঁছিবার অসামর্থতা। তিনি বুঝিয়াছেন যে, ইহাতে হযরত ইব্রাহীমের মিথ্যা বলা প্রতিপন্ন হয়।

বস্তুতঃ ইহা এই হাদীছের বাস্তব তাৎপর্য নহে, বরং ইহা পণ্ডিত মিঞার অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী প্রসূত বক্র ও ভুল ধারণা হইতে সৃষ্ট। হাদীছখানার সঠিক তাৎপর্য পাঠক উপলব্ধি করুন।

পণ্ডিত সাহেব আবু হোরায়রা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি ক্ষেপিয়াছেন, কিন্তু আনাছ (রাঃ), হাম্মাম (রাঃ) ও আবু ছায়ীদ (রাঃ) সাহাবীগণের হাদীছসমূহেও আছে যে, ইব্রাহীম (আঃ) নিজেই হাশরের দিন বলিবেন, আমি তিনটি মিথ্যা বলিয়াছিলাম; এই সব হাদীছ সম্পর্কে তিনি কি বলিবেন এবং উক্ত ছাহাবীগণ সম্পর্কে কি মন্তব্য করিবেন?

১৬৩৫। হাদীছ ঃ আব্দুলাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) (রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হইতে*) বর্ণনা করিয়াছেন, ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের দ্বিতীয় স্ত্রী হাজেরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গর্ভে ইসমাঈল (আঃ) জন্ম গ্রহণ করিলেন (মাতৃ জাতির মানবীয় স্বভাবের প্রবণতায় ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রথমা স্ত্রী ছারাহ্ (রাঃ) ও বিবি হাজেরার মধ্যে গরমিলের সৃষ্টি হইল। (হাজেরা (রাঃ) তাহা দূর করায় সচেষ্ট হইলেন।) বিবি হাজেরাই প্রথম নারী যিনি পরিচারিকা নারীদের কোমরে পরিকর বা কোমরবন্ধ বাঁধার রীতি অবলম্বন করেন। তিনি সাধারণ পরিচারিকার ন্যায় কোমর বাঁধিয়া বিবি ছারার মনের আবিলতা দূর করার উদ্দেশে সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন । (কিন্তু তাঁহার চেষ্টা নিষ্ফল হইল, এমনকি বিবিদ্বয়ের মধ্যেকার মনের আবিলতায়) যখন ইব্রাহীম (আঃ) এবং বিবি ছারার মধ্যেও প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হইল তখন (আল্লাহ তাআলার আদেশ ক্রমে) ইব্রাহীম (আঃ) শিশু পুত্র ইসমাঈল ও বিবি হাজেরা (রাঃ)-কে (দেশান্তরিত করার জন্য) লইয়া বাহির হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে একটি মোশকে পানি ছিল– তাঁহারা পথিমধ্যে তাহা পান করিতেন এবং ইসমাঈল মাতার দুগ্ধ পান করিত। এইভাবে তাঁহারা মক্কা নগরীর বর্তমান অবস্থাস স্থলে পৌঁছিলেন।

ইব্রাহীম (আঃ) বিবি হাজেরা ও শিশুকে বড় একটি বৃক্ষের নীচে রাখিলেন। তখন এই এলাকায় কোন মানুষ ছিল না, পানিরও কোন ব্যবস্থা ছিলা না। তিনি তাঁহাদের নিকট শুধুমাত্র একটি থলিয়ার মধ্যে কিছু খুরমা এবং মোশকের মধ্যে অল্প পরিমাণ পানি দিয়া আসিলেন। এই অবস্থায় শিশু ও তাঁহার মাতাকে তথায় রাখিয়া ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহার (ফিলিস্তীনস্থ) গৃহজনের দিকে রওয়ানা হইলেন।

যখন ইব্রাহীম (আঃ) শিশু ও শিশুর মাতাকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিতেছিলেন, তখন হাজেরা (রাঃ) তাঁহার পিছনে ছুটিলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিলেন–

يَا اِبْرَاهِيْمُ اَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا فِىْ هٰذَا الْوَادِىْ الَّذِىْ لَيْسَ فِيْهِ اَنِيْسٌ وَلاَ شَئٌ ـ

"হে ইব্রাহীম! আপনি কোথায় চলিয়া যাইতেছেন? অথচ আমাদিগকে এমন স্থানে ফেলিয়া যাইতেছেন যেখানে কোন মানুষ নাই, পানাহারের কোন ব্যবস্থা নাই।" বার বার এইরূপ বলিতে লাগিলেন, কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সেদিকে মোটেই তাকাইতে ছিলেন না– তাঁহার দৃষ্টি ও গতি সম্মুখ দিকেই।

অবশেষে হাজেরা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন الله امرك بهذا আপনি কি আল্লাহর আদেশে এই ব্যবস্থা করিলেন? ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, نعم হাঁ। জবাব শুনিয়া হাজেরা (রাঃ) সান্ত্বনা লাভ করিলেন এবং নির্ভীক চিত্তে বলিলেন, اذن لايضيعنا "তাহা হইলে আমাদের কোন ভয় নাই– আল্লাহ আমাদিগকে হালাক করিবেন না।" হাজেরা (রাঃ) ইহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, الى من تتركنا আপনি আমাদিগকে এই জনশূন্য এলাকায় কাহার আশ্রয়ে রাখিয়া যাইতেছেন? ইব্রাহীম (আঃ) বলিয়াছিলেন, الى الله আল্লাহর আশ্রয়ে ইহা শ্রবণে বিবি হাজেরা (রাঃ) বলিয়াছিলেন, رضيت আল্লাহর আশ্রয়ে আমি পূর্ণ সন্তুষ্ট" –এই বলিয়া তিনি হযরত ইব্রাহীমের পেছন হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

ইব্রাহীম (আঃ) শিশুপুত্র ও তাঁহার মাতাকে ত্যাগ করিয়া পেছন দিকে না তাকাইয়া সম্মুখপানে অগ্রসর হইতেছিলেন। যখন গিরিপথের বাঁকে পৌঁছিলেন যেখান হইতে স্ত্রী-পুত্র চোখের নজরে পড়িবার সম্ভাবনা নাই, তখন কা'বা গৃহের (স্থানের) প্রতি মুখ করিয়া দাঁড়াইলেন এবং হাত উঠাইয়া দোয়া করিলেন–

رَبَّنَا اِنِّى اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرَ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ـ

---

* এই হাদীছ বর্ণনার প্রারম্ভে স্পষ্ট উল্লেখ নাই যে, এই বিবরণ ছাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) হইতে শুনিয়াছেন; কিন্তু ইহা অবধারিত যে; তিনি এই বিবরণ হযরত (সঃ) হইতে শুনিয়াছেন। কারণ, প্রারম্ভে উহার উল্লেখ না থাকিলেও হাদীছখানার বিবরণের মধ্যে একাধিক স্থানে সে সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

"হে পরওয়ারদেগার! আমি জনশূন্য মরুর বুকে আমার পরিজনের বসতি স্থাপন করিয়া যাইতেছি তোমার সম্মানিত ঘরের নিকটে, এই উদ্দেশে যে, তাহারা নামায তোমার এবাদত-বন্দেগী) ভাল ভাবে আঁকড়াইয়া থাকিবে। প্রভু হে! তুমি আরও লোকের মন এই স্থানের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া দাও যেন উহার জনশূন্যতা দূর হইয়া যায়। আর ফলফলারি খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিয়া পানাহারের সুব্যবস্থা করিয়া দাও; যাহাতে তোমার নেয়ামত উপভোগ করিয়া মানুষ তোমার শোকরগুজারী করিবে। (পারা- ১৩; রুকু- ১৮)

বিবি হাজেরা (রাঃ) হযরত ইব্রাহীমের পিছন হইতে নিজ স্থানে চলিয়া আসিলেন : মোশকের পানি নিজে পান করিতেন এবং শিশুকে বুকের দুধ পান করাইতেন। কিছু দিনের মধ্যেই পানি ফুরাইয়া গেল। তখন নিজেও ভীষণভাবে তৃষ্ণার্ত হইলেন এবং শুষ্কতার দরুন বুকের দুধ না থাকায় শিশুও পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িল। এমনকি চক্ষের সামনে শিশু পুত্র পিপাসায় ছটফট করিতে লাগিল। তখন চোখের সামনে শিশু-পুত্রের এই করুণ অবস্থা সহ্য করিতে না পারিয়া হাজেরা (রাঃ) তথা হইতে সরিয়া পড়িলেন এবং নিকটতম "সাফা" পর্বতের উপর উঠিয়া এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিলেন যে, কাহারও কোন খোঁজ পাওয়া যায় কিনা; কিছুর খোঁজই নাই। সুতরাং তিনি দ্রুত সাফা পর্বত হইতে নামিয়া সম্মুখস্থ "মারওয়া" পর্বতের দিকে অগ্রসর হইলেন। (এর মধ্যে তিনি শিশু ইসমাঈলের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেছিলেন।) সাফা পাহাড় হইতে নামিয়া একটু সম্মুখের স্থানটি তখন যথেষ্ট নীচু, (তথা হইতে শিশু-পুত্র দৃষ্টির আড়াল হইত, তাই) উহা অতিক্রম করিতে তিনি ক্লান্ত পরিশ্রান্তের ন্যায়ই দৌড়িয়া চলিলেন। অতঃপর "মারওয়া" পাহাড়ের উপর উঠিয়া চতুর্দিকে তাকাইলেন, কিন্তু কোন কিছুর খোঁজ পাইলেন না। এইরূপে বিচলিত হইয়া তিনি (আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করিতে করিতে এবং আল্লাহকে ডাকিতে ডাকিতে) উক্ত পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন, এমনকি বারংবার একটি হইতে অপরটিতে যাওয়ার সংখ্যা সাতের সংখ্যায় পৌঁছিল।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) উক্ত ঘটনার প্রতি ইশারা করিয়া বলিয়াছেন, বিবি হাজেরা কর্তৃক উক্ত পাহাড়দ্বয়ে আসা-যাওয়া করার স্মরণেই আজও হজ্জ সমাপনকারীগণ হজ্জের একটি বিশেষ অঙ্গ হিসাবে এই পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে (বিভিন্ন দোয়া ও যিকির করতঃ) সাতবার সা'য়ী বা আসা-যাওয়া করিয়া থাকেন। (এমনকি উল্লিখিত নীচু স্থানটি যদিও বর্তমানে সমতল,* তবুও শরীয়তের নির্দেশানুসারে তাহাকে বিবি হাজেরার ন্যায় দৌড়িয়া অতিক্রম করিতে হয়।)

বিবি হাজেরা (রাঃ) সপ্তম বার "মারওয়া" পাহাড়ে উঠিবার পর শিশু পুত্রের অবস্থা দেখার জন্য শিশুর নিকট চলিয়া আসার ইচ্ছা করিলে হঠাৎ একটি শব্দ শুনিলেন। তিনি পূর্ণ মনোযোগের সহিত ঐ শব্দের প্রতি ধ্যান দিলেন এবং পুনরায় শব্দ শুনিলেন।

এইবার তিনি বলিলেন, তোমার আওয়াজ ত শুনাইয়াছ; সাহায্য করার কোন ব্যবস্থা তোমার নিকট থাকিলে সাহায্য কর। তখন তিনি (বর্তমান) যমযম কূপের স্থানে একজন ফেরেশতা দেখিলেন, তিনি

* বিগত ১৯৫০ সনে আমি নরাধমের আল্লাহর ঘরের মহান দরবারে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল। তখন সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয় এবং তাহার মধ্যবর্তী স্থান সম্পূর্ণরূপে হেরেম শরীফের মসজিদ হইতে বাহিরে ছিল। তখন পাহাড়দ্বয়ের পার্শ্ববর্তী দালান-কোঠা, ঘর-বাড়ী, দ্বারা শহরের পরিবর্তন হইয়াছিল বটে কিন্তু পাহাড়দ্বয় এবং তাহার মধ্যবর্তী ভূচিত্র পুরাতনকালেরই অনেকটা দৃশ্য বহন করিতেছিল, এমনকি দৌড়িয়া অতিক্রম করার নীচু স্থানটি তখনও প্রাচীন কালের ন্যায় নীচুই ছিল। যাতায়াতের পথ প্রাকৃতিক পাহাড়ী এলাকার পাথরিয়া ভূমিই ছিল, সুরম্য অট্টালিকার আবরণে আবদ্ধ ছিল না, শুধু উপরে নব নির্মিত সাধারণ ছায়ার ব্যবস্থা ছিল।

১৯৫৫ ইং সালের পর বাদশাহ সউদ হেরেম শরীফের মসজিদ সম্প্রসারণের কাজে হাত দেওয়ায় উক্ত পাহাড়দ্বয় ও তাহাদের মধ্যবর্তী স্থান সহসমুদয় এলাকা মসজিদের সুরম্য দ্বিতল অট্টালিকার ভিতরে আসিয়া যাওয়াতে সব কিছু দৃশ্য এবং হাল-অবস্থা পরিবর্তিত হয়া গিয়াছে। বিশেষত পাহাড়দ্বয়কে ভাঙ্গিয়া তাহাদের অস্তিত্বই প্রায় বিলোপ করিয়া ফেলা হইয়াছে, না থাকার মত একটু নিদর্শন অবশিষ্ট রাখা হইয়াছে; যাহা দেখিয়া কেহ তাহা পাহাড় বলিয়া ভাবিতে পারিবে না এবং সমুদয় এলাকা কংক্রিটের ঢালাই হইয়া সমতল আকার ধারণ করিয়াছে। সম্পূর্ণ এলাকা মরমর পাথরের সুরম্য ফরাশে পরিণত হইয়াছে। অবশ্য দৌড়িয়া অতিক্রম করার স্থানটির সীমা চিহ্নিত রাখা হইয়াছে।

জিব্রাঈল (আঃ)। ঐ ফেরেশতা স্বীয় পায়ের গোড়ালির আঘাতে তথায় গর্ত করিলেন, তাহা হইতে পানি উথলিয়া উঠিতে লাগিল। বিবি হাজেরা (রাঃ) আচম্বিত হইলেন এবং মাটি দ্বারা চতুর্দিকে বাঁধ সৃষ্টি করতঃ হাউজের ন্যায় বানাইলেন; অতঃপর অঞ্জলি ভরিয়া মোশকে পানি ভরিতে লাগিলেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, উক্ত বিষয় উল্লেখ করিয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিলেন, ইসমাঈলের মাতাকে আল্লাহ রহম করুন–তিনি পানির চতুর্দিকে বাঁধ না দিলে যমযমের ঐ পানি কূপ না হইয়া প্রবাহমান ঝরণায় পরিণত হইত।

বিবি হাজেরা (রাঃ) এই পানি পানে দিন কাটাইতে লাগিলেন, তাঁহার বুকেও দুধের সঞ্চার হইল; শিশুকে পর্যাপ্ত দুগ্ধ পান করাইতে লাগিলেন। জিব্রাঈল (আঃ) তাঁহাকে এই সান্ত্বনাও দিয়াছিলেন যে, এই পানি নিঃশেষ হইয়া আপনি আবার বিপদের সম্মুখীন হইবেন। এই আশঙ্কা করিবেন না যে, জানিয়া রাখুন– এখানেই আল্লাহর ঘরের স্থান নির্দিষ্ট আছে এবং এই শিশু স্বীয় পিতার সঙ্গে সেই ঘর পুনঃনির্মাণ করিবেন। এই ঘরের নির্মাতাগণকে আল্লাহ তাআলা ধ্বংস করিবেন তাহা হইতে পারে না। ঐ সময় তথায় (তুফানে নূহের পর ভগ্নাবশেষ) আল্লাহর ঘরের নিদর্শন শুধুমাত্র উহার ভিটা যমীনের উপর উঁচু টিলার ন্যায় ছিল, তাহাও পাহাড়ী ঢলের স্রোতে ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল।

বিবি হাজেরা (রাঃ) একাকী এই এলাকায় বাস করিতে লাগিলেন। কিছু দিনের মধ্যে (ইয়ামান দেশীয়) "জুরহুম" গোত্রের একটি কাফেলা এই এলাকা অতিক্রম করাকালে নিকটবর্তী স্থানে বিশ্রাম নিল। তাহারা হঠাৎ দেখিতে পাইল, কতকগুলি পাখী কোন কিছুকে কেন্দ্র করিয়া উড়িতেছে। এতদ্দৃষ্টে তাহারা অনুমান করিতে পারিল যে, এই পিপাসার্ত জীবগুলি নিশ্চয় পানিকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছে এবং তাহারা আশ্চর্য হইল যে, আমরা তো এই এলাকায় বহুবার গমনাগমন করিয়াছি; এখানে পানি দেখি নাই। তৎক্ষণাৎ তাহারা এক দুইজন লোক তথায় পাঠাইল; ঐ স্থান হইতে পানির কূপের সংবাদ আসিলে তাহারা সকলে তথায় উপস্থিত হইয়া বিবি হাজেরাকে দেখিতে পাইল। তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমরা আপনার এই স্থানে বসতি স্থাপন করিতে চাই, অনুমতি দিবেন কি? বিবি হাজেরা (রাঃ) বলিলেন, অনুমতি দিতে পারি, কিন্তু এই কূপের উপর তোমাদের স্বত্ব স্থাপিত হইবে না। তাহারা সম্মত হইয়া তথায় বসবাস আরম্ভ করিল।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, বিবি হাজেরা লোকদের সাহচর্যের আশা করিতেছিল, তিনি সেই সুযোগও পাইলেন। এই পর্যটক দলটি তথায় বসতি স্থাপন করিল, তাহারা নিজেদের আরও লোক সংবাদ দিয়া তথায় আবাদ করিল; এমনিভাবে সেখানে কয়েকটি পরিবারের বস্তি হইয়া গেল। এদিকে ইসমাঈল (আঃ)-এরও বয়স ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি "জুরহুম" গোত্র হইতে তাহাদের ভাষা "আরবী" শিক্ষা করিলেন। ফলে তিনি ঐ জুরহুম গোত্রের লোকদের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। ইসমাঈল (আঃ) বয়স্ক হইলে তাহারা নিজেদের একটি মেয়েকে তাঁহার সঙ্গে বিবাহ দিল। বিবাহের পর ইসমাঈল আলাইহিস সালামের মাতা হাজেরা (রাঃ) ইন্তেকাল করিলেন।

ইসমাঈলের বিবাহের (ও মাতার মৃত্যুর) পর একদা ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় পরিজন পরিদর্শনে মক্কায় তশরীফ আনিলেন। ইসমাঈল (আঃ) তখন বাড়ীতে ছিলেন না, তাঁহার স্ত্রীর নিকট ইব্রাহীম (আঃ) ইসমাঈলের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্ত্রী বলিল, তিনি শিকার করিয়া আহার্যের ব্যবস্থায় কোথাও গিয়াছেন। অতঃপর ইব্রাহীম (আঃ) পুত্রবধূকে তাহাদের জীবন যাপনের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। পুত্রবধূ বলিলেন, আমরা অতিশয় দুরবস্থা, দারিদ্র্য ও কষ্টে আছি। (পুত্রবধূ শ্বশুর ইব্রাহীম (আঃ)-কে চিনে নাই।) ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, তোমার স্বামী বাড়ী আসিলে আমার সালাম জানাইও এবং বলিও, সে যেন তাহার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলাইয়া নেয়। এই বলিয়া হযরত ইব্রাহীম (আঃ) চলিয়া গেলেন।

ইসমাঈল (আঃ) বাড়ী উপস্থিত হইলে পর তিনি স্বীয় পিতার আগমনের আভাস অনুভব করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়ীতে কোন মেহমান আসিয়াছিল কি? স্ত্রী বলিল হাঁ (এবং আকৃতি-প্রকৃতি বর্ণনা করিয়া বলিল),

এমন আকৃতির এক বৃদ্ধ আসিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া আপনার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি সে সম্পর্কে উত্তর দিয়াছি এবং আমাদের সাংসারিক অবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি বলিয়াছি, আমরা অত্যন্ত কষ্ট ও দারিদ্র্যের মধ্যে আছি। ইসমাঈল (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন আদেশ করিয়া গিয়াছেন কি? স্ত্রী বলিল, হাঁ– আপনাকে সালাম জানাইবার এবং আপনার ঘরের চৌকাঠ বদলাইতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন।

এতদশ্রবণে ইসমাঈল (আঃ) বলিলেন, সেই বৃদ্ধ আমার পিতা; তিনি এই কথার দ্বারা আমাকে তোমায় পৃথক করিয়া দেওয়ার আদেশ করিয়া গিয়াছেন, অতএব তুমি স্বীয় পিত্রালয়ে চলিয়া যাও। এই বলিয়া ইসমাঈল (আঃ) স্ত্রীকে তালাক দিয়া দিলেন এবং ঐ গোত্রের অপর একটি মেয়েকে বিবাহ করিলেন।

কিছু দিন কাটিবার পর ইব্রাহীম (আঃ) পুনরায় আসিলেন। সেই দিনও ইসমাঈল (আঃ) বাড়ী ছিলেন না। তাঁহার স্ত্রীকে ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন; স্ত্রী জানাইলেন, তিনি আহার্যের সন্ধানে বাহিরে গিয়াছেন। তাহাদের সাংসারিক অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে পুত্রবধূ বলিলেন, আমরা ভাল ও সচ্ছলতায় আছি; এই বলিয়া আল্লাহর প্রশংসা করিলেন। পুত্র বধূ তাঁহাকে পানাহারের জন্যও বিশেষ অনুরোধ করিলেন। ইব্রাহীম (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের প্রধান খাদ্যবস্তু কি? পূত্রবধু বলিলেন, গোশত। পানীয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, পানি। ইব্রাহীম (আঃ) দোয়া করিলেন اللهم بارك لهم فى اللحم والماء আয় আল্লাহ! তাহাদের জন্য গোশ্ত ও পানিতে বরকত (আধিক্য ও অধিক জীবনী শক্তি) দান করুন।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসালাম বলিয়াছেন, ঐ সময় তথায় শস্য-ফসল ছিল না, নতুবা তাহা সম্পর্কেও ইব্রাহীম (আঃ) দোয়া করিতেন।

ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের এই দোয়ার ফলেই শুধু গোশত ও পানির দ্বারা মক্কা অঞ্চলে মানুষের স্বাস্থ্য ঠিক থাকিতে পারে, অন্য কোন স্থানে শুধু এই দুই বস্তুর দ্বারা মানুষের স্বাস্থ্য টিকিতে পারে না। ইব্রাহীম (আঃ) তখন এই দোয়াও করিয়াছিলেন।

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِىْ طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ -

"হে আল্লাহ! তাহাদের খাদ্য ও পানীয়ে বরকত (অধিক মঙ্গল) দান কর।" নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, মক্কা শরীফে খাদ্য পানীয়ের বরকত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের দোয়ার বদৌলতেই।

ইব্রাহীম (আঃ) পুত্রবধূর সঙ্গে আলাপের পর বলিলেন, তোমার স্বামী বাড়ী আসিলে আমার সালাম বলিও বরং সে নিজ ঘরের চৌকাঠ যেন বহাল রাখে।

ইসমাঈল (আঃ) বাড়ী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের নিকট কেহ আসিয়াছিলেন কি? স্ত্রী বলিলেন, হাঁ– এক নূরানী চেহারার বৃদ্ধ আসিয়াছিলেন– তিনি আপনার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; আমি যথাযথ উত্তর দিয়াছি। সাংসারিক অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিয়াছি– আমরা সুখে-শান্তিতেই আছি। ইসমাঈল (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন আদেশ করিয়া গিয়াছেন কি? স্ত্রী বলিলেন, হাঁ– আপনার নিকট সালাম বলিয়াছেন এবং আদেশ করিয়াছেন, আপনি যেন নিজ ঘরের চৌকাঠ বহাল রাখেন। ইসমাঈল (আঃ) বলিলেন, তিনি আমার পিতা; তোমাকে স্ত্রীরূপে বহাল রাখিবার আদেশ করিয়াছেন।

কিছু দিন পর ইব্রাহীম (আঃ) আবার আসিলেন। এইবার ইসমাঈল (আঃ)-এর সাক্ষাৎ পাইলেন। তিনি যমযম কূপের নিকটে বৃক্ষের নীচে বসিয়া তীর বানাইতেছিলেন। ইসমাঈল (আঃ) ইব্রাহীম (আঃ)-কে দেখামাত্র দাঁড়াইয়া গেলেন এবং পিতা-পুত্রের মধ্যে যে ব্যবহারের আদান-প্রদান হয় পরস্পর তাহাই করিলেন। অতপর ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, হে ইসমাঈল! আল্লাহ আমাকে একটি আদেশ করিয়াছেন। ইসমাঈল (আঃ) বলিলেন, স্বীয় প্রভুর আদেশ বাস্তবায়িত করুন। ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, আল্লাহর আদেশ

বাস্তবায়নে তুমি আমার সাহায্য করিবে কি? ইসমাঈল (আঃ) বলিলেন, আমি নিশ্চয় আপনার সাহায্য করিব। ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, আল্লাহ আমাকে আদেশ করিয়াছেন, এই উঁচু ভিটাটিকে ঘেরাও করিয়া একটি ঘর তৈয়ারি করি। ঐ সময়েই উভয়ে বায়তুল্লাহ শরীফের ঘর প্রস্তুত করিতে লাগিয়া গেলেন। ইসমাঈল (আঃ) পাথর আনিয়া দিতেন এবং ইব্রাহীম (আঃ) গাঁথুনি করিতেন। যখন দেওয়াল উঁচু হইয়া গেল তখন ইসমাঈল (আঃ) একটি বড় পাথর আনিলেন, ইব্রাহীম (আঃ) উহার উপর দাঁড়াইয়া নির্মাণ কার্য করিতে লাগিলেন * এবং ইসমাঈল (আঃ) তাঁহাকে গাঁথুনীর পাথর আনিয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়ে চতুর্দিকে ঘুরিয়া ঘর নির্মাণ করিতেছিলেন এবং এই দোয়া করিতেছিলেন–

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

"হে আমাদের প্রভু! আমাদের এই আমলটুকু কবুল করিয়া লউন; আপনি সব কিছু শুনেন এবং প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সব কিছু জানেন।*

ব্যাখ্যা ঃ ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর দ্বীন তবলীগ করিতে করিতে মিসর পৌঁছিয়াছিলেন। মিসর এলাকায় তবলীগ করার পর সিরিয়ার অন্তর্গত ফিলিস্তীনে চলিয়া আসিয়াছিলেন এবং তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়াছিলেন। মক্কার মরুভূমিতে ফেলিয়া আসা স্ত্রী-পুত্রকে দেখিবার জন্য ইব্রাহীম (আঃ) ফিলিস্তিনস্থ আবাসগৃহ হইতে আগমন করিতেন। ইসমাঈল (আঃ) ও তাঁহার মাতাকে যখন মক্কার মরুভূমিতে রাখিয়া গিয়াছিলেন তখন ইসমাঈল (আঃ)-এর বয়স ছিল দুই বৎসর।(ফতহুল বারী, ৬–৩০৮) তারপর ইব্রাহীম (আঃ) সময় সময় পরিদর্শনে আসিতেন। (ফতহুল, বারী ৬–৩১১) যখন ইসমাঈল (আঃ) সাত বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলেন তখন স্বপ্নের নির্দেশানুযায়ী ক্বোরবানীর ঘটনা সংঘটিত হইল। হযরত ইসমাঈলের বয়স যখন ১৪ বৎসর তখন তাঁহার প্রথম বিবাহ হয় এবং কিছু দিনের মধ্যেই তাঁহার মাতা বিবি হাজেরার মৃত্যু হয়। (আহওয়ালে আম্বিয়া–৯) তারপরও ইব্রাহীম (আঃ) সময় সময় আসিতেন। তিনবার

আসার উল্লেখ উপরের হাদীছেই আছে। ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের বয়স ১০০ বৎসর এবং হযরত ইসমাঈলের বয়স ৩০ বৎসর, তখনই কা'বা ঘর নির্মাণ কার্য সমাধা করেন। (ফতহুল বারী ৬–৩১৩)

ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) কর্তৃক কা'বা ঘর নির্মাণকালে যে দোয়ার উল্লেখ আলোচ্য হাদীছে রহিয়াছে উহার পূর্ণ বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপে আছে–

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ـ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ـ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا .....

অর্থঃ একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা– যখন ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) কা'বা গৃহের দেওয়াল উঠাইতে ছিলেন (এবং আল্লাহর দরবারে মিনতি করিয়া দোয়া করিতেছিলেন–) হে আমাদের প্রভু! আমাদের পক্ষ হইতে এই সামান্য প্রচেষ্টা ও আমল কবুল করুন, নিশ্চয় আপনি সব কিছু শুনেন সব কিছু জানেন। (আমাদের দোয়া শুনিতেছেন এবং আমাদের অকপটতা ও আন্তরিকতা জ্ঞাত আছেন।) হে আমাদের প্রভু! আরও আমাদের দরখাস্ত যে, আপনি আমাদের উভয়কে আপনার প্রতি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণকারী, আপনার সন্তুষ্টির জন্য সর্বস্ব বিলীনকারী বানাইয়া রাখুন এবং আমাদের উভয়ের বংশধরের মধ্য হইতে এইরূপ একটি

* যেই পাথরটির উপর ইব্রাহীম (আঃ) দাঁড়াইয়া নির্মাণ কার্য করিতেছিলেন ঐ পাথর কা'বা শরীফের সন্নিকটে সুরক্ষিত আছে; তাহার উপর হযরত ইব্রাহীমের পদ-চিহ্নের রেখাপাতও রহিয়াছে। ঐ পাথরকেই মাকামে ইব্রাহীমে বলা হয়– যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে।

* হাদীছটি ৪৭৪ ও ৪৭৬ পৃঃ দুই স্থানে বর্ণিত হইয়াছে; উভয়ের সমষ্টির অনুবাদ হইয়াছে।

দল সৃষ্টি করুন যাহারা ঐরূপ আত্মসমর্পণকারী ও সর্বস্ব বিলীনকারী হয় এবং আমাদিগকে (এই কা'বা গৃহের) হজ্জের সমুদয় নিয়মাবলী শিক্ষা দিন এবং আমাদের প্রতি নেক দৃষ্টি রাখুন; একমাত্র আপনিই নেক দৃষ্টিবান দয়ালু! হে আমাদের প্রভু! আমাদের উভয়ের বংশধর হইতে যে বিশেষ দলটি দাড় করিবেন তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে রসূলরূপে মনোনীত করিবেন যিনি তাহাদিগকে আপনার কালাম পড়িয়া শুনাইবেন এবং আপনার কিতাব (কালাম) ও হেকমত (আপনার প্রদত্ত শরীয়ত) শিক্ষা দিবেন এবং তাহাদিগকে বাহ্যিক ও আত্মিক কদর্যতা হইতে পাক-পবিত্র করিবেন; নিশ্চয় আপনি সর্বাধিক ক্ষমতাশালী সুকৌশলী।

(পারা- ১; রুকু- ১৫)

১৬৩৬। হাদীছ ঃ আবু যর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! ভূপৃষ্ঠে সর্বপ্রথম কোন মসজিদের ভিত্তি রাখা হইয়াছে? হযরত (সঃ) বলিলেন, হেরেম শরীফের মসজিদ (কা'বা শরীফ ও উহাকে কেন্দ্র করিয়া যে মসজিদ আছে)। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, অতঃপর কোন মসজিদ? হযরত (সঃ) বলিলেন; মসজিদে আক্‌সা (বায়তুল মোকাদ্দাসের মসজিদ)। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, উক্ত মসজিদদ্বয় নির্মিত হওয়ার মধ্যে কত সময়ের ব্যবধান ছিল? হযরত (সঃ) বলিলেন, চল্লিশ বৎসর।* (পূর্বের উম্মতে নামাযের জন্য মসজিদ শর্ত ছিল; ঐ সম্পর্কে-)

হযরত (সঃ) ইহাও বলিলেন, তোমাদের জন্য বিধান এই যে, যে স্থানেই নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হয় সেই স্থানেই নামায আদায় করিবে, মসজিদ বা অন্য যে কোন স্থানে নামায আদায় করিলে নামাযের সওয়াব লাভ হইবে।

ইহা শুধু নামায শুদ্ধ হওয়ার মাসআলা। নতুবা মসজিদে জামাতে নামায পড়ার বেশি সওয়াব এবং গুরুত্ব ও চাপ আমাদের শরীয়তেও রহিয়াছে।

হযরত ইব্রাহীমের দ্বিতীয় পুত্র ইসহাক

ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের ৭০ বৎসর বয়সে প্রথম পুত্র ইসমাঈল (আঃ) ছোট বিবি হাজেরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গর্ভে জন্ম লাভ করেন। (ফতহুল বারী ৬-৩১৩) অতপর হযরত ইব্রাহীম ১২০ বৎসর বয়সে বড় বিবি ছারাহ্ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার পক্ষে সন্তান লাভের সুসংবাদ লাভ করেন, তখন বিবি ছারার বয়স ছিল ৯০ বা ৯৯ (তফসীর মাওয়াহেবে রহমান ১২-৫৯)। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ আছে। যথা-

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرَاهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا ـ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ ـ فَلَمَّا رَاٰ اَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ ـ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ـ قَالُوْا لاَتَخَفْ اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ ـ

একদা আমার প্রেরিত কতিপয় ফেরেশতা ইব্রাহীমের নিকট একটি সুসংবাদ লইয়া পৌঁছিলেন। তাঁহারা ইব্রাহীমকে সালাম করিলেন। ইব্রাহীমও উত্তরে সালাম করিলেন এবং (তাঁহাদিগকে সাধারণ মেহমান ভাবিয়া) অবিলম্বে কাবাব করা গো-শাবক উপস্থিত করিলেন। কিন্তু যখন ইব্রাহীম দেখিলেন, তাঁহাদের হাত খাদ্যের প্রতি অগ্রসর হইতেছে না, তখন তিনি তাঁহাদিগকে স্বীয় ধারণা বহির্ভূত ভাবিলেন এবং তাহাদের দরুন ভয় অনুভব করিলেন। আগন্তুকগণ বলিলেন, ভয় পাইবেন না; আমরা (ফেরেশতা। আল্লাহ তাআলা কর্তৃক)

---

* ইব্রাহীম (আঃ) মক্কাস্থ হেরেম শরীফের মসজিদ তথা উহার মূল কেন্দ্র কা'বা শরীফের পুনঃ নির্মাণ করিয়াছিলেন, আর সোলায়মান (আঃ) মসজিদে আকসার পুনঃ নির্মাণ করিয়াছিলেন। উভয়ের ব্যবধান হাজার বৎসরের অধিক ছিল। কিন্তু উক্ত মসজিদদ্বয়ের মূল নির্মাতা হযরত আদম (আঃ)- তাঁহার নির্মাণে উভয়ের মধ্যে চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান ছিল।

প্রেরিত হইয়াছি লুতের বস্তিবাসীদের প্রতি (তাহাদিগকে ধ্বংস করার জন্য। পথিমধ্যে আপনাকে পুত্রের সুসংবাদ দানে আসিয়াছে।)

وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ـ

ইব্রাহীমের স্ত্রী "ছারাহ্" নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, (পুত্র হওয়ার খবরে) হাসিয়া উঠিলেন। তখন (ঐ ফেরেশতাদের মাধ্যমেই) আমি বিবি ছারাহ্‌কে ইসহাক এবং ইসহাকের ঔরসে ইয়াকুবের জন্ম সম্পর্কে সুসংবাদ দিলাম।

قَالَتْ يٰوَيْلَتٰى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا ـ اِنَّ هٰذَا لَشَئٌ عَجِيْبٌ ـ

বিবি ছারাহ্ বলিলেন, কি বিপদ– আমার সন্তান হইবে! অথচ আমি বৃদ্ধা আর এই ত আমার স্বামীও বৃদ্ধ; ইহা একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার।

قَالُوْٓا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ـ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

ফেরেশতাগণ বলিলেন, আল্লাহর কাজে আপনি তাজ্জব বোধ করিতেছেন? হে নবীর পরিবার! আপনাদের প্রতি ত আল্লাহর বিশেষ রহমত ও বরকত পূর্ব হইতেই আছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রশংসাভাজন মহিমান্বিত। (সূরা হুদঃ পারা– ১২;রুকু– ৭)

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ ـ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ـ قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ ـ

হে মুহম্মদ (সঃ)! আপনি তাহাদিগকে ইব্রাহীমের অতিথিগণের ঘটনা জ্ঞাত করুন। যখন অতিথিগণ ইব্রাহীমের নিকট উপস্থিত হইল এবং সালাম করিল। ইব্রাহীম (আগন্তুকদের খাদ্য স্পর্শ না করায়) বলিলেন, আমরা তোমাদের দরুন ভয় অনুভব করিতেছি।

قَالُوْا لَاتَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ـ

আগন্তুকগণ বলিলেন, ভয় পাইবেন না, আমরা আপনাকে এক বিজ্ঞ পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দান করিতেছি।

قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِىْ عَلٰى اَنْ مَسَّنِىَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ ـ

ইব্রাহীম বলিলেন, তোমরা আমাকে এই সুসংবাদ শুনাইতেছ আমার বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও– তোমরা আমাকে কি রকম সুসংবাদ দিতেছ?

قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقَانِطِيْنَ ـ قَالَ وَمَنْ يَّقْنُطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ ـ

ফেরেশতাগণ বলিলেন, আমরা বাস্তব বিষয়ের সুসংবাদই আপনাকে দিয়াছি; আপনি নিরাশ হইবেন না। ইব্রাহীম (আঃ) উত্তর করিলেন, উদভ্রান্ত লোক ব্যতীত নিজ পরওয়ারদেগারের রহমত হইতে কি কেহ নিরাশ হইতে পারে? (সূরা হেজ্‌রঃ পারা– ১৪; রুকু– ৪)

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ـ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ـ قَالَ سَلٰمٌ ـ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ـ

ইব্রাহীমের সম্ভ্রান্ত অতিথিগণের ঘটনার বিবরণ জ্ঞাত আছেন কি? যখন তাঁহারা ইব্রাহীমের নিকট উপস্থিত হইলেন ও সালাম করিলেন; তখন তিনিও সালাম করিলেন এবং বলিলেন, আপনাদেরকে চিনিতে পারিলাম না।

فَرَاغَ اِلٰى اَهْلِه فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ ـ فَقَرَّبَه اِلَيْهِمْ قَالَ اَلاَ تَاكُلُوْنَ ـ

অতঃপর ইব্রাহীম নিজ পরিজনের নিকট গেলেন এবং অবিলম্বে একটি মোটা তাজা গোবৎস কাবাব আনিয়া অতিথিদের সম্মুখে রাখিলেন। (তাঁহারা হাত অগ্রসর করেন না দেখিয়া) তিনি বলিলেন, আপনারা খাইতেছেন না কেন?

فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ـ قَالُوْا لاَتَخَفْ ـ وَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ـ

ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহাদের এই অবস্থা দৃষ্টে ভীত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, ভয় পাইবেন না। তাঁহারা তাঁহাকে সুবিজ্ঞ পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলেন।

فَاَقْبَلَتْ امْرَاَتُه فِىْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ ـ قَالُوْا كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكِ اِنَّه هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ـ

তাঁহার স্ত্রী উল্লাস-ধ্বনি করিতে করিতে সম্মুখে আসিলেন এবং কপাল চাপড়াইয়া বলিলেন, (আমি ত) বাঁঝা বৃদ্ধা (সন্তান হইবে কিরূপে)? তাঁহারা বলিলেন (এই অবস্থায়ই সন্তান হইবে;) এইরূপই তোমার পরওয়ারদেগার বলিয়াছেন; নিশ্চয় তিনি সুকৌশলী সর্বজ্ঞ। (পারা-২৬; শেষ রুকু)

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের আরও কতিপয় বিশেষ ইতিহাস পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে। যথা-

পুনর্জীবিত করার দৃশ্য স্বচক্ষে অবলোকন

এ সম্পর্কে কোরআনের বিবরণ এই-

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى ......

অর্থঃ একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা- ইব্রাহীম (আঃ) আবদার করিলেন, প্রভু! আমাকে স্বচক্ষে দেখাইয়া দিন, কিরূপে মৃতকে পুনর্জীবিত করিবেন।* আল্লাহ তাআলা প্রশ্ন করিলেন, এ সম্পর্কে আপনার বিশ্বাস নাই কি?

* হযরত ইব্রাহীমের জিজ্ঞাসার তাৎপর্য সুস্পষ্ট- তাঁহার জিজ্ঞাসা ছিল পুনর্জীবিত করার আকার নিরূপণ সম্পর্কে- যেন চোখের সামনে তাহা পরিদৃষ্ট হয়।

পুনর্জীবিত করার নির্দিষ্ট আকার মনে উপস্থিত করিয়া উহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নহে। আল্লাহ মৃতকে জীবিত করিবেন- শুধু এই বিশ্বাসই ঈমানের অন্তর্ভুক্ত; কি আকারে জীবিত করিবেন তাহা অতিরিক্ত বিষয়; তাহা জানিবার জন্য আল্লাহ তাআলা মানবকে আদেশ করেন নাই। হযরত ইব্রাহীমের মনে উক্ত রূপ আকারের দৃশ্য অবলোকনের কৌতুক জন্মিয়াছিল নমরূদের সঙ্গে বিতর্কের ঘটনা হইতে- যাহার বিবরণ সম্মুখে আসিতেছে।

আল্লাহ তাআলা কর্তৃক মৃতকে পুনর্জীবিত করার মূল বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ছিল না; তাহার প্রতি অটুট বিশ্বাস মূল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত, যাহা প্রত্যেক মোমেনের মধ্যে অকাট্যরূপে বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য। ইব্রাহীম (আঃ) পয়গম্বর ছিলেন; তাঁহার ত ঐ বিশ্বাস পূর্ব হইতে অসাধারণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। সুতরাং ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, হযরত ইব্রাহীমের জিজ্ঞাসা ঈমান পর্যায়ের বিষয় সম্পর্কে ছিল না এবং তাহা হইতে পারে না। অতএব হযরত ইব্রাহীমের জিজ্ঞাসার উপর তাঁহাকে তাঁহার ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন করা অপ্রাসঙ্গিকই গণ্য হইবে। তবুও আল্লাহ তাআলা এ স্থলে ইব্রাহীম (আঃ)-কে সেই প্রশ্ন করিয়াছেন এই উদ্দেশে যে, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যেন প্রকৃত বিষয় সুস্পষ্টরূপে উদ্ভাসিত হইয়া যায়, যাহাতে সাধারণ শ্রোতাদের ভুল বুঝে পতিত হওয়ার এবং হযরত ইব্রাহীমের প্রতি ভ্রান্ত ধারণা ও অছওয়াছা সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ না থাকে।

ইব্রাহীম বলিলেন, বিশ্বাস ত অবশ্যই পূর্ণ মাত্রায় আছে, তবে তাহার বাস্তবায়ন কি আকারে হইবে তাহা চাক্ষুষ দেখিয়া ঐ আকার সম্পর্কে (মানবসুলভ নানাবিধ কল্পনার অবসানপূর্বক) মন স্থির করিয়া লইতে চাই। আল্লাহ তাআলা বলিলেন, আচ্ছা– তবে আপনি চারটি পাখি সংগ্রহ করুন এবং পালিয়া-পুষিয়া ইহাদের সহিত ভালরূপে পরিচিত হউন। অতপর (এই পাখীগুলিকে জবাই করতঃ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া) এক একটার এক এক অংশ এক এক পাহাড়ে রাখিয়া আসুন। তারপর (পোষা পাখীকে ডাকার ন্যায়) ঐ পাখীগুলিকে ডাকুন; দেখিবেন, আপনার চোখের সামনে প্রত্যেকটি (পাখীর বিভিন্ন অংশ একত্রিত হইয়া পুনর্জীবনলাভে) আপনার নিকট দৌড়িয়া আসিবে। (দেখার পূর্বে ভাবিতে না পারিলেও) বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, আল্লাহ তাআলা সর্বশক্তিমান সুকৌশলী। (পারা– ৩; রুকু– ৩)

পাঠকবর্গ! উল্লিখিত আয়াতের যে তফসীর করা হইল তাহার বিস্তারিত বিবরণ পূর্ববর্তী বিখ্যাত সমস্ত তফসীরের কিতাবেই উল্লেখ আছে। এ স্থানে প্রসিদ্ধ "তফসীর ইবনে কাসীর" হইতে বিবরণ পেশ করা হইতেছে–

فذكروا انه عمد الى اربعة من الطير فذبحهن ثم قطعهن ونتف ريشهن ومزقهن وخلط بعضهن ببعض - ثم جزاهن اجزاء وجعل على كل جبل منهن جزءا قيل اربعة اجبل وقيل سبعة - قال ابن عباس واخذ رؤسهن بيده ثم امره الله عزوجل - ان يدعوهن فدعاهن كما امره الله عزوجل فجعل ينظر الى الريش يطير الى الريش والدم الى الدم واللحم الى اللحم والاجزاء من كل طائر يتصل بعضها الى بعض حتى قام كل طائر على حدته واتينه يمشين سعيا ليكون ابلغ له فى الروية التى سالها وجعل كل طائر يجئ لياخذ راسه الذى فى يد ابراهيم عليه السلام - فاذا قدم له غير راسه ياباه فاذا قدم اليه راسه تركب مع بقية جسده ......

অর্থঃ (ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন–) উল্লিখিত ঘটনার বিবরণে পূর্ববর্তী তফসীরকারগণ বর্ণনা করিয়াছেন, ইব্রাহীম (আঃ) ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর চারিটি পাখী গ্রহণ করিলেন, ঐগুলিকে জবাই করিলেন, তারপর টুকরা টুকরা করিলেন এবং পালকও উপড়াইয়া ফেলিলেন। সবগুলিকে ছিন্নভিন্ন করিয়া একত্র মিলাইয়া ফেলিলেন, অতঃপর কয়েক ভাগে বিভক্ত করিলেন এবং এক এক ভাগ এক পাহাড়ে রাখিয়া আসিলেন। কাহারও মতে চারি ভাগ করিয়া কাহারও মতে সাত (বা দশ) ভাগ করিয়া প্রতি ভাগ এক এক পাহাড়ে রাখিয়াছিলেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, পাখীগুলির মাথা ইব্রাহীম (আঃ) নিজ হস্তে রাখিয়াছিলেন। অতঃপর মহামহিম আল্লাহ তাঁহাকে ঐ পাখীগুলিকে ডাকিতে বলিলেন। ইব্রাহীম (আঃ) ঐগুলিকে ডাকিলেন। তখন ইব্রাহীম (আঃ) প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন যে, প্রতিটি পাখীর পালক উড়িয়া আসিয়া একটা অপরটার সহিত মিলিত হইতেছে, রক্তের কণাগুলিও একটা অপরটার সঙ্গে মিলিত হইতেছে, গোশতের এক একটা অংশ অপরটার সঙ্গে মিলিত হইতেছে– এইরূপে প্রত্যেকটি পাখীর অংশ পরস্পর মিলিত হইল, এমনকি প্রত্যেকটি পাখী ভিন্ন ভিন্নভাবে নিজ নিজ পায়ে দাঁড়াইয়া ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের দিকে আসিতে লাগিল– আল্লাহ তাআলা এরূপ ব্যবস্থা এই জন্য করিলেন যেন ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় কাঙ্খিত দৃশ্য ভালরূপে দেখিতে পারেন।

অতপর প্রত্যেকটি পাখী হযরত ইব্রাহীমের হস্তে রক্ষিত মাথার সঙ্গে মিলনের জন্য আগাইয়া আসিল। ইব্রাহীম (আঃ) একটার সম্মুখে অপরটার মাথা পেশ করিলে মিলিত হইল না; উহার নিজ মাথা সম্মুখে ধরিলে বিনা দ্বিধায় মিলিত হইয়া গেল। এই সব ব্যাপার আল্লাহর মহাশক্তি ও মহাকুদরতে হইয়াছিল। তাই আল্লাহ বলিলেন, واعلم ان الله عزيز حكيم জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সর্বক্ষমতার

অধিকারী সুকৌশলী। অর্থাৎ তিনি সর্বশক্তিমান, কোন বিষয়ই তাঁহার ক্ষমতাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না এবং তাঁহার সম্মুখে কোন বিষয়ই অসম্ভব থাকে না। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন বিনা বাধায় তাহা সম্পন্ন হয়। কেননা, তিনি সকলের উপর ক্ষমতার অধিকারী, তিনি হেকমতওয়ালা, বিজ্ঞ, তাঁহার হেকমত ও বিজ্ঞতা প্রকাশ পাইতেছে তাঁহার বাণীসমূহে, তাঁহার কার্যাবলীতে, তাঁহার প্রবর্তিত শরীয়তে এবং তাঁহার নির্ধারিত ব্যবস্থাপনায়। (ইবনে কাসীর– ১ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ৩১৫)।*

সুধী পাঠক! আল্লাহর জন্য সর্বস্ব কোরবানকারী, বহু পরীক্ষায় পরীক্ষিত এবং আল্লাহর তরফ হইতে সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণের সনদপ্রাপ্ত আল্লাহর খলীল বা বিশেষ প্রিয় পাত্র।

ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ তাআলার প্রতি এবং তাঁহার অসীম কুদরতের প্রতি যে কিরূপ অগাধ ও দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিলেন তাহা ব্যক্ত করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা অনাবশ্যক। অবশ্য বৈচিত্র্যময় ব্যাপারে দৃশ্য অবলোকন করার কৌতুক ও স্পৃহা জন্মা– বিশেষতঃ কোন রকম প্রয়োজনের সূত্র বিদ্যমান থাকাবস্থায় অতি স্বাভাবিক সাধারণ ব্যাপার। ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) আল্লাহ তাআলার দরবারে সেই শ্রেণীর কৌতুক ও স্পৃহা নিবারণের আবদারই করিয়াছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁহার মাধ্যমেই স্বীয় কুদরতের লীলা প্রকাশ্যরূপে দেখাইয়া আবদার পূরণ করিয়াছিলেন এবং সেই ঘটনা আমাদের সম্মুখে বর্ণনা করিয়া আমাদেরও বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

আখেরাত তথা পরজীবনের সমুদয় বৃত্তান্ত– যাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের ও ইসলামের বিশেষ অঙ্গ, যাহাকে اليوم الاخر। আখেরাতের কাল বা জীবন" বলা হয়; সেই পরজীবনের উপর ঈমানের মূলই মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। ইহাকেই البعث بعد الموت মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়া" নামে ব্যক্ত করা হয়– যাহার প্রতি বিশ্বাসও ঈমানের একটি বিশেষ অঙ্গ বলিয়া অনেক হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। এই বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করা হইয়াছে। কারণ–

এই পুনর্জীবন লাভের গোটা বিষয়টার প্রতিই অনেকে সন্দেহ বরং অস্বীকারের ভাব পোষণ করে এই অজুহাতে যে, একটা মানুষ পচিয়া-গলিয়া কিম্বা ভস্ম হইয়া বা বিভিন্ন পশু-পক্ষীর ভক্ষিত হইয়া ইত্যাদি আকারে ছিন্ন-ভিন্ন হওয়ার পর এবং অংশসমূহ ধূলা কণারূপে বাতাসে উড়িয়া হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মাইলের ব্যবধানে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর উহাকে জীবিত করা সম্ভব হইবে কিরূপে?

---

* বহু সমালোচিত পণ্ডিত আক্রম খাঁ মরহুম স্বীয় তথাকথিত তফসীরুল-কোরআনে এই ঘটনাটিকেও বিকৃত রূপ দান করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্যের সার হইল এই যে, চারিটি পাখীকে ইব্রাহীম (আঃ) পালিয়া নিজের আয়ত্তে করার পর ঐগুলিকে জীবিতাবস্থায় বিভিন্ন পাহাড়ে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, অতঃপর ডাক দিলে ঐগুলি উড়িয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল।

পণ্ডিত সাহেব এই প্রলাপ সম্পর্কে বিশেষ কিছু না বলিয়া পবিত্র কোরআন শরীফের বিবৃতি হইতে একটি বিশেষ শব্দের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন– ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا এই বাক্যে আল্লাহ তাআলা جزءا জুয্‌আন" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যাহার অর্থ টুকরা বা অংশ। অতএব এই শব্দটি আমাদের পক্ষে বিরোধমান বক্তব্যের স্পষ্ট প্রমাণ; পণ্ডিত সাহেব এই শব্দটি তরজমায় বাদ রাখিয়াছেন– অনুবাদই করেন নাই।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে, পূর্বাপর তফসীরকারগণ ঘটনার বিবরণে উল্লিখিত যে বিবরণ দান করিয়াছেন, পণ্ডিত সাহেব সেই বিবরণকে বাজে ও কল্পিত কাহিনী নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন এবং উহার সমর্থনে "ইবনে কাসীর" নামক প্রসিদ্ধ তফসীরের নাম ভাঙ্গাইয়াছেন। পণ্ডিত সাহেবের এই রেফারেন্স কতদূর সত্য তাহা খোদা তাআলা জানেন। তফসীরে ইবনে-কাসীরে আমরা ঘটনার বিবরণ যাহা পাইয়াছি তাহা পূর্বাপর তফসীরকারগণের বিবৃতিরই অবিকল রূপ। তফসীরে ইবনে কাসীরে এই বিবরণ সমর্থনীয়রূপেই উল্লেখ আছে, অন্য কোন রূপে নহে। আমরা যে ইবনে-কাসীরে উদ্ধৃতি প্রকাশ করিয়াছি; তাহার পূর্ণ বিবরণ উল্লেখ করিয়া দিয়াছি, যে কেহ অনুসন্ধান করিতে পারেন। পণ্ডিত সাহেব কোন ইবনে-কাসীর দেখিয়াছেন তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই, তাই অনুসন্ধান সম্ভব হইল না।

পণ্ডিত সাহেব শ্রেণীর লোকদের একটি বাতিক রোগ আছে যে, কোরআন হাদীছে বর্ণিত কোন অলৌকিক ঘটনাকে তাহারা অলৌকিক ও অসাধারণ রূপে গ্রহণ করিতে চান না, এই নীতি অনুসারেই পণ্ডিত সাহেব পবিত্র কোরআনে নবীগণের "মোজেযা" স্বরূপ যত ঘটনার উল্লেখ আছে সবগুলিকেই বিকৃত রূপ দান করিয়া পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ঘটনায় ত দেখা যায়, পণ্ডিত সাহেব আল্লাহর কুদরত সম্পর্কেও তদ্রূপ ঈমানই পোষণ করেন– সেখানেও তিনি কোন অলৌকিক অসাধারণ বিষয়কে স্থান দিতে রাজি নহেন। নাউযু বিল্লাহি মিন যালিকা– এইরূপ ধারণা হইতে আমরা আল্লাহ তাআলার আশ্রয় চাই।

ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের চাক্ষুষ দৃষ্ট ঘটনা ঐ ধরনের সমুদয় প্রশ্নকে অহেতুক প্রতিপন্ন করিয়াছে। আল্লাহর কালাম কোরআনে উক্ত ঘটনার উল্লেখে এই বিষয়টিও অন্যতম বিশেষ উদ্দেশ্য। আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরতের এই শ্রেণীর নমুনারূপে এই ঘটনা সংলগ্ন ওযায়ের আলাইহিস সালামেরও একটি ঘটনা পবিত্র কোরআনে আছে। এতদ্ভিন্ন এক ব্যক্তির শবদেহ আগুনে পুড়িয়া ছাই-ভস্মকে পিষিয়া ধূলিবৎ করতঃ পানিতে ও বাতাসে বিলীন করিয়া দেওয়ার পর তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তাআলা কর্তৃক পুনর্জীবিত করার ঘটনা হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে (৭ম খণ্ড; ২৪৫০ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)। এইসব ঘটনা জ্ঞাত হইয়া আখেরাত ও পুনর্জীবনের ঈমানকে দৃঢ় করা চাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ইব্রাহীম (আঃ) পুনর্জীবিত করার দৃশ্য নিজ চোখে দেখিবার আবদার কেন করিয়াছিলেন সে সম্পর্কে তফসীরকারগণ লিখিয়াছেন যে, ইতিপূর্বে বাবেল সিংহাসনের অধিপতি খোদায়ী দাবীদার নমরূদের সঙ্গে হযরত ইব্রাহীমের বিতর্ক বাহাছ হইয়াছিল। সেখানে মৃতকে পুনঃজীবিত করা সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছিল– যাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে।

নমরূদের সঙ্গে হযরত ইব্রাহীমের বাহাছ ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى اَلَّذِىْ حَاجَّ اِبْرَاهِيْمَ فِىْ رَبِّهٖ اَنْ اٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ ـ اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّىَ اَلَّذِىْ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ ـ قَالَ اَنَا اُحْيٖ وَاُمِيْتُ ـ

ঐ লোকটির অবস্থা লক্ষ্য করিয়াছ কি? যে ইব্রাহীমের সহিত হুজ্জতি করিয়াছিল তাঁহার পরওয়ারদেগার সম্পর্কে– এই শক্তিতে মত্ত হইয়া যে, পরওয়ারদেগার আল্লাহ তাহাকে রাজত্ব দিয়াছিলেন। যখন ইব্রাহীম বলিলেন, আমার প্রভু পরওয়ারদেগার (এত বড় শক্তিমান যে,) তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটাইয়া থাকেন। তদুত্তরে সে বলিল, আমিও জীবিত করিয়া থাকি ও মারিয়া থাকি।

ঐ উক্তির পর নমরুদ তাহার কারাগার হইতে দুই জন কয়েদীকে আনিয়া একজনকে হত্যা করিল অপর জনকে ছাড়িয়া দিল– জীবিত করার এবং মারিয়া ফেলার এই নমুনা সে দেখাইল। কিরূপ বুদ্ধিহীনতা! احياء অর্থ জীবন দান করা; পক্ষান্তরে তাহার কাজটা হইল জীবিত মানুষটাকে বন্ধন হইতে ছাড়িয়া দেওয়া; ঐ নাদান উভয়কে এক পর্যায়ের গণ্য করিল। তদ্রূপ اماتة অর্থ মৃত্যু ঘটানো; আর তাহার কার্যটা হইল শুধু আঘাত করা– ইহাকে মৃত্যু ঘটানো বলা হইলে শৃগাল-কুকুরকেও সেই মর্যাদা দিতে হইবে। কারণ, উহাদের আঘাতেও মানুষের মৃত্যু ঘটে। তাহার মগজ পচা বুদ্ধি দেখিয়া ইব্রাহীম (আঃ) অন্য একটি প্রমাণ পেশ করিলেন–

قَالَ اِبْرَاهِيْمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ اَلَّذِىْ كَفَرْ وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, আল্লাহ যিনি তিনি ত সূর্যকে পূর্বদিক হইতে উদিত করেন; তুমি (যদি আল্লাহ হইয়া থাক তবে) সূর্যকে পশ্চিম দিক হইতে উদিত কর। ঐ কাফের এইবার হতভম্ব হইয়া রহিল। বস্তুতঃ আল্লাহ তাআলা স্বৈরাচারীদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (পারা–৩; রুকু–৩)

এই ঘটনায় احياء এহ্ইয়া– পুনঃজীবনদান যাহা একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ সিফত গুণ বা পরিচয়। উক্ত সিফত সম্পর্কে ইব্রাহীম (আঃ) বিভ্রান্তিকর অর্থ ও তাৎপর্যের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তাই তিনি ইচ্ছা করিলেন যে, احياء এহ্ইয়া– পুনঃজীবন দানের বাস্তব অর্থ ও তাৎপর্য, যে অর্থে তাহা আল্লাহ তাআলার বিশেষ সিফত সে অথ তাৎপর্যের বাস্তবরূপ কি তাহা তিনি নিজ চক্ষে প্রকাশ্য

দিবালোকে দেখিয়া সে সম্পর্কে পূর্ণ ও বিস্তারিত অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন; যেন আগামীতে এইরূপ বিভ্রান্তিকর অর্থ ও তাৎপর্যের সম্মুখীন হইলে তখন তিনি চাক্ষুষ দৃষ্ট তাৎপর্যের বিস্তারিত বিবরণের দ্বারা তাহার খণ্ডন করিতে বিশেষভাবে সমর্থ হন; شنیده کئے بود مانند دیده শ্রুত তাৎপর্য কি দৃষ্ট তাৎপর্যের সমান হইতে পারে?

মূল আলোচ্য ঘটনা তথা পুনঃ জীবন দানের দৃশ্য দেখাইবার প্রশ্নের দরুন ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে যে, ইব্রাহীম (আঃ) কি এ সম্পর্কে পূর্ণ আস্থাশীল ছিলেন না? হযরত ইব্রাহীমের পক্ষে এরূপ ধারণার কোন অবকাশই যে ছিল না তাহা সর্বজ্ঞ আল্লাহ তাআলা পূর্ব হইতেই জ্ঞাত। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা সেই করিলেন اولم تؤمن আপনি কি এ সম্পর্কে পূর্ণ আস্থাশীল নহেন? হযরত ইব্রাহীমের নিকট এই প্রশ্নের উত্তর কি তাহাও আল্লাহ তাআলা জ্ঞাত; তবুও প্রশ্ন করিলেন এই উদ্দেশে যে, তিনি যে উত্তর দিবেন সে উত্তর দ্বারা যেন চিরতরে সাধারণ শ্রোতাদের পক্ষে ঐ ভুল ধারণার অবসান হইয়া যায়।

এতদুদ্দেশে তথা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে ভুল ধারণা নিরসনের জন্য হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)ও একটি সাধারণ যুক্তি বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা এই

১৬৩৭। হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন– ইব্রাহীম (আঃ)-এর দরখাস্ত হে পরওয়ারদেগার! আমাকে প্রকাশ্যে দেখাইয়া দিন, "কিরূপে মৃতকে পুনর্জীবিত করিবেন। এই জিজ্ঞাসা দৃষ্টে যদি কেহ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে বলে যে, তিনি আল্লাহ তাআলা কর্তৃক পুনঃজীবন দান সম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারী ছিলেন তবে (তাহা ভিত্তিহীন প্রমাণিত করার জন্য) আমি বলিব, এইরূপ সন্দেহ পোষণ "ইব্রাহীম (আঃ) অপেক্ষা আমাদের জন্য অধিক উপযুক্ত ও অধিক নিকটবর্তী।

অতপর হযরত (সঃ) লূত পয়গাম্বরের (ঘটনা ও তাঁহার অসহায়তার করুণ কাহিনী স্মরণপূর্বক তাঁহার) প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, আল্লাহ রহম করুন (হযরত) লূতের প্রতি; তিনি (বাহ্যিক দিক দিয়া কিরূপ অসহায়তার মধ্যে আল্লাহর দ্বীন প্রচার করিয়া গিয়াছেন যে, শত্রুদের মোকাবিলায় স্বীয় গোষ্ঠীর লোকদের দ্বারা যে সাধারণ সহায়তাটুকু লাভ হইতে পারে, তাহা হইতেও তিনি বঞ্চিত ছিলেন। তিনি নিজের দেশ হইতে দূর এলাকায় প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাই এক সময়) আক্ষেপে বলিয়াছেন, অন্ততঃ আমার গোষ্ঠীর লোকজনের মজবুত দল থাকিলে হয়ত তাহাদের বাহ্যিক সহায়তা লাভ হইত।

অতপর হযরত (সঃ) ইউসুফ পয়গম্বরের ঘটনা স্মরণ করতঃ তাঁহার দৃঢ় মনোবল ও ধৈর্যের প্রশংসায় বলিলেন, (বোধহয়) আমি যদি এত দীর্ঘ দিন কারাগারে কাটাইবার পর বাদশার তরফ হইতে মুক্তির আহ্বান পাইতাম তবে তৎক্ষণাৎ আহ্বানকারীর কথায় সাড়া দিয়া বসিতাম। (ইউসুফ (আঃ) কত দৃঢ় মনোবলের অধিকারী ছিলেন যে, দশ বৎসর কারাগারে কাটাইবার পর বাদশার আহ্বান সত্ত্বেও তিনি সেই আহ্বানে সাড়া দিলেন না। পরিষ্কার বলিয়া দিলেন, আমার উপর যে অপবাদ দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাইয়া ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত আমি কারাগার ত্যাগ করিব না)।

ব্যাখ্যা ঃ ইব্রাহীম (আঃ) সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ (সঃ) যাহা বলিয়াছেন তাহা একটি বাস্তব ও যুক্তিযুক্ত কথা। ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন তওহীদ বা একত্ববাদের প্রতীক; তিনি আল্লাহর জন্য সর্বস্ব কোরবান করার ব্যাপারে কঠিন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়া প্রত্যেকটিতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, যদ্দরুন তাঁহাকে আল্লাহ তাআলা সকলের উপর নেতৃত্বদান করিয়াছিলেন এবং পরবর্তী সকল পয়গম্বরকে তাঁহারই আদর্শবাদী হওয়ার আদেশ ছিল, এমনকি নবীগণের সর্দার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-ও ঐরূপ আদিষ্ট ছিলেন–اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا "আমি অহী মারফত আপনার প্রতি আদেশ পাঠাইয়াছি যে, আপনি ইব্রাহীমের আদর্শে আদর্শবান হউন– যিনি একমাত্র আল্লাহর প্রতি নিজকে সোপর্দ করিয়াছিলেন। (পারা– ১৪; রুকু– ২২) তদুপরিত হযরত ইব্রাহীমের আদর্শের উপর থাকিবার জন্য উম্মতে-মুহাম্মদীকেও আদেশ করা হইয়াছে–

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْ نَصٰرى تَهْتَدُوا ـ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا ـ

"হে মুহাম্মদের উম্মত! ইহুদী-নাসারারা বলে, তোমরা ইহুদী-নাসারা হও, তাহা হইলে তোমরা হেদায়াত– সত্য-পথের পথিক সাব্যস্ত হইবে। (আল্লাহ বলেন,) তোমরা তাহাদেরকে বলিয়া দাও, আমরা ইব্রাহীমের আদর্শ অবলম্বন করিব; যিনি একমাত্র আল্লাহর প্রতি নিজকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন।"

(১ম পারা শেষ রুকু)

ইব্রাহীম (আঃ) যাঁহার আদর্শ এই শ্রেণীর– সেই ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে যদি ধারণা করা হয় যে, তিনি আল্লাহ তাআলা কর্তৃক পুনঃ জীবনদান সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন, তবে আমাদের (তথা তাঁহার আদর্শে আদর্শবাদী হওয়ার আদিষ্ট হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং উম্মতে মুহাম্মদী) সকলের সম্পর্কে এরূপ ধারণা তাঁহার তুলনায় অধিক উপযুক্ত ও সহজ হইবে না কি? অথচ মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এবং তাঁহার উম্মত সম্পর্কে এই ধারণা হইলে জগতে আর বাকী থাকিতে পারে কে, যাহার সম্পর্কে ঐ ধারণা না করা যায়? আর হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-সহ সকলের সম্পর্কে এই সন্দেহ পোষণের ধারণা অতি জঘন্য ধৃষ্টতা বৈ নহে। অতএব নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে ঐরূপ ধারণা জঘন্য ধৃষ্টতাই বটে।

লূত (আঃ) সম্পর্কে হযরত (সঃ) যাহা বলিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্য তাঁহার প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করা। তাঁহার ঘটনার বিবরণ সম্মুখে আসিতেছে।

ইউসুফ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে হযরত (সঃ) যাহা বলিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র তাঁহার দৃঢ় মনোবলের প্রশংসা করা। আলোচ্য হাদীছের মূল তাৎপর্য ইহাই; এস্থলে শব্দার্থের সূক্ষ্মার্থ বাহির করিতে যাইয়া মাথা ঘামান ঠিক হইবে না।

ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে কতিপয় বিশেষ ঘোষণা ঃ

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে বহু মর্যাদাপূর্ণ ঘোষণা উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নে এই ধরনের কতিপয় আয়াতের উদ্ধৃতি দেওয়া হইল–

وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرَاهِيْمَ .... قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ـ

" একটি স্বরণীয় ঘোষণা– ইব্রহীম (আঃ)-কে তাঁহার প্রভু কতিপয় বিষয়ে পরীক্ষা করিয়াছিলেন; তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; তখন তাঁহার প্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আমি আপনাকে বিশ্বের জন্য ইমাম (অনুসরণীয়) বানাইব– আপনার আদর্শকে সারা বিশ্বের জন্য আদর্শ করিব।" (পারা– ১ম পারা; রুকু– ১৫)

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ اِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَه ـ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰه فِى الدُّنْيَا ـ وَاِنَّه فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ـ

"ইব্রাহীমের দ্বীন ও আদর্শ হইতে একমাত্র সে-ই বিচ্যুত হইবে যে প্রকৃতই জ্ঞানশূন্য আহমক। আমি ইব্রাহীম (আঃ)-কে দুনিয়াতে বিশিষ্টরূপে নির্বাচিত করিয়াছি এবং আখেরাতে ত তিনি বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের মধ্যে একজন। (তিনি স্বীয় প্রভুর এতই অনুরক্ত ছিলেন যে,) যেকোন পরিস্থিতিতে তাঁহার প্রভু তাঁহাকে যেকোন বিষয়ে আনুগত্যের আহ্বান জানাইলে তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন যে, (দেলে, মুখে ও অষ্টাঙ্গে) আমি সারা জাহানের প্রভুর আনুগত্যে নিজকে বিলীন করিয়া দিয়াছি।" (পারা– ১ম; রকু– শেষ)।

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَه لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا ـ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً ـ

"ঐ ব্যক্তির ন্যায় উত্তম দ্বীন আর কাহারও হইতে পারে কি? যে নিজের লক্ষ্যকে একমাত্র আল্লাহ তাআলার প্রতি নিবদ্ধ করিয়া নিয়াছে পূর্ণ একনিষ্ঠতার সহিত এবং ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের আদর্শের অনুসারী হইয়াছে- যে আদর্শে বক্রতার নামও নাই; (যে আদর্শের বদৌলতে) আল্লাহ তাআলা ইব্রাহীম (আঃ)-কে স্বীয় "খলীল" বিশেষ বন্ধু বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।" (পারা-৫; রুকু-১৫)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اِبْرَاهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ـ

"আমি প্রথম হইতেই ইব্রাহীম (আঃ)-কে বিশুদ্ধ জ্ঞান দান করিয়াছিলাম এবং আমি তাঁহার (ব্যক্তিত্ব) সম্পর্কে পূর্ব হইতেই জ্ঞাত ছিলাম"। (পারা-১৭,রুকু-৫)

وَاذْكُرْ عِبٰدَنَا اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُوْلِى الْاَيْدِىْ وَالْاَبْصَارِ ...... وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ ـ

"স্মরণ কর আমার বিশিষ্ট বান্দা ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবকে। তাঁহারা ছিলেন জ্ঞান-বুদ্ধি ও কার্য দক্ষতায় শীর্ষস্থানীয়; (যাহার মূল কারণ ছিল আমি তাঁহাদিগকে এই বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিলাম যে, তাঁহারা সর্বদা পরকালের জীবনকে স্মরণে রাখিতেন এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই আমার বাছাই করা, মনোনীত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অন্যতম।" (পারা- ২৩; রুকু- ১৩)

اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ حَنِيْفًا ..... وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

"নিশ্চয় ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন অতি বড় আদর্শবান অনুসরণীয় মানুষ, আল্লার প্রতি পূর্ণ অনুগত, একনিষ্ঠ- তওহীদ বা একত্ববাদের বিপরীত কোন কিছুর লেশমাত্র তাঁহার মধ্যে ছিল না। তিনি ছিলেন আল্লাহর নেয়ামতসমূহের শোকরগুজার। আল্লাহ তাঁহাকে বাছাই করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে সরল সঠিক পথের পথিক বানাইয়াছিলেন। (আল্লাহ আরও বলেন) আমি দুনিয়াতে তাঁহাকে দিয়াছিলাম সকল প্রকার কল্যাণ; আর আখেরাতে ত তিনি নিশ্চিতরূপে সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গের অন্যতম হইবেন। তদুপরি অহী মারফৎ আপনাকে নির্দেশ দিয়াছি যে, আপনি ইব্রাহীমের আদর্শের উপর চলিবেন, যাঁহার মধ্যে চরম একনিষ্ঠতা ছিল এবং পূর্ণ তওহীদ একত্ববাদের বিপরীত কোন কিছুর লেশমাত্র তাঁহার মধ্যে ছিল না।"

(পারা- ১৪; রুকু- শেষ)

ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে মোশরেকদের কুসংস্কার

মক্কার মোশরেকরা দ্বীনে ইব্রাহীমের অনুসারী বলিয়া দাবী করিত। তাহাদের সেই দাবী ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত দাবী। মোশরেকদের আকীদা-বিশ্বাস ও কার্যকলাপ দ্বারা পবিত্র কোরআনের অনেক জায়গায়ই উক্ত দাবী অসামঞ্জস্য হওয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। নিম্নে বর্ণিত হাদীছে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) একটি সামান্য বিষয়ের মাধ্যমে সেই সামঞ্জস্যহীনতা প্রমাণ করিয়াছেন-

১৬৩৮। হাদীছ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (মক্কা বিজয়ের দিন) কা'বা শরীফে প্রবেশ করিয়া ইব্রাহীম (আঃ) ও মরিয়ম (আঃ)-এর চিত্র দেখিতে পাইলেন। তখন তিরস্কারের স্বরে হযরত (সঃ) বলিলেন, মক্কার লোকেরা ত এই কথা নিশ্চয় শুনিয়া থাকিবে যে, (রহমতের) ফেরেশতা ঐ ঘরে প্রবেশ করে না যেই ঘরে চিত্র থাকে।

চিত্রে হযরত ইব্রাহীমের হাতে তীর দেখান ছিল; সেই সম্পর্কে হযরত (সঃ) বলিলেন, তীর দ্বারা এসতেকসামের রীতির সঙ্গে ইব্রাহীমের কি সম্পর্ক ছিল?

ব্যাখ্যাঃ তীর দ্বারা দুইটি হারাম কাজ করার রীতি মোশরেকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। একটি ছিল জুয়ারূপে তীর দ্বারা ভাগ বন্টন–৭ বা ১০টি তীর হইত; উহার কোনটায় ৫ সের, কোনটায় ৮ সের, কোনটায় ১৫ সের ইত্যাদি বিভিন্ন পরিমাণের সংকেত চিহ্ন থাকিত এবং কোনটায় ফাঁকা বা শূন্যের চিহ্ন থাকিত। কতিপয় লোক সমান অংশে টাকা দিয়া একত্রে একটি উট ক্রয় করিয়া উহার গোশত ঐ তীর দ্বারা বন্টন করিত এইরূপে যে, আবৃত স্থান হইতে অংশীদার প্রত্যেকে এক একটি তীর বাহির করিবে; যাহার তীরে শূন্যের চিহ্ন থাকিবে সে ফাঁকা যাইবে, অথচ ঐ উটের মূল্যে প্রত্যেকেই সমপরিমাণ টাকা দিয়াছে।

দ্বিতীয়টি ছিল, কোন কার্যের শুভ-অশুভ নির্ণয়। পুরোহিতের নিকট কতিপয় তীর থাকিত; উহার কোনটিতে ভাল, কোনটিতে মন্দ এবং কোনটিতে ফাঁকার চিহ্ন থাকিত। কেহ কোন কাজ করিতে বা কোথাও যাত্রা করিতে পুরোহিতের দ্বারা ঐ তীর বাহির করিত; ফাঁকা চিহ্ন বাহির হইলে পুনরায় বাহির করিত, আর ভাল-মন্দের চিহ্নের দ্বারা উক্ত কার্য বা যাত্রার মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ধারিত করিত এবং তাহা অবধারিত অখণ্ডনীয় বলিয়া বিশ্বাস করিত।

এই উভয় কার্যকেই "এসতেক্সাম বিল-আয্‌লাম" বলা হয় এবং ইহা হারাম বলিয়া পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। (সূরা মায়েদা ১ম রুকু দ্রষ্টব্য)

মোশরেকরা চিত্রে ইব্রাহীমের হাতে এইরূপ একটি তীর দেখাইয়া বুঝাইতে চাহিয়াছে যে, তাহাদের প্রচলিত ঐ রীতি হযরত ইব্রাহীমের নীতি ও আদর্শ। হযরত (সঃ) এই ইঙ্গিতকেই ভিত্তিহীন মিথ্যা গর্হিত বলিয়াছেন। মোশরেকরা হযরত ইব্রাহীমের নামে এইরূপ বহু কুসংস্কার গড়িয়াছিল। উল্লিখিত হাদীছের অনুরূপ আরও একখানা হাদীছ দ্বিতীয় খণ্ডে ৮৩৭ নম্বরে অনূদিত হইয়াছে।

হযরত ইব্রাহীমের একটি বিশেষ ঝাড়-ফুঁকের দোয়া ঃ

১৬৩৯। হাদীছ ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পৌত্র হাসান এবং হোসাইনকে নিম্নে বর্ণিত দোয়াটি দ্বারা আল্লাহ তাআলার হেফাযতে সমর্পণ করিতেন এবং বলিতেন, তোমাদের বংশের আদি পিতা ইব্রাহীম (আঃ) এই দোয়াটি দ্বারা তাঁহার পুত্রদ্বয় ইসমাঈল ও ইসহাককে আল্লাহর হেফাযতে সমর্পণ করিতেন–

أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ -

"আল্লাহ তাআলার মঙ্গল, কল্যাণ ও বরকতপূর্ণ কালেমাসমূহের আশ্রয়ে দিলাম তোমাদের উভয়কে– সমস্ত শয়তান, ভূত-প্রেত হইতে এবং সাপ-বিচ্ছু, বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ হইতে এবং সকল প্রকার বদ নজর হইতে।"

হযরত লূত (আঃ) ইব্রাহীম আলাইহিস সালামেরই ভাইয়ের ছেলে– ভাতিজা ছিলেন, তাঁহার পিতার নাম "হারান্"। তিনি বাল্যকাল হইতে ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের সাহচর্যে চিলেন। প্রথমতঃ তিনি ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের আহ্বানে সাড়া দিয়া তাঁহার প্রচারিত সত্য ধর্ম গ্রহণ করেন এবং সেই সত্য ধর্ম প্রচারে হযরত ইব্রাহীমের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও হিজরত করতঃ মাতৃভূমি ইরাক ত্যাগ করিয়া মিসরে চলিয়া আসিয়াছিলেন এবং হযরত ইব্রাহীমের সঙ্গে একযোগে কাজ করিয়া যাইতেছিলেন। এমনকি তিনিও হযরত ইব্রাহীমের যুগেই নবুয়ত প্রাপ্ত হন।

* মেশকাত শরীফে বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের নামে আলোচ্য দোয়াটির মধ্যে এই শব্দই বিদ্যমান আছে। অর্থের দিক দিয়া এই শব্দটিই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। كما শব্দটি দ্বিবাচক। হাসান ও হোসাইন এবং ইসমাঈল ও ইসহাক – দুই দুই জন একত্রে উদ্দেশ্য হওয়ায় হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং ইব্রাহীম (আঃ) দ্বিবাচক শব্দ كما ই ব্যবহার করিয়াছিলেন। শুধু একটি বালকের উদ্দেশে দোয়া পড়া হইলে সে ক্ষেত্রে নিয়ম মতে اعيذك (কাফ জবর) এবং একটি বালিকার উদ্দেশে হইল- اعيذك (কাফ জের) পড়িলে উদ্দেশের সহিত শব্দের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে।

তাঁহারা উভয়েই মিসরে এক সঙ্গে কাজ করার পর মিসর হইতে দুইজন দুই এলাকায় চলিয়া যান। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মিসর হইতে সিরিয়ার ফিলিস্তিনে চলিয়া আসেন, এমনকি সিরিয়াতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। অবশ্য তিনি সিরিয়া হইতে স্বীয় দেশ (বেবিলন–) বাবেলেও তবলীগ কার্যে আসিয়া থাকিতেন।

হযরত লূত (আঃ) মিসর হইতে ঐ এলাকায় আসিয়াছিলেন যাহাকে বর্তমানে জর্দান রাজ্য বা "ট্রান্সজর্দান" বলা হইয়া থাকে। এই এলাকায় "সাদ্দুম" সামক একটি বস্তি ছিল, এই বস্তিতেই তিনি আসিয়াছিলেন। নিকটবর্তী আরও কতিপয় বস্তি ছিল, এইসব বস্তিতেই তিনি সত্য ধর্মের তবলীগ করিয়া থাকিতেন। ঐ এলাকার লোকদের মধ্যে কুফর, শেরক ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে জুলুম, অত্যাচার, পথিক, আগন্তুক, মুসাফির, বিদেশী বণিক-ব্যবসায়ীগণকে লুণ্ঠন ইত্যাদি সাধারণ অপরাধও অগণিত রকমের ছিল। তাহাদের উল্লেখযোগ্য অপরাধ যাহা মানবতার চরম অবমাননা এবং মান-বৈশিষ্ট্য লজ্জা-শরমের চরম বিপর্যয়কারী কুৎসিত ও ঘৃণিত ছিল– তাহা ছিল এই যে, তাহারা ছেলেদের সঙ্গে কুকর্মে অভ্যস্ত ছিল। এই কার্যে তাহারা এতই মত্ত ছিল যে, তাহার মোকাবিলায় নারী-সহবাসও তাহাদের নিকট উপেক্ষণীয় ছিল এবং তাহারা হাটে-মাঠে, রাস্তা-ঘাটে, মহফিল-মজলিসেও বিনা দ্বিধায় এই কুকর্মে লিপ্ত হইত এবং ভূপৃষ্ঠে তাহারাই ছিল এই কুকর্মের সর্বপ্রথম উদ্যোক্তা। মানবতার এই চরম অবমাননা, লজ্জা-শরমের এই চরম বিপর্যয়ে হযরত লূত (আঃ) তাহাদিগকে অন্যায় অপরাধ বিশেষতঃ এই কুকর্ম হইতে বারণ করিবার শত চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইলেন। অবশেষে তাহাদের উপর আল্লাহ তাআলার গজব নামিয়া আসিল– ভীষণ তর্জন-গর্জন, ভূকম্প ও উপর হইতে প্রস্তর বর্ষণের মধ্য দিয়া সমগ্র অঞ্চলের ভূখণ্ডকে উপরের দিকে উঠাইয়া উল্টাইয়া দিয়া সজোরে নিক্ষেপ করা হইল; ফলে সব কিছু ধ্বংস হইয়া সম্পূর্ণ এলাকা সাগরে পরিণত হইয়া গেল। আজও মানচিত্রে উহা জর্দানের মধ্যে আরবী ভাষায় بحر ميت বাহরে মাইয়্যেত্" বাংলা ভাষায় "মরু সাগর" ইংরেজীতে "Dead sea" নামে বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহার পরিমাপ এই– দৈর্ঘ্য ৭৭ কিলোমিটার তথা প্রায় ৫০ ইং মাইল, প্রস্থ ১২ কিলোমিটারের কিছু ঊর্ধ্বে প্রায় ৯ ইং মাইল, গভীরতা ৪০০ মিটার প্রায় পোয়া মাইল। পুরাতন ইতিহাসে উহাকে بحر لوط লূত সাগর নামে" আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

চতুর্দিকে স্থলভাগ বেষ্টিত, কোন সাগর মহাসাগরের যোগাযোগ হইতে বহু দূরে অবস্থিত– এই ভৌগোলিক দৃশ্যটি বাস্তবিকই পূর্ব ইতিহাস স্মরণ করাইয়া থাকে। ১০৩৯–৪০ ইং সনের সমসাময়িক ভূতাত্ত্বিকগণ কর্তৃক উক্ত সাগরকূল এলাকায় যে খনন কার্য চালান হইয়াছিল এবং তাহাতে যেসব পুরাতন নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারাও উল্লিখিত ইতিহাস সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে– সেই ইতিহাস চৌদ্দ শ'ত বৎসর পূর্বে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা দিয়াছিল। (কাসাসুল কোরআন খণ্ড– ১ম; পৃষ্ঠা– ২৩১)

পবিত্র কোরআনে লূত আলাইহিস সালামের ঘটনার বিভিন্ন বর্ণনা

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اَتَاتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۔ اِنَّكُمْ لَتَاتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ۔

আর আমি লূতকে এক বিশেষ জাতির প্রতি নবীরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম। যখন তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা কি লিপ্ত থাকিবে এই কদর্য ও নির্লজ্জ কাজে, যাহা তোমাদের পূর্বে বিশ্ব জগতের আর কেহই করে নাই? কি কুকাণ্ড! তোমরা নারীদেরকে ছাড়িয়া পুরুষের সঙ্গে যৌন কামনা চরিতার্থ কর! অধিকন্তু তোমরা অনাচারী জাতিতে পরিণত হইয়াছ।

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْاۤ اَخْرِجُوْهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ۔ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ۔

ঐ লোকগুলির পক্ষ হইতে উত্তর শুধু ইহাই ছিল যে, তাহারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, লূত ও তাহার

দলকে বস্তি হইতে দেশান্তরিত কর। তাহারা পবিত্রতাধারী দল সাজিয়াছে।

فَانْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ اِلاَّ امْرَاَتَهٗ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ـ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ـ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ـ

অতপর আমি রক্ষা করিয়াছিলাম লূতকে এবং তাঁহার পরিজনকে, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী রক্ষা পায় নাই; সে আযাবে পতিতদের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। আমি তাহাদের উপর ভয়াবহ (পাথর) বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম। খোঁজ লও, অপরাধীদের পরিণাম কি ঘটিয়াছিল। (সূরা আ'রাফ ঃ পারা- ৮; রুকু-১৭)

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ نِ الْمُرْسَلِيْنَ ـ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلاَ تَتَّقُوْنَ ـ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ـ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ـ

লূত (আঃ) যাহাদের প্রতি প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহারা নবীগণের আদর্শকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছিল। যখন তাহাদের মঙ্গলকামী লূত তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা সংযত হইবে না কি? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত রসূল। আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান।

وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

আমি তোমাদের নিকট সত্য পথ বাতলাইবার উপর কোন আজুরা চাই না। আমার আজুরা সারা জাহানের প্রভু আল্লাহর নিকট পাইব।

اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ـ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ـ

সারা বিশ্বের নজিরবিহীন কাজ- যৌন কামনা চরিতার্থের জন্য তোমাদের প্রভু কর্তৃক সৃষ্ট তোমাদের স্ত্রীগণকে ছাড়িয়া পুরুষদের সঙ্গে কুকর্মে তোমরা লিপ্ত থাকিবে কি? শুধু ইহাই নহে, বরং তোমরা ত সীমালঙ্ঘনকারী জাতি হইয়াছ।

قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ ـ

তাহারা হুমকি দিল, হে লূত! তুমি যদি তোমার এই ধরনের প্রচার কার্য হইতে বিরত না থাক তবে নিশ্চয় তুমি দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইবে।

قَالَ اِنِّىْ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ ـ رَبِّ نَجِّنِىْ وَاَهْلِىْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ـ

লূত (আঃ) বলিলেন, তোমাদের কার্যের প্রতি আমি চরম ঘৃণা ও ক্ষোভ পোষণ করি। হে পরওয়ারদেগার! আমাকে এবং আমার পরিজনকে তাহাদের কার্যাবলীর অভিশাপ হইতে রক্ষা করিও।

فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ اَجْمَعِيْنَ ـ اِلاَّ عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ ـ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ـ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ـ

সে মতে আমি লুততকে এবং তাঁহার সমস্ত পরিজনকে রক্ষা করিলাম, কিন্তু লুতের স্ত্রী- বৃদ্ধা রক্ষা পাইল না, সে আযাবে পতিতদের শামিলই থাকিল। তারপর লূত ও তাঁহার পরিজন ভিন্ন অন্য সকলকে

বিধ্বস্ত করিলাম এবং তাহাদের উপর বিশেষ ধরনের বৃষ্টি বর্ষণ করিলাম; সতর্ককৃত ঐ বস্তিবাসীর উপর বর্ষিত বৃষ্টি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ছিল।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ـ وَّمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ـ

নিশ্চয় এই ইতিহাসে উপদেশমূলক নিদর্শন আছে। এতদসত্ত্বেও অনেকেই ঈমান আনে না। (আল্লাহ তাহাদিগকে সময় দিতেছেন;) নিশ্চয় আপনার প্রভু ভীষণ পরাক্রমশালী এবং দয়ালুও।

(সূরা শোআ'রাঃ পারা– ১৯; রুকু– ১৩)

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ـ اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ ـ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ـ

এবং লূতকে নবীরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম। স্মরণীয় ইতিহাস– যখন তিনি তাঁহার এলাকার বাসিন্দাকে বলিয়াছিলেন, তোমরা কি নির্লজ্জ কুৎসিৎ কাজেই লিপ্ত থাকিবে? অথচ তোমরা ত অজ্ঞান নও। তোমরা স্ত্রীকে ছাড়িয়া পুরুষদের সঙ্গে যৌনতা চরিতার্থ কর– কত বড় জঘন্য কাজ! শুধু ইহাই নহে, বরং তোমরা সব কার্যে একেবারেই নাদান।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖ اِلاَّ اَنْ قَالُوْا اَخْرِجُوْا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ـ

তাঁহার এলাকার বাসিন্দারা উত্তরে এই সিদ্ধান্তই করিল যে, লূত পরিবারকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হউক; তাহারা পবিত্রতাশীল দল সাজিয়াছে।

فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهٗ اِلاَّ امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ـ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ـ

অতপর লূতকে এবং তাঁহার পরিজনকে বাঁচাইয়া নিলাম, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী রক্ষা পাইল না; তাহার আমল অনুযায়ী তাহাকে আযাবে পতিত দলের অন্তর্ভুক্ত রাখিয়াছিলাম। সেই লোকদের উপর বিশেষ ধরনের (পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম। সতর্ককৃত লোকগুলির উপর বর্ষিত বৃষ্টি ভয়ঙ্কর ছিল। (পারা– ১৯; রুকু– ১৯)

লূত আলাইহিস সালামের দেশবাসীর উপর আযাবের ঘটনা বৈচিত্র্যময় ছিল। ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের বয়ানে বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখ হইয়াছে– কতিপয় ফেরেশতা মেহমানরূপে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন যাঁহাদের সম্মুখে তিনি গো-শাবকের কাবাব পেশ করিয়াছিলেন; তাঁহারা তাহা গ্রহণ না করায় ইব্রাহীম (আঃ) ভীত হইয়াছিলেন। তাহার পর ফেরেশতাগণ নিজ পরিচয় দানপূর্বক ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁহার স্ত্রী ছারাহ (আঃ)-কে পুত্র লাভের সুসংবাদ দিয়াছিলেন, সেই ফেরেশতাগণই ছিলেন হযরত লূতের বস্তিবাসীদের উপর আযাবের বাহক। তাঁহারা যে ঐ বস্তির উপর আযাব বর্ষণে যাইতেছেন তাহা হযরত ইব্রাহীমের নিকটও প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইব্রাহীম (আঃ) সে সম্পর্কে কথা কাটাকাটি এবং ঐ বস্তিতে হযরত লূতের পরিবারবর্গ সম্পর্কেও প্রশ্নোত্তর করিয়াছিলেন।

ঐ ফেরেশতাগণ সুশ্রী বালকবেশে মেহমানরূপে হযরত লূতের গৃহে উপস্থিত হইলেন। লূত (আঃ) তখন বাড়ীতে ছিলেন না; কোথাও গিয়াছিলেন। বাড়ী আসিয়া এই সব সুশ্রী যৌবনের কুরি বালকশ্রেণীর বিদেশী মেহমানগণকে দেখিয়া দেশবাসীর চরিত্র ও অভ্যাস স্মরণে চিন্তায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। এদিকে নিজ ঘরেই ইঁদুর– তাঁহার স্ত্রী ছিলেন তাঁহার সম্পূর্ণ অসহযোগী; সে যাইয়া এইসব মেহমান সম্পর্কে দেশবাসীকে খবর দিয়া আসিল। দেশবাসী মাতালের ন্যায় ছুটিয়া আসিতে লাগিল। লূত (আঃ) অস্থির হইয়া পড়িলেন; কাহারও

কোন সাহায্য-সহায়তা পাইবার আশা নাই। গুণ্ডারা উপস্থিত হইল। তিনি মেহমানগণকে রক্ষা করার শেষ চেষ্টা করিলেন– আপন কন্যাগণকে ঐ গুণ্ডা দলের সর্দারদের বিবাহে দিবার প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু তাহারা সব কিছু অগ্রাহ্য করিল এবং একই কথা বলিল যে, আপনি ত জানেন আমরা কি চাই।

হযরত লূতের অবস্থা চরমে পৌঁছিল। তখন ফেরেশতাগণ গোপনে তাঁহার নিকট নিজেদের পরিচয় দান করিলেন এবং উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া পরামর্শ দিলেন যে, আপনি স্বীয় পরিজন ও সঙ্গীগণকে লইয়া রাত্রে রাত্রেই এই দেশ ত্যাগ করিবেন। ভোর হইতে না হইতেই এই দেশের উপর আল্লাহর আযাব আসিবে; অবশ্য আপনার স্ত্রী যাইবে না; তাহার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করিবেন না।

যেসব বদমায়েশ হযরত লূতের বাড়ী চড়াও করিয়াছিল আল্লাহ তাআলা ঐ সময়েই তাহাদের অন্ধ করিয়া দিলেন এবং রাত্রি অতিবাহিত হইতেই স্থায়ী আযাব সমগ্র এলাকাকে গ্রাস করিল। পবিত্র কোরআনের বর্ণনা– (পারা– ২৭; রুকু– ৯)

وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ فَطَمَسْنَا اَعْيُنَهُمْ فَذُوْقُوْا عَذَابِىْ وَنُذُرِ ....

"বদমায়েশের দল লুত (আঃ)-কে চাপ দিতেছিল তাঁহার মেহমানগণকে হস্তগত করার জন্য; বস্– আমি তাহাদের চক্ষুগুলি নির্বাপিত করিয়া দিলাম; আমার আযাব ও সতর্ককরণের মজা ভোগ কর। আর প্রভাত আরম্ভেই সমগ্র এলাকায় স্থায়ী আযাব আসিয়া গেল। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন–

وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ـ

"লূত (আঃ) তাহাদিগকে আমার পাকড়াও সম্পর্কে সতর্ক করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা সতর্ককরণকে সন্দেহ ও দ্বিধার দৃষ্টিতে দেখিয়াছে। (পারা–২৭ ; রুকু– ৯)

ফেরেশতাদের পরামর্শ মতে লুত (আঃ) স্বজনগণকে লইয়া সিরিয়া দেশের উদ্দেশে রাত্রেই এই বস্তি ছাড়িয়া গেলেন। প্রভাতে এই এলাকায় ভয়ঙ্কর ভূকম্প-ভূচালের তর্জন-গর্জন আরম্ভ হইল, উপর হইতেও প্রস্তর বর্ষিতে লাগিল, সমগ্র দেশকে উপরে তুলিয়া উল্টাইয়া সজোরে নিক্ষেপ করা হইল। প্রভাতেই সমগ্র দেশ ধ্বংস হইয়া দেশবাসী পাপিষ্ঠরা ভূপৃষ্ঠ হইতে চিরতরে মুছিয়া গেল– রহিল শুধু তাহাদের কুৎসিত কলঙ্কের কালিমা রেখা। এই সব কেসসা-কাহিনী বা গল্পের ছড়া নহে, ইহা বাস্তব ইতিহাস। পবিত্র কোরআনে ইহার বিস্তারিত আলোচনা বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে।

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اَنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ـ اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ ـ وَتَاْتُوْنَ فِىْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ـ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖ اِلاَّ اَنْ قَالُوْا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ـ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ـ

লূতকে নবীরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম। যখন তিনি তাঁহার দেশবাসীকে বলিলেন, নিশ্চয় তোমরা এমন নির্লজ্জ কুৎসিৎ কাজে লিপ্ত যাহা তোমাদের পূর্বে বিশ্ব জগতের কেহই করে নাই। পুরুষ ছেলেদের সঙ্গে কুকর্ম, ডাকাতি এবং প্রকাশ্য মজলিসে কুকর্মে কি তোমরা ডুবিয়া থাকিবে? দেশবাসীর উত্তর ইহাই ছিল যে, যদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক তবে আমাদের উপর আল্লাহর গজব নিয়া আস। লূত (আঃ) ফরিয়াদ করিয়া বলিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমাকে এই দুষ্টদের মোকাবিলায় মদদ করুন। এদিকে যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ (পথিকবেশে) ইব্রাহীমের নিকট উপস্থিত হইলেন (পুত্রের) সুসংবাদ লইয়া; তখন তাঁহারা ইহাও বলিলেন যে, আমরা হযরত লূতের ঐ বস্তিবাসীদের ধ্বংসের প্রোগ্রাম নিয়া যাইতেছি; ঐ বস্তিবাসীরা স্বৈরাচারী দলে পরিণত হইয়াছে।

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرَاهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوا اِنَّا مُهْلِكُوْا اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظَالِمِيْنَ ـ

ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, ঐ বস্তিতে ত লূত পয়গম্বরও বাস করেন। তাঁহারা বলিলেন, সেখানে কে কে আছে তাহা আমরা ভালরূপেই অবগত আছি। আমরা তাঁহার এবং তাঁহার পরিজনের রক্ষার ব্যবস্থা করিব; কিন্তু তাঁহার স্ত্রী– সে আযাবগ্রস্তদের মধ্যেই থাকিবে।

قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا ـ قَالُوْآ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ اِلاَّ امْرَاَتَهٗ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ـ وَلَمَّا اَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوْا لاَتَخَفْ وَلاَ تَحْزَنْ ـ اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ اِلاَّ امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ـ اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ـ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا اٰيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ـ

আমার প্রেরিত ঐ ফেরেশতাগণ যখন লূতের গৃহে উপস্থিত হইলেনম, তখন (যেহেতু তাঁহারা সুশ্রী বালক বেশে ছিলেন এবং লুত (আঃ) তাঁহাদিগকে চিনিতে পারেন নাই, তাই) লূত (আঃ) ভীষণ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মনও ভাঙ্গিয়া পড়িল। ফেরেশতাগণ বলিলেন, আপনি শঙ্কিত হইবেন না। আমরা আপনার এবং আপনার পরিজনের রক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চয় করিব। অবশ্য আপনার স্ত্রী আযাবে পতিতদের দলভুক্ত রহিয়াছে। নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখুন এই বস্তিবাসীদের উপর আমরা আসমানী আযাব ফেলিব তাহাদেরই বদকারীর দরুন। নিশ্চয় আমি ঐ বস্তির এমন নিদর্শন রাখিয়া দিয়াছ যাহা বুদ্ধিমান লোকদে পক্ষে সুস্পষ্ট উপদেশমূলক। (পারা-২০; রুকু–১৬)

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ـ قَالُوْا اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ اِلاَّ اٰلَ لُوْطٍ ـ اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ـ اِلاَّ امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنَا اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ ـ

ইব্রাহীম (আঃ) আগন্তুক ফেরেশতা দলের মনোভাব অনুভব করিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদের সম্মুখে আর কি প্রোগ্রাম আছে? তাঁহারা বলিলেন, আমরা (লূত নবীর বস্তিবাসী) এক অপরাধ-পরায়ণ জাতির প্রতি (তাহাদের ধ্বংস করার জন্য) প্রেরিত হইয়াছি; অবশ্য লূত পরিবারকে বাঁচার সুব্যবস্থা নিশ্চয় করিব, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী রক্ষা পাইবে না। তাহার জন্য আমরা (আল্লাহর আদেশ) সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছি, সে আযাবে পতিত দলেই থাকিবে।

فَلَمَّا جَاءَ اٰلَ لُوْطِ ِالْمُرْسَلُوْنَ ـ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ـ قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ـ وَاَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ـ

প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূতের গৃহে পৌঁছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, আমরা তোমাদের চিনিতে পারি নাই। তাঁহারা বলিলেন, আমরা অন্য কিছু নহি. বরং আপনার নিকট সেই ব্যাপার নিয়াই আসিয়াছি যেইটা সম্বন্ধে এই দেশবাসী সন্দেহ পোষণ করিয়া আসিতেছে অর্থাৎ আসমানী আযাব। আমরা আপনার নিকট অবশ্যম্ভাবী প্রোগ্রাম লইয়া আসিয়াছি। আমরা যাহা বলিতেছি তাহা সত্য।

فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَّامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ ـ

অতএব আপনি স্বীয় পরিজনসহ রাত্রের অংশেই এই দেশ ত্যাগ করিবেন; আপনি সকলের পিছনে থাকিবেন। আপনার দলের কেহ যেন পিছনের দিকে না তাকায়; যথাসত্বর আপনারা আদিষ্ট স্থানে যাইয়া পৌঁছিবেন। وَقَضَيْنَا اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هٰؤُلَاءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ ـ

আমি লূতকে এই সিদ্ধান্তও জানাইয়াছিলাম যে, ভোর হইতে না হইতেই এই দেশবাসী সমূলে ধ্বংস হইবে। وَجَاءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُوْنَ ـ

(ঘটনার প্রথম অংশের বিবরণ–) ঐ দেশবাসীরা (আগন্তুক ছদ্মবেশী যৌবনের কুরি ছেলেদের উদ্দেশ্যে) উল্লাস-স্ফূর্তির সহিত ধাবিত হইল। قَالَ اِنَّ هٰؤُلَاءِ ضَيْفِىْ فَلَا تَفْضَحُوْنَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنَ ـ

লূত (আঃ) তাহাদের বলিলেন দেখ! ইহারা আমার মেহমান; তাঁহাদের প্রতি দুব্যবহার করিয়া আমাকে অপমান করিও না। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আমাকে অপদস্থ করিও না।

قَالُوْا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ـ

তাহারা (লূতের উপর দোষ চাপাইল–) আমরা ত পূর্বেই আপনাকে নিষেধ করিয়াছি, দুনিয়াভর মানুষের যাহাকে তাকে স্থান দিবেন না। (তাহাদিগকে স্থান না দিলে অপদস্থ হইতেন না)।

قَالَ هٰؤُلَاءِ بَنَاتِىْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ـ

লূত (আঃ) তাহাদের বড়দেরকে ইহাও বলিলেন, আমার কন্যাগণ আছে; তোমারা যদি চাও বিবাহ করিয়া নিয়া যাও; আমাকে অপদস্থ করিও না। لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِىْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ـ

আল্লাহ শপথ করিয়া বলিলেন যে, তাহারা ত তখন মাতলামির জোশে পাগল হইয়া গিয়াছিল, (এই সব কথা তাহাদের উপর ক্রিয়া করিবে কিরূপে)? فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ ـ

ফলে প্রভাত হইতেই প্রচণ্ড শব্দের গর্জন তাহাদিগকে আক্রমণ করিল।

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ـ

সঙ্গে সঙ্গে ঐ বস্তিকে উল্টাইয়া উপর দিক নীচে, নীচের দিক উপরে করিয়া দিলাম এবং তাহাদের উপর শক্ত কাঁকরে পাথর বৃষ্টিও বর্ষণ করিয়া ছিলাম।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ ـ وَاِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ ـ

এই ঘটনায় তথ্যানুসন্ধানীদের জন্য অনেক কিছু নির্দশন রহিয়াছে এবং ঐ এলাকাটি মক্কাবাসীর সিরিয়া যাতায়াতের রাস্তার উপর অবস্থিত। (পারা– ১৪; রুকু– ৪)

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِىْ قَوْمِ لُوْطٍ ـ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ـ

ইব্রাহীম যখন (আগন্তুকদের পরিচয় লাভে) নির্ভয় হইলেন এবং পুত্র লাভের সুসংবাদে সন্তুষ্টি লাভ করিলেন, তখন ইব্রাহীম লূতের দেশবাসী সম্পর্কে আমার নিকট পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। বাস্তবিকই ইব্রাহীম ছিলেন ধৈর্যশীল, অতিশয় কোমল হৃদয়, নম্র স্বভাবের।

يَاِبْرَاهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ـ اِنَّهُ قَدْ جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ ـ وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ـ

(তখন বলা হইল,) হে ইব্রাহীম! আপনি এই বিষয়ে নিবৃত্ত থাকুন। নিশ্চয় এ সম্পর্কে আপনার প্রভুর অকাট্য ফরমান আসিয়া গিয়াছে এবং লুতের দেশবাসীর উপর অপ্রতিরোধ্য আযাব আসিবেই।

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ ـ

অতঃপর আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ যখন (সুশ্রী বালকবেশে) উপস্থিত হইল লূতের গৃহে তখন তাহাদেরকে নিয়া তিনি বিব্রত হইলেন, দুর্বল ও ভীত হইয়া পড়িলেন এবং হায়-হুতাশ করিয়া বলিলেন, আজিকার দিনটি (আমার পক্ষে) ভয়ানক কঠিন দিন।

وَجَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰت ـ قَالَ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِىْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ فِىْ ضَيْفِىْ ـ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ ـ

এদিকে তাঁহার দেশবাসী তাঁহার গৃহের প্রতি ছুটিয়া আসিতে লাগিল; তাহারা পূর্ব হইতেই কুকর্মে অভ্যস্ত ছিল। লূত (আঃ) তাহাদের সর্দারদেরকে বলিলেন, আমার কন্যাগণকে তোমরা ইচ্ছা করিলে বিবাহ করিয়া নিতে পার– তাহারা তোমাদের জন্য বৈধ হইবে। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করিয়া আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে অপদস্থ করা হইতে বারণ থাক। তোমাদের মধ্যে একজনও কি সুবোধ মানুষ নাই?

قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَا فِىْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ـ

দেশবাসীরা বলিল, আমাদের প্রয়োজন নাই আপনার কন্যাদের। আমরা কি চাই তাহা আপনি ভাল রূপেই জানেন।

قَالَ لَوْ اَنَّ لِىْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِىْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ـ قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوْا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ ـ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَا اَصَابَهُمْ ـ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ـ

লূত (আঃ) অনুতপ্ত হইয়া বলিলেন, হায়– যদি তোমাদিগকে শায়েস্তা করার শক্তি আমার থাকিত বা আমি কোন মজবুত পৃষ্ঠপোষকের সহায়তা পাইতাম! আগন্তুক ফেরেশতাগণ তখন নিজেদের পরিচয় দানে লূত (আঃ)-কে বলিলেন, আমরা আপনার মহান প্রভুর প্রেরিত। এই বদমাশরা আপনার কিছুই করিতে পারিবে না। অতএব আপনি নিজ পরিজনকে লইয়া রাত্র থাকিতে এই দেশ হইতে চলিয়া যান এবং আপনাদের কেহ পিছন দিকে ফিরিয়া যেন না দেখে। অবশ্য আপনার স্ত্রী– তাহার উপর পড়িবে সেই আযাব যাহা দেশবাসীর উপর আসিবে।* তাহাদের জন্য নির্ধারিত সময় হইল প্রভাত। প্রভাত কি অতি নিকটবর্তী নহে?

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ مَّنْضُوْدٍ ـ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ـ وَمَا هِىَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ـ

(আল্লাহ তাআলা বলেন,) অতঃপর যখন উপস্থিত হইল আমার ফরমান তখন ঐ দেশটাকে উল্টাইয়া উপরকে নীচ নীচকে উপর করিয়া দিলাম। এতদ্ভিন্ন ঐ বস্তিবাসীদের উপর পাথর বৃষ্টিও বর্ষণ করিয়াছিলাম;

* হযরত লুৎ আলাইহিস সালামের স্ত্রী আযাব হইতে রক্ষা পাইল না– যেরূপ হযরত নূহ আলাইহিস সালামের স্ত্রীও আযাব হইতে রক্ষা পাইয়াছিল না। নিজে কাফির হইলে কাহারও কোন সম্পর্ক যে নাজাতের জন্য ফলপ্রদ হয় না তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ এই দুই নারীর ঘটনা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বিশেষরূপে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করিয়াছেন। যাহার বিবরণ হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের বিবরণে বর্ণিত হইয়াছে।

পাথর খণ্ডগুলি বৃষ্টির ধারায় বর্ষিত হইয়াছিল; ঐ পাথর আপনার প্রভুর নিকট তাহাদের জন্য নিদর্শনযুক্ত ছিল; ঘটনাস্থল ঐ বস্তি মক্কার স্বৈরাচারীদের হইতে অধিক ব্যবধানে নহে (তাহা দেখিয়া তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে)। (সূরা হুদঃ পারা-১২ রুকু-৭)

হযরত ইসমাঈল (আঃ)

ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের পুত্র ছিলেন ইসমাঈল (আঃ)। তাঁহার বংশধর হইতে একমাত্র পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম। বায়তুল্লাহ শরীফ তৈয়ার করিতে ইসমাঈল (আঃ) স্বীয় পিতা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের সঙ্গে একত্রে আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করিয়াছিলেন- رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ ـ

"হে আমার প্রভু পরওয়ারদেগার! আমাদের বংশধরদের মধ্য হইতে একজন রসূল পাঠাইও-যিনি তাহাদিগকে তোমার কিতাবের আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনাইবেন,

ঐ কিতাবের বিস্তারিত শিক্ষা এবং কর্ম জ্ঞান দান করিবেন। শরীয়ত তথা আল্লাহ প্রদত্ত আদর্শের শিক্ষা দান করিবেন এবং তাহাদের ভিতর, বাহির, বাহ্যিক ও আত্মিক পরিচ্ছন্ন তথা চরিত্র গঠনের ব্যবস্থা করিবেন। হে প্রভু! তুমি সর্বশক্তিমান সুকৌশলী- তুমি সব কিছু করিতে পার।"

ইব্রাহীম (আঃ) এবং ইসমাঈল (আঃ) উভয়ের মিলিত এই দোয়ায় প্রার্থনীয় রসূলই হইলেন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)। এই বিষয়টি এক হাদীছে উল্লেখ আছে যে- "আমি আমার পিতা ইব্রাহীমের দোয়ারই বাস্তবরূপ।" এই হাদীছে আলোচ্য আয়াতের দোয়ার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

হযরত ইব্রাহীম ও ইসমাঈলের পর দুনিয়াতে বহু সংখ্যক রসূলের আবির্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু সর্বশেষ রসূল হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে উক্ত দোয়ার বাস্তবরূপ সাব্যস্ত করা হইল। অন্য কোন রসূলকে সাব্যস্ত করার মধ্যে অসুবিধা এই যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) উভয়ে মিলিতভাবে বলিয়াছিলেন- "আমাদের বংশধর হইতে"। অতএব এই দোয়ার রূপে রূপায়িত ঐ রসূলই হইতে পারেন যিনি বংশীয় সূত্রে উভয়ের সঙ্গে মিলিত হন। হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের পূর্ববর্তী নবীগণ ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের দ্বিতীয় পুত্র ইসহাক আলাইহিস সালামের বংশ হইতে ছিলেন; ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশে কোন নবী আসেন নাই; একমাত্র সর্বশেষ রসূল হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁহার বংশের ছিলেন। অতএব হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল উভয়ের মিলিত বংশের রসূল একমাত্র সর্বশেষ রসূল হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-ই ছিলেন, তাই তিনিই উক্ত দোয়ার বাস্তবরূপ হিসাবে নির্ধারিত।

হযরত ইসহাক (আঃ)

ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের দ্বিতীয় পুত্র- যিনি তাঁহার বিবি ছারাহ্ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহার তরফে ছিলেন, তিনিই ইসহাক (আঃ)। তাঁহার জন্মের পূর্বেই ফেরেশতাগণ দুনিয়াতে তাঁহার শুভাগমন সম্পর্কে তাঁহার পিতা ইব্রাহীম (আঃ) ও মাতা ছারাহ্ (রাঃ)-কে সুসংবাদ দান করিয়াছিলেন। এমনকি তিনি যে পূর্ণ বয়সপ্রাপ্তির সুযোগ পাইবেন সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য ফেরেশতাগণ এই সুসংবাদও দিয়াছিলেন যে, তাঁহার ঔরসে এক ছেলে জন্মগ্রহণ করিবেন তাঁহার নাম হইবে "ইয়াকুব"। এই ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে যাহা হযরত ইব্রাহীমের বিবরণে বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত ইয়াকুব (আঃ)

হযরত ইসহাকের পুত্র ইয়াকুব (আঃ), তাঁহার সময়কাল খৃষ্ট সনের প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্বে। তাঁহার আর এক নাম ছিল 'ইসরাঈল"। ইহা ইবরানী ভাষা- "ইছরা" শব্দ আরবী "আব্দ" শব্দের অর্থে এবং "ঈল্" "আল্লাহ" অর্থে। এই সূত্রে 'ইসরাঈল" অর্থ "আবদুল্লাহ"-আল্লাহর বান্দা বা দাস।

এই নামের সূত্রে তাঁহার বংশধরকে “বনী ইসরাঈল” ইসরাইলের তথা ইয়াকুবের বংশধর বলা হয়। পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার যুগে বিশ্বের বিশেষতঃ আরবের দুইটি বিশেষ সম্প্রদায়- ইহুদী ও নাসারা উক্ত বনী ইসরাঈল নছলেরই ছিল এবং বহু ঐতিহাসিক ঘটনাবিশিষ্ট প্রসিদ্ধ নবী মূসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ) তাহাদের মধ্য হইতে ছিলেন। তাই অনেক অনেক ঘটনার সংশ্লিষ্টে পবিত্র কোরআনের অগণিত স্থানে বনী ইসরাঈলের উল্লেখ ও সম্বোধন রহিয়াছে।

হযরত ইব্রাহীমের জন্মদেশ ইরাক ছিল বটে, কিন্তু তথা হইতে হিজরত করতঃ তিনি অবশেষে সিরিয়ার ফিলিস্তিনে বসবাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ইসহাক (আঃ) এবং তাঁহার পুত্র ইয়াকুব (আঃ) এবং তাঁহার বংশধর বনী ইসরাইলও সিরিয়ার বাসিন্দাই ছিলেন। এই সূত্রে বনী ইসরাঈলগণ মূলতঃ সিরিয়ার অধিবাসী ছিল। হযরত ইয়াকুবের পুত্র ইউসুফ (আঃ) ভাগ্যচক্রে মিসরে উপনীত হইয়াছিলেন। ঘটনার বিবর্তনে তিনি মিসরের অধিপতি হইয়া স্বীয় মাতা-পিতা ও ভাই বোনদেরকে মিসরে নিয়া আসিয়াছিলেন। এইরূপে এশিয়ার অন্তর্গত সিরিয়া হইতে বনী ইসরাঈলদের পূর্বপুরুষরা আফ্রিকার অন্তর্গত মিসরে চলিয়া আসিলেন, তথায় তাঁহাদের আবাদী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বহু যুগ অতিক্রমের পর সেই মিসরে বনী ইসরাঈলদের মধ্যে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের আবির্ভাব হইল। তিনি তৎকালীন মিসর অধিপতি ফেরাউনের কবল হইতে বনী ইসরাঈলকে মুক্ত করার জন্য তাহাদিগকে লইয়া মিসর হইতে সিরিয়া আসিয়াছিলেন; যেই ঘটনা সংশ্লিষ্টেই ফেরআউন ধ্বংস হইয়াছিল। এইভাবে বনী ইসরাঈলরা সিরিয়ায় পুনঃ প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল এবং তাহারা মিসরেরও মালিক হইয়াছিল। এই সব ঘটনা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে; হযরত মূসা (আঃ)-এর বর্ণনায় ইনশাআল্লাহ তাআলা উদ্ধৃত হইবে।

হযরত ইসুফ (আঃ)

ইয়াকুব আলাইহিস সালামের পুত্র ছিলেন ইউসুফ (আঃ)। হযরত ইউসুফের ঘটনা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত সর্বাধিক সুদীর্ঘ ও বিস্তারিত ঘটনা। এই ঘটনার আরও একটি বিশেষত্ব এই যে, পবিত্র কোরআনে অন্যান্য নবীগণের ঘটনা টুকরা টুকরা অংশ অংশরূপে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ হইয়াছে; পূর্ণ ঘটনা একত্রে উল্লেখ হয় নাই। হযরত ইউসুফের ঘটনা সুদীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ণ ঘটনা একত্রে ধারাবাহিকরূপে উল্লেখ হইয়াছে। পবিত্র কোরআন এই ঘটনাকে احسن القصص অতি উত্তম কাহিনী বা ইতিহাস নামে আখ্যায়িত করিয়াছে।

হযরত ইউসুফের ইতিহাস এমনই এক বিচিত্রময় ইতিহাস যে, তাহার মধ্যে উপদেশমূলক বহু উপাদান এবং আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরতের নিদর্শন নিহিত রহিয়াছে। তাই আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন-

لَقَدْ كَانَ فِىْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖٓ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ ـ

“নিশ্চয় ইউসুফ এবং তাঁহার ভাইদের ঘটনায় (উপদেশ লাভের, আল্লাহর কুদরতের এবং মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সত্যবাদিতার) বহু নিদর্শন রহিয়াছে- বিশেষতঃ জিজ্ঞাসাকারীদের জন্য।”

ইহুদীরা মক্কাবাসীদের পরামর্শ দিয়াছিল যে, নবুয়ত ও অহী প্রাপ্তির দাবীদার মুহাম্মদকে ইউসুফ নবীর ইতিহাস জিজ্ঞাসা কর যাহা এমন ইতিহাস যে, আসমানী এলম ছাড়া তাহা কঠিন। অতএব এই প্রশ্নের দ্বারাই মুহাম্মদের সত্য-মিথ্যার প্রমাণ হইয়া যাইবে। সেমতে তাহাই করা হইল এবং সেই প্রশ্নের উত্তরেই হযরত ইউসুফের পূর্ণ ইতিহাস সম্বলিত এই সুদীর্ঘ সূরা নাযিল হইয়াছিল। অতএব এই বিবরণ প্রশ্নকারীদের পক্ষে বিশেষরূপে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সত্যতার উজ্জ্বল প্রমাণ ছিল। আর এই ঘটনা

বিশেষরূপে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যে, "আল্লাহ যাকে চান বাঁচাইতে কে পারে তাকে মারিতে? এবং আল্লাহ যাহাকে চান উঠাইতে কে পারে তাহাকে নামাইতে?

এতদ্ভিন্ন এই ঘটনার মধ্যে আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরতের যেসব নিদর্শন রহিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। হযরত ইউসুফের ভাইগণ তাঁহাকে প্রাণে বধ করার জন্য অন্ধ কূপে ফেলিয়াছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) ক্রীতদাসরূপে মিসরের বাজারে বিক্রীত হইয়াছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে মিসর অধিপতি বানাইয়াছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি বিচিত্রময় কুদরতের লীলার বহু নিদর্শন রহিয়াছে।

হযরত ইউসুফের ইতিহাসের জন্য অন্য কোন বই-পুস্তক বা গ্রন্থের আবশ্যক নাই, পবিত্র কোরআনের বিবরণই যথেষ্ট। অতএব এ স্থানে পবিত্র কোরআনের বিবরণের অনুবাদই করা হইবে, অবশ্য সংক্ষিপ্ততার জন্য আয়াতসমূহ উল্লেখ করা হইবে না। ১২-১৩ পারা- সূরা ইউসুফের মধ্যে সমস্ত আয়াত বিদ্যমান রহিয়াছে।

হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বিভিন্ন স্ত্রীর পক্ষ হইতে বার জন ছেলে ছিল; তন্মধ্যে হযরত ইউসুফ (আঃ) এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিনইয়ামীন এই দুই জন এক মাতার ঔরসের ছিলেন, অন্যান্য ভ্রাতাগণ বিভিন্ন মাতার পক্ষের ছিলেন। ইয়াকুব (আঃ) ইউসুফ এবং তাঁহার সূত্রে তাঁহার ভ্রাতা বিনইয়ামীনকে সর্বাধিক ভালবাসিতেন। ইউসুফের প্রতি তাঁহার ভালবাসা অতিমাত্রায় ছিল এবং এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কারণ, ইউসুফের উপর নূরে নবুয়তের যে উজ্জ্বল আভা ছিল তাহা হযরত ইয়াকুব (আঃ) স্পষ্টরূপে দেখিতেছিলেন- যাহা অন্য আর কোন পুত্রের উপর ছিল না। এতদ্ভিন্ন বাল্যকালেই তাঁহার মাতা ইন্তেকাল করিয়াছিলেন, তাই তাঁহাকে এত অধিক ভালবাসিতেন। তদুপরি ইউসুফের একটি স্বপ্ন, যাহা তাঁহার প্রাধান্যতার পূর্বাভাস এবং স্পষ্ট প্রমাণ ছিল, তাহার দরুন সেই ভালবাসা আরও অধিক হইয়া গেল।

ইউসুফের প্রতি পিতার এই ভালবাসা অন্যান্য বড় ভাইদের পক্ষে বিষতুল্য পরিগণিত হইল। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত সুদীর্ঘ ঘটনার সূচনা ইহা হইতেই।

সূরা ইউসুফের অনুবাদ

ভূমিকা ঃ আলিফ লা-ম্-রা- (এ স্থানে তোমাদের সম্মুখে যাহা পেশ করা হইবে-) এই সব এমন এক কিতাবের আয়াতসমূহ যে কিতাবের সত্যতা অকাট্যতা ও বিবরণ অতি উজ্জ্বল সুস্পষ্ট। আমি তাহাকে আরবী ভাষায় কোরআনরূপে নাযিল করিয়াছি যেন (তাহার প্রথম সম্বোধক) তোমরা (আরববাসী) সহজে ও ভালরূপে বুঝিতে পার (তোমাদের মাধ্যমে সারা বিশ্ব তাহা বুঝিতে সক্ষম হইবে)। এই কোরআনের অহী মারফত আমি আপনাকে এক উত্তম কাহিনী বয়ান করিয়া শুনাইব, অবশ্য আপনিও ইতিপূর্বে উহার খবর রাখিতেন না।

ঘটনার প্রকাশ্য সূচনা

একদা ইউসুফ স্বীয় পিতাকে বলিলেন, আমি (স্বপ্নে) এগারটি নক্ষত্র ও চন্দ্র-সূর্যকে আমার সম্মুখে নত হইতে দেখিয়াছি। এতদশ্রবণে পিতা ইয়াকুব (আঃ) তাঁহাকে বলিলেন, হে বৎস! তোমার ভাইদের নিকট এই স্বপ্ন প্রকাশ করিও না, নতুবা তাহারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবে; নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (তোমাকে আল্লাহ তাআলা যেরূপ স্বপ্ন দেখাইয়াছেন, বাস্তবেও) তদ্রূপ তোমাকে তোমার পরওয়ারদেগার (শ্রেষ্ঠত্ব দান করতঃ) বিশেষত্ব প্রদান করিবেন এবং বিশেষরূপে তোমাকে স্বপ্ন ব্যাখ্যার গভীর জ্ঞানদান করিবেন এবং আরও নেয়ামত (তথা নবুয়ত) দানপূর্বক তোমার উপর এবং ইয়াকুবের বংশধরের উপরে নেয়ামতদান কার্য সম্পন্ন করিবেন; যেরূপ তোমার পূর্বপুরুষ ইব্রাহীম ও ইসহাকের উপর করিয়াছিলেন। তোমার প্রভু-পরওয়ারদেগার সর্বজ্ঞ, হেকমতওয়ালা- সুকৌশলী।

ঘটনার আরম্ভ

বাস্তবিকই ইউসুফ ও তাঁহার ভাইদের ঘটনায় বহু নিদর্শন ছিল জিজ্ঞাসাকারীদের জন্য। একদা ভ্রাতাগণ একত্রে পরামর্শ করিয়া বলিল, ইউসুফ ও তাঁহার ভ্রাতা "বিনইয়ামীন"ই আমাদের পিতার অধিক ভালবাসার পাত্র, অথচ (আমরা শক্তিশালী এবং সংখ্যায় বেশী) আমরা হইতেছি একটি দল! (আমাদের দ্বারা পিতার স্বার্থ অধিক উদ্ধার হইতে পারে, তবুও পিতা তাহাদেরকে অধিক ভালবাসেন,) নিশ্চয় আমাদের পিতা স্পষ্ট ভুলে আছেন।

অতএব সকলের প্রচেষ্টায় ইউসুফকে হত্যা করিয়া ফেলা হউক কিম্বা কোন দূরদেশে ফেলিয়া আসা হউক; ইহাতে তোমাদের পিতার দৃষ্টি তোমাদের প্রতি নিবদ্ধ হইবে এবং এই ব্যবস্থাবলম্বনে তোমাদের সব কিছু শোধরাইয়া যাইবে।

তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিল, ইউসুফকে প্রাণে বধ না করিয়া কোন একটি অন্ধকূপে ফেলিয়া দেওয়া হউক; (পার্বত্য অঞ্চলের কূপের পানি কম হয়, তাই সে প্রাণে বাঁচিয়া থাকিবে এবং) কোন পথিক তথা হইতে তাহাকে উঠাইয়া লইয়া যাইবে। যদি তোমরা কিছু করিতে ইচ্ছা কর তবে এই ব্যবস্থাবলম্বন কর। (এই কথার উপর সকলে একমত হইয়া তাহা বাস্তবায়নের তদবীরে লাগিয়া গেল)।

ইউসুফ (আঃ)-কে কূপে ফেলিবার ঘটনা

একদা ভ্রাতাগণ সকলে মিলিতভাবে পিতার নিকট বলিতে লাগিল, আপনি ইউসুফ সম্বন্ধে আমাদের উপর আস্থা বিশ্বাস স্থাপন করেন না কেন? অথচ নিঃসন্দেহে আমরা তাহার শুভাকাঙ্ক্ষী। অতএব তাহাকে আগামীকল্য আমাদের সঙ্গে যাইতে দিবেন; সে আমাদের সঙ্গে (জঙ্গলে যাইয়া) ফল-ফলারি খাইবে এবং খেলাধুলা করিবে; আমরা তাহার হেফাজত করিব নিশ্চয়।

পিতা বলিলেন, এই ভাবিয়া আমি নিশ্চয় চিন্তিত হই যে, তোমরা ইউসুফকে আমার চোখের আড়ালে লইয়া যাইবে এবং আশঙ্কাও করি যে, তোমাদের উদাসীনতার সুযোগে (জঙ্গলে) তাহাকে বাঘে খাইয়া ফেলে নাকি!

তাহারা বলিল, আমাদের একদল মানুষ থাকা সত্ত্বেও যদি তাহাকে বাঘে খাইয়া ফেলিতে পারে তবে ত আমাদের মুখ দেখাইবার স্থান থাকিবে না।

যখন তাহারা ইউসুফকে (নিজেদের নির্ধারিত স্থানে) নিয়া গেল এবং তাঁহাকে অন্ধকূপের তলদেশে ফেলিবার সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া নিল, তখন আমি ইউসুফকে গোপন সূত্রে জ্ঞাত করিলাম, (তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই, তাহাদের এই সব তদবীর সত্ত্বেও তুমি বাঁচিয়া থাকিবে, এমনকি এইরূপ দিনও আসিবে যে, তাহাদের উপর তোমার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং) তুমি তাহাদিগকে তাহাদের এই অপকর্মের বিবরণ জানাইয়া তাহাদের প্রতি কটাক্ষ করিবে। এখন তাহারা তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না (অতঃপর তাহারা ইউসুফকে অন্ধকূপে নামাইয়া দিয়া বাড়ী চলিয়া আসিল)।

পিতার নিকট ভাইদের মিথ্যা প্রবঞ্চনা

ভ্রাতাগণ সন্ধ্যার পর কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার নিকট উপস্থিত হইল। তাহারা বলিল, বাবাজান! আমরা সকলে দৌড় প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের মাল-সামানার নিকট রাখিয়া গিয়াছিলাম; ইত্যবসরে তাহাকে বাঘে খাইয়া ফেলিয়াছে– আপনি ত আমাদিগকে বিশ্বাস করিবেন না যদিও আমরা সত্যবাদী হইয়া থাকি। আর তাহারা ইউসুফের জামার উপর মিথ্যা রক্ত (তথা অন্য কিছুর রক্ত) মাখাইয়া নিয়া আসিল। (খোদার লীলা– তাহার জামাটিকে বাঘে খাওয়া মানুষের জামার ন্যায় ছিড়িয়া ফাঁড়িয়া লয়

নাই, তাহা ছিল সম্পূর্ণ আস্ত– ইহা লক্ষ্য করিয়া) পিতা ইয়াকুব (আঃ) বলিলেন (তাহাকে বাঘে খায় নাই), বরং তোমরাই নিজে নিজে একটা কথা গড়িয়া লইয়াছ; অতএব পূর্ণ ধৈর্যধারণ ছাড়া আর আমার গতি কি? আর তোমরা যাহা বলিতেছ সেই ব্যাপারে আল্লাহই হইতেছেন সাহায্য প্রার্থনার স্থল।

কূপ হইতে ইউসুফের বাঁচিয়া আসার ঘটনা

এদিকে একদল সওদাগর পথিক কূপটির নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহাদের পানিবাহক ভিশ্‌তীকে পানি আনিবার জন্য ঐ কূপে পাঠাইল; সে ঐ কূপে ডোল ফেলিল। (বালক ইউসুফ ঐ ডোল ধরিয়া কূপ হইতে উঠিয়া আসিলেন। ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিয়া) চীৎকার করিয়া উঠিল যে, এ দেখি একটি বালক। দলের লোকগণ ইউসুফকে লাভজনক বস্তুরূপে গোপন রাখিল যেন কেহ খোঁজ পাইয়া দাবী না করে)। অথচ আল্লাহ তাআলা তাহাদের সর্ব কার্যকলাপ জ্ঞাত হইতেছিলেন। (সওদাগর দল ইউসুফকে লইয়া মিসর পৌঁছিল) এবং তাঁহাকে কম মূল্যে– মাত্র কয়েকটি রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করিল। তাহারা (ইউসুফকে উপলব্ধি করিতে পারে নাই, তাই তাহারা) তাঁহার প্রতি অনুরাগী ছিল না।

মিসরে ইউসুফের প্রাথমিক অবস্থা

মিসরে যে ব্যক্তি ইউসুফকে ক্রয় করিল (সে ছিল মিসরের উজিরে আযম তথা প্রধান শাসনকর্তা এবং সে নাকি নিঃসন্তান ছিল); সে তাহার স্ত্রীকে বলিল, বিশেষ সুনজরের সহিত তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে; হয়ত আমাদের উপকারে আসিবে অথবা আমরা তাহাকে ছেলে বানাইয়া নিব। এইরূপে মিসরে ইউসুফকে প্রতিষ্ঠিত (করার সূচনা) করিলাম। এইসব করার মধ্যে এই উদ্দেশ্যও ছিল যে, (তাঁহাকে নবুয়ত দেওয়া হইবে মোজেযা স্বরূপ) আমি তাঁহাকে স্বপ্নের তাবীর সম্পর্কে অসাধারণ জ্ঞান দান করিব। বস্তুতঃ আল্লাহ তাআলা নিজ কার্যে ও ইচ্ছা প্রয়োগে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও প্রবল, কিন্তু অধিকাংশ লোক সে সম্পর্কে অজ্ঞ। (আল্লাহ তাআলার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিতে পারেন– তাহার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন ইউসুফের ঘটনা। ইউসুফ নিরুপায় নিঃসহায়রূপে কূপে নিক্ষিপ্ত হইল, তারপর বাজারে বিক্রীত হইল। আল্লাহ তাআলার কুদরতের লীলা– সেই ইউসুফকে শুধু ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিতই করিলেন না, বরং আল্লাহ বলেন,) অতপর যখন ইউসুফ পূর্ণ বয়সে পৌঁছিলেন তখন আমি তাঁহাকে এলম এবং হেকমত দান করিলাম। (তথা শরীয়তের জ্ঞান এবং নবুয়ত দান করিলাম)। সৎ ও খাঁটী কর্মশীল ব্যক্তিবর্গকে আমি এইরূপে পুরস্কৃত করিয়া থাকি। (যেই ইউসুফ মিসর রাজ্যের ক্ষমতাসীন, শরীয়তের জ্ঞানী এবং নবুয়তের আসনে আসীন হইয়াছেন, সেই ইউসুফের প্রথম জীবনের কাহিনী কিছু বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার সেই জীবনের দুঃখ-যাতনা ভোগের বৈচিত্র্যময় ধারাবাহিক বিবরণ আরও শুন–)

ক্রেতার গৃহে ইউসুফের দারুন পরীক্ষা

(মিসরের উজিরে আযম যিনি ইউসুফকে খরিদ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় স্ত্রীর নিকট রাখিয়াছিলেন। ইউসুফ যখন যৌবনে পড়িলেন তখন) ঐ মহিলা যাহার গৃহে ইউসুফ বসবাস করিতেন অর্থাৎ উজিরে আযমের স্ত্রী), সে-ই ইউসুফকে নিজের প্রতি ফুসলাইতে লাগিল, এমনকি একদিন ঘরের সব দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল, হে ইউসুফ! আমি তোমাকে বলি– তুমি আমার প্রতি আস। (আল্লাহ তাআলার ভয় অন্তরে জাগ্রত থাকিলে কোন পরিস্থিতিই মানুষকে বিপথগামী করিতে পারে না, তাহার এক বিরাট নমুনা স্থাপন করিয়াছিলেন ইউসুফ (আঃ)। ইউসুফ (এইরূপ পরিস্থিতিতেও পরিষ্কার) বলিলেন, আল্লাহ আমাকে কত উত্তম অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন! এমন উপকারী জন প্রভুর আদেশ বিরোধী ও অসন্তুষ্টির কাজ করার ন্যায় অন্যায় অপরাধ আর কি হইতে পারে?) ইহা সুনিশ্চিত যে, অন্যায়কারীর ভালাই কখনও হয় না।

(কি সাংঘাতিক পরিস্থিতি ও অগ্নিপরীক্ষা! একমাত্র আল্লাহ তাআলার প্রতি লক্ষ্য রাখাই এই পরিস্থিতিতে ইউসুফকে রক্ষা করিতে পারিয়াছে)। স্ত্রীলোকটির অন্তরে ত ইউসুফের প্রতি অভিলাষ পূর্ণ মাত্রায় গাঁথিয়া গিয়াছিলই; যদি ইউসুফ স্বীয় প্রভুর অভিজ্ঞান (তথা ইহা যে, গোনাহর কাজ, আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির কাজ তাহা) প্রত্যক্ষ না করিতেন তবে তাঁহার অন্তরেও খেয়াল সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র ছিল না।* আমি ইউসুফকে এই ধরনের জ্ঞান দান করিয়াছিলাম; উদ্দেশ্য ছিল- তাঁহাকে মন্দ, নির্লজ্জতা ও খারাপ কাজ- ছোট বড় সমস্ত গোনাহ হইতে অস্পৃশ্য রাখা। তিনি আমার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন ছিলেন।

(আবদ্ধ দরজার ভিতরে যে উদ্দেশের প্রতি ইউসুফকে ডাকা হইতেছিল,) ইউসুফ তাহা হইতে (রক্ষা পাইবার জন্য) দরজার প্রতি দৌড়িয়া ছুটিলেন, স্ত্রীলোকটিও তাঁহার পেছনে ছুটিল, পিছন হইতে জামা টানিয়া ধরিলে তাহা ছিঁড়িয়া গেল। উভয়ে দৌড়িয়া দরজার বাহিরে গৃহস্বামীকে উপস্থিত পাইল।

ইউসুফের প্রতি চরম আঘাত কিন্তু সত্যের জয়

(গৃহস্বামীকে উপস্থিত দেখা মাত্র) স্ত্রীলোকটি চীৎকার করিয়া উঠিল, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে যে কুকর্ম করিতে ইচ্ছা করিয়াছে জেল ভোগ বা কঠিন শাস্তি ভোগ ছাড়া তাহার সাজা কি হইতে পারে? (অর্থাৎ ইউসুফ আমার সঙ্গে কুকর্ম করিতে চাহিয়াছিল; তাহাকে শাস্তি দেওয়া আবশ্যক)। ইউসুফ (আঃ) বলিলেন, (আমি অপরাধী নহি, বরং) সে-ই নিজে আমার দ্বারা মতলব হাসিলের জন্য আমাকে ফুসলাইতেছিল। এই সম্পর্কে ঐ স্ত্রীলোকটির আপন জনের মধ্য হইতে একজন (অভিনব ধরনের) সাক্ষ্যদাতা (দুগ্ধপোষ্য শিশু ইউসুফের সত্যতার সাক্ষ্যস্বরূপ একটি যুক্তির অবতারণা করিয়া বলিল, যদি ইউসুফের জামা সম্মুখ দিকে ছিড়া হইয়া থাকে তবে স্ত্রীলোকটি সত্যবাদিনী এবং ইউসুফ মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হইবে। আর যদি তাঁহার জামা পিছন দিকে ছিড়া হয় তবে স্ত্রীলোকটি মিথ্যাবাদিনী এবং ইউসুফ সত্যবাদী সাব্যস্ত হইবেন।

যখন গৃহস্বামী দেখিতে পাইল যে, ইউসুফের জামা পিছনের দিক হইতে ছিঁড়া তখন স্ত্রীকে তিরস্কার করিয়া বলিল, ইহা তোমাদের নারী জাতির ধূর্ততা। তোমাদের ধূর্ততা বাস্তবিকই অতি সাংঘাতিক। (ইউসুফ (আঃ) কে বলিলেন,) হে ইউসুফ! যাহা ঘটিয়াছে তাহার জন্য মনে কিছু করিও না। (স্ত্রীকে ইহাও বলিলেন যে,) তুমি নিজের অন্যায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর; বস্তুত তুমিই অপরাধিনী।

* বস্তুত যেকোন রকম পরিস্থিতিতে যত অভিলাষপূর্ণ গোনাহই হউক না কেন আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁহার ভয় অন্তরে জাগ্রত থাকিলে ঐ গোনাহের প্রতি আকর্ষণ মোটেই জন্মিতে পারে না। মানুষ তাহার অন্তরে ঈমান তথা আল্লাহর বিশ্বাস ও ভয় থাকাবস্থায় যেনা-ব্যভিচার, চুরি, ডাকাতি, মদ্যপান ইত্যাদি কোন গোনাহতেই লিপ্ত হইতে পারে না। অতএব মানুষের অন্তরে আল্লাহর বিশ্বাস ও ভয় সৃষ্টি করাই হইল অপরাধপ্রবণতা বন্ধ করার একমাত্র উপায়, অন্য কোন উপায়ে যে তাহা সম্ভব নহে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বর্তমান জগতের অবস্থা, যাহা জ্ঞানী মাত্রই উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

ইউসুফ (আঃ) এই পরিস্থিতিতে একটি অতি প্রয়োজনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন যে, তিনি দরজা বন্ধ দেখিয়া হাত-পা ছাড়িয়া নিষ্কর্মারূপে বসিয়া থাকেন নাই, বরং যেস্থানে তিনি ছিলেন ঐ স্থান হইতে যেহেতু দরজা পর্যন্ত ছুটিয়া আসিতে সামর্থ্যবান ছিলেন। কোন বাধা ছিল না, তাই তিনি সামর্থজনক কর্তব্যটুকু পালন করিতে ইতস্তত না করিয়া সম্মুখপানে দৌড়িলেন; অমনিই আল্লাহর রহমতে বন্ধ দরজা খুলিয়া গেল। এই দৃষ্টান্তটিকে লক্ষ্য করিয়া দার্শনিক কবি মাওলানা রুমী এক সুন্দর উপদেশমূলক কথা বলিয়াছেন- گرچه رخنه نیست عالم راپدید # خیر یوسف وارمیباید دوید

"নিজকে রক্ষা করার জন্য যদি জগতের সমস্ত পথও বন্ধ দেখ- কোন দিকে ছিদ্র না দেখ ,তবুও কিন্তু খবরদার! তুমি হতাশ হইয়া হাত-পা গুটাইয়া নিজকে কলুষে ফেলিও না, বরং ইউসুফের ন্যায় খারাপ কাজ- আল্লাহর নাফরমানী হইতে বাঁচিবার উদ্বেগ লইয়া সম্মুখপানে ছুটিতে থাক।"

এই ব্যবস্থাবলম্বনে আল্লাহ তাআলার রহমতের সাহায্যে সহজে অধিক সাফল্য লাভ হইয়া থাকে। এক হাদীছে কুদসীতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, যে বান্দা আমার প্রতি এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হইবে আমি তাহার প্রতি এক হাত অগ্রসর হইব, সে এক হাত অগ্রসর হইলে আমি তাহার প্রতি এক বাও অগ্রসর হইব। যে আমার প্রতি হাঁটিয়া অগ্রসর হইবে আমি তাহার প্রতি দ্রুতবেগে অগ্রসর হইব যে, দ্রুতবেগে অগ্রসর হইবে আমি তাহার প্রতি দৌড়িয়া অগ্রসর হইব।

(এদিকে ঘটনা গোপন রহিল না– জানাজানি হইয়া গেল, এমনকি) শহরের কতিপয় নারী (দোষারোপ করতঃ) বলিল, আজীজের (তথা উজিরের আজমের) স্ত্রী তাহার পরিচারককে ফুসলাইয়া থাকে তাহার হইতে মতলব সিদ্ধির জন্য; পরিচারকের প্রতি আসক্তি তাহার অন্তরের অন্তস্থলে ঘর করিয়া নিয়াছে; আমরা তাহাকে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে পতিত মনে করি। আজীজের স্ত্রী তাহাদের ঐ দোষারোপ শুনিতে পাইয়া তাহাদের নিকট নিমন্ত্রণ পাঠাইল এবং তাহাদের জন্য ছুরি-চাকু দ্বারা কাটিয়া খাইবার মত খাদ্য সামগ্রী ফলের ব্যবস্থা রাখিল। তাহারা উপস্থিত হইলে পর তাহাদের প্রত্যেককে এক একখানা ছুরি দিল এবং ইউসুফকে বলিল, তুমি একটু তাহাদের সম্মুখে আসিয়া যাও। (বস্তুতঃ ছিলেন এত সুশ্রী সুন্দর ছিলেন যে,) তাহারা যখন তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল তখন তাহাদের দৃষ্টি তাঁহার প্রতি নিবদ্ধ হইয়া রহিয়া গেল, এদিকে তাহাদের হাত কাটিয়া গেল এবং তাহারা একবাক্যে বলিয়া উঠিল, সোবহানাল্লাহ– এ ত মানুষ জাতীয় নহে– এ ত উচ্চ মর্যাদাবান ফেরেশতা ভিন্ন আর কিছু নহে। তখন আজীজের স্ত্রী নিজের ওজর প্রকাশ করতঃ বলিল, এ-ই সেই ব্যক্তি যাহার সম্পর্কে তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলে। শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি তাহাকে ফুসলাইতেছি সত্য, কিন্তু সে সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র রহিয়াছে। আগামীতেও যদি সে আমার আদেশ পুরা না করে, নিশ্চয় তাহার কারাবরণ করিতে হইবে এবং অপদস্থ হইতে হইবে। (নিমন্ত্রিত নারীরাও হযরত ইউসুফকে পরামর্শ দিল যে, তুমি তোমার গৃহকর্ত্রীর কথা রক্ষা কর)।

ইউসুফ (আঃ) কর্তৃক এক বিরাট আদর্শ স্থাপন

এই পরিস্থিতি এবং এই হুমকি-ধমকি! এর মোকাবিলায় ইউসুফ (আঃ) যাহা বলিয়াছিলেন তাহা কিয়ামত পর্যন্ত স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে এবং সারা বিশ্বের জন্য এক যুগান্তকারী উপদেশরূপে পরিগণিত হইবে। তাঁহার তৎকালীন বলিষ্ঠ উক্তি পবিত্র কোরআনের ভাষায় শুনুন। তিনি বলিলেন–

"হে আমার প্রভূ-পরওয়ারদেগার! জেলখানা ও কারাগার আমার নিকট শ্রেয় ঐ কার্য অপেক্ষা যে কার্যের প্রতি এই নারীগণ আমাকে আহ্বান করিতেছে। প্রভু! তুমি আমাকে তাহাদের ফন্দি-ফেরেব হইতে বাঁচাইয়া রাখ; যদি তুমি আমাকে বাঁচাইয়া না রাখ তবে আমি তাহাদের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িতে পারি এবং অজ্ঞানদের দলভুক্ত হইয়া যাইতে পারি।

(ইউসুফের আন্তরিকতা ও কাকুতি-মিনতির) ফলে তাঁহার প্রভু পরওয়ারদেগার তাঁহার দোয়া কবুল করিলেন এবং নারীদের ফন্দি-ফেরেব তাঁহার উপর ক্রিয়াশীল হইতে দিলেন না; নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছু শ্রবণকারী এবং জ্ঞাত।

ইউসুফ (আঃ)-কে কারাগারে প্রেরণ

(ইউসুফ আলাইহিস সালামের সততা ও সত্যতা অকাট্যরূপেই প্রমাণিত ও স্বীকৃত ছিল, কিন্তু আজীজ তথা উজিরে আযমের পরিবার সম্পর্কে একটা খারাপ চর্চা হইতে লাগিল, সুতরাং) অতপর ইউসুফের সততা ও সত্যতার বিভিন্ন দলীল-প্রমাণ দেখা সত্ত্বেও (ঐ চর্চা বন্ধ করার জন্য) সকলে ইহাই সাব্যস্ত করিল যে, ইউসুফকে কিছু দিনের জন্য কারাগারে দেওয়া হউক।

জেলখানার মধ্যে তওহীদের তবলীগ

ইউসুফ (আঃ) যখন কারাগারে গেলেন তখন (রাজ্যপতির) দুই জন পরিচারক (রাজার পানাহারে বিষ মিশ্রণ করার অভিযোগে) কারাগারে পতিত হইল। (পরিচারকদ্বয় একদা একটি স্বপ্ন দেখিল। তাহারা হযরত

ইউসুফের জ্ঞান-গুণ এবং নূরানী চেহারায় তাঁহার প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট ছিল, তাই তাঁহার নিকট স্বপ্ন ব্যক্ত করতঃ) তাহাদের একজন বলিল, আমি স্বপ্নে দেখি, আমি যেন আঙ্গুর হইতে চাপিয়া রস বাহির করিতেছি। (বস্তুতঃ ছিলও সে রাজার পানীয় সংগ্রহকারক)। অপরজন বলিল, আমি দেখিয়াছি, আমি যেন মাথায় রুটির বোঝা উঠাইয়া রাখিয়াছি, আর কতকগুলি পাখী তাহা খাইতেছে। স্বপ্ন বর্ণনান্তে তাহারা বলিল, আপনি আমাদিগকে এই স্বপ্নের অর্থ বলিয়া দিন। আমরা আপনাকে সৎ-সাধু লোক গণ্য করি। (এই সুযোগে) ইউসুফ (আঃ) তাহাদিগকে (তওহীদের দাওয়াত দিবেন, তাই তাহাদিগকে অধিক আকৃষ্ট করার জন্য) বলিলেন, (আমি স্বপ্নের অর্থ ভালরূপেই বলিতে পারিব; আমাকে ত আল্লাহ তাআলা এমন জ্ঞান দান করিয়াছেন যে,) তোমাদের খাদ্য যাহা তোমাদিগকে আহার করিতে দেওয়া হয় তাহা তোমাদের নিকট পৌঁছিবার (এবং তাহা দৃষ্টিগোচর হইবার) পূর্বেই আমি তাহার পূর্ণ বৃত্তান্ত বলিয়া দিতে পারি; এই অসাধারণ বিদ্যা ও অভিজ্ঞান আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার কর্তৃক আমাকে প্রদত্ত।

আমি তোমাদিগকে একটি বিশেষ কথা শুনাইতেছি– আমি এইরূপ লোকদের মতবাদ সম্পূর্ণ বর্জন করিয়াছি যাহারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, পরকালকেও অস্বীকার করে। পরন্তু আমি আমার পূর্বপুরুষ ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের মতবাদের অনুসারী। আমাদের জন্য কখনও সম্ভব হইতে পারে না যে, আমরা আল্লাহর সঙ্গে কোন বস্তুকে শরীক করি। (এই সত্যের সন্ধান লাভ) ইহা হইতেছে আমাদের ও বিশ্বমানবের উপর আল্লাহর একটি অনুগ্রহ; কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, অনেক লোক এই নিয়ামতের কদর বা মূল্য দান (তথা তাহাকে গ্রহণ) করে না।

হে আমার কারাগারের সঙ্গীদ্বয়! বল দেখি– বিভিন্ন প্রভু গ্রহণ করা ভাল, না এক অদ্বিতীয় পরম পরাক্রমশালী আল্লাহকে মাবুদরূপে এককভাবে গ্রহণ করা ভাল?

তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য যত কিছুর উপাসনা কর (সে সবই অবাস্তব–) সেগুলির আছে শুধু নাম, যাহা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা নির্ধারিত করিয়াছ, আল্লাহ এগুলি সম্পর্কে কোন দলীল-প্রমাণ নাযিল করেন নাই।

জানিয়া রাখ, হুকুমের মালিক আর কেহ নাই এক আল্লাহ ব্যতীত। তিনি এই হুকুম করিয়াছেন যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও উপাসনা করিও না– ইহাই হইতেছে সঠিক ও সুদৃঢ় ধর্ম, কিন্তু অনেক লোক তাহা বুঝে না।

অতপর তিনি স্বপ্নের তা'বীর বলিলেন– হে আমার সঙ্গীদ্বয়! তোমাদের একজন– (যে প্রথম দেখিয়াছে সে নির্দোষ সাব্যস্ত হইবে এবং তাহার চাকুরী বহাল থাকিবে; ফলে) সে রাজাকে (পূর্বেরমত) সুরা পান করাইবার কাজ করিবে। দ্বিতীয় জন– (যে দ্বিতীয় স্বপ্ন দেখিয়াছে সে দোষী সাব্যস্ত হইয়া) তাহার শূলদণ্ড হইবে এবং (শূলীকাষ্ঠে) পক্ষীদল তাহার মাথার মগজ খাইবে। তোমরা যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তাহার ফয়সালা ইহাই নির্ধারিত হইয়াছে।

ইউসুফের কারাগার হইতে বাহির হওয়ার সূচনা

(আসামীদ্বয়ের মধ্যে) যাহার সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, (নির্দোষী সাব্যস্ত হইয়া) খালাস পাইবে তাহাকে ইউসুফ (আঃ) বলিয়া দিলেন, তোমার মনিব– রাজার নিকট আমার উল্লেখ করিও। (অতঃপর তাহাই হইল যে, ঐ ব্যক্তি খালাস পাইয়া চাকুরীতে পুনঃ বহাল হইল, কিন্তু) তাহার মনিব তথা রাজার নিকট যে, ইউসুফের উল্লেখ করিবে তাহা শয়তান তাহাকে ভুলাইয়া দিল, ফলে ইউসুফ আরও কতক বৎসর কারাগারে রহিলেন।

তারপর একদা রাজা বলিল, আমি স্বপ্নে দেখিলাম, সাতটি হৃষ্টপুষ্ট গরু– এগুলিকে অন্য সাতটি জীর্ণ শীর্ণ গরু খাইয়া ফেলিতেছে। আরও দেখিলাম, সাতটি তাজা সবুজ রঙ্গের শস্য ছড়া আর সাতটি শুষ্ক। শুষ্ক

সাতটি সবুজ সাতটি ছড়ায়ে জড়াইয়া ধরিয়া শুষ্ক করিয়া ফেলিয়াছে (রাজা তাহার এই স্বপ্ন বর্ণনা করিয়া বলিলেন,) হে আমার দরবারস্থ লোকগণ! তোমরা আমার এই স্বপ্নের অর্থ বলিয়া দাও যদি তোমরা স্বপ্নের তাবীর দানে অভ্যস্ত হও।

উপস্থিত সকলে বলিল, এইগুলি হইতেছে বিবিধ জল্পনা-কল্পনার সমষ্টিগত (বাস্তবহীন) স্বপ্ন। অধিকন্তু আমরা স্বপ্নের তাবীর দানে অভিজ্ঞ নহি। (পূর্বোল্লিখিত আসামীদ্বয়ের যেব্যক্তি খালাস পাইয়াছিল (–যাহাকে ইউসুফ (আঃ) বলিয়াছিলেন যে, তোমার মনিব রাজার নিকট আমার উল্লেখ করিও, কিন্তু সে ভুলিয়া গিয়াছিল) এবং অনেক দিন পর (রাজার এই স্বপ্নের ঘটনা উপলক্ষে স্বপ্নের তাবীর দানে অভিজ্ঞ ইউসুফের কথা) স্মরণ হইল, সে বলিল, আপনাদিগকে আমি এই স্বপ্নের অর্থ জানাইতে পারিব, আমাকে (কারাগারে একজন লোকের নিকট) পাঠাইয়া দিন (তাহাই করা হইল)।

(সে কারাগারে ইউসুফ আলাইহিস সালামের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,) হে ইউসুফ! হে সত্যের প্রতীক! আমাদিগকে তাবীর দান করুন এই স্বপ্ন সম্পর্কে– সাতটি হৃষ্টপুষ্ট গরুকে জীর্ণ-শীর্ণ সাতটি গরু খাইয়া ফেলিতেছে এবং সাতটি তাজা সবুজ শস্য ছড়াকে অপর সাতটি শুষ্ক ছড়া জড়াইয়া ধরিয়া শুষ্ক করিয়া দিয়াছে। এই স্বপ্নের অর্থ কি তাহা আপনি আমাকে বলিয়া দিন, আমি লোকদের নিকট যাইয়া তাহাদেরকে বলিব– তাহারাও জানিয়া যাইবে।

(ঐ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিয়া) হযরত ইউসুফ বলিলেন, এই দেশে তোমরা অনবরত সাত বৎসর ফসল বপন করিতে থাক (এই সাত বৎসর ফসল ভাল জন্মিবে)। এবং শস্য কাটিয়া আনিবার পর তাহা ছড়া ও গুচ্ছের মধ্যেই থাকিতে দিবে, অল্প কিছু মাড়াইয়া লইবে, যে পরিমাণ আহারের আবশ্যক মনে কর। (অবশিষ্ট ফসলগুচ্ছ ছড়াসহ গুদামজাত করিয়া রাখিবে। কারণ,) এর পরই সাতটি বৎসর ভীষণ দুর্ভিক্ষের আসিবে; প্রথম সাত বৎসরের রক্ষিত সমুদয় ফসল এই সাত বৎসরে খাইয়া নিঃশেষ করিবে; শুধু কেবল অল্প পরিমাণ যাহা (অতি কষ্টে) সামলাইয়া রাখিবে (জমিতে বপনের জন্য)। দ্বিতীয় সাত বৎসর পর আবার সুদিন আসিবে যাহাতে মানুষ পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃষ্টির সাহায্য পাইবে এবং ফল-ফলারির রস চিপিয়া জমা করার সুযোগও পাইবে।

(রাজ্যপতির স্বপ্নের এত বড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা– যাহার উপর লক্ষ লক্ষ নর-নারীর জীবন রক্ষা নির্ভর করে– ইহা শুনিতে পাইয়া রাজা হযরত ইউসুফের প্রতি অত্যধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন) এবং রাজা আদেশ করিলেন, (এই ব্যাখ্যাদানকারী) ব্যক্তিকে আমার নিকট এখনই নিয়া আস।

হযরত ইউসুফের আত্ম মর্যাদাবোধের পরিচয়

ঘটনার বিবরণ দানকারীদের মতে; এই সময় হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের দীর্ঘ দশ বৎসর কারাবাসে কাটিয়াছে। অতঃপর স্বয়ং রাজ্যপতির দূত প্রেরণ এবং সসম্মানে রাজদরবারের নৈকট্য লাভের আহ্বান মানুষের পক্ষে কিরূপ হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়; কিন্তু হযরত ইউসুফের নজরে আত্মমর্যাদার মূল্য এতই অধিক ছিল যে, বর্তমান মান-মর্যাদা লাভের উদীয়মান সুযোগ তাঁহাকে উল্লাস ও উৎফুল্লতায় মাতাইতে পারিল না। দশ বৎসর পূর্বের কাহিনী তাঁহার মনে গাঁথিয়াছিল যে, তাঁহার উপর অপবাদ চাপান হইয়াছিল। প্রকাশ্যে ঐ ঘটনার ফয়সালা করিয়া স্বীয় মান-মর্যাদা ও পবিত্রতা প্রমাণ করিতে হইবে।

বাস্তবিকই এই অদম্য আত্ম মর্যাদাবোধের ধারণাও করা যায় না, যাহার মোকাবিলায় দীর্ঘ দশ বৎসর কারাবাসের পর খালাস পাওয়াকেও উপেক্ষা করা হইয়াছে। হযরত ইউসুফের এই বিরাট মনোবল ও মহতী গুণের প্রশংসায়ই রসূলে করীম (সঃ) বলিয়াছেন, যাহা ১৬৩৭ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে–

وَلَوْ لَبِثْتُ طُوْلَ مَالَبِثَ يُوْسُفُ لَاَجَبْتُ الدَّاعِىَ

"ইউসুফ (আঃ) যে দীর্ঘকাল কারাবাসে কাটাইয়াছেন এত দীর্ঘকাল যদি আমি কারাবাসে কাটাইতাম এবং পরে রাজার পক্ষ হইতে দূত আসিয়া আমাকে ডাকিত, তবে নিশ্চয় আমি ঐ ডাকে সাড়া দিয়া বসিতাম।"

হযরত ইউসুফের ধৈর্য ও মনোবল পবিত্র কোরআনের বর্ণনায় লক্ষ্য করুন- যখন (কারাগারে) হযরত ইউসুফের নিকট রাজদূত উপস্থিত হইল (এবং রাজার আহ্বান জানাইল), তখন তিনি বলিলেন, তুমি তোমার মনিব রাজার নিকট ফিরিয়া যাও এবং জিজ্ঞাসা কর- যেসকল নারী (দাওয়াত খাওয়াকালে আমাকে দেখিয়া) নিজ নিজ হাত কাটিয়া ফেলিয়াছিল তাহাদের কোন খোঁজ আছে কিনা? (তাহাদের নিকট ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেই আমার সততা ও সত্যতা প্রমাণিত হইবে। কারণ, তাহাদের সম্মুখে ঘটনার মূল- আজীজের স্ত্রী নিজেই স্বীকারোক্তি করিয়াছিল যে, সে নিজেই আমাকে ফুসলাইয়াছিল, কিন্তু আমি সম্পূর্ণ পবিত্র রহিয়াছি। অধিকন্তু ঐ নারীদের দ্বারা আমার কারাবাসের আসল কারণও জানা যাইবে; তাহাদের সম্মুখেই আজীজের স্ত্রী আমাকে হুমকি দিয়াছিল, আমি তাহার কথামত কাজ না করিলে আমাকে কারাবাস ভোগ করিতে হইবে সুতরাং সেই নারীগণকে খোঁজ করিতে হইবে এবং আমার ঘটনার পূর্ণ তদন্ত করিতে হইবে, তারপর আমি রাজ দরবারে যাইতে পারি- এর পূর্বে নহে)। আমার পরওয়ারদেগার নারী জাতির ফন্দি-ফেরেব সব জানেন। (সুতরাং তাঁহার নিকট ত আমার পবিত্রতা প্রমাণিত আছেই, এখন তদন্তের দ্বারা মানুষ চোখেও তাহা দেখাইতে হইবে)।

হযরত ইউসুফের সততার সাক্ষ্য

(ঐ স্ত্রীলোকগণকে খোঁজ করিয়া আনা হইল)। রাজা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঘটনা কি ছিল যখন তোমরা ইউসুফকে ফুসলাইয়াছিলে? তাহারা একবাক্যে বলিয়া উঠিল, আল্লাহর পানাহ- আমরা তাঁহার মধ্যে বিন্দুমাত্র ত্রুটির সূত্র পাই নাই। আজীজের স্ত্রীও তখন স্পষ্ট বলিয়া ফেলিল, এখন ত বাস্তব সত্য স্পষ্টরূপে প্রকটিত হইয়া গিয়াছে (এখন সত্য গোপনের চেষ্টা বৃথা, অতএব আমিও স্বীকার করিতেছি,) আমিই তাহার দ্বারা মতলব হাসিলের জন্য তাহাকে ফুসলাইয়াছিলাম, সে সম্পূর্ণ খাঁটি ও সত্যবাদী।

সাক্ষ্যপ্রমাণের পর হযরত ইউসুফের উক্তি

অতঃপর ইউসুফ (আঃ) বলিলেন, আমি এই সব সাক্ষ্য-প্রমাণের তৎপরতা এই জন্য দেখাইয়াছি যে, গৃহকর্তা "আজীজ" যেন উপলব্ধি করিতে পারেন যে, আমি তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার সাথে খেয়ানত বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই এবং ইহাও যেন স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়া যায় যে, (নিজের মধ্যে ত্রুটি না থাকিলে) খেয়ানতকারী বিশ্বাসঘাতকদের ফন্দি-ফেরেব আল্লাহ তাআলা শেষ পর্যন্ত চলিতে দেন না।

(যাঁহারা আল্লাহওয়ালা হন তাঁহারা সংযত ও সতর্ক রাখার উদ্দেশে নিজেকে সর্বদা কিরূপ গণ্য করিয়া থাকেন, হযরত ইউসুফের পরবর্তী উক্তি দ্বারা তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায়। ইউসুফ (আঃ) ইহাও বলিলেন,) আমি আমার প্রবৃত্তি সম্পর্কে বলিতে চাই না যে, তাহা দোষমুক্ত (-দোষের সম্ভাবনাই তাহার মধ্যে নাই)। নিশ্চয় মানুষের নফস বা প্রবৃত্তি তাহাকে মন্দের দিকে পরিচালিত করিতে চায়; অবশ্য যাহার প্রতি আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার দয়া করেন (তাহার অবস্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে)। আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার ক্ষমাশীল দয়ালু।

মিসর রাজ্যে হযরত ইউসুফের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা

(সমস্ত ব্যাপার পর্যবেক্ষণের পর) রাজা বলিলেন, তাঁহাকে (ইউসুফকে) আমার নিকট নিয়া আস, আমি তাঁহাকে আমার বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে মনোনীত করিব। ইউসুফ (আঃ) আসিলেন এবং রাজা তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলিলেন। রাজা তাঁহাকে বলিলেন, নিশ্চয় আপনি আজ হইতে বিশ্বাসভাজন, অতি মর্যাদাশালীরূপে রাজকীয় স্বীকৃতি লাভ করিলেন। ইউসুফ (আঃ) বলিলেন, আমাকে রাজ্যের সম্পদ-ভাণ্ডারের কর্তৃ পদে নিয়োগ করুন (সম্মুখে ভীষণ দুর্ভিক্ষ আসিতেছে, এখন হইতে সতর্কতাবলম্বন আবশ্যক;) আমি (সমস্ত সম্পদ) ভালরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিব; ঐ সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা আছে।

(আল্লাহ বলেন,) ঐরূপে মিসরে আমি ইউসুফের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিলাম। (একদিন তিনি এই দেশেই কারাগারের কয়েদী ছিলেন। আজ তিনি এই দেশে বিশিষ্ট কর্তা–) তিনি যথায় ইচ্ছা তথায় বিশেষ মর্যাদার সহিত থাকিতে পারেন। (এ ঘটনায় প্রত্যক্ষরূপে প্রমাণিত হয়, আমি আমার বিশেষ রহমত যাহাকে ইচ্ছা দান করিতে পারি এবং ইহাও প্রমাণিত হয়, সদাচারী লোকদের কর্মফল আমি (দুনিয়াতেও) নষ্ট হইতে দেই না, আর আখিরাতের কর্মফল ত কতই না উত্তম হইবে তাহাদের পক্ষে যাহারা ঈমান এবং তাক্বওয়া অবলম্বনকারী।

হযরত ইউসুফ সমীপে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভাইদের উপস্থিতি

(ইউসুফ (আঃ) মিসরে ধন-ভাণ্ডারের কর্তৃত্ব ভার গ্রহণের উদ্দেশ্যই ছিল আগত মহাদুর্ভিক্ষের মোকাবিলা এবং সেই সময়ে জনসাধারণের খেদমত করা। তিনি স্বীয় পরিকল্পনানুসারে কাজ চালাইতে লাগিলেন। সাত বৎসর পর সমগ্র দেশ ভীষণ দুর্ভিক্ষে পতিত হইল, এমনকি মিসরের নিকটস্থ সিরিয়ায়ও দুর্ভিক্ষ ছড়াইয়া পড়িল। "কানআন" (কেনান) অঞ্চলেও দুর্ভিক্ষ পড়িল। দুর্ভিক্ষের সময় লোকদিগকে মিসরের সরকারী ভাণ্ডার হইতে খাদ্য ক্রয়ের সুযোগ দেওয়া হইল। সাত বৎসর পূর্ব হইতে এই উদ্দেশেই সরকারী ভাণ্ডারকে পুষ্ট করা হইতেছিল। এইসব কাজ পরিচালনার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন ইউসুফ (আঃ)।

আল্লাহ তাআলার মহিমার বিচিত্র লীলা আরম্ভ হইল। দেশ-বিদেশে এই দুর্ভিক্ষের সময় মিশর রাজ্যের খাদ্য বিক্রয়ের খবর ছড়াইয়া পড়িল এবং দূর দূরন্ত হইতে লোকদের আগমন আরম্ভ হইল। (এরই মধ্যে হযরত) ইউসুফের ঐ ভ্রাতাগণও আসিল (যাহারা তাহাকে কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল। তাহারা অন্যান্য লোকদের ন্যায় খাদ্যবস্তু ক্রয়ে হযরত ইউসুফের নিকট উপস্থিত হইল। হযরত ইউসুফ তাহাদিগকে চিনিয়া ফেলিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহাকে চিনে নাই।

(দুর্ভিক্ষের সময় বিক্রয়ে কন্ট্রোল ব্যবস্থা প্রর্বতন স্বাভাবিক এবং তদবস্থায় খাদ্য গ্রহণকারী প্রত্যেক পরিবারের জনসংখ্যার বিবরণ দান আবশ্যক; এই ধরনের কোন ব্যাপারে তাহারা বাড়ীতে অবস্থানকারী বৈমাত্রেয় ভাই "বিনইয়ামীন"-এর নাম উল্লেখ করিয়া থাকিবে, যে ছিল ইউসুফের সহোদর ভাই)।

হযরত ইউসুফ তাহাদিগকে মাল-সামান ঠিক করিয়া দিয়া বলিলেন, আবার আসিতে বৈমাত্রেয় ভাইকে সঙ্গে করিয়া আনিবে। তোমরা ত দেখিতেছ, আমি প্রত্যেক আগন্তুকের জন্য বরাদ্দকৃত পরিমাণ পুরাপুরিভাবে দিয়া থাকি এবং আমি উত্তমরূপে আতিথেয়তা করি। যদি তাহাকে আনিতে না পার তবে আমার নিকট রেশন পাইবে না, বরং তোমরা আমার নিকটেও আসিও না। তাহারা ভাবিল, পিতাকে বুঝ-প্রবোধদানে আমরা এই কাজ সমাধা করিতে পারিব।

হযরত ইউসুফ (ভাইদের সম্পর্কে এই কাজও করিলেন যে,) স্বীয় কার্যনির্বাহকগণকে বলিয়া দিলেন, তাহারা মূল্যরূপে যাহা প্রদান করিয়াছে তাহা (গোপনে) তাহাদের মাল-সামানের মধ্যে রাখিয়া দাও; আশা করা যায়– তাহারা বাড়ী যাইয়া যখন এইসব দেখিবেন তখন আমাদের সহৃদয়তা অনুভব করিয়া পুনরায় আমাদের নিকট আসিতে বিশেষরূপে আগ্রহশীল হইবে।

ভ্রাতাগণের মিসর হইতে প্রত্যাবর্তন

তাহারা যখন পিতার নিকট ফিরিয়া আসিল তখন পিতাকে বলিল, আগামীর জন্য আমাদের রেশন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে –(যদি বিন্‌ইয়ামীনকে সঙ্গে লইয়া না যাই)। অতএব ছোট ভাইকে অবশ্যই আমাদের সঙ্গে পাঠাইবেন; তবেই আমরা রেশন আনিতে পারিব। আমরা বিশেষরূপে তাহার হেফাযত করিব।

পিতা ইয়াকুব (আঃ) বলিলেন, বিন্‌ইয়ামীন সম্বন্ধে তোমাদের প্রতি ঐরূপ বিশ্বাসই করিব যেরূপ তাহার ভ্রাতা (ইউসুফ) সম্বন্ধে পূর্বে করিয়াছি। (অর্থাৎ মনে ত বিশ্বাস জন্মে না, তোমাদের কথা শুনিলাম মাত্র;) সুতরাং আসল বিশ্বাস ইহাই যে, আল্লাহ্ তাআলাই সর্বোত্তম হেফাযতকারী এবং তিনি সর্বাধিক দয়ালু।

অতঃপর যখন তাহারা মাল-সামান খুলিল তখন দেখিতে পাইল, খাদ্য বস্তুর মূল্য তাহারা যাহা কিছু দিয়াছিল তাহা তাহাদিগকে ফেরত দেওয়া হইয়াছে। ইহা দেখিয়া তাহারা বলিল, হে পিতা! আর কি চাই! এই দেখুন– আমাদের প্রদত্ত মূল্য আমাদিগকে ফেরত দেওয়া হইয়াছে। (আমরা ছোট ভাইকে নিয়া পুনরায় তথায় যাইব;) বাড়ীর সকলের রেশন আনিব, ভাইকে হেফাযতে রাখিব এবং (ভাইকে নেওয়ায়) এক উটের বোঝা অতিরিক্ত রেশন লাভ করিব। এইবার আমরা যাহা আনিয়াছি তাহা ত অল্প দিনের জন্য মাত্র।

দ্বিতীয়বার ভ্রাতাগণের মিসর যাত্রা

(এইবার যাত্রাকালে পূর্ব বর্ণিত শর্তানুসারে ছোট ভাই বিন্‌ইয়ামীনকে সঙ্গে নেওয়ার প্রস্তাব করিলে) পিতা ইয়াকুব (আঃ) বলিলেন, তাহাকে আমি কিছুতেই দিতে পারি না যাবত না তোমরা আমার নিকট আল্লাহর কসম করিয়া অঙ্গীকার দাও যে, নিশ্চয় তাহাকে আমার নিকট প্রত্যার্পণ করিবে, অবশ্য যদি বিপদ-আপদে অপারগ হও তবে তাহা ভিন্ন কথা (তাহারা তাহাই করিল)। যখন তাহারা মজবুত ওয়াদা-অঙ্গীকার করিল তখন ইয়াকুব (আঃ) বলিলেন, আমাদের সমুদয় আলোচনা আল্লাহর হাওলা রহিল।

ইয়াকুব (আঃ) পুত্রগণকে এই উপদেশও দিলেন, হে পুত্রগণ! মিসর শহরে প্রবেশ করিতে সকলে একত্রে একই দ্বার দিয়া প্রবেশ না করিয়া বিভিন্ন দ্বারে প্রবেশ করিও। (ইহা একটি বাহ্যিক তদবীর বা ব্যবস্থা অবলম্বন মাত্র– কোন অঘটন ঘটিয়া যাওয়া হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য; যেমন বদ নজর লাগার আশঙ্কা বা বিদেশীদের ভিড় দেখিয়া দেশীয় লোকদের উত্তেজিত হওয়ার আশঙ্কা। নতুবা) আল্লাহ তাআলার হুকুম (তকদীর) হটাইবার ব্যবস্থা করা উদ্দেশ্য নহে। একমাত্র আল্লাহর হুকুমই চলিবে, অতএব তাঁহার উপর আমার সম্পূর্ণ ভরসা এবং যাহারা ভরসা করিতে চায়– আল্লাহর উপরই ভরসা করা চাই।

আর যখন তাহারা স্বীয় পিতার উপদেশ মতে (বিভিন্ন দ্বার ও পথে) মিসরে প্রবেশ করিল (তখন পিতার উপদেশ বাস্তবায়িত হইল); অবশ্য এই ব্যবস্থা আল্লাহর কোন হুকুমকে ঠেকাইতে পারে না, কিন্তু ইয়াকুবের মনে ছেলেদের পক্ষে বাহ্যিক তদবীর স্বরূপ একটা আবেগ আসিয়াছিল, তাহাই তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। (তিনি এই তদবীর খোদার হুকুম রদকারীরূপে গ্রহণ করেন নাই;) তিনি ছিলেন বিশেষ এল্‌মসম্পন্ন, যেহেতু আমি তাঁহাকে বিশেষ এল্‌ম দান করিয়াছিলাম, কিন্তু অনেক লোকই মূল তাৎপর্য বুঝিতে পারে না। (ফলে বাহ্যিক তদবীরকে বাস্তব কর্তা পদের মর্যাদা দেয়)।

হযরত ইউসুফ সমীপে বিন্‌ইয়ামীনের উপস্থিতি

হযরত ইউসুফের নিকট (তাঁহার সহোদর ভাই বিন্‌ইয়ামীনকে লইয়া) যখন (বৈমাত্রেয়) ভাইগণ উপস্থিত হইল তখন তিনি (গোপনে) স্বীয় ভাইকে (আদর যত্নে) নিজের নিকটে স্থান দিলেন এবং বলিলেন, আমি তোমার সহোদর ভ্রাতা (ইউসুফ)। আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর মেহেরবানী করিয়াছেন যে, দীর্ঘদিন পর আমাদের মিলনের সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। অতএব (বৈমাত্রেয় ভাইদের দ্বারা যত দুঃখ-যাতনা পৌঁছিয়াছে সব ভুলিয়া যাও), তাহারা যত কিছু করিয়া আসিতেছিল সে সম্পর্কে মনে দুঃখ রাখিও না।

বিন্‌ইয়ামীনকে রাখিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা

অতঃপর যখন ইউসুফ (আঃ) তাহাদের মাল-সামান ঠিক করিয়া দিলেন তখন ভাই (বিন্‌ইয়ামীন)-এর মাল-সামানের মধ্যে (আমলাদের দ্বারা গোপনে রৌপ্য নির্মিত) একটি পানি পানের পেয়ালা রাখিয়া দিলেন। তরপর (ভাইদের কাফেলা রওয়ানা হইয়া গেল, তখন) এক ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, হে কাফেলার লোকগণ! তোমরা চুরি করিয়াছ তাহারা পেছন দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনাদের কি জিনিষ হারাইয়াছে? তাহারা বলিল, রাজার একটি পেয়ালা (যদ্দ্বারা পানিও পান করা হয়), খাদ্য শস্যও মাপিয়া দেওয়া হয় তাহা হারাইয়াছে; যে ব্যক্তি তাহা বাহির করিতে পারিবে তাহাকে এক উটের বোঝা পরিমাণ খাদ্য শস্য পুরষ্কার দেওয়া হইবে, এ সম্পর্কে আমি (সরকারের পক্ষে) দায়িত্ব লইতেছি।

তাহারা বলিল, খোদার কসম– আপনারাও জানেন যে, আমরা এই দেশে কোন দুষ্কর্মের উদ্দেশে আসি নাই এবং চুরির অভ্যাসও আমাদের নাই।

রাজকীয় লোকগণ বলিল, যদি তোমরা মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হও (অর্থাৎ তোমাদের কাহারও নিকট হইতে ঐ পেয়ালা বাহির হয়) তবে তাহার পরিণাম কি হওয়া চাই? তাহারা বলিল, যেব্যক্তির মাল-সামানের মধ্যে তাহা পাওয়া যাইবে সেব্যক্তি নিজেই ঐ কার্যের পরিণামরূপে গোলাম হইয়া থাকিবে; আমরা এরূপ অন্যায়কারীকে এই শাস্তিই দিয়া থাকি– আমাদের দেশের আইন ইহাই।

এই কথার উপর (কাফেলাওয়ালাদের তল্লাশি লওয়া হইবে–) প্রথমে অন্যদের মাল-সামানের তল্লাশী লওয়া হইল। অতপর ঐ ছোট ভাইয়ের মাল-সামানের মধ্য হইতে পেয়ালা বাহির করা হইল।

(আল্লাহ তাআলা বলেন, ইউসুফ নিজ ভ্রাতাকে রাখা সক্ষম হউক এই উদ্দেশ্যে) আমি ইউসুফের জন্য ঐরূপ গোপন কৌশল (তাঁহার পরিকল্পনায় আনয়ন) করিয়াছিলাম। মিসরের রাজার আইন মতে (চুরি সূত্রেও) ইউসুফ নিজ ভ্রাতাকে রাখিতে পারিত না, কিন্তু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হইয়াছে ইউসুফের এই উদ্দেশ্য পূর্ণ হউক, তাই স্বয়ং কাফেলাওয়ালাদের হাতে বিচার অর্পিত হইল; তাহারা নিজেদের আইনে রায় দিল যাহা হযরত ইউসুফের আকাঙ্খা পূরণে সহায়ক হইল। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,) আমি যাহাকে ইচ্ছা উচ্চ মর্যাদা দান করিয়া থাকি। সকল বিজ্ঞের উপর আছেন বিজ্ঞতম একজন– আল্লাহ তাআলা।

বৈমাত্রেয় ভাইগণ (বিরক্তি ভাবাপন্নরূপে) বলিল, সে যদি চুরি করিয়া থাকে তবে তাহার সম্ভাবনাও আছে; তাহারই এক সহোদর বড় ভাই ছিল, সে পূর্বে একবার চুরি করিয়াছিল।* (ভ্রাতাগণ যে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছিল ইউসুফ (আঃ) তাহা বুঝিতেছিলেন) ইউসুফ (আঃ) একটি কথা মনে মনে বলিলেন–

* এই উক্তিতে তাহারা হযরত ইউসুফকেই ইঙ্গিত করিতেছিল। যাহার ঘটনা এই যে, শিশুকালে ইউসুফের ফুফু তাঁহার অনুগামিনী হইয়া তাঁহাকে নিজের কাছে রাখিবার ফন্দি করিয়াছিল– রূপার একটি চেইন গোপনে ইউসুফের কোমরে গুঁজিয়া প্রচার করিল, চেইন চুরি হইয়াছে। অতঃপর তাহা ইউসুফের কোমর হইতে বাহির হওয়ায় ঐ দেশের নিয়মানুসারে ফুফুর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহাকে তাহার নিকট থাকিতে হইয়াছিল। ভ্রাতাগণ সেই ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করিতেছিল এবং তাহাদের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, এক মায়ের পেটের দুই ভাই; বড় ভাই এক সময় চুরি করিয়াছিল; এখন ছোট ভাইও হয়ত চুরি করিয়াছে।

তাহাদের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন না। তিনি (মনে মনে) বলিলেন, তোমরা ত অধিক অপরাধী, তোমরা ত আমাদেরকে হত্যা করার ব্যবস্থা করিয়াছিলে)। তোমরা (আমাদের দুই ভাইয়ের চুরি সম্পর্কে) যাহা বলিতেছ (উভয় ঘটনাই যে বস্তুতঃ চুরি ছিল না) তাহা আল্লাহ তাআলা ভালরূপে জানেন।

বিন্‌ইয়ামীনকে ছাড়াইয়া নিবার চেষ্টা

অতপর তাহারা বিশেষ অনুরোধের সহিত বলিল, হে আজীজ! * এই ছেলেটির বৃদ্ধ পিতা আছে (সে তাহার জন্য পাগল)। অতএব তাহার স্থলে আমাদের একজনকে রাখিয়া দিন; আমরা আপনাকে অত্যন্ত ভদ্র ও কোমল স্বভাবের দেখিতেছি। হযরত ইউসুফ বলিলেন, আমরা আল্লাহর পানাহ্ চাই, আমাদের বস্তু যাহার নিকট পাইয়াছি সে ভিন্ন অপর একজনকে দোষী করিব না। কারণ, এমতাবস্থায় আমরা অন্যায়কারী সাব্যস্ত হইব।

তাহারা যখন বিন্‌ইয়ামীনের আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল তখন তাহারা তথা হইতে চলিয়া আসিল এবং পরস্পর পরামর্শ করিল। তাহাদের মধ্যে সকলের বড় যে ছিল সে বলিল, তোমাদের স্মরণ নাই কি যে, তোমাদের পিতা আল্লাহর কসম দিয়া তোমাদের হইতে ওয়াদা-অঙ্গীকার লইয়াছিলেন এবং তোমরা পূর্বে একবার ইউসুফ সম্পর্কে কি কেলেঙ্কারি করিয়াছিলে? অতএব আমি এখানেই থাকিয়া যাইব; দেশে যাইব না– স্বয়ং পিতাই আমাকে অনুমতি দেন বা আল্লাহ তাআলা আমার জন্য কোন ফয়সালার ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ তাআলা সর্বোত্তম ফয়সালাকারী। তোমরা পিতার নিকট যাও এবং পিতাকে বুঝাইয়া বল যে, আব্বাজান! আপনার ছেলে চুরি করিয়াছে, আমরা যাহা জানি তাহাই বলিলাম। (চুরির অপরাধে সে আটক রহিয়াছে, সে যে চুরি করিবে তাহা পূর্বে জানি না) এবং গায়েবের কথা আমরা জানিতে পারি না।

(আপনার যদি কোন রকম সন্দেহ হয় তবে) ঐ এলাকাবাসীদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে পারেন যেখানে আমরা ছিলাম এবং ঐ কাফেলার লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যাহাদের সঙ্গে আমরা আসিতেছিলাম। আমরা নিশ্চয় সত্য বলিতেছি। পিতা পূর্বের অভিজ্ঞতানুসারে বলিলেন, এইসব কিছুই নহে, বরং তোমরা একটা ঘটনা গড়িয়া লইয়াছ। সুতরাং পূর্ণরূপে ধৈর্যধারণই আমার পক্ষে শ্রেয়। আমি আশা করি, আল্লাহ তাআলা ইউসুফ, বিন্‌ইয়ামীন– তাহাদের সকলকে এক সঙ্গেই আমার নিকট পৌঁছাইয়া দিবেন, তিনি হইতেছেন সর্বজ্ঞ হেকমতওয়ালা। (ইয়াকুব (আঃ) নবী, তাঁহার সম্মুখে আগাম ঘটনার আভাস ভাসিয়া উঠিল; তাহারই বিবৃতি মুখেও ফুটিল,

ইউসুফের বিচ্ছেদের পুরাতন আঘাতও তাজা হইয়া উঠিল। তিনি সকল হইতে মুখ ফিরাইয়া নিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চক্ষু সাদা (দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত) হইয়া গিয়াছিল এবং চিন্তায় শ্বাস রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সকলে তাঁহাকে (বিরক্তিভরে) বলিল, খোদার কসম– আপনি ত এক ইউসুফের চিন্তা করিতে করিতে রসাতলে যাইবেন জীবন হারাইয়া বসিবেন। তিনি উত্তর দিলেন, আমার সব কিছু দুঃখ-যাতনা, আবেদন-নিবেদন একমাত্র আল্লাহ তাআলার হুজুরে পেশ করিতেছি– তোমাদেরকে ত কিছু বলিতেছি না। আল্লাহ তাআলার সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি তোমরা ততটুকু জান না।

ইউসুফ ও বিনইয়ামীনের খোঁজে গমন এবং ইউসুফের পরিচয় দান

পিতা ইয়াকুব (আঃ) বলিলেন, হে পুত্রগণ! তোমরা বাহির হও; ইউসুফ ও তাহার ভাইকে লাভ করা যায় সেই ব্যবস্থার খোঁজে লাগিয়া যাও; নিরাশ হইও না। নিশ্চয় কাফের জাত ব্যতীত অন্য কেহ আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হয় না।

(ভ্রাতাগণ বিন্‌ইয়ামীনকে মিসরে ছাড়িয়াই ছিল, তাই তথায় উপস্থিত হইল এবং রেশনের বাহানায়

* মিসরের তৎকালীন সাধরণ ভাষায় দেশ শাসনের কর্মকর্তাগণকে "আজীজ" বলা হইত, যেরূপ বর্তমানে আমাদের দেশে "মন্ত্রী" বা "উজির" বলা হইয়া থাকে।

মিসরের সরকারী কর্মকর্তা আজীজের নিকট পৌঁছিল; তিনি ছিলেন ইউসুফ (আঃ)। তাহারা তথায় পৌঁছিয়া (প্রধান কর্মকর্তার সাথে যোগসূত্র সৃষ্টির কৌশলরূপে রেশনের আবদার উত্থাপনে) বলিল, হে আজীজ (মন্ত্রী মহোদয়)! আমরা পরিবারবর্গ লইয়া (দুর্ভিক্ষের দরুন) বিপদে পড়িয়াছি, আমরা অল্প পরিমাণ পুঁজি লইয়া আসিয়াছি। আপনি দয়া করিয়া আমাদিগকে পুরাপুরি (অল্প মূল্যেই) রেশন দিয়া দেন এবং অবশিষ্ট মূল্য আমাদিগকে দান করেন তথা মাফ করিয়া দিন। দানকারীদিগকে আল্লাহ অবশ্যই প্রতিফল দিবেন।

ইউসুফ (আঃ) এইবার ভ্রাতাগণকে বলিলেন, স্মরণ আছে কি? তোমাদের অজ্ঞতার অবস্থায় ইউসুফ ও তাহার সহোদর ভ্রাতার প্রতি কি ব্যবহার করিয়াছিলে? তাহারা হতভম্ব হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনিই কি ইউসুফ? তিনি বলিলেন, হাঁ– আমি ইউসুফ এবং এই বিন্‌ইয়ামীন আমার ভাই; আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। বাস্তবিক– যাহারা গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকে এবং বিপদে ধৈর্যধারণ করে, সেই মহতী লোকদের প্রতিদান আল্লাহ তাআলা নষ্ট হইতে দেন না।

ভ্রাতাগণ স্বীকারোক্তি করিল– খোদার কসম, আল্লাহ তাআলা আপনাকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন এবং আমরা নিশ্চয় অপরাধ করিয়াছি।

ভ্রাতাগণের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা এবং পিতার নিকট নিদর্শন প্রেরণ

ইউসুফ (আঃ) ভ্রাতাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণায় বলিলেন, তোমাদের উপর আজ কোন ভর্ৎসনা নাই, আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন; তিনি সর্বাধিক মেহেরবান। (ইউসুফ (আঃ) আরও বলিলেন,) আমার এই জামাটি পিতার নিকট লইয়া যাও, ইহা পিতার চোখের উপর রাখিলেই তাঁহার হারানো দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিবে। অতঃপর তোমাদের পরিজন সকলকে আমার এখানে নিয়া আস।

পিতা কর্তৃক ইউসুফের সুঘ্রাণ প্রাপ্তি

(যখন হযরত ইউসুফের জামা লইয়া ভ্রাতাদের) কাফেলা মিসর ত্যাগ করিল মাত্র, তখনই (সুদূর "কান্‌আ'ন দেশে) পিতা ইয়াকুব (আঃ) (গৃহবাসীদের নিকট) বলিলেন, যদি তোমরা আমার কথাকে বার্ধক্যের বিভ্রম গণ্য না কর তবে শুন নিশ্চয় আমি ইউসুফের সুঘ্রাণ অনুভব করিতেছি। উপস্থিত সকলে বলিল, খোদার কসম– আপনি ত পুরাতন বিভ্রান্তির মধ্যেই আছেন।

অতঃপর যখন (ইউসুফের) সুসংবাদ বাহক আসিয়া পৌঁছিল এবং ইউসুফের জামা পিতার চোখের উপর রাখিল, তৎক্ষণাৎ তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিল। পিতা ইয়াকুব (আঃ) তখন বলিলেন, আমি পূর্বেই তোমাদিগকে বলিয়াছিলাম, আমি আল্লাহর তরফ হইতে এমন সব বিষয় অবগত হই যাহা তোমরা জান না।

যখন সমস্ত ঘটনা খুলিয়া গেল তখন ইউসুফের বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণ পিতা হযরত ইয়াকুবের নিকট বিনয় করিয়া বলিল, হে আমাদের স্নেহশীল পিতা! আল্লাহর দরবারে আমাদের গোনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নিশ্চয় আমরাই ছিলাম অপরাধী। পিতা বলিলেন, এখনই আমি তোমাদের ক্ষমার জন্য দোয়া করিব; নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল (অতঃপর মাতা-পিতা পরিবারবর্গ কেনান হইতে মিসর যাত্রা করিলেন)।

মাতা-পিতা সকলের ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট উপস্থিতি

(পিতা-মাতার আগমন সংবাদে ইউসুফ (আঃ) তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়া রহিলেন)। যখন সকলে ইউসুফের নিকট পৌঁছিলেন, ইউসুফ (আঃ) স্বীয় মাতাপিতাকে নিজের সঙ্গে রাখিলেন

এবং বলিলেন, সকলে মিসর শহরে চলুন, তথায় ইনশাআল্লাহ আরাম ও শান্তিতে থাকিবেন। গৃহে পৌঁছিয়া ইউসুফ (আঃ) পিতা-মাতাকে রাজকীয় উচ্চাসনে স্থান দিলেন। (সকলের অন্তরে ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধার ঢেউ খেলিতেছিল, এমনকি শ্রদ্ধা নিবেদনের তৎকালীন জায়েয ও প্রচলিত রীতি অনুযায়ী) সকলে হযরত ইউসুফের সম্মুখে সেজদায় পড়িয়া গেলেন।

এই দৃশ্য লক্ষ্য করিয়া ইউসুফ (আঃ) বলিলেন, হে পিতা! আমার অতীত স্বপ্ন চন্দ্র-সূর্য, এগার নক্ষত্র আমার সম্মুখে সেজদা করার তাৎপর্য এই ঘটনাই। চন্দ্র-সূর্য অর্থ মাতা-পিতা, এগার নক্ষত্র অর্থ এগার ভ্রাতা। আমার পরওয়ারদেগার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করিলেন।

আমার পরওয়ারদেগার আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছেন– আমাকে কারাগার হইতে বাহির করিয়াছেন এবং শয়তান কর্তৃক আমার ও ভ্রাতাগণের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির পরও আপনাদের সকলকে দূরদেশ হইতে নিয়া আসিয়া মিলিত করিয়াছেন। আমার প্রভু যাহা করিতে ইচ্ছা করেন সূক্ষ্ম তদবীরের দ্বারা তাহা বিনা বাধায় করিয়া থাকেন, নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, হেকমতওয়ালা।

হযরত ইউসুফের দোয়া

...... فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ اَنْتَ وَلِيّٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ۔ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ۔

(হে আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার! আপনি আমার প্রতি বহু অনুগ্রহ করিয়াছেন–) "হে আসমান-যমীনের তথা সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা! আপনি আমার অভিভাবক ইহকালে ও পরকালে। চিরকাল আমাকে খাঁটি মুসলিম তথা আপনার তাবেদাররূপে রাখিবেন, এই অবস্থায়ই মৃত্যু দান করিবেন এবং নেক লোকদের শামীল রাখিবেন।* (আমীন!)

হযরত আইউব (আঃ)

হযরত আইউবের বংশ ও সময়কাল সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইমাম বোখারীর মতামতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আইউব আলাইহিস সালামের সময়কাল মূসা আলাইহিস সালামের এবং হযরত ইয়াকুব ও হযরত ইউসুফের সময়কালের মধ্যবর্তী সময়ে ছিল, তথা হযরত মূসার পূর্বে এবং হযরত ইয়াকুব ও হযরত ইউসুফের পরে। অধিকাংশ ঐতিহাসিক এই মত সমর্থন করেন।

---

* মিসরের তৎকালীন সাধরণ ভাষায় দেশ শাসনের কর্মকর্তাগণকে "আজীজ" বলা হইত, যেরূপ বর্তমানে আমাদের দেশে "মন্ত্রী" বা "উজির" বলা হইয়া থাকে।

* হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাহিনীর বিরাট অংশের উল্লেখযোগ্য মহিলাটি সর্বসাধারণ্যে "জোলেখা" নামে পরিচিতা। সেই জোলেখার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে নানারূপ উপকথা বর্ণিত আছে। এক বর্ণনায় আছে, হযরত ইউসুফ (আঃ) শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরই জোলেখার স্বামী উজিরে আজমের ইন্তেকাল হইয়া যায়। সে যেহেতু নপুংসক ছিল, তাই জোলেখা তখনও কুমারী ছিলেন। স্বয়ং রাজার মাধ্যমে হযরত ইউসুফের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর ইউসুফ (আঃ) কৌতুক করিয়া একদিন বলিলেন, তুমি যাহা চাহিয়াছিলে বর্তমান ব্যবস্থা তাহা অপেক্ষা কত উত্তম ইয়াছে! জোলেখা লজ্জিত স্বরে ওজর বর্ণনা করিলেন।

আর এক বর্ণনায় আছে, একদা জোলেখা অভাবে পড়িয়া হযরত ইউসুফের দরবারে আসিলেন এবং তাঁহার বর্তমান অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, সমস্ত প্রশংসার যোগ্য ঐ মহান আল্লাহর যিনি তাঁহার তাবেদারীর বদৌলতে গোলামকে বাদশাহ বানান এবং তাঁহার নাফরমানীর পরিণামে বাদশাহকে গোলাম বানান। ইউসুফ (আঃ) তাঁহার প্রয়োজন পুরা করিয়া দিলেন এবং পরে তাঁহার সঙ্গে পরিণয়ে আবদ্ধ হইলেন। আল্লাহ তাআলা স্বীয় কুদরতে তাঁহার কৌমার্য ও সৌন্দর্য পুনঃ দান করিলেন।

এক বর্ণনায় আছে– বিবাহের পর জোলেখার প্রতি হযরত ইউসুফের মহব্বত অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছিল। আর জোলেখার মহব্বত কম হইয়া গিয়াছিল। ইউসুফ (আঃ) এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আপনার উসিলায় আল্লাহর মহব্বত এই পরিমাণ লাভ হইয়াছে যে, তাহার সম্মুখে অন্য সব মহব্বত ম্লান হইয়া গিয়াছে।

হযরত আইউবের বংশ তালিকা সম্পর্কে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতামতও উল্লিখিত সিদ্ধান্তের অনুকূল। তাহাদের মত এই যে, আইউব (আঃ) হযরত ইব্রাহীমের বংশধর। হযরত ইব্রাহীমের স্ত্রী ছারাহ (আঃ)-এর পক্ষের পুত্র হযরত ইসহাকের এক পুত্র ছিল ইয়াকুব যাঁহার অন্যনাম ইসরাঈল; তাঁহার হইতে বনী-ইসরাঈলের বংশ। হযরত ইসহাকের আর এক পুত্র ছিল "ঈসু" তাহার অন্য নাম "আদুম", আইউব (আঃ) তাঁহার বংশের একজন। আইউব (আঃ) দুই বা তিন জন পিতা-পিতামহের মাধ্যমে আদুমের সঙ্গে মিলিত হন।

হযরত আইউবের বংশ পরিচয় লাভের পর তাঁহার আবাস ভূমির খোঁজ সহজেই লাভ হয়। কারণ তিনি "আদুম" বংশের লোক। আদুমী জাতির অবস্থান যে অঞ্চলে ছিল সেই অঞ্চলটি এশিয়ার অন্তর্গত (বর্তমানে জর্দান রাজ্যের আওতাভুক্ত) মরু সাগর- "Dead sea" ও আকাবা উপসাগরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। উত্তরে মরু সাগর ও ফিলিস্তীন, দক্ষিণে আকাবা উপসাগর ও মাদইয়ান, পশ্চিমে সাইনা উপত্যকা, পূর্বে আরবের উত্তর সীমান্ত ও "মাওয়াব" অঞ্চল।

অবশ্য আদুমী জাতির আবাস অঞ্চল পরবর্তীকালে আরও বিস্তার লাভ করিয়া মরু সাগর হইতেও উত্তরে অনেক দূর পর্যন্ত পৌছিয়াছিল; যাহার কতিপয় শহরের নাম "তওরাত" কিতাবেও উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে "বোসরা" (ইরাকস্থিত "বসরা" নহে) শহরের নামও আছে। আরব ভূখণ্ডের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ফিলিস্তীনের নিকটবর্তী মরু সাগর হইতে প্রায় এক শত মাইল উত্তরে মরু সাগর ও দামেশকের মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত; এখনও বোসরা নামেই প্রসিদ্ধ। হযরত রসূলে করীমের যুগেও " বোসরা" গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল। আইউব (আঃ) এই "বোসরা" শহরেরই অধিবাসী। (আরজুল-কোরআন ২য় খণ্ডঃ ১, ২৮, ৩৮ পৃঃ)।

কোরআন শরীফে হযরত আইউব আলাইহিস সালামের বিশেষ কোন ঘটনা বর্ণিত হয় নাই। শুধু কেবল তাঁহার একটি ব্যক্তিগত ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছিলেন- কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন ধনে-জনে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। সেই পরীক্ষায় তিনি অসীম সবরের পরিচয় দান করিয়াছিলেন। কষ্ট-যাতনা ধৈর্যের সীমা অতিক্রমকারী ছিল, কিন্তু তিনি এক মুহূর্তের জন্যও সবর ভঙ্গ করেন নাই। আল্লাহ তাআলার সঙ্গে নিজের সম্পক বহাল রাখিয়াই নয় শুধু বরং বিপদের কঠোরতা ও আধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলার প্রতি অধিক ধাবিত হইলেন। ফলে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে তাঁহাকে সবরের সুফল প্রদান করিয়াছিলেন। বিশ্ববাসীকে সবর শিক্ষাদান এবং তাহার প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশে আল্লাহ তাআলা তাঁহার সেই পরীক্ষা ও সবরের ইতিহাস পবিত্র কোরআনে নিম্নোক্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন- وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

আইউবের ঘটনা স্মরণ কর; যখন তিনি স্বীয় প্রভুকে ডাকিলেন, হে প্রভু! আমার উপর কষ্ট-যাতনা পড়িয়াছে; আপনি সকল দয়ালের শ্রেষ্ঠ দয়াল; আমাকে কষ্ট-যাতনা হইতে রক্ষা করুন।

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ـ

আমি তাঁহার আবেদন মঞ্জুর করিলাম, সেমতে তাঁহার কষ্ট-যতনা সমূলে দূর করিয়া দিলাম; তাঁহার হারান পরিজনবর্গ পুনঃ দান করিলাম এবং ঐ পরিমাণ তৎসঙ্গে আরও দান করিলাম- ইহা আমার রহমত ছিল। এই ঘটনায় অনেক শিক্ষা রহিয়াছে এবং আল্লাহর গোলামীকারীদের জন্য ধৈর্যের সুফল লাভের চিরস্মরণীয় নিদর্শন রহিয়াছে। (সূরা আম্বিয়া- পারা -১৭; রুকু- ৬)

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوْبَ ـ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ـ اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ـ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ ـ وَوَهَبْنَا لَهٗ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ـ

আমার বিশিষ্ট বান্দা আইউবের ঘটনা স্মরণ কর। যখন তিনি স্বীয় প্রভুকে ডাকিলেন, হে প্রভু! শয়তান আমাকে কষ্ট-যাতনায় ফেলিয়াছে। (আমাকে রক্ষা করুন। আল্লাহ বলেন, তাঁহাকে বলিলাম,) নিজ পা দ্বারা যমীনে আঘাত করুন। (তাহাতে তৎক্ষণাৎ এক পানির ঝরণা বাহির হইল; আল্লাহ তাআলা বলিলেন,) ইহা আপনার গোসলের জন্য ঠাণ্ডা পানির স্থান এবং পান করিবার জন্য। (আইউব (আঃ) ঐ পানিতে গোসল এবং তাহা পান করিয়া আরোগ্য লাভ করিলেন। এইরূপে) আমি তাঁহাকে রোগ হইতে মুক্তি দিয়াছি। আর তাঁহার পরিজনবর্গ এবং আরও অধিক পরিমাণ দান করিয়াছি। (ইহা ছিল তাঁহার প্রতি) আমার বিশেষ রহমত এবং জ্ঞানী লোকদের জন্য স্মরণীয় উপদেশস্বরূপ।

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهٖ وَلَاتَحْنَثْ - اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا - نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهٗ اَوَّابٌ -

আরও (এক অনুগ্রহ যে, আইউবকে সুযোগ দিয়াছিলাম,) এক মুষ্টি তৃণগুচ্ছ হাতে লইয়া তাহা দ্বারা স্ত্রীকে মারুন এবং কসম ভঙ্গ করিবেন না। নিশ্চয় আইউবকে আমি ধৈর্যশীল পাইয়াছিলাম; নিশ্চয় তিনি ছিলেন অতি মহৎ বান্দা, আমার প্রতি বিশেষ অনুরাগী। (সূরা সেয়াদঃ পারা- ২৩, রুকু-১৪)

আইউব (আঃ) আল্লাহর আদেশ মতে ঐ পানিতে গোসল করিলেন এবং পানি পান করিলেন; সেই অছিলায় আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে রোগমুক্ত করিলেন।*

এইরূপে হযরত আইউবের শারীরিক বিপদ দূরীভূত হইল; তিনি পূর্ণ স্বাস্থ্য পুনঃ লাভ করিলেন। অতঃপর তাঁহার ধন-জনের ক্ষতি পূরণও হইল। কাহারও মতে আকস্মিক মৃত্যুমুখে পতিত তাঁহার সন্তান-সন্ততি আল্লাহ তাআলার কুদরতে জীবিত ইয়া উঠিল তদুপরি আরও সন্তান জন্ম লাভ করিল। অধিকাংশের মতে মৃতগণ জীবিত হয় নাই, কিন্তু নূতনভাবে যে সন্তান-সন্ততি জন্মিয়াছিল তাহারা গুণে-জ্ঞানে এবং সংখ্যায় পূর্ব সন্তানগণ অপেক্ষা দ্বিগুণ ছিল।

ধন-দৌলতের দিক দিয়াও তাঁহার পূর্বাপেক্ষা বহু আধিক্য লাভ হইল, এমনকি আল্লাহ তাআলার কুদরতে ঘাটে-মাঠে তাঁহার উপর স্বর্ণ-পতঙ্গ ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া পড়িত- যেমন প্রথম খণ্ডে ২০৩ নং হাদীছে একটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আইউবের স্ত্রী অতিশয় নেককার এবং স্বামীভক্তা ছিলেন। হযরত আইউব কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলে সকল বন্ধু-বান্ধবই তাঁহাকে ছাড়িয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু স্ত্রী তাঁহাকে মুহূর্তের জন্যও ত্যাগ করেন নাই, ঐ অবস্থায় তিনি জানে-প্রাণে তাঁহার খেদমতে লাগিয়া থাকিতেন। একদা তাঁহার দ্বারা কোন একটু ত্রুটি হইয়া গেল। রুগ্ন আইউব (আঃ) তাহাতে ভীষণ চটিয়া গেলেন, এমনকি কসম করিয়া বসিলেন যে, সুস্থ হইলে তিনি তাঁহাকে একশত বেত্রাঘাত করিবেন। রাগের সময় কসম খাইয়া বসিয়াছেন; কিন্তু যেহেতু স্ত্রীর অপরাধও সামান্য ছিল, তাই পরবর্তীকালে আইউব (আঃ) নিজেও এই কসমে অনুতপ্ত ছিলেন নিশ্চয়; এতদ্ভিন্ন এইরূপ স্বামীভক্তা নেককার স্ত্রী সামান্য ত্রুটিতে বেত্রাঘাত খাইবেন তাহাও অসহনীয়। এদিকে কসম ভঙ্গ করাও সাধারণ ব্যাপার নহে।

এইসব ব্যাপারেও হযরত আইউবের প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ হইল। আল্লাহ তাআলা কসম পূরণের বিধানে শুধু তাঁহার পক্ষে এক বিশেষ সংশোধনী দিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে আদেশ করিলেন,

* বহু সমালোচিত পণ্ডিত তাঁহার অভ্যাসের দাসত্বে رکض। শব্দের অর্থ অভিধান গ্রন্তের নাম ভাঙ্গাইয়া এই তফসীর করিয়াছেন যে, আল্লাহ আইউবকে আদেশ করিলেন-"তুমি দ্রুত পদে পলায়ন কর; এই দেখ গোসল করার ও পান করার পানি এখানে মওজুদ আছে।"

পণ্ডিত সাহেবের এই উদ্ভট অপব্যাখ্যা সম্পর্কে এতটুকুই জিজ্ঞাস্য যে, দীর্ঘ তেরশত বৎসরে শত শত তফসীর বিশেষজ্ঞ ইমামগণের কেহ আপনার এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন কি? করিয়া থাকিলে কোন তফসীরে তাহা লিপিবদ্ধ আছ?

আমরা যে তফসীর বর্ণনা করিয়াছি তাহা ইবনে জরীর, রুহুল মাআনী, দুররে মনসুর ইত্যাদি প্রসিদ্ধ তফসীরের কিবাতসমূহে বর্ণিত আছে। অধিকন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ) এর চাচাত ভাই ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতেও উক্ত তফসীর বর্ণিত হইয়াছে। (দুররে মনসুর)

একশত তৃণের গুচ্ছ হাতে লইয়া তাহার দ্বারা স্ত্রীকে একবার প্রহার করুন; তাহাতেই একশ'ত বেত্রাঘাত করার কসম পূর্ণ গণ্য হইবে। অন্য কাহারও পক্ষে এই নিয়মে কসম পুরা হইবে না– ইহা শুধু হযরত আইউবের জন্য আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ছিল।*

উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে চারিটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত দান করা হইয়াছে–(১) হযরত আইউবের কষ্ট-যাতনা, (২) ঠাণ্ডা পানির ঝর্ণা, (৩) পূর্বের পরিজনবর্গ এবং আরও তৎপরিমান অধিক প্রদত্ত হওয়া, (৪) একমুষ্টি তৃণগুচ্ছ দ্বারা প্রহার করতঃ কসম ভঙ্গ করা হইতে নিষ্কৃতি লাভ। এই চারিটি বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বিবরণ আবশ্যক। নিম্নে এই সব বিষয়ের সমষ্টিগত একটি বিবরণ দান করা হইতেছে।

আইউব (আঃ) ধনে-জনে, স্বাস্থ্যে-সম্পদে, সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে পুষ্ট ছিলেন। এই অবস্থায় তিনি আল্লাহ তাআলার শোকরগুজারী করিয়া থাকিতেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার মর্তবা আরও বাড়াইবার জন্য এবং বিশ্ববাসীকে ধৈর্যের স্বরূপ দেখাইবার জন্য তাঁহাকে পরীক্ষায় ফেলিলেন। তাঁহার শস্য-ফসল সব নষ্ট হইয়া গেল, পশুপাল মরিয়া গেল, আওলাদ-ফরজন্দ নিখোঁজ ও বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল বা আকস্মিক দুর্ঘটনায় মরিয়া গেল, নিজে কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেন– এমতাবস্থায় বন্ধু-বান্ধব সব পৃথক হইয়া গেল; শুধু স্ত্রী তাঁহার খেদমতে নিয়োজিত হইয়া রহিলেন।

হযরত আইউবের রোগ সম্পর্কে অনেক বিবরণ দেখা যায়, কোনটা অতিরঞ্জিতও মনে হয়। কোরআন-হাদীছে নির্দিষ্ট রোগের উল্লেখ নাই। এ সম্পর্কে দুইটি বিষয় সুস্পষ্ট– (১) রোগ অতি কঠিন ছিল (২) এই শ্রেণীর রোগ নিশ্চয় ছিল না যাহা সর্ব সাধারণের ঘৃণার কারণ হয়; আল্লাহ তাআলা পয়গাম্বরকে এইরূপ অবস্থায় ফেলেন না যাহাতে তাঁহার প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মে, নতুবা নবুয়তের উদ্দেশ্য– সর্বসাধারণের হেদায়াত কার্যে ব্যাঘাত ঘটিবে।

শয়তান কষ্ট-যাতনায় ফেলিয়াছে এই উক্তির ব্যাখ্যা

কষ্ট-যাতনা ও রোগ-শোকের বাহ্যিক ও নিকটবর্তী কার্যকারণ কোন কিছু থাকে বটে, কিন্তু অনেক সময় সব কিছুর গোড়ায় অন্য একটি মূল কার্যকারণ এই থাকে যে, কোন গোনাহ ও আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির কাজ করা হইয়াছে তদ্দরুন বিপদ আসিয়াছে শাস্তির জন্য বা গোনাহ মাফ হইয়া যাওয়ার জন্য। এই মূল

---

* পূর্বোল্লিখিত পণ্ডিত সাহেব এস্থলেও অপব্যাখ্যার সমাবেশ করিয়াছেন এবং স্বভাবগত অভ্যাসের দাস হইয়া لا تحنث শব্দের আভিধানিক পাণ্ডিত্য দেখাইতে যাইয়া একটি মনগড়া সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, حنث শব্দের আসল অর্থ "পাপ, গোনাহ"। অতঃপর তিনি সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন; "স্মরণ রাখিতে হইবে যে, "কসম ভঙ্গ করা" অর্থ ঐ শব্দের আসল তাৎপর্য নহে। এই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়াই একটা নিজের মনগড়া আজগুবি গোঁজামিলকে পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যারূপে প্রাধান্য দিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, তিনি বাংলাভাষায় পাণ্ডিত্যের জোরে অন্যান্য ভাষাকেও ঠেলিয়া নিয়া যাইতে চেষ্টা করেন এবং লাগামহীনভাবে সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন। তিনি যদি আরবী ভাষায় সাধারণ জ্ঞানও রাখিতেন তবে ঐরূপ বাস্তবের বিপরীত স্বপ্ন দেখিতেন না।

আরবী ভাষায় কোন শব্দের আসল অর্থ এবং তাহার উপঅর্থ জানিতে হইলে কোন পণ্ডিতের গবেষণার আবশ্যক হয় না, তাহার জন্য বিশেষ অভিধান বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই শ্রেণীর সর্বাধিক সুপ্রসিদ্ধ অভিধান "আসাসুল বালাগাহ" হইতে আলোচ্য حنث শব্দ সম্পর্কে একটু উদ্ধৃতি পেশ করিতেছি–

حنث فى يمينه حنثا ۔ وقع فى الحنث ومن المجاز بلغ الغلام الحنث (وكانوا يصرون على الحنث العظيم) وهو الذنب استعير من حنث الحانث الذى هو نقيض البر ۔

অর্থাৎ حنث শব্দের আসল অর্থ "কসম ভঙ্গ করা" পক্ষান্তরে তাহার একটি উপঅর্থ হয় গোনাহ ও পাপের অর্থ;وكانوا يصرون على الحنث العظيم এই আয়াতে ঐ উপঅর্থই উদ্দেশ করা হইয়াছে। গোনাহ বা পাপের উপঅর্থ حنث শব্দের আসল অর্থ "কসম ভঙ্গ করা" হইতে হাওলাত স্বরূপ গ্রহণ করা হয়।

পাঠকবৃন্দ! লক্ষ্য করুন, পণ্ডিত সাহেব তাহার গোঁজামিলপূর্ণ ব্যাখ্যায় শুধু যে তফসীর বিশেষজ্ঞ ইমামগণের বরখেলাফ করিয়াছেন তাহাই নহে, বরং আভিধানিক বিষয়াবলীতেও ভুল সিদ্ধান্তের ও অবাস্তব তথ্যের আশ্রয় লইয়াছেন। এই ব্যক্তির পক্ষে পবিত্র কোরআনের তফসীরকার সাজা কি সমীচীন হইয়াছে!

কার্যকারণ তথা "গোনাহ"-র মূল সূত্র হইল শয়তান; মানুষ শয়তানের প্ররোচনায়ই গোনাহ করিয়া বসে। এইরূপে সূত্রের সূত্র হিসাবে অনেক ক্ষেত্রে রোগ-শোক, কষ্ট-যাতনার মূল সূত্র দাঁড়ায় শয়তান।

হযরত আইউবের রোগ আল্লাহ তাআলার পক্ষ হইতে বস্তুতঃ তাঁহার মর্তবা বাড়াইবার জন্য পরীক্ষা স্বরূপ ছিল, তাঁহার কোন গোনাহের কারণে ছিল না। কিন্তু আইউব (আঃ) নম্রতাবশে ভাবিলেন, শয়তানের কারসাজিতে আমার দ্বারা কোন ত্রুটি হইয়াছে, যার ফলে বিপদ আসিয়াছে। তাই তিনি বলিয়াছেন مسنى الشيطان بنصب وعذاب "শয়তান আমাকে কষ্ট-যাতনা পৌঁছাইয়াছে।"

আইউব (আঃ) নবী হইয়াও কষ্ট-যাতনায় নিজেকে অপরাধী গণ্য করিয়াছিলেন, শয়তানকে শত্রুরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের সর্ব-সাধারণের পক্ষে এই আদর্শ অবলম্বন করা অতি কল্যাণময় ও মঙ্গলজনক। কারণ, এই উপলব্ধির ফলে বিপদ-আপদের ন্যায় কঠিন সময়েও মানুষের জন্য এনাবত-ইলাল্লাহ তথা আল্লাহর প্রতি রুজু ও আল্লাহর আনুগত্যের পথ সহজ হইয়া যায় এবং বিপদের কারণে (মাআযাল্লাহ) আল্লাহর প্রতি বিরূপ ভাব সৃষ্টি না হইয়া শয়তানের প্রতি শত্রুতার ভাব বাড়িয়া যায়, যাহা মানুষের জন্য মঙ্গলজনক।

আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন- اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ـ

"নিশ্চয় জানিও, শয়তান তোমাদের ঘোর শত্রু, তোমরা সর্বদা তাহাকে শত্রুই গণ্য করিও।"

আইউব (আঃ) যে সব বিষয়ে পরীক্ষিত হইয়াছিলেন তাহা পবিত্র কোরআনের বিঘোষিত পরীক্ষণীয় বিষয় ছিল। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন-

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ـ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ـ اَلَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ ـ

অর্থঃ আর জানিয়া রাখিও, নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করিব (কম বা বেশী) কিছু পরিমাণ ভয়-ভীতি দ্বারা (তথা শত্রুর বা বিপদের আক্রমণ দ্বারা) এবং অনাহারীর (তথা খাদ্য-খাবারের অভাব-অনটন দ্বারা) এবং ধন-সম্পদ, জন-ফরজন্দ ও ফল-মূলের বিনষ্টির দ্বারা। সুসংবাদ শুনাইয়া দিন ঐ সব ধৈর্যাবলম্বনকারীকে যাঁহারা বিপদের সময় মনে-মুখে পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত বলিয়া থাকেন, "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন"-আমরা সকলেই আল্লাহ তাআলার (তথা আমরা আল্লাহ তাআলার সর্বপ্রকার ক্ষমতার আওতাভুক্ত; অতএব তিনি আমাদিগকে যেকোন অবস্থায় রাখিতে পারেন; তহাতে আমাদের কিছু ভাবিবার নাই)। এবং নিশ্চয় আমরা সকলে আল্লাহ তাআলার প্রতি ফিরিয়া যাইব, (অতএব আমাদের ইহকালীন দুঃখ-কষ্ট বিফল যাইবে না, তাঁহার নিকট পৌঁছিলে তিনি নিশ্চয় আমাদিগকে সবরের মেওয়া দান করিবেন)।

এইরূপ ধৈর্যশীলদের প্রতি তাঁহাদের প্রভুর পক্ষ হইতে শত ধন্যবাদ এবং রহমত; আর তাঁহারাই সঠিক পথের পথিক। (পারা- ২, রুকু- ৩)

আইউব (আঃ) সীমাহীন বিপদে পড়িলেন, কিন্তু বিপদের স্রোতে ভাসিয়া প্রভুহারা হইলেন না; বরং সেই স্রোত তাঁহাকে অধিক দ্রুত ধাবিত করিল তাঁহার প্রভুর প্রতি। বিপদাবস্থায় তাঁহার এনাবত ইলাল্লাহ- আল্লাহর প্রতি আনুরাগ অধিক বৃদ্ধি পাইল, তিনি পূর্ণ সবরের পরিচয় দিলেন। ফলে আল্লাহ তাআলার বিঘোষিত নীতির বিকাশ আরম্ভ হইল- সবরে মেওয়া ফলনের রীতি বাস্তবায়িত হইল।

প্রথমে আল্লাহ তাআলা গায়েবী মদদে হযরত আইউবের আরোগ্যের ব্যবস্থা করিলেন। আল্লাহ তাআলা হযরত আইউবকে বলিলেন, "আপনি মাটির উপর পদাঘাত করুন।" আইউব (আঃ) তাহা করিলে তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তাআলার কুদরতে তথায় ঠাণ্ডা পানির ঝর্ণা আবিষ্কার হইল। যেরূপ হযরত ইসমাঈলের শৈশবে তাঁহার জন্য যমযম কূপের সৃষ্টি হইয়াছিল যাহা আজও বিদ্যমান আছে।

আইউব (আঃ) আল্লাহ তাআলার এই সব নেয়ামত লাভ করিলেন– ইহা তাঁহার সবরের জাগতিক ফল ছিল। তাহাই আল্লাহ তাআলা সকল নেয়ামত উল্লেখান্তে বলিলেন–انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب "নিশ্চয় আইউব আমার নিকট বড়ই ধৈর্যশীল প্রমাণিত হইয়াছিলেন, তিনি ছিলেনও অতি মহৎ বান্দা, আমার প্রতি রুজুকারী ও অনুরাগী।"

হযরত মূসা (আঃ)

বনী ইস্রাঈল বংশের প্রসিদ্ধ রসূল মূসা (আঃ) এবং তাঁহারই বয়োজ্যেষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা হারুন (আঃ) তাঁহাদের পিতার নাম ছিল এমরান। ইসরাঈল তথা হযরত ইয়াকুবের সঙ্গে মাত্র তিন জন পিতা-পিতামহের মাধ্যমে হযরত মূসার বংশ মিলিত হয়। হযরত মূসার পিতামহের পিতামহ ছিলেন ইয়াকুব (আঃ)।

হযরত মূসার পয়গাম্বরীর যমানায় তাঁহার সাধারণ সম্পর্ক সুয়েজ ও সুয়েজ উপ সাগরের পূর্বপারে সাইনা বা সীনা উপত্যকা, ফিলিস্তীন, সিরিয়া, ইত্যাদির সঙ্গে ছিল; কিন্তু তাঁহার জন্ম ছিল সুয়েজের পশ্চিম পারস্থিত মিসরে।

বনী ইস্রায়ীলের আসল আবাস ভূমি ছিল ফিলিস্তিনের "কান্‌আন" শহর এলাকায়, কিন্তু হযরত ইয়াকুবের শেষ আমলে হযরত ইউসুফের ঘটনায় তাঁহারা তথা হইতে মিসরে আসিয়াছিলেন; বিস্তারিত বিবরণ হযরত ইউসুফের বর্ণনায় বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত মূসার জন্ম

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে হযরত ইউসুফ (আঃ) খৃষ্ট সনের প্রায় ১৬০০ বৎসর পূর্বে মিসরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাহার কতেক বৎসর পর হইতেই বনী ইসরাঈল মিসরে আবাদ হইল। এর প্রায় ৩০০/৩৫০ বৎসর পর হযরত মূসার জন্মের যুগ। ঐ যুগে মিসরে রাজাগণের প্রত্যেকেরই উপাধি হইত " "ফেরআউন"। খৃষ্টপূর্ব ১২৯২ হইতে ১৩১৫ পর্যন্ত যে ফেরআউনের রাজত্ব ছিল, তাহারই আমলে মিসরে হযরত মূসার জন্ম হয়। উক্ত হিসাব মতে হযরত মূসার জন্ম খৃষ্টপূর্ব (১২০০) দ্বাদশ শতাব্দীর যুগে। (কাসাসুল কোরআন)

কাহারও মতে তাঁর জন্ম খৃষ্টপূর্ব (১৬০০) ষষ্ঠদশ বা (১৭০০) সপ্তদশ যুগে এবং তাহাদের মতে মিসরে হযরত ইউসুফের প্রবেশ খৃষ্টপূর্ব (২০০০) বিংশ শতাব্দী যুগ ছিল। (আরজুল কোরআন) হযরত মূসার জন্মের সঙ্গে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা জড়িত; ঐ সবের বিবরণ পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে।

হযরত মূসার জন্ম এমন কঠিন সময়ে হইয়াছিল যখন, মিসরস্থ দুর্ধর্ষ রাজা ফেরআউনের আদেশবলে বনী ইসরাঈল বংশের নবজাত প্রত্যেকটি ছেলে সন্তানকে মারিয়া ফেলা হইত। কারণ, জ্যোতিষগণ তাহাকে খবর দিয়াছিল যে, এই বনী-ইসরাঈল বংশে জন্মগ্রহণকারী একজন পুরুষের হাতে তাহার ধ্বংস ঘটিবে, তাই সে তাহার মোকাবিলায় ঐ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল। আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরতের লীলা– ঐ সময়ে হযরত মূসা (আঃ) উক্ত ফেরআউনেরই শাসন এলাকায় তাহার রাজ্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং শুধু বাঁচিয়াই রহিলেন না, বরং সেই ফেরআউনের গৃহেই দীর্ঘ ৩০ বৎসর আদর-যত্নে প্রতিপালিত হইলেন। যাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে এই–

نَتْلُوْ عَلَيْكَ مِنْ نَبَاٖ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ -

আপনাকে মূসা ও ফেরআউনের ঘটনা ঠিক ঠিক শুনাইব মোমেনদের জন্য।

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَائَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاۤءَهُمْ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ -

অর্থ ঃ নিশ্চয় ফেরআউন অতিশয় স্বেচ্ছাচারী হইয়া ছিল দেশের উপর এবং দেশের অধিবাসীগণকে শ্রেণী বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছিল; তাহার একটি দল (তথা বনী ইসরাঈল)-কে হীন ও দুর্বল করিয়া রাখাই ছিল তাহার উদ্দেশ্য। সে তাহাদের মেয়েগকে জীবন্ত রাখিত (দাসী বানাইয়া) আর ছেলে সন্তানগুলিকে জবাই করিত; নিশ্চয় সে ছিল মস্ত বড় ফাসাদকারী।

وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِيْنَ - وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ -

অর্থ ঃ (আল্লাহ বলেন,) এদিকে আমার ইচ্ছা হইল যে, আমি বিশেষ অনুগ্রহ করি ঐ দলের উপর যাহাদিগকে হীনবল করিয়া রাখা হইতেছিল এবং তাহাদিগকে প্রাধান্য দান করি ও তাহাদিগকে দেশের উত্তরাধিকারী করি এবং তাহাদিগকে দেশের শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করি; আর ফেরআউন ও তাহার উজির হামান এবং তাহাদের লোক-লস্করদের দেখাইয়া দেই ঐ পরিস্থিতি যাহার আশঙ্কা তাহারা করিতেছিল।

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّ مُوْسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهِ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلَا تَخَافِىْ وَلَا تَحْزَنِىْ اِنَّا رَادُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ -

অর্থ ঃ (মূসা জন্মগ্রহণ করিলেন,) আমি মূসার জননীর অন্তরে এই নির্দেশ মর্ম ঢালিয়া দিয়াছিলাম যে, মূসাকে দুগ্ধপান করাইয়া লালন-পালন করিতে থাক। যখন মূসার উপর (ফেরআউনী লোকদের) আশঙ্কা বোধ করিবে তখন তাহাকে (সিন্দুকে রাখিয়া) নদীতে ভাসাইয়া দিও; কোন ভয় ও চিন্তা করিও না। নিশ্চয় আমি তাহাকে তোমাদের নিকট ফিরাইয়া দিব এবং তাহাকে রসূল বানাইব।

فَالْتَقَطَهٗ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا - اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِئِيْنَ -

অর্থ ঃ (ঘটনার) শেষে এই ঘটিল যে, ফেরআউনেরই স্ত্রী মূসাকে উঠাইয়া নিল (ছেলে বানাইয়া উপকার লাভের পাত্ররূপে তাঁহাকে পাইবে এই আশায়, কিন্তু) শেষকালে তিনি তাহাদের পক্ষে শত্রু ও চিন্তার কারণ হইলেন। নিশ্চয় ফেরআউন হামান ও তাহাদের লোকজন ঠকার কাজ করিয়াছিল।

وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّىْ وَلَكَ - لَا تَقْتُلُوْهُ - عَسٰى اَنْ يَّنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ -

অর্থ ঃ ফেরআউনের স্ত্রী (নদীর তীরস্থ বাগানের ঘাটে ভাসমান সিন্দুক হইতে শিশু মূসাকে উঠাইয়া ফেরআউনকে) বলিলেন, আমার তোমার নয়ন জুড়ান আদরের বস্তু হইবে এই শিশুটি– ইহাকে হত্যা করিও না। সে আমাদের উপকারে আসিবে বা তাহাকে আমরা ছেলে বানাইব। তাহারা (মূসাকে লালন-পালনের শেষফল) অবহিত ছিল না।

وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فَارِغًا - اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِىْ بِهٖ لَوْلَا اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ -

অর্থ ঃ (ঘটনার প্রারম্ভে মূসা জননী আল্লাহর এলহাম মতে ফেরআউনের আশঙ্কায় মূসাকে সিন্দুকে রাখিয়া দরিয়ায় ভাসাইয়া দেওয়াকালে) মূসা-জননীর মন ধৈর্যহারা হইয়া পড়িল; হয়ত সে ঘটনাটা প্রকাশই করিয়া বসিত যদি আমি (আল্লাহ) তাহাদের অন্তরকে সুদৃঢ় না রাখিতাম এই উদ্দেশে যে, সে যেন আমার উপর অবিচল বিশ্বাসী হয়।

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ـ

অর্থ ঃ মূসা জননী মূসার ভগ্নীকে বলিল, মূসার (সিন্দুকের) অনুসরণ কর। সেমতে ভগ্নী তাঁহাকে দূরে দূরে থাকিয়া দেখিল; তাহার পরিচয় সম্পর্কে ফেরআউনী লোকদের অনুভূতি ছিল না।

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ـ

অর্থ ঃ (আল্লাহ বলেন, মূসাকে মাতার নিকট ফিরাইতে) আমি পূর্বেই নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছিলাম, মূসা কোন ধাত্রীর দুগ্ধ পান করিবে না। (সেমতে ফেরআউনী লোকগণ সঙ্কটে পড়িলে) ঐ ভগ্নী বলিল, আমি তোমাদিগকে এমন লোকের সন্ধান দিতে পারি যাহারা এই শিশুকে যত্নে লালন-পালন করিবে।

فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ـ

অর্থ ঃ এই সূত্রে আমি মূসাকে তাঁহার মাতার নিকট ফিরাইয়া দিলাম যেন সে সান্ত্বনা লাভ করে এবং তাহার চিন্তা দূর হয় এবং সে দেখিয়া লয় যে, আল্লাহর ওয়াদা-অঙ্গীকার নিশ্চয় বাস্তবায়িত হয়, কিন্তু অধিকাংশ লোক সেই জ্ঞান রাখে না।

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ـ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ـ

অর্থ ঃ যখন মূসা পূর্ণ বয়স্ক, পাকা-পোক্ত হইলেন তখন তাঁহাকে পরিপক্ক জ্ঞান ও এলম দান করিলাম; সৎকর্মশীলগণকে আমি এইরূপেই পুরস্কৃত করিয়া থাকি। (পারা– ২০ রুকু– ৫)

উক্ত ঘটনাকে আল্লাহ তাআলা অন্যত্র হযরত মূসার উপর বিশেষ করুণা ও অনুগ্রহসমূহের ফিরিস্তিদানের প্রথম নম্বরে উল্লেখ করিয়াছেন। যখন আল্লাহ তাআলা হযরত মূসাকে নবুয়ত প্রদান করিয়া ফেরআউনকে তবলীগ করিতে যাইতে বলিলেন, আর হযরত মূসা স্বীয় ভ্রাতা হারুনকে নবুয়ত দানের দরখাস্ত করিলেন। তাঁহার সেই দরখাস্তে মঞ্জুরী দান করতঃ আল্লাহ তাআলা বলিলেন–

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ـ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ ـ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ـ

অর্থ ঃ নিশ্চয় আমি পূর্বে তোমার প্রতি আরও অনুগ্রহ করিয়াছি– যখন আমি (তোমাকে ফেরআউন হইতে বাঁচাইবার জন্য) তোমার মাতার অন্তরে বিশেষ এলহাম করিয়াছিলাম যে, শিশু মূসাকে সিন্দুকে রাখিয়া তাহাকে দরিয়ায় ভাসাইয়া দাও; দরিয়া তাহাকে কূলে ঠেকাইবে। তথা হইতে তাহাকে এমন এক ব্যক্তি উঠাইয়া নিবে যে আমারও শত্রু মূসারও শত্রু। আমি তোমার উপর স্নেহ মমতার আভা ঢালিয়া

দিয়াছিলাম; তোমাকে (বাঁচাইয়া রাখার জন্য) এবং আমার তত্ত্বাবধানে গড়িয়া তোলার উদ্দেশে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

اِذْ تَمْشِىْ اُخْتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَنْ يَكْفُلُهٗ ـ فَرَجَعْنٰكَ اِلٰى اُمِّكَ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ ـ

অর্থ ঃ আর একটি স্মরণীয় ঘটনা– তোমার ভগ্নী (সিন্দুকের অনুসরণে) চলিতেছিল, অতপর সে ফেরআউনী লেকগণকে বলিল, আমি এমন লোকদের সন্ধান দিব যে এই শিশুকে সযত্নে পালন করিবে। এইরূপে আমি তোমাকে তোমার মাতার নিকট ফিরাইয়া আনিয়াছিলাম যেন তোমাকে পাইয়া তাহার চক্ষু জুড়ায় এবং সব চিন্তা-ভাবনা দূর হয়।

১৬৪০। হাদীছ ঃ আব মূসা আশআরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, পুরুষের মধ্যে ত অনেকেই কামেল সিদ্ধ ও সুখ্যাত হইয়াছেন, কিন্তু নারীদের মধ্যে সিদ্ধ ও বিশেষ খ্যাতিসম্পন্না হইয়াছেন একমাত্র ফেরাউনের স্ত্রী "বিবি আছিয়া" এবং এমরানের কন্যা "বিবি মরইয়াম"। আর আয়েশার মর্যাদা ত সর্বোপরি– সমস্ত নারীদের মধ্যে আয়েশার মর্যাদা এরূপ বড় যে রূপ সমস্ত খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে "ছারীদের" মর্যাদা।

ব্যাখ্যা ঃ গোশত ও উহার সুরুয়ার মধ্যে রুটির ছোট ছোট টুকরা ভিজাইয়া এক প্রক প্রকার খাদ্য বস্তু তৈয়ার করা হয় উহাকেই "সারীদ" বলা হয়। আরব দেশে উহা অতি জনপ্রিয় ও উচ্চাঙ্গের খাদ্য। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার অতি উচ্চ মর্যাদা বুঝাইবার জন্য হযরত (সঃ) এই দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত মূসার মিসর ত্যাগ

হযরত মূসা (আঃ) ফেরআউনের লালন-পালনে রাজকীয় সুখ শান্তির মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার বয়স ত্রিশে পৌঁছিল। তাহার নিজের সম্পর্কে পূর্ণ অনুভূতি ছিল যে, তিনি একজন বনী ইসরাঈল বংশীয় এবং মিসরীয় কিবতীগণ বনী ইসরাঈলদের প্রতি যে অত্যাচার করিয়া যাইতেছিল – তাহাদিগকে শুধু পরাধীনই নহে বরং দাস-দাসীতে পরিণত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাও তিনি লক্ষ্য করিয়া যাইতেছিলেন এইসব অনুভূতির প্রতিক্রিয়া যে, হযরত মূসাকে বিব্রত ও বিচলিত করিয়া রাখিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। এই সূত্রের একটি ঘটনার ফলেই হযরত মূসা আকস্মিকভাবে মিসর ত্যাগ করিয়া মাদইয়ানের দিকে চলিয়া যান। উক্ত ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ–

وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ ـ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ ـ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِىْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِىْ مِنْ عَدُوِّهٖ فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ ـ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ـ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ـ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَغَفَرَلَهٗ ـ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ قَالَ رَبِّ بِمَا اَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ ـ

অর্থ ঃ একদা মূসা (আঃ) নিরবচ্ছিন্নতার মুহূর্তে শহর এলাকায় প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন, দুই ব্যক্তি বিবাদ করিতেছে– একজন মূসার সমাজের অপরজন শত্রু পক্ষীয় তথা মিসরীয় কিবতী। নিজ পক্ষীয় লোকটি শত্রু পক্ষীয় লোকটির বিরুদ্ধে মূসার সাহায্য প্রার্থনা করিল। মিসরীয়রা বনী ইসরাঈলকে অত্যাচার করে তাহা মূসা (আঃ) জানিতেন এবং মনের আগুন মনেই রাখিতেন; এই ঘটনায় চাক্ষুষরূপে ইসরাঈলী

ব্যক্তির সম্পূর্ণ নিরপরাধতা এবং মিসরীয় ব্যক্তির নির্মম ব্যবহার দেখিয়া মূসা ধৈর্যচ্যুত হইলেন। তিনি মিসরীয় লোকটিকে একটি ঘুষি মারিলেন যাহাতে তাহার দফা রফা হইয়া গেল। (তাহাকে শায়েস্তা করার ইচ্ছা ছিল হত্যার ইচ্ছা ছিল না। তাই মূসা অনুতপ্ত হইয়া বলিলেন, এইরূপ ধৈর্যচ্যুত করা) ইহা শয়তানের কাজ; নিশ্চয় সে স্পষ্ট শত্রু ও বিভ্রান্তকারী। মূসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার নিকটও ক্ষমা প্রার্থনায় বলিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমি অপরাধ করিয়াছি; তুমি আমায় ক্ষমা কর। তিনি তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন; নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল দয়ালু। মূসা আরও বলিলেন, হে প্রভু! আমার উপর তোমার অসংখ্য অনুগ্রহ, অতএব প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আগামীতে কখনও (ঝগড়া-বিবাদী) অপরাধ পরায়ণদের সাহায্য করিব না।

فَاَصْبَحَ فِى الْمَدِيْنَةِ خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِىْ اسْتَنْصَرَهٗ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهٗ ـ قَالَ لَهٗ مُوْسٰى اِنَّكَ لَغَوِىٌّ مُّبِيْنٌ ـ فَلَمَّا اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِىْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يٰمُوْسٰى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِىْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْاَمْسِ اِنْ تُرِيْدُ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِى الْاَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ـ

অর্থ ঃ (কেহ না দেখায় হত্যাকারীর পরিচয় গোপন থাকিল। মূসা শহরেই রহিলেন, সন্ত্রস্ততার মধ্যে রাত্রি কাটাইলেন। ইতিমধ্যে পুনরায় ঐ ইসরাঈলী ব্যক্তি, যে পূর্বের দিন সাহায্যপ্রার্থী ছিল (এবং তাহাতে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছিল) সে ই আজ আবার (এক মিসরীয়ের সঙ্গে বিবাদে) মূসাকে চীৎকার করিয়া ডাকিতেছে। মূসা তাহাকে ভর্ৎসনা করিলেন– নিশ্চয় তুমি স্পষ্টতঃই দুষ্টলোক! (প্রতিদিন তোমার ঝগড়া বাধে।) অতপর যখন মূসা (বারণ করণার্থে ধরিতে চাহিলেন ঐ ব্যক্তিকে, যে মূসা ও ইসরাঈলী উভয়ের শত্রু (তথা মিসরীয়; তখন সাহায্যপ্রার্থী ইসরাঈলী ব্যক্তি ভাবিল, মূসা আমাকে রাগ করিয়াছে; আমাকেই মারিবে– এই ভয়ে) সে বলিয়া উঠিল, হে মূসা! গতকল্য তুমি এক ব্যক্তিকে খুন করিয়াছ, আজ ঐরূপে আমাকে খুন করিতে চাও! তুমি ত দেশে শুধু নিজের জোরবাজি করিয়া চলিতে চাও, সংশোধনীর কাজ করার ইচ্ছা তোমার মোটেও নাই।

وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى ـ قَالَ يٰمُوْسٰى اِنَّ الْمَلَاَ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ اِنِّىْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ ـ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ ـ قَالَ رَبِّ نَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ

অর্থ ঃ (এই ঘটনায় পূর্ব দিনের হত্যাকারীরূপে মূসার নাম ফাস হইয়া সংবাদ ফেরআউনের দরবারে পৌছিল। রাজ্যসভায় মূসার প্রাণদণ্ড সাব্যস্ত হইল।) এক ব্যক্তি (ফেরআউনেরই ঘনিষ্ঠ, কিন্তু অন্তরে মূসার ভালবাসা; সে গোপনে) শহরের দূর প্রান্তের পথে,দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, হে মূসা! রাজসভায় তোমার সম্পর্কে পরামর্শ হইতেছে, তোমাকে তাহারা হত্যা করিবে; তুমি এই দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাও। আমি তোমার মঙ্গলকামী; তোমাকে সব বলিয়া দিলাম।

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّىْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِىْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ـ

অর্থ ঃ মূসা ঐ দেশ হইতে বাহির হইয়া ভয়-ভীতি ও ত্রাসের মধ্যে বিপদের আশঙ্কারত অবস্থায় দোয়া করিলেন, হে পরওয়ারদেগার! জালেমদের হইতে আমাকে নাজাত দিন।

আর যখন মূসা "মাদইয়ান" এলাকার প্রতি পথ ধরিলেন তখন বলিলেন, আশা করি আমার প্রভু আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করিবেন।

"মাদইয়ান" এলাকার ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক তথ্য শোআয়ব আলাইহিস সালামের বিবরণে বর্ণিত

হইবে। এস্থানে শুধু এতটুকু বলা আবশ্যক যে, মিসর এলাকা, বিশেষতঃ যে এলাকায় তাহার রাজধানী তাহা সুয়েজ উপসাগরের পশ্চিম কূল হইতেও বেশ কিছু ব্যবধানে অবস্থিত। সুয়েজ উপসাগরের অপর পারে সাইনা উপত্যকা, তাহার পর আকাবা উপসাগর, তাহা পার হইয়া পূর্ব কূলে তাহার দক্ষিণ মাথা তথা লোহিত সাগর হইতে তাহার আরম্ভস্থল সংলগ্নে লোহিত সাগরের উপকূলীয় দক্ষিণ পূর্ব দিকের বিস্তীর্ণ এলাকাটিই "মাদইয়ান"।

সেকালে সুয়েজ খাল ছিল না, অতএব মিসর এলাকা হইতে পূর্ব দিকে ফিলিস্তীন, সিরিয়া, আরব ইত্যাদি এশিয়ার অঞ্চলে সরাসরি স্থল পথে আসা যাইত। মিসর হইতে পূর্ব দিকে সাইনা উপত্যকা অতিক্রম করিয়া ফেলিস্তীন এলাকায়, অতপর দক্ষিণ দিকে আকাবা উপসাগরের কূল বাহিয়া "মাদ্‌য়ানে" পৌঁছার জন্য স্থলপথের যোগাযোগ ছিল, কিন্তু এই সমস্ত এলাকা পর্বতময় মরু অঞ্চল; উক্ত পথ অতিক্রম করিতে অন্ততঃ প্রায় হাজার মাইল চলিতে হইত।

মূসা (আঃ) ঐ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া মাদইয়ানে পৌঁছিলেন। তখন তথায় শোআয়ব (আঃ) নবী ছিলেন। পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত একটি বিশেষ ঘটনা সূত্রে মূসা (আঃ) হযরত শোআয়বের নিকট পৌঁছিলেন এবং তথায় তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা হইল। হযরত শোআয়বের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহও হইল এবং দীর্ঘ দশ বৎসর তথায় রহিলেন। উক্ত ঘটনা পবিত্র কোরআনের বর্ণনায় এইরূপ-

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ ۔ وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ ۔ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۔ قَالَتَا لاَنَسْقِىْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۔ وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ۔

অর্থ ঃ মূসা (আঃ) মাদইয়ানে একটি কূপের নিকট পৌঁছিয়া দেখিলেন, একদল লোক কূপের পানি পশুপালকে পান করাইতেছে; আর দুইটি রমণী নিজের পশু থামাইয়া রাখিতেছে। মূসা রমণীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের ব্যাপার কি? তাহারা বলিল, আমরা পানি পান করাইতে (কূপে) যাই না যাবত রাখালরা চলিয়া না যায়। আর (আমাদের কূপে আসার হেতু) আমাদের পিতা বৃদ্ধ।

فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ۔

অর্থ ঃ মূসা (আঃ) (ইহা শুনিয়া) নিজে তাহাদের পশু পালকে পানি পান করাইলেন অতঃপর গাছের ছায়ায় আসিয়া আল্লাহর হুজুরে বলিলেন, হে পরওয়ারদেগার! তুমি আমাকে যাহা দান কর- আমার জন্য যে ব্যবস্থা করিয়া দাও আমি তাহার প্রত্যাশী।

فَجَاءَتْهُ اِحْدٰهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ ۔ قَالَتْ اِنَّ اَبِىْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۔ فَلَمَّا جَاءَهٗ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لاَ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۔ قَالَتْ اِحْدٰهُمَا يٰاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ۔ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ ۔

অর্থ ঃ ইতিমধ্যেই উক্ত রমণীদ্বয়ের একজন লজ্জা-শরমে ভারাক্রান্ত অবস্থায় মূসার নিকট আসিয়া বলিল, আপনাকে আমার পিতা ডাকিতেছেন; আপনি আমাদের পশুপালকে পানি পান করাইয়াছেন তাহার প্রতিদান দেওয়ার জন্য। সে মতে যখন মূসা রমণীর পিতার নিকট আসিলেন এবং (মিসর ও তথা হইতে পলায়নের) ঘটনা ব্যক্ত করিলেন তখন তিনি বলিলেন, তুমি নিশ্চিন্ত হও; ঐ জালেম দল হইতে নাজাত পাইয়াছ। (এখানে তাহাদের শাসন নাই। এই বৃদ্ধ ছিলেন হযরত শোআয়ব (আঃ)।

উক্ত রমণীদ্বয়ের একজন বলিল, হে পিতা! এই লোককে চাকুরীতে রাখুন; শক্তিমান বিশ্বাসী লোকই চাকুরীতে শ্রেয় (এই লোকটির উভয় গুণই আছে।

قَالَ اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَىَّ هٰتَيْنِ عَلٰى اَنْ تَاْجُرَنِىْ ثَمٰنِىَ حِجَجٍ ـ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ـ وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ـ سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ـ

অর্থ ঃ শোআয়ব (আঃ) নবী; তিনি মূসাকে চিনিতে পারিলেন, কিন্তু প্রকাশ না করিয়া) তিনি বলিলেন, আমার ইচ্ছা– আমার কন্যাদ্বয়ের একটিকে তোমার বিবাহে প্রদান করা এই শর্তে যে, তুমি আট বৎসর আমার চাকুরী করিবে (তাহার আজুরা মহরানা গণ্য হইবে।) আর যদি দশ বৎসর পূর্ণ কর তবে তোমার উদারতা হইবে; তাহার জন্য আমি তোমার উপর চাপ প্রয়োগের ইচ্ছা রাখি না! ইনশাআল্লাহ আমাকে ন্যায়-নিষ্ঠা পাইবে।

قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَىَّ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ـ

অর্থ ঃ মূসা বলিলেন, আচ্ছা– আমার ও আপনার মধ্যে এই কথাই সাব্যস্ত রহিল; নির্ধারিত দুইটা পরিমাণের যে কোনটাই আমি পূর্ণ করি আমার উপর তাহার অধিকের জন্য কোন চাপ দেওয়া হইবে না। আমার কথার উপর আল্লাহ সাক্ষী রহিলেন। (পারা– ২০)

হযরত মূসার মাদইয়ান ত্যাগ ও পথিমধ্যে নবুয়তপ্রাপ্তি

মূসা (আঃ) চাকুরীর মেয়াদ (দশ বৎসর) শেষ করিয়া শর্ত পুরা করিলেন; অতঃপর শ্বশুর শোআয়ব আলাইহিস সালামের অনুমতিপ্রাপ্তে স্ত্রীকে লইয়া নিজের আদি ভূমি সিরিয়া বা তৎকালীন বনী ইসরাঈল দেশ মিসর পানে যাত্রা করিলেন।

পথিমধ্যে যখন তিনি সুয়েজ খাল এলাকা ও আকাবা উপসাগরের মধ্যস্থ সাইনা উপত্যকা অঞ্চলে "তুর" পর্বতমালার এলাকাস্থ "তুয়া" নামক স্থানে মরূদ্যানে পৌঁছিলেন তখন এই ঘটনা ঘটিল যে, অত্যধিক শীতের কারণে কষ্ট বোধ করিতে লাগিলেন, এদিকে রাত্রের অন্ধকারে রাস্তাও খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। এমতাবস্থায় হঠাৎ কিছু দূরে আগুনের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত একটি বস্তু দেখিতে পাইয়া তাহাকে আগুন বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন এবং সঙ্গীগণকে বলিলেন, তোমরা এ স্থানে অপেক্ষা কর; আমি ঐ অগ্নির স্থানে যাইয়া পথের খোঁজ নিয়া আসিব এবং কিছু অগ্নিও নিয়া আসি, যেন তোমরা তাহার তাপ লইয়া শীতের কষ্ট লাঘব করিতে পার। পরবর্তী বহুবচন শব্দ দ্বারা স্ত্রী ব্যতীত আরও সঙ্গী প্রমাণিত হয়।

যখন মূসা (আঃ) ঐ অগ্নির নিকটে আসিলেন তখন তথায় একটি বৃক্ষ হইতে এক মহান আহ্বান শুনিতে পাইলেন এবং স্নেহময় সম্ভাষণের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার মনোনীত হওয়ার সনদ পাইয়া নবুয়ত প্রাপ্ত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফেরআউনের হেদায়াতের জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হওয়ারও আদিষ্ট হইলেন। মূসা (আঃ) নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করিয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হারুনের জন্যও নবুয়তের দরখাস্ত করিলেন। আল্লাহ তাআলা দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন এবং হযরত হারুনকে সঙ্গে লইয়া ফেরআউনের নিকট যাইতে আদেশ করিলেন। এই বিবরণ পবিত্র কোরআনের তিন স্থানে বর্ণিত হইয়াছে–

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْا اِنِّىْ اٰنَسْتُ نَارًا لَعَلِّىْ اٰتِيْكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ـ

অর্থ ঃ অতপর যখন মূসা চাকুরীর মেয়াদ সমাপ্ত করিলেন এবং নিজ পরিবারবর্গ লইয়া যাত্রা করিলেন। তখন পথিমধ্যে তুর পর্বতের দিকে একটা আগুন দেখিলেন। নিজ পরিবারবর্গকে বলিলেন, তোমরা এ স্থানে অপেক্ষা কর। আমি একটু দূরে আগুন দেখিয়াছি; আমি তথায় যাইয়া তোমাদের জন্য হয়ত রাস্তার খবর আনিব অথবা এক খণ্ড অগ্নি-অঙ্গার; তোমরা তাহার তাপ লইতে পারিবে।

فَلَمَّا اَتٰهَا نُوْدِىَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِى الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰى اِنِّىْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

অর্থ ঃ যখন মূসা (আঃ) ঐ অগ্নির স্থানে উপস্থিত হইলেন তখন মরূদ্যানের ডান দিকে বরকতপূর্ণ ভূখণ্ডস্থিত একটি বৃক্ষ হইতে ঘোষণা শুনিতে পাইলেন–"হে মূসা! নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি কর, আমি সারা জাহানের প্রভু পরওয়ারদেগার মহান আল্লাহ।"

وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ـ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ـ يٰمُوْسٰى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ـ

অর্থ ঃ আর তোমাকে একটি মোজেযা দিতেছি; তোমার হাতের লাঠি মাটিতে ফেলিয়া দাও ত! (মাটিতে পড়িয়া তাহা ৮০ গজ লম্বা অজগর হইয়া দ্রুত ছুটাছুটি করিতে লাগিল।) যখন মূসা দেখিলেন, তাহা এত বড় হইয়াও সরু সর্পের ন্যায় দ্রুত ছুটাছুটি করে, তখন (মানবীয় স্বভাবে সর্পের ভয়ে) তিনি দৌড়িয়া সরিয়া পড়িলেন– পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়াও দেখিলেন না। (আহ্বান আসিল–) হে মূসা! সম্মুখে আসিয়া যাও, কোন ভয় করিও না, তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। (আরও বলিলেন–)

اُسْلُكْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ـ وَّاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ـ

অর্থ ঃ হে মূসা! তোমার হাত জামার ভিতরে বগলতলে প্রবেশ করাইয়া বাহির করিয়া আন; দেখিবে তাহা অতি উজ্জ্বল– (শ্বেত) রোগের কারণে নহে। হাতের পরিবর্তনে ভয় হইলে তাহার জন্য পুনঃ তুমি হাতকে বগলের সঙ্গে মিলাইও; দেখিবে, তাহা স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়াছে। এই দুইটি মোজেযা তোমার সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ দান করতঃ তোমাকে ফেরআউন ও তাহার পরিষদের প্রতি প্রেরণ করিতেছি; তাহারা নাফরমান জাতি হইয়াছে।

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ـ وَاَخِىْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّىْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِىَ رِدْءًا يُّصَدِّقُنِىْ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنَ ـ

অর্থ ঃ মূসা (আঃ) আরজ করিলেন, প্রভু! আমিফেরআউন গোষ্ঠীর একজন লোক হত্যা করিয়াছিলাম; আমার ভয় হয় তাহারা আমাকে (পাইলে) মারিয়া ফেলিবে। আমার ভ্রাতা "হারুন" আমার তুলনায় অধিক বাক-শক্তিমান, তাঁহাকে আমার সঙ্গে রসূলরূপে প্রেরণ করুন; তিনি আমার সমর্থন করিবে; ফলে আমার কথা জোরদার হইবে। আমার ভয় হয় তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে।

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا ـ بِاٰيٰتِنَا اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ـ

অর্থ ঃ আল্লাহ বলিলেন, এখনই তোমার ভ্রাতার (নবুয়ত) দ্বারা তোমার শক্তি বৃদ্ধি করিব এবং তোমাদেরকে বিশেষ প্রভাব দান করিব; ফলে তাহারা (ক্ষতি করিতে) তোমাদের কাছেও ভিড়িতে পারিবে না। আমার প্রদত্ত (সত্যবাদিতার) নিদর্শন লইয়া তাহার নিকট যাও। তোমাদের এবং তোমাদের অনুসারীদেরই বিজয় হইবে। (পারা-২০ রুকু- ৭)

اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖ اِنِّىْ اٰنَسْتُ نَارًا ـ سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ اٰتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ـ

অর্থ ঃ স্মরণীয় ঘটনা- মূসা স্বীয় স্ত্রী ও সঙ্গীগণকে বলিলেন, আমি কিছু দূরে আগুন দেখিয়াছি (তোমরা স্থানে থাক), আমি তথা হইতে পথের খোঁজ নিয়া আসিব বা জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়া আসিব; তোমরা তাহার তাপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِىَ اَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

অর্থ ঃ যখন মূসা ঐ অগ্নির নিকটে আসিলেন, তখন তাঁহাকে সম্ভাষণ জানাইয়া বলা হইল, বরকতপূর্ণ হউক যাহারা এই অগ্নির (ন্যায় উজজ্বল নূরের ব্যবস্থারূপে তাহার) মধ্যে আছে (ফেরেশতা) এবং যে তাহার পাশ্ববর্তী আছে (তথা মূসা)। অধিকন্ত (বলা হইল,) সারা জাহানের প্রভু-পরওয়ারদেগার মহান আল্লাহ হইতেছেন পবিত্রতাময় মহামহিমান্বিত। (আর যাহা দৃষ্টিগোচর হইতেছে, সবই স্থূল বস্তু; এই সব মহান আল্লাহ নহেন, বরং তাঁহার কুদরতের লীলা মাত্র!)

يٰمُوْسٰى اِنَّهٗ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

হে মূসা! নিশ্চয় জানিও, আমি হইতেছি মহান আল্লাহ তাআলা প্রবল পরাক্রমশালী মহা প্রজ্ঞাময়।

وَاَلْقِ عَصَاكَ ـ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ـ يٰمُوْسٰى لَاتَخَفْ ـ اِنِّىْ لَايَخَافُ لَدَىَّ الْمُرْسَلُوْنَ ـ اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوْءٍ فَاِنِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

অর্থ ঃ আর তোমার লাঠি মাটিতে ফেল ত। অতঃপর যখন তাহাকে (বড় অজগররূপে) সরু সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে দেখিলেন তখন তিনি ভয়ে সরিয়া পড়িলেন, পিছনে তাকাইলেনও না। আহ্বান আসিল, হে মূসা! ভয় পাইও না; আমার নিকট রসূলগণের ভয় পাওয়ার কারণ নাই। অবশ্য যে অন্যায় করে (সে ভীত হইতে পারে, কিন্তু) তৎপর খারাপের পরিবর্তে ভাল করিলে গোনাহের পরে তওবা করিলে তাহারও গোনাহ মাফ হইবে, ভয়-ভীতির কারণ থাকিবে না;) নিশ্চয় আমি ক্ষমাশীল দয়ালু।

وَاَدْخِلْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ فِىْ تِسْعِ اٰيٰتٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ ـ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ـ

অর্থ ঃ আর তুমি নিজ হাতকে জামার ভিতর বক্ষে প্রবেশ করাও, তাহা রোগ ব্যতিরেকে উজ্জ্বল হইয়া যাইবে। এই দুইটিসহ নয়টি মোজেযা লইয়া ফেরআউন ও তাহার পরিবারবর্গের প্রতি যাও। তাহারা নাফরমান জাতিতে পরিণত হইয়াছে। (পারা-১০ রুকু- ১৬)

وَهَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ـ اِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْا اِنِّىْ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّىْ اٰتِيْكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ـ

অর্থ ঃ মূসার ঘটনা কি আপনি জানেন? যখন তিনি পথিমধ্যে দূর হইতে একটি আগুন রূপ বস্তু দেখিয়া নিজ পরিজনকে বলিলেন, তোমরা এখানে অপেক্ষা কর; আমি দূরে একটা আগুন দেখিয়াছি; আশা করি তাহা হইতে কিছুটা অংশ তোমাদের জন্য নিয়া আসিব; অথবা তথায় আগুনের সন্ধান পাইব।

فَلَمَّا اَتٰهَا نُوْدِىَ يٰمُوْسٰى - اِنِّىْ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ - اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى - وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى -

অর্থ ঃ মূসা ঐ আগুনের নিকটবর্তী আসিলে ঘোষণা শুনিলেন, নিশ্চয় আমি তোমার প্রভু-পরওয়ারদেগার; তুমি পায়ের জুতাদ্বয় খুলিয়া ফেল; তুমি ত এক পবিত্র প্রান্তরে উপস্থিত হইয়াছ। আর শুন, আমি তোমাকে মনোনীত করিয়াছি, (রসূলরূপে), অতএব প্রেরিত অহী মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর।

اِنَّنِىْ اَنَا اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا تَسْعٰى - فَلاَ يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لاَّ يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ فَتَرْدٰى -

অর্থ ঃ নিশ্চয় আমি হইতেছি আল্লাহ, আমি ব্যতীত মা'বুদ আর কেহই নাই, অতএব বন্দেগী একমাত্র আমারই করিবে এবং আমাকে স্মরণ করার উদ্দেশ্য নিয়া "নামায" উত্তমরূপে আদায় করিবে। "কেয়ামত" নিশ্চয় আসিবে, আমি তাহার আগমন তারিখ গোপন রাখিতে ইচ্ছা করি। (নির্ধারিত সময় তাহা সংঘটিত হইবেই;) যেন প্রত্যেক ব্যক্তি কর্ম অনুসারে ফল লাভ করিতে পারে। অতএব যে ব্যক্তি তাহা বিশ্বাস করে না এবং নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে কেয়ামতের উপর বিশ্বাস স্থাপন হইতে কোন মতেই বিরত রাখিতে না পারে, অন্যথায় তুমি ধ্বংসের সম্মুখীন হইবে। আল্লাহ তাআলা আরও বলিলেন–

وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى - قَالَ هِىَ عَصَاىَ - اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِىْ وَلِىَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى -

অর্থ ঃ হে মূসা! তোমার ডান হস্তের ঐ জিনিসটা কি? মূসা বলিলেন, তাহা আমার লাঠি; তাহার উপর আমি ভর করিয়া থাকি এবং তাহা দ্বারা আমার পালের জন্য বৃক্ষের পাতা পাড়িয়া থাকি; তাহা আরও অনেক কাজে আসে।

قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى - فَاَلْقٰهَا فَاِذَا هِىَ حَيَّةٌ تَسْعٰى - قَالَ خُذْهَا وَلاَ تَخَفْ - سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى -

অর্থ ঃ আল্লাহ বলিলেন, হে মূসা! লাঠিটা মাটিতে ফেল ত; মূসা তাহা মাটিতে ফেলিলেন; তৎক্ষণাৎ তাহা (৮০ গজ লম্বা) অজগর হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। আল্লাহ তাআলা বলিলেন, ইহাকে ধরিয়া ফেল, ভয় পাইও না। এখনই তাহাকে প্রথম অবস্থায় ফিরাইয়া দিব।

وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ اٰيَةً اُخْرٰى - لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى - اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى -

অর্থ ঃ আল্লাহ আরও বলিলেন, নিজ হস্তকে বগলের সঙ্গে মিলিত কর; তাহা রোগ ব্যতিরেকে উজ্জ্বলরূপে

বাহির হইবে। ইহা আমার শক্তির ও তোমার সত্যতার দ্বিতীয় নিদর্শন। (সম্মুখ ঘটনাপ্রবাহে) আমার বৃহত্তম নিদর্শনের আরও কতকগুলি তোমাকে দেখাইবার ইচ্ছা রাখি। তুমি ফেরআউনের নিকট যাও; নিশ্চয় সে সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে।

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ ـ وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ ـ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ ـ يَفْقَهُوْا قَوْلِى ـ وَاجْعَلْ لِّىْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِىْ هٰرُوْنَ اَخِىْ ـ اشْدُدْ بِهٖ اَزْرِىْ ـ وَاَشْرِكْهُ فِىْ اَمْرِىْ ـ كَىْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ـ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ـ قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى ـ ... .

অর্থ ঃ মূসা দোয়া করিলেন, হে প্রভু! আমার সিনা খুলিয়া দাও (তোমার বাণী ভালরূপে বুঝিতে পারি, প্রচারে মনোবল পাই, ভয়-ভীতি না আসে)। আমার সব কাজ আমার জন্য সহজ করিয়া দাও; আমার মুখের জড়তা দূর করিয়া দাও যেন সকলে আমার কথা ভালরূপে বুঝিতে পারে। আর আমার আপন লোকদের হইতে আমার একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত কর– আমার ভ্রাতা হারুনকে মনোনীত কর; তাহার দ্বারা আমার বাহুবল বাড়াইয়া দাও– তাহাকেও আমার সঙ্গে আমার কর্তব্যে নিয়োগ কর; যেন আমরা উভয়ে তোমার পবিত্রতা প্রচার বেশী পরিমাণে করিতে পারি, তোমার যিকির বেশী করিতে পারি; তুমি আমাদের সব অবস্থা দেখিতেছ। আল্লাহ বলিলেন, হে মূসা! তোমার দরখাস্ত পুরা করিলাম।...

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِىْ ـ اذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِاٰيٰتِىْ وَلاَ تَنِيَا فِىْ ذِكْرِىْ ـ اذْهَبَا اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ـ فَقُوْلاَ لَهٗ قَوْلاً لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ـ

অর্থ ঃ আর আমি তোমাকে গঠন করিয়াছি আমার নিজের (কাজের) জন্য; তুমি ও তোমার ভ্রাতা (তোমাদের সত্যতা প্রমাণে) আমার প্রদত্ত নিদর্শন মোজেযাগুলি লইয়া রওয়ানা হও; আমাকে স্মরণে রাখিতে অবহেলা করিও না। তোমরা যাও ফেরআউনের নিকট। নিশ্চয় সে সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। তোমরা তাহাকে নম্রভাবে বুঝাও; হয় ত সে উপদেশ গ্রহণ করিবে অথবা পরিণামের ভয় করিবে।

قَالاَ رَبَّنَا اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَّطْغٰى

অর্থ ঃ উভয়ে আরজ করিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমাদের আশঙ্কা হয় সে আমাদের আক্রমণ করিয়া বসে বা কোন অসঙ্গত কার্য করিয়া বসে। قَالَ لاَ تَخَافَا اِنَّنِىْ مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَاَرٰى ـ

অর্থ ঃ আল্লাহ তাআলা বলিলেন, তোমরা ভয় পাইও না, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি– সব (কথাবার্তা) শুনিতে থাকিব, (সব অবস্থা) দেখিতে থাকিব।

فَاْتِيٰهُ فَقُوْلاَ اِنَّا رَسُوْلاَ رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَلاَ تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ـ اِنَّا قَدْ اُوْحِىَ اِلَيْنَا اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ـ

অর্থ ঃ তোমরা উভয়ে ফেরআউনের নিকট পৌঁছিয়া তাহাকে এই বল যে, আমরা তোমার সৃষ্টিকর্তা রক্ষাকর্তা পালনকর্তা প্রভুর তরফ হইতে রসূলরূপে আসিয়াছি। বনী ইসরাঈলগণকে আমাদের সঙ্গে ছাড়িয়া দাও, তাহাদিগকে আর যাতনা দিও না। আমরা তোমার নিকট আসিয়াছি তোমার প্রভুর তরফ হইতে

আমাদের সত্যতার প্রমাণ লইয়া স্মরণ রাখিও– যাহারা সত্যের অনুসরণ করিবে তাহাদের জন্যই শান্তি। আমাদিগকে অহী মারফত জ্ঞাত করা হইয়াছে, যে ব্যক্তি সত্যকে মিথ্যা বলিবে এবং অস্বীকার করিবে নিশ্চয়, তাহাকে আযাব ভোগ করিতে হইবে।(সূরা ত্বোয়াহাঃ পারা– ১৬ রুকু– ১০, ১১)

ফেরআউনের নিকট হযরত মূসা ও হারুনের উপস্থিতি

আল্লাহ তাআলার আদেশনানুসারে মূসা (আঃ) ও হারুন (আঃ) উভয়ে ফেরআউনের নিকট আল্লাহর আদেশ পৌঁছাইবার জন্য উপস্থিত হইলেন। ফেরআউন ত হযরত মূসার মুখে নবুয়তের দাবী শুনিয়াই অবাক হইয়া গেল যে, কিছু দিন পূর্বে তুমি আমাদের লালন পালনে ছিলে; খুনের অপরাধী হইয়া পলাইয়া গিয়াছিলে। এখন বলিতেছ– তুমি নবী হইয়াছ! এইরূপে ফেরআউন প্রতিবাদ করতঃ তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। আর মূসা (আঃ) যে তাহাকে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের আহ্বান জানাইতে ছিলেন তাহা প্রত্যাখ্যান করিল এবং হযরত মূসাকে তাঁহার সত্যতার প্রমাণ দেখাইতে বলিল। মূসা (আঃ) তাঁহার লাঠী এবং হাতের মোজেযা দেখাইলেন। ফেরআউন ও তাহার পরিষদমণ্ডলী ঐ সব মোজেযাকে "যাদু" সাব্যস্ত করিল এবং দেশের বড় বড় জাদুকরদের দ্বারা হযরত মূসার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে প্রস্তুত হইল। পবিত্র কোরআনে বহু স্থানে উক্ত ঘটনা বর্ণিত আছে; কতিপয় উদ্ধৃতি নিম্নে দেওয়া হইতেছে।

فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ وَقَالَ مُوْسٰى رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ـ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ـ

অর্থ ঃ মূসা (আঃ) যখন আমার প্রদত্ত সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ লইয়াফেরআউন গোষ্ঠীর নিকট পৌঁছিলেন তখন তাহারা বলিল, এই সব ত জালিয়াতি যাদু ভিন্ন কিছু নহে। (আল্লাহ আছেন, তিনি নবী পাঠান, মোজেযা প্রদান করেন–) এইসব কথা ত আমাদের চৌদ্দ পুরুষের মধ্যেও শুনি নাই। মূসা (আঃ) বলিলেন, আমার পরওয়ারদেগার ভালরূপে জানেন কে তাঁহার নিকট হইতে সত্য দ্বীন নিয়া আসিয়াছে এবং কে পরিণামে সাফল্য লাভ করিবে! ইহা ধ্রুব সত্য যে, পরিণামে স্বৈরাচারীরা সাফল্য লাভ করিতে পারিবে না।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ فَاَوْقِدْلِيْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ ـ فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ـ

অর্থ ঃ ফেরআউন তাহার পরিষদকে বলিল, আমি ভিন্ন তোমাদের অন্য কোন মা'বুদ আছে ইহা আমি ধারণাও করি না। অতপর সে লোকদিগকে প্রভাবান্বিত করার উদ্দেশে বিদ্রূপ করিয়া উজীর) হামানকে বলিল, আগুনে পুড়িয়া পাকা–পোক্ত ইট তৈয়ার কর তদ্দ্বারা উঁচু বালাখানা (মানমন্দির) তৈয়ার কর; তাহার উপর উঠিয়া আমি দেখিব, মূসার খোদার খোঁজ পাই নাকি। আমার ত বিশ্বাস, মূসা মিথ্যাবাদীদের একজন।

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ ـ

অর্থ ঃ ফেরআউন এবং তাহার লোক-লস্কররা দুনিয়ার মধ্যে মিছামিছি আত্মগর্বে ফুলিয়াছিল; তাহাদের ধারণা বিশ্বাস এই ছিল যে, তাহাদের আমার নিকট ফিরিয়া আসিতে হইবে না।

فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ ـ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ـ وَجَعَلْنٰهُمْ

اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ـ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ ـ وَاَتْبَعْنٰهُمْ فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ـ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ـ

পরিণামে আমি ফেরআউন ও তাহার লোক-লস্করকে পাকড়াও করিলাম এবং দরিয়ায় ডুবাইয়া দিলাম। চিন্তা কর স্বৈরাচারীদের পরিণাম কি ঘটিয়াছিল। আর আমি তাহাদিগকে সরদার বানাইয়াছিলাম; তাহারা লোকদিগকে দোযখের দিকে পরিচালিত করিত, তাই কেয়ামতের দিন তাহারা কোন সাহায্যকারী পাইবে না। শুধু তাই নহে– এই দুনিয়াতেই আমি তাহাদের পিঠে লা'নতের ছাপ লাগাইয়া দিয়াছি, আর কেয়ামতের দিন তাহাদের যে দুরবস্থা হইবে তাহা ত আছেই। (পারা– ২০ রুকু-৭)

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ـ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ ـ

(পূর্বোল্লিখিত রসূলগণের) পরে আমি মূসা ও হারুনকে পাঠাইলাম আমার পক্ষ হইতে তাঁহাদের সত্যতার কতিপয় নিদর্শন দিয়া (বিশেষরূপে) ফেরআউন ও তাহার পরিষদবর্গের প্রতি। কিন্তু তাহারা গোঁড়ামি করিল, বস্তুতঃ তাহারা ছিলই অপরাধ পরায়ণ দল। যখন আমার পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট সত্য উদ্ভাসিত হইল তখনও তাহারা বলিল, ইহা ত স্পষ্ট যাদু।

قَالَ مُوْسٰى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ اَسِحْرٌ هٰذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُوْنَ ـ

মূসা (আঃ) বলিলেন, সত্য তোমাদের নিকট উদ্ভাসিত হওয়ার পরও তোমরা তাহা সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য কর? যাদু কি এরূপ হয়? কোন যাদুকর (নবুয়তের দাবী করিয়া কোন যাদুর মধ্যে) কৃতকার্য হইতে পারে না।

قَالُوْا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَائَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِى الْاَرْضِ ـ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ـ

তাহারা বলিল, তুমি কি আমাদের নিকট আসিয়াছ আমাদিগকে ঐ ধর্ম হইতে হটাইবার জন্য, যে ধর্ম মতের উপর আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষগণকে পাইয়াছি; আর এই জন্য যে, দেশের মধ্যে তোমাদের দুই জনের সরদারী কায়েম হউক? আমরা তোমাদিগকে কস্মিনকালেও বিশ্বাস করিব না।

(সূরা ইউনুছঃ পারা–১১ রুকু–১৩)

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ـ

তারপর আমি পাঠাইলাম মূসাকে আমার প্রদত্ত প্রমাণাদি দিয়া ফেরআউন ও তাহার সরদারদের প্রতি। তাহারা ঐসব প্রমাণের সহিত অন্যায় ব্যবহার করিল (তাহা উপেক্ষা করিল)। ফলে সেই ফাসাদকারীদের পরিণাম কি ঘটিয়াছিল তাহা তোমরা লক্ষ্য করিয়া দেখ।

وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ حَقِيْقٌ عَلٰى اَنْ لَّا اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِىَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ ـ

মূসা (আঃ) বলিলেন, হে ফেরআউন! আমি সারা জাহানের প্রভুর পক্ষ হইতে রসূল নিয়োজিত হইয়াছি। আমার কর্তব্য– আমি আল্লাহ তাআলা সম্বন্ধে সত্য বৈ আর কিছু বলিব না। আমি তোমাদিগকে জানাইতেছি, আমি তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে আমার সত্যতা প্রমাণের নিদর্শন নিয়া আসিয়াছি। অতএব বনী ইসরাঈলগণকে আমার সঙ্গে ছাড়িয়া দাও।

قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ـ

ফেরআউন বলিল, তুমি যদি কোন নিদর্শন আনিয়া থাক তবে তাহা প্রকাশ কর যদি তুমি সত্যবাদী হও।

فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ـ وَنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِىَ بَيْضَاۤءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ـ

সেমতে মূসা স্বীয় লাঠি ফেলিয়া দিলেন; তৎক্ষণাৎ তাহা স্পষ্টতঃ (৮০ গজ লম্বা) অজগর হইয়া গেল। এতদ্ভিন্ন মূসা নিজ হস্ত বগলের নীচ হইতে বাহির করিলে তাহা সমস্ত দর্শকদের সমক্ষে উজ্জ্বল ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল।

قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ـ يُرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ ـ فَمَا ذَا تَاْمُرُوْنَ ـ

ফেরআউন গোষ্ঠীল সাহেব-সরদাররা তাহাদের সর্বসাধারণকে বুঝাইল যে, নিশ্চয় এই ব্যক্তি বড় বিজ্ঞ যাদুকর; সে তোমাদিগকে দেশান্তর করিতে চায়, সুতরাং তোমাদের পরামর্শ কি?

قَالُوْا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِى الْمَدَاۤئِنِ حٰشِرِيْنَ ـ يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ـ

তাহারা সকলে মিলিয়া ফেরআউনকে পরামর্শ দিল যে, মূসা ও তাহার ভ্রাতাকে এখনকার মত অবকাশ দেওয়া হউক, আর নগরে নগরে লোক সংগ্রহকারীদিগকে পাঠাইয়া দেওয়া হউক; তাহারা সমস্ত বিজ্ঞ যাদুকরগণকে নিয়া আসিবে। (পারা– ৯; রুকু– ৩)

قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى ـ قَالَ رَبُّنَا الَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ـ

ফেরাউন বলিল, হে মূসা! তোমরা যে প্রভুর কথা বল সেই প্রভু কে? মূসা বলিলেন, সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুকে উহার আকার-আকৃতিতে রূপায়িত করিয়াছেন, অতঃপর প্রত্যেককে তাহার উপযোগী খাদ্য-খাদক, কাজ-কর্ম, চাল্-চলন ইত্যাদির প্রতি স্বতঃপ্রবৃত্তরূপে পরিচালিত করিয়াছেন যিনি, তিনিই আমাদের প্রভু।

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى ـ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ فِىْ كِتٰبٍ ـ لَا يَضِلُّ رَبِّىْ وَلَا يَنْسٰى ـ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً ـ فَاَخْرَجْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ـ كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى ـ مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ـ

ফেরআউন (প্রভু হওয়ার দাবীদার; মূসার মুখে সে বাস্তব প্রভুর পরিচয় ও গুণাগুণ শুনিয়া ভয় পাইল যে, এই পরিচয়ে ত আমার দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন হইবে, তাই ঐ আলোচনা এড়াইবার উদ্দেশে অন্য প্রশ্ন তুলিয়া) বলিল, পূর্ব যুগের লোকদের অবস্থা কি হইবে? (অনেকে ত "প্রভু" অস্বীকার করিত। মূসা (আঃ) এই প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপ করতঃ বাস্তব প্রভুর আরও গুণাবলী উল্লেখ করিলেন যেন ফেরআউনের দাবীর অসারতা

অসারতা সুস্পষ্ট হয়। মূসা (আঃ) বলিলেন, পূর্ব যুগীয় লোকদের সংবাদ আমার প্রভুর নিকট লিখিত রহিয়াছে; আমার প্রভু তাহা হইতে অজ্ঞ নহেন, তিনি তাহা ভুলিবেনও না। (প্রভুর আরও গুণাবলী শুন,) তিনি তোমাদের বসবাসের জন্য যমীনকে বিছানার ন্যায় করিয়াছেন, তাহার মধ্যে চলাফেরার জন্য বিভিন্ন পথ বানাইয়া দিয়াছেন এবং আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করেন। (আল্লাহ বলেন সেই পানি দ্বারা আমি বিভিন্ন শ্রেণীর বহু রকম উদ্ভিদ মাটি হইতে বাহির করিয়া দিয়াছি; তোমরা তাহা খাও, তোমাদের পশু পালকেও তাহাতে চরাও। নিশ্চয় এই সমস্তের মধ্যে (প্রভুর পরিচয়ের) বহু নিদর্শন রহিয়াছে জ্ঞানবানদের জন্য। (আল্লাহ আরও বলেন,) আমি এই যমীন হইতে তোমাদিগকেও সৃষ্টি করিয়াছি (যমীনের উদ্ভিদ হইতে খাদ্য, তাহা খাইয়া রক্ত, রক্ত হইতে বীর্য, বীর্য দ্বারা মানব দেহ সৃষ্ট) এবং এই যমীনের মধ্যেই তোমাদিগকে ফিরাইয়া আনিব এবং ইহা হইতে পুনঃ তোমাদিগকে বাহির করিব। (যেমন বীজ যমীনই জন্মে, আবার যমীনেই ফিরিয়া আসিয়া পুনঃ জন্মে।)

وَلَقَدْ اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَاَبٰى ـ قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى ـ فَلَنَاْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّانُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلَا اَنْتَ مَكَانًا سُوًى ـ

আমি (মূসার মাধ্যমে আমার পরিচয়ের) সব রকম নিদর্শনই ফেরআউনকে দেখাইয়াছিলাম, কিন্তু সে অমান্য করিল। সে বলিল, হে মূসা! তুমি যাদুর দ্বারা আমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে তাড়াইতে আসিয়াছ? আমরাও তোমার বিরুদ্ধে অনুরূপ যাদুর ব্যবস্থা করিতেছি। অতএব উভয়ের মধ্যে সময় নির্ধারিত কর; আমরা বা তুমি– কেহই তাহার ব্যতিক্রম করিবে না, ঐ সময়ে উভয় পক্ষ মাঝামাঝি এক স্থানে সমবেত হইবে।

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى

মূসা (আঃ) বলিলেন, তোমাদের উৎসব দিবস নির্ধারিত রহিল, বেলা এক প্রহরে সমস্ত লোক সমবেত হইবে। فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ اَتٰى

ফেরাউন চলিয়া গেল এবং নিজের ফন্দিফিকির সম্পন্ন করিয়া নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল।

قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ـ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى ـ

মূসা (আঃ) উপস্থিত সকলকে উপদেশ দানে বলিলেন, তোমাদের ভয়াবহ অবস্থা হইবে; তোমরা (আল্লাহ প্রদত্ত মোজেযাকে 'যাদু' বলিয়া) আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করিও না; অন্যথায় তিনি তোমাদিগকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করিয়া দিবেন। মিথ্যা প্রবঞ্চনাকারী ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

فَتَنَازَعُوْا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى ـ

উপদেশের ফলে লোকদের মধ্যে (মূসা সম্পর্কে) মতভেদ সৃষ্টি হইল এবং গোপনে সলা-পরামর্শ চলিল।

قَالُوْٓا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى ـ فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا ـ وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى ـ

তাহারা বলিল, মূসা ও হারুন- তাহারা দুইজন যাদুকর তোমাদিগকে যাদুর জোরে তোমাদের দেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়া তোমাদের সুশৃঙ্খল ধর্মমত নষ্ট করিয়া দিতে চায়, অতএব তোমরা সমবেতভাবে সকল প্রকার তয়-তদবীর লইয়া প্রতিরোধের জন্য সারিবদ্ধ হইয়া একতাবদ্ধতার সহিত উপস্থিত হইবে।

(সূরা ত্বোয়া-হা ঃ পারা– ২৬ রুকু–১২)

وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ـ قَوْمَ فِرْعَوْنَ اَلَا يَتَّقُوْنَ ـ

আরও একটি স্মরণীয় ঘটনা–যখন তোমার পরওয়ারদেগার মূসাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি একটি স্বরাচারী জাতি তথা ফেরআউন জাতির নিকট যাও; তাহারা কি সংযত হইবে না?

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنَ ـ وَيَضِيْقُ صَدْرِىْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِىْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ ـ وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنْبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنَ ـ

মূসা (আঃ) বলিলেন, আমার ভয় হয়, (আমি একা হইলে) তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে। আমার মধ্যে ত সঙ্কোচবোধ আছেই, তদুপরি আমার মুখও চালু নহে– মুখে তোতলামি আছে, অতএব (আমার ভ্রাতা) হারুনকেও নবুয়ত দান করুন। তদুপরি আমার উপর তাহাদের একটি (খুনের) অপরাধের দাবী আছে। আমার ভয় হয়, তাহারা আমাকে মারিয়া ফেলিবে।

قَالَ كَلَّا ـ فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَا اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ـ فَاْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَا اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ ـ

আল্লাহ বলেন, না না – কিছুই করিতে পারিবে না, তোমরা আমার প্রদত্ত দলীল-প্রমাণ, আদেশাবলী লইয়া যাত্রা কর, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি; সব শুনিতে থাকিব। তোমরা ফেরআউনের নিকট যাও এবং বল, আমরা সারা জাহানের প্রভুর রসূল; প্রভুর আদেশ– তুমি বনী ইসরাঈলগণকে আমাদের সঙ্গে ছাড়িয়া দাও।

قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَّلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ ـ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِىْ فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ـ

(মূসা (আঃ) ফেরআউনকে নবুয়তের দাবী জানাইলেন,) ফেরআউন বলিল, আমরা ত তোমাকে শিশুকাল হইতে লালন-পালন করিয়াছি এবং আমাদের মধ্যে তুমি নিজ বয়সের অনেক বৎসর কাটাইয়াছ, তারপর তুমি একটা জঘন্য কাজ করিয়াছিলে (এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলে), তুমি ত বড়ই অকৃতজ্ঞ।

قَالَ فَعَلْتُهَآ اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ ـ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِىْ رَبِّىْ حُكْمًا وَّجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ـ

মূসা (আঃ) বলিলেন, ঐ কাজ করিয়াছি– তখন তাহা আমার অসর্কতায় সংঘটিত হইয়াছিল। অতঃপর তোমাদের ভয়ে তোমাদের হইতে পলায়ন করিয়াছিলাম। পরে আমার পরওয়ারদেগার আমাকে বিশেষ জ্ঞান দান করিয়াছেন এবং আমাকে রসূলরূপে নির্ধারিত করিয়াছেন।

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ اَنْ عَبَّدْتَّ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ ۔

আর (লালন-পালন করার) যে উপকার আমার প্রতি দেখাইতেছ– তাহা তোমারই কারণে ছিল যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে দাস বানাইয়া রাখিয়াছিলে। (তাহাদের ছেলে সন্তান তুমি মারিয়া ফেলিতে, তাহারই দরুন দীর্ঘ ঘটনার জেরে তোমার গৃহে আমি পৌছিয়াছিলাম।)

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۔ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ۔ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗٓ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ۔ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ۔ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْٓ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ۔

ফেরাউন বলিল, (তোমাদে উল্লেখ্য) সারা জাহানের পরওয়ারদেগারের পরিচয় কি? মূসা বলিলেন, সমস্ত আসমান, যমিনে এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা যিনি, তিনিই সারা জাহানের পরওয়ারদেগার; যদি বিশ্বাস কর (তবে এই পরিচয়ই যথেষ্ট)। ফেরআউন দরবাস্থিত সকলকে বলিল, তোমরা শুনিতেছ কি? (আমি ভিন্ন অন্য প্রভু আছে!) মূসা আরও বলিলেন, তোমাদের সকলের এবং তোমাদের বাপ-দাদার সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা (–তিনিই সারা জাহানের প্রভু)। ফেরআউন বলিল, তোমাদের এই (দাবীদার) রসূল যে (স্বীয় দাবী মতে) তোমাদের প্রতি প্রেরিত, নিশ্চয় পাগল। (নতুবা আমাদের বাপ-দাদা তুলিয়া কথা বলিতে ভয় পাইত।)

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۔ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ۔

মূসা (আঃ) বলিলেন, (যিনি আমার প্রভু) তিনি চন্দ্র-সূর্যের উদয়-অস্ত, উদয়-অস্তের কাল ও স্থান এবং সমগ্র পৃথিবীর প্রভু।* বিবেক-বুদ্ধি থাকিলে ইহাতে প্রভুকে চিনিতে পারিবে।

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ۔

(প্রভুর গুণ ও পরিচয় শ্রবণে প্রভুত্বের দাবীদারফেরআউন নিরুত্তর দিশাহারার ন্যায় হুমকিদানে বলিল,) যদি তুমি আমি ভিন্ন অন্য মা'বুদ গ্রহণ কর তবে নিশ্চয় তোমাকে কারারুদ্ধ করিবে।

قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ ۔ قَالَ فَاْتِ بِهٖٓ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۔

মূসা (আঃ) বলিলেন, আমি যদি (সত্যতার) স্পষ্ট প্রমাণ দিতে পারি তবুও (কারাভোগ)? ফেরআউন বলেল, সত্যবাদী হইলে প্রমাণ কর।

فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ۔ وَنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ۔

মূসা (আঃ) স্বীয় লাঠি মাটিতে ফেলিলেন, তাহা স্পষ্ট অজগর হইয়া গেল। আর তিনি নিজ হস্ত বগলের তলদেশ হইতে বাহির করিলে তাহা দর্শকদের সম্মুখে ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল।

قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهٗٓ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ ۔ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ۔

ফেরাউন তাহার পরিষদকে বলিল, নিশ্চয় এই ব্যক্তি বিজ্ঞ যাদুকর; তাহার ইচ্ছা– যাদুর জোরে

* অর্থাৎ সমগ্র সৌরজগত যাহা লক্ষ লক্ষ বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত– এই সব বস্তু বিভিন্ন অবস্থায় ও বিভিন্ন পর্যায়ে রহিয়াছে; বিভিন্ন গতিতে চলিতেছে। সেই সবের গতিবিধি এবং তাহার বর্তমান শৃঙ্খলা ইত্যাদি সব কিছু তাঁহার প্রভুত্বের অধীন। আছে কি আর কেহ যে, এই সবের মধ্যে বিন্দুমাত্র অধিকার খাটায়? ইহা অতি উজ্জ্বল ও অকাট্য পরিচয় বাস্তব প্রভুর। তোমাদের বিবেক-বুদ্ধি থাকিলে এই সূত্রে প্রভুকে সহজে চিনিতে পারিবে।

তোমাদেরকে দেশান্তরিত করিবে; তোমরা (তাহার সম্পর্কে) কি পরামর্শ দাও?

قَالُوْاۤ اَرْجِهْ وَاَخَاه وَابْعَثْ فِى الْمَدَائِن حشرِيْنَ - يَاتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّار عَلِيْم -

পরিষদ বলিল, তাঁহাকে ও তাহার ভ্রাতাকে এখন অবকাশ দিন এবং নগরে নগরে সংগ্রহকারী লোক পাঠাইয়া দিন, তাহারা প্রত্যেক বিজ্ঞ যাদুকরকে আপনার নিকট উপস্থিত করিবে।

(সূরা শোয়ারাঃ পারা- ১৯; রুকু- ৬/৭)

হযরত মূসা ও যাদুকরদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

ফেরআউনের লোক-লস্কর বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বড় বড় বিজ্ঞ যাদুকর সংগ্রহ করিল। সেই যুগও ছিল যাদুবিদ্যার উন্নতির সেরা যুগ। সমবেত প্রচেষ্টায় একদল সেরা যাদুকর ফেরআউনের দরবারে সংগৃহীত হইল। যাদুকরগণ জয়ী হইতে পারিলেফেরআউন তাহাদিগকে প্রচুর পুরস্কার দিবে- সে সম্পর্কে কথাবার্তা বলিয়া সময়মত নির্দিষ্ট স্থানে যাদুকরগণ উপস্থিত হইল। তাহারা হযরত মূসাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি আপনার লাঠি প্রথমে ফেলিবেন, না আমাদেরটা প্রথমে ফেলিবে? মূসা (আঃ) বলিলেন, তোমরাই প্রথম ফেল। তাহারা নিজেদের কতিপয় লাঠি ও দড়ি মাটিতে ফেলিল এবং যাদুর দ্বারা লোকদের নজরবন্দি করিয়া দিল; ফলে উপস্থিত লক্ষ লক্ষ লোকদের চক্ষে এইরূপ দেখাইতেছিল যেন ঐ লাঠি ও রশিগুলি সাপের ন্যায় ছুটাছুটি করিতেছে। এইরূপে তাহারা এক মস্ত বড় যাদুর অবতারণা করিল।

মূসা (আঃ) সব কিছুই উপলব্ধি করিতেছিলেন, কিন্তু তিনি এই ভয় করিলেন যে, যাদুকররা দর্শকদের নজরবন্দি করিয়া যাহা দেখাইল আমার মোজেযাও ত সেই শ্রেণীরই, এমতাবস্থায় দর্শকদের নজরে হক ও না হক মোজেযা এবং যাদুর পার্থক্য উদ্ভাসিত হইবে কিনা? আল্লাহ তাআলা হযরত মূসার নিকট অহী পাঠাইলেন, আপনি কোন প্রকার আশঙ্কা না করিয়া আপনার লাঠি মাটিতে ফেলিয়া দিন। মূসা (আঃ) স্বীয় লাঠি মাটিতে ফেলিয়া দিলেন; সঙ্গে সঙ্গে তাহা এক অজগর হইয়া যাদুকরগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সব কিছুকে গিলিয়া ফেলিল।

অবস্থাদৃষ্টে প্রতিদ্বন্দ্বি যাদুকররা সর্বাধিক প্রভাবান্বিত হইল। তাহারা যাদুর বাস্তব অবস্থা ও তাহার শক্তি-সীমা ইত্যাদি ভালরূপে জানিত। সুতরাং তাহারা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিল যে, মূসা (আঃ) যাহা দেখাইলেন তাহা যাদু নহে, অলৌকিক শক্তি, নতুবা তাহা বাস্তব অজগরে পরিণত হইয়া আমাদের যাদুর বস্তুসমূহ খাইয়া ফেলিতে পারিত না। অধিক এই হইত যে, তাঁহার লাঠিও আমাদের লাঠিগুলির ন্যায় বা তাহা অপেক্ষা বড় আকারের সাপের মত দেখাইত; বাস্তব সাপে পরিণত হইত না, যদ্দরুন তাহা আমাদের যাদুকে ভক্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। যাদুর দ্বারা কোন বস্তুর প্রকৃত পরিবর্তন ঘটে না, শুধুমাত্র দর্শকের নজরে একটি বস্তুর উপর অপর বস্তুর আকার ও রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং তাহা নজরবন্দির কারণে তাহা হইয়া- প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা দৃষ্ট রূপের বস্তুতে পরিণত হয় না। যেমন আলোচ্য ঘটনায় যাদুকরদের লাঠি ও দড়িগুলি আগে পরে সব সময় প্রকৃত প্রস্তাবে নির্জীব লাঠি ও দড়িই রহিয়াছে, অবশ্য নজরবন্দীর দরুন কিছু সময়ের জন্য দর্শকদের চোখে ঐগুলির উপর সাপের আকৃতি ও রূপ ও দৃষ্ট হইয়াছিল মাত্র, ঐগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে সাপ হইয়াছিল না। পক্ষান্তরে হযরত মূসার নির্জীব লাঠি বিশেষ সময়ের জন্য হইলেও জীবন্ত অজগরে পরিণত হইয়াছিল। সেমতে তাহার পক্ষে যাদুকরদের বস্তুসমূহ গলাধঃ করা সম্ভব হইয়াছিল এবং ইহা যে, নজরবন্দী বা ভোজবাজি ছিল না, তাহা যাদুকরগণ নিজেদের বিজ্ঞতার দ্বারা সহজেই উপলব্ধি করিতেছিল ফলে তৎক্ষণাৎ সর্বসমক্ষে ঐ প্রতিদ্বন্দি যাদুকরগণ খাঁটি ঈমান গ্রহণের ঘোসনা পূর্বক প্রভু-পরওয়ারদেগারের দরবারে নিজেকে নিবেদিত করিয়া দিবার নিদর্শনস্বরূপ সেজদায় পড়িয়া গেল। উক্ত ঘটনার বিবরণ নিম্নের আয়াতসমূহে বর্ণিত আছে-

قَالُوْا يٰمُوسٰى اِمَّا اَنْ تُلْقِىَ وَاِمَّا اَنْ نَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى -

যাদুকররা বলিল, হে মূসা! প্রথমে আপনি লাঠি ফেলিবেন, না- আমরা প্রথমে ফেলিব?

قَالَ بَلْ اَلْقُوْا - فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى -

মূসা (আঃ) বলিলেন, বরং তোমরাই ফেল। তখন তাহাদের নিক্ষিপ্ত দড়ি এবং লাঠিগুলি যাদুর বলে

(দর্শকদের, এমনকি) মূসা (আঃ)-এর দৃষ্টিতেও দেখাইতেছিল যেন ঐগুলি (সাপের ন্যায়) ছুটাছুটি করিতেছে।

فَاَوْجَسَ فِى نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوسٰى ـ قُلْنَا لاَ تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ـ وَاَلْقِ مَا فِي يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ـ وَلاَ يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى ـ

মূসা (আঃ) মনে আশঙ্কা বোধ করিলেন; (ইহা ভেলকিবাজী, কিন্তু দেখিতে আমার মোজেযার অনুরূপই; দর্শকরা পার্থক্য করিতে পারিবে কি? আল্লাহ বলেন,) আমি মূসাকে বলিলাম, ভয় পাইবেন না; নিশ্চয় আপনিই হইবেন জয়ী। আপনার ডান হস্তের বস্তুটা মাটিতে ফেলুন; তাহা যাদুকরদের গর্হিত সব কিছু গিলিয়া ফেলিবে। তাহারা যাহা বানাইয়াছে তাহা শুধু যাদুকরের ভেলকিবাজি। যাদুকর (মোজেযার সম্মুখে) আসিয়া কখনও জয়ী হয় না। (সূরা ত্বোয়া-হাঃ পারা– ১৬; রুকু– ১২)

فَجَمَعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ـ وَقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُجْتَمِعُوْنَ ـ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ـ

যাদুকর দলকে নির্দিষ্ট দিনটিতে একত্র করা হইল এবং লোকদের মধ্যে ঢোল-শোহত করা হইল যে, তোমরা সকলে অবশ্য অবশ্য একত্রিত হইবে। যদি যাদুকর দল জয়ী হয় তবে আমরা সকলে তাহাদের তরীকা তথা ফেরআউনের প্রভুত্ব স্বীকারের উপরই থাকিব।

فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ـ

যাদুকর দল যখন ফেরআউনের নিকট উপস্থিত হইল তখন তাহারা ফেরআউনকে বলিল, আমরা কি বড় পুরস্কার লাভ করিব, যদি আমরা জয়ী হইতে পারি?

قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ـ

ফেরাউন বলিল নিশ্চয়, অধিকন্তু তোমরা রাজদরবারে নৈকট্য লাভকারীদের মধ্যে গণ্য হইবে।

قَالَ لَهُمْ مُوْسٰى اَلْقُوْا مَا اَنْتُمْ مُلْقُوْنَ ـ

(মূসা (আঃ) ও যাদুকর উভয় পক্ষ ময়দানে আসিলে) মূসা (আঃ) যাদুকর দলকে বলিলেন, ফেল যাহা কিছু তোমাদের ফেলিবার আছে।

فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ ـ فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ـ

যাদুকর দল তাহাদের দড়ি ও লাঠিগুলি মাটিতে ফেলিল এবং ফেরআউনের জয়ধ্বনি করিয়া বলিল নিশ্চয় আমরাই জয়ী হইব। অতঃপর মূসা (আঃ) স্বীয় লাঠি নিক্ষেপ করিলেন, তৎক্ষণাৎ আচম্বিত তাহা (বড় অজগর হইয়া) যাদুকরদের বানোয়াট বস্তুগুলি গিলিয়া ফেলিল। (পারা– ১৯; রুকু– ৭)

وَجَآءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْا اِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ـ قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ـ

যাদুকর দল ফেরআউনের দরবারে উপস্থিত হইয়া বলিল, যদি আমরা জয়ী হইতে পারি তবে আমরা নিশ্চয় বড় পুরস্কার লাভ করিব ত?ফেরআউন বলিল– হ্যাঁ, তদুপরি তোমরা রাজদরবারে বিশেষ নৈকট্যের অধিকারী হইবে।

قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِمَّا اَنْ تُلْقِىَ وَاِمَّا اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ ـ قَالَ اَلْقُوْا فَلَمَّا اَلْقَوْا سَحَرُوْا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَاۤءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ـ

যাদুকরগণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে মূসা। আপনি ফেলিবেন, না আমরা ফেলিব? মূসা (আঃ) বলিলেন, তোমরাই ফেল। যাদুকররা যখন (লাঠি ও দড়ি) ফেলিল তখন তাহারা (যাদুর দ্বারা) দর্শকদের চোখে ভেলকি লাগইয়া দিল এবং যাদুর চাপে তাহাদের ভীত করিয়া দিল, (ফলে লাঠি ও দড়ি দর্শকদের চোখে সাপের ন্যায় দেখাইল*) যাদুকররা একটা বড় রকমের যাদু উপস্থিত করিল।

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ـ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ـ

আর আমি মূসার নিকট ওহী পাঠাইলাম, আপনি স্বীয় লাঠি ফেলুন; তৎক্ষণাৎ তাহা বড় অজগর হইয়া যাদুকরদের বানোয়াট বস্তুসমূহকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। সত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল এবং তাহাদের বানাওটির অবসান ঘটিল। পরিণামে ফেরআউনগোষ্ঠী উপস্থিত ক্ষেত্রেই পরাজিত হইল এবং অপমানিত হইল। (সূরা আ'রাফঃ পারা-৯; রুকু-৪)

যাদুকরগণের ঈমান ও ফেরআউনের ভীতির উত্তর

যাদুকররা হযরত মূসার মোজেযা দেখিয়া সহজেই তাঁহার সত্যতা উপলব্ধি করিল; তৎক্ষণৎ সর্ব সমক্ষে খাঁটি ঈমানের ঘোষণাদানপূর্বক সেজদায় পড়িয়া গেল।ফেরআউন তাহাদের প্রতি ভীষণ চটিয়া গেল। সে বলিল, মনে হয় তোমরাও মূসার দলেরই; মূসা ওস্তাদ, তোমরা শার্গেদ। সকলে মিলিয়া এই ফন্দি করিয়াছ যে, প্রথমে একজন আসিয়াছ, অতঃপর অবশিষ্টরা আসিয়া সর্ব সমক্ষে পরাজয় বরণে নিজেদের দলেরই বিজয় প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পাইয়াছ। আমি তোমাদিগকে এই কার্যের সমুচিত শাস্তি দিতেছি- আমি তোমাদেরকে শূলদণ্ড দিব, বুঝিতে পারিবে কিরূপ মজা লাগে!

ফেরআউনের ভীতি প্রদর্শনের উত্তরে যাদুকরগণ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা পবিত্র কোরআনের বর্ণনায় শোনাই উত্তম। নিম্নের আয়াতসমূহের যুগান্তকারী উত্তর লক্ষ্য করুন-

فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى ـ

তৎক্ষণাৎ যাদুকর দল সেজদায় পড়িল এবং ঘোষণা করিল, আমরা মূসা ও হারুনের (বর্ণিত) প্রভু পরওয়ারদেগারের উপর ঈমান আনিলাম।

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ـ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ـ فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِىْ جُذُوْعِ النَّخْلِ ـ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى ـ

ফেরআউন (ভীষণ চটিয়া গিয়া) বলিল, তোমরা মূসার প্রতি ঈমান আনিলে- আমার অনুমতির পূর্বেই? (মনে হয়-) নিশ্চয় মূসা তোমাদেরই প্রধান, সে-ই তোমাদের যাদুবিদ্যার ওস্তাদ (তোমরা একই দল) সুতরাং আমি তোমাদের এক দিকের হাত অপর দিকের পা কাটিয়া শাস্তি দিব এবং তোমাদিগকে শূলে

* যাদুর শক্তি এতটুকুই- ভেলকিবাজি, নজরবন্দী এবং মানসিক চাপ প্রয়োগের দ্বারা এক বস্তুকে অন্য বস্তুর ন্যায় দেখাইতে পারে মাত্র। ইহা কোন বড় কথা নহে- মানুষ সাধারণতঃ বায়রোগ, মস্তিস্কের শুষ্কতা ইত্যাদির চাপেও নানা রকম বস্তু বা রং চোখে দেখিতে পায়, যাহা বাস্তবে মোটেই নাই।

চড়াইয়া হত্যা করিব। (তোমাদের প্রভুর আর আমার মধ্যে) কে অধিক কঠোর ও স্থায়ী শাস্তি দিতে পারে তাহা জানিতে পারিবে!

قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِىْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ ـ اِنَّمَا تَقْضِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ـ

তাঁহারা ফেরআউনকে উত্তর দিলেন, আমাদের নিকট (মূসার সত্যতার) যেসব সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত হইয়াছে ঐ সবের উপর এবং আমাদিগকে যিনি পয়দা করিয়াছেন তাঁহার উপর তোমাকে প্রাধান্য দিতে আমরা আদৌ প্রস্তুত নহি; অতএব তোমার যাহা ইচ্ছা করিয়া ফেলিতে পার তুমি ত শুধুমাত্র এই পার্থিব জীবনের উপর হুকুম চালাইবে।

اِنَّا اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا وَمَا اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ـ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

নিশ্চয় আমরা ঈমান আনিয়াছে আমাদের সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তার উপর, আমাদের আশা— তিনি আমাদের সব অপরাধ মাফ করিবেন, তোমার চাপে পড়িয়া যাদুর ব্যাপারে যাহা করিয়াছি তাহাও মাফ করিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ হইলেন মঙ্গলময় অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী।

اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ـ وَمَنْ يَاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ـ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى ـ

ইহা অবধারিত যে, যেব্যক্তি তাহার প্রভুর দরবারে উপস্থিত হইবে অপরাধীরূপে, তাহার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত রহিয়াছে, তথায় (কঠোর আযাব ভোগ করিতে থাকিবে।) তাহার সম্পূর্ণ মৃত্যুও ঘটিবে না, আবার (কষ্ট-যাতনা লক্ষ্য করিলে) তাহাকে জিন্দেগীও বলা চলে না। পক্ষান্তরে যে উপস্থিত হইবে ঈমানদার সৎকর্মশীলরূপে, এই শ্রেণীর লোকদের জন্য অতি উচ্চ মর্যাদা তথা চিরস্থায়ী বেহেশত রহিয়াছে যাহার নিম্নদেশে নহর বহিয়া চলিবে; তথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে। আত্মশুদ্ধি লাভকারীদের প্রতিদান এইরূপই হইবে। (পারা– ১৬ রুকু– ১২)

وَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ـ قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ـ

যাদুকর দল সেখানেই সেজদায় পড়িল। তাহারা ঘোষণা করিল, আমরা সারাজাহানের সৃষ্টিকর্তা রক্ষাকর্তা পালনকর্তা তথা হযরত মূসা ও হারুনের (বর্ণিত) প্রভু-পরওয়ারদেগারের প্রতি ঈমান আনিলাম।

قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَا اَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ـ

ফেরআউন (চটিয়া গিয়া) বলিল, আমার অনুমতি ছাড়াই তোমরা মূসার প্রতি ঈমান আনিয়াছ? (তোমরা সব এক দলের;) নিশ্চয় এই ঘটনা তোমাদের একটা বড় ষড়যন্ত্র। এই দেশবাসীকে দেশান্তর করার উদ্দেশে এই অভিসন্ধি আঁটিয়াছ। আচ্ছা— ইহার পরিণাম শীঘ্রই জানিতে পারিবে।

لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ـ

নিশ্চয় আমি তোমাদের এক দিকের হাত অপর দিকের পা কাটিয়া দিব, অতঃপর নিশ্চয় নিশ্চয় তোমাদের সকলকে শূলে চড়াইয়া মারিব।

قَالُوْا اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ـ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا اِلاَّ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ـ

তাঁহারা বলিলেন, (ভয় নাই; মৃত্যু হইলে) আমরা আমাদের প্রভুর নিকটই পৌঁছাইব। তোমার নিকট আমাদের অপরাধ একমাত্র এই ত যে, আমাদের পরওয়ারদেগারের আদেশাবলী ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আমাদের নিকট পৌঁছিলে আমরা তাহার উপর ঈমান আনিয়াছি।

رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ـ

অতঃপর তাঁহারা মোনাজাত করিলেন, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! ধৈর্যধারণের শক্তিবলে আমাদের পরিপূর্ণ করিয়া দাও এবং আমাদের মৃত্যু যেন তোমার অনুগত দাস অবস্থায়ই আসে। (পারা-৯; রুকু- ৪)

فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ـ قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ـ

যাদুকর দল সেজদায় পড়িলেন। তাঁহারা ঘোষণাও করিলেন যে, আমরা সারা জাহানের প্রভু তথা মূসা ও হারুনের বর্ণিত প্রভু-পরওয়ারদেগারের প্রতি ঈমান আনিয়াছি।

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ـ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ـ

ফেরাউন ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, তোমরা আমার অনুমতি লইবার পূর্বে তাহার উপর ঈমান আনিয়া ফেলিলে? নিশ্চয় মূসা তোমাদের প্রধান- যে তোমাদিগকে যাদু শিখাইয়াছে। (তোমরা সব আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছ) অচিরেই পরিণাম বুঝিতে পারিবে।

لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ـ

তোমাদের এক দিকের হাত অপর দিকের পা কাটিয়া দিব এবং নিশ্চয় তোমাদের সকলকে শূলে চড়াইয়া মারিব।

قَالُوْا لَاضَيْرَ ـ اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ـ اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَلَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَا اَنْ كُنَّا اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

তাঁহারা বলিলেন, মৃত্যুতে কোনই ক্ষতি নাই; (মৃত্যু হইলে) আমরা আমাদের প্রভুর নিকটই পৌঁছিব-(প্রভুর জন্য প্রাণ দিয়া প্রভুর দরবারে পৌঁছিলে ত খুশীর সীমা নাই)। আমরা আশা রাখি, আমাদের প্রভু আমাদের সব অপরাধ ক্ষমা করিবেন; ইহার বদৌলতে যে, আমরা উপস্থিতদের মধ্যে সর্বপ্রথম মোমেন হইয়াছি। (সূরা শোয়ারাঃ পারা-১৯;রুকু-৭)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ঈমানের জন্য জীবন দানে প্রস্তুত যাদুকরদের সর্বশেষ অবস্থা কি? কাহারাও মত এই যে,ফেরআউন তাহাদের হুমকি কার্যে পরিণত করিয়াছিল এবং তাঁহারা দৃঢ় চিত্তে তাহা বরণ করিয়াছিলেন, ঈমান ছাড়েন নাই।

তফসীর "রুহুল-মাআ'নী" এই মতামতকে দুর্বল সাব্যস্ত করিয়া বিপরীত মতকে প্রাধান্য দিয়াছে যে,ফেরআউন শাস্তি প্রয়োগে সাহসী হয় নাই।

বনী ইসরাঈলদের মধ্যে ঈমানের বিস্তার

মূসা আলাইহিস সালামের বিজয়ে যাদুকর দল ত ঈমান আনিলই বনী ইসরাঈলদেরও একদল লোক ঈমান আনিল; অবশ্য তাহারা ফেরআউনের ভয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিতে সাহস করে নাই। মূসা (আঃ) তাহাদিগকে আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা স্থাপনের উপদেশ দিলেন; তাহারা আল্লাহ তাআলার দরবারে আবেদন

নিবেদন করিতে লাগিলেন। পবিত্র কোরআনে তাহার বিবরণ এই–

فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰى اِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَاۡئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ - وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْاَرْضِ - وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ -

মূসার বংশধর হইতে কিছু সংখ্যক লোক ঈমান আনিল– তাহাও ফেরআউনে এবং তাহার পরিষদের ভয়ে ভীত অবস্থা যে, তাহারা (জানিতে পারিলে) তাহাদিগকে কষ্ট-যাতনা দিবে। বস্তুতঃফেরআউন ছিলও দেশের মধ্যে অতিশয় দুর্ধর্ষ ও সীমা অতিক্রমকারী।

وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ -

মূসা (আঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, হে আমার জাতি! যদি তোমরা বাস্তবিকইআল্লাহর উপর ঈমান আনিয়া থাক, তবে তাঁহার উপরই ভরসা কর (সেই ঈমানের মোকাবিলায় সব কিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হও), যদি তোমরা বাস্তবিকই মুসলমান তথা আল্লাহর অনুগত হইয়া থাক।

فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا - رَبَّنَا لَاتَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ - وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ -

তাহারা হযরত মূসার আহ্বানে সাড়া দিয়া বলিল, আমরা আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা স্থাপন করিলাম। হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! আমাদিগকে জালেমদের দ্বারা অত্যাচারিত হইতে দিও না এবং নিজ রহমতে আমাদিগকে কাফেরদের হইতে রক্ষা কর। (পারা– ১১; রুকু–১৪)

বনী ইসরাঈলদের মধ্যে নামাযের ব্যবস্থা করার নির্দেশ

হযরত মূসার জয়লাভ এবং কিছু লোকের ঈমান গ্রহণের পর আল্লাহ তাআলা মূসা ও হারুন (আঃ)-কে নির্দেশ দিলেন, এখন বনী ইসরাঈলগণকে লইয়া মিসরেই অবস্থান করুন এবং তাহাদের মধ্যে নামাযের সুব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে নামাযী বানাইতে চেষ্টা করুন। নিম্নের আয়াতে এই বিবরণই রহিয়াছে–

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ -

আর আমি মূসা ও হারুনের প্রতি অহী পাঠাইলাম যে, তোমরা (এখন) নিজ জাতির ঘড়-বাড়ী বাসস্থান মিসরেই রাখ এবং ঐ সব ঘর-বাড়ীর মধ্যেই নামাযের জায়গার ব্যবস্থা কর এবং সকলে নামাযের পাবন্দী কর। আর খাঁটি মোমেনগণকে সুসংবাদ দান কর। (পারা– ১১; রুকু– ১৪)

মূসা (আঃ) ও বনী ইসরাঈলদের প্রতি ব্যবস্থাবলম্বন

ফেরআউন ও তাহার দলবল হযরত মূসার সাফল্যে অগ্নি যাতনা অনুভব করিতে লাগিল। সকলে ফেরআউনকে মূসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাবলম্বনের জন্য চাপ দিল। ফেরআউন এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিল যে, মূসার জাতি বনী ইসরাঈলকে শাস্তিদান এবং দুর্বল করার উদ্দেশে পূর্বের ন্যায় তাহাদের ছেলে সন্তান মারিয়া ফেলা হউক এবং মেয়েদেরকে জীবিত রাখিয়া দাসীরূপে ব্যবহার করা হউক। বনী ইসরাঈলগণ এ সম্পর্কে হযরত মূসার নিকট ফরিয়াদ জানাইলে তিনি তাহাদের সবরের উপদেশ দিলেন এবং অচিরেই আল্লাহ তাআলা কর্তৃক ব্যবস্থাবলম্বনের আশ্বাস দিলেন। যাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে এই–

وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ - قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ -

ফেরাউনগোষ্ঠীর একদল লোক ফেরআউনকে বলিল, আপনি কি মূসা এবং তাহার জাতিকে ছাড়িয়া দিবেন– তাহারা দেশের ঐক্য নষ্ট করিবে, আপনা এবং আপনার মনোনীত মা'বুদদের উপাসনা পরিত্যাগ করিবে? ফেরআউন বলিল, (হুকুম জারি করিতেছি,) তাহাদের ছেলে সন্তান মারিয়া ফেলিব এবং মেয়ে সন্তান জীবিত রাখিয়া দাসী বানাইব। আর (ইহা সহজই হইবে;) আমরা ত তাহাদের উপর প্রবল।

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ـ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ـ

মূসা (আঃ) নিজ জাতিকে বলিলেন, তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর। সমগ্র ভূমণ্ডলের মালিক আল্লাহ, তিনি নিজ বান্দাগণ হইতে যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে ক্ষমতা দান করেন। (তাঁহার ইচ্ছা বিভিন্ন কারণে বিভিন্নরূপে পরিচালিত হয়; জাগতিক উন্নতির দ্বারা আল্লাহর প্রিয়-অপ্রিয় হওয়ার বিচার হয় না। অবশ্য) শুভ পরিণাম একমাত্র খোদাভীরুদের জন্য নির্দিষ্ট।

قَالُوْا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ تَاْتِيْنَا وَمِنْۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ـ قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ كَانَ تَعْمَلُوْنَ ـ

বনী ইসরাঈলগণ বলিল, আপনার আবির্ভাবের পূর্বেও আমরা কষ্ট-যাতনা ভোগ করিয়াছি, আপনার আবির্ভাবের পরেও সেই দুঃখ-কষ্টই ভোগ করিব! মূসা (আঃ) সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, আশা করি তোমাদের পরওয়ারদেগার তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করিবেন এবং তোমাদিগকে তাহাদের স্থলে ভূপৃষ্ঠে ক্ষমতাসীন করিবেন; অতঃপর তিনি দৃষ্টি রাখিবেন, সুযোগপ্রাপ্তে তোমরা (দায়িত্ব পালনে) কিরূপ কাজ কর।

(পারা–৯; রুকু–৫)

ফেরআউনগোষ্ঠীর উপর আল্লাহর গজব

হযরত মূসার সত্যতা এবং তাঁহার নবুয়তের দাবী স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়া গেল, এমনকি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী যাদুকরদল তাঁহার প্রতি ঈমান আনিল। ফেরআউন ও তাহার দলবলের অন্তরেও হযরত মূসার সত্যতার ছাপ অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু ফেরাউনের স্বৈরাচারী স্বভাব, গোঁড়ামী এবং স্বার্থান্ধতা তাহাকে যাদুকর দলের ন্যায় সত্যতার সামনে নত করিতে দিল না এবং তাহার দলবলও তাহারই পথ অবলম্বন করিল। এ সম্পর্কে কোরআনে বর্ণনা এই–

فَلَمَّا جَاۤءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ـ وَجَحَدُوْا بِهَا ....

অর্থ ঃ যখন ফেরাউন গোষ্ঠীর নিকট আমার বিভিন্ন নিদর্শন দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হইল, তখনও তাহারা এই বলিল যে, এইসব স্পষ্ট যাদু। তাহারা (মূসার সত্যতার) নিদর্শনসমূহকে (ঐরূপ) অমান্য অস্বীকার করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের অন্তরে (অনিচ্ছা সত্ত্বেও) একীন বিশ্বাসের রেখাপাত হইয়াছিল; (অবশ্য তাহারা অন্তরে সেই উদিত একীন গ্রহণ করে নাই) তাহাদের স্বৈরাচারী স্বভাব এবং গোঁড়ামীর কারণে। ফলে সেই স্বৈরাচারীদের পরিণতি কি হইয়াছিল তাহাই দেখিবার জিনিস।

(সূরা নমলঃ পারা–১৯; রুকু–১৬)

ফেরআউন নিজকে ও দলবলকে আখেরাতের আযাবে ত ঠেলিয়া দিলই, দুনিয়াতেও অভিশাপে পতিত হইল। পবিত্র কোরআনেই রহিয়াছে–

وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ۔

"মূসাকে আমি (তাঁহার সত্যতার উপর) আমার প্রদত্ত নিদর্শনসমূহ এবং স্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরআউন ও তাহার দলবলের প্রতি পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু (ফেরাউন ঐ নিদর্শন ও প্রমাণসহ মূসাকে অমান্য করিল এবং) ফেরআউনের দলের লোকেরা ফেরআউনের পরামর্শেই চলিল; অথচ ফেরআউনের পরামর্শ ভাল ছিল না– তাহাদের জন্য ধ্বংসকারী ছিল। ফেরআউন (দুনিয়াতে যেমন দলের নেতৃত্ব দিতেছিল, তদ্রূপ) কেয়ামতের দিন তাহার দলবলের আগে থাকিয়া (নিজেও জাহান্নামে পতিত হইবে,) তাহাদিগকেও জাহান্নামে পতিত করিবে; জাহান্নাম কতই না খারাপ জায়গা! ফেরআউন ও তাহার দলবলের উপর দুনিয়াতেও অভিশাপের ছাপ মারিয়া দেওয়া হইয়াছে, কেয়ামতের দিনও তাহাই ভোগ করিবে। কতই না খারাপ পরিণতি তাহাদের।
(সূরা হুদঃ পারা–১২; রুকু–৯)

ফেরআউন ও তাহার দলবল অন্যায় ও স্বৈরাচারিতার দরুন দুনিয়াতেই নানা প্রকার গযবে পতিত হইয়াছিল। পবিত্র কোরআনে তাহার বিবরণ এই–

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ۔

আমি ফেরআউনগোষ্ঠীকে পাকড়াও করিয়াছিলাম দুর্ভিক্ষ এবং শস্য-ফসল, ফল-ফলারির ক্ষয়-ক্ষতির দ্বারা এই উদ্দেশে যে, তাহাদের সুবুদ্ধি আসিবে।

فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ

কিন্তু (তাহাদের অবস্থা কি জঘন্য!) যখনই (পরীক্ষা স্বরূপ) তাহাদের একটু ভাল অবস্থা দেখা দিত তখন বলিত, আমরা ত এই অবস্থারই উপযুক্ত; আর যদি (স্বরাচারিতার ফলে) খারাপ অবস্থার সম্মুখীন হইত, তবে তাহাকে মূসা ও তাঁহার সঙ্গীগণের অশুভতার পরিণতি বলিয়া থাকিত।

أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۔

স্মরণ রাখিও, তাহাদের অশুভতা আল্লাহ তাআলা ভালরূপেই জানেন (যে, তাহাদেরই কৃত-কর্মের ফল)। যদিও অধিকাংশ লোক ইহা বুঝে না।

وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۔

তাহারা (হযরত মূসাকে) আরও বলিল, আমাদের উপর যাদু চালাইবার জন্য যেকোন রকম আশ্চর্য বস্তুই পেশ কর আমরা কিছুতেই তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী হইব না।

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ ۔
فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ۔

ফলে তাহাদের উপর বন্যা শস্য-ফসল, ফল-মূল ধ্বংসকারী পঙ্গপালের আক্রমণ, গুদামজাত খাদ্যদ্রব্য বিনষ্টকারী কীট পোকা, শরীর ও মাথার উকুনের প্রাদুর্ভাব, অত্যধিক ব্যাঙের উপদ্রব, পানীয় বস্তু রক্তে পরিণত হওয়া– নানা রকমের গজব প্রকাশ্য মোজেযা ও কুদরতের নিদর্শনরূপে পাঠাইয়াছি, কিন্তু তাহারা গোঁড়ামি করিয়াছে এবং তাহারা ছিলই অপরাধ-পরায়ণ জাতি। (পারা– ৯; রুকু–৬)

এই আয়াতে দেখা যায়, ফেরআউন জাতি হযরত মূসার ডাকে সাড়া না দেওয়ায় তাহাদের উপর আল্লাহ তাআলার সাত প্রকার গযব আসিয়াছিল–

(১) দুর্ভিক্ষ ও দারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কট, (১) শস্য ফল, ফল-মূল উৎপন্নের ক্ষতি ও ধ্বংস, (৩) ভীষণ বন্যা ও প্রলয়ঙ্কর তুফান, (৪) দেশে পঙ্গপালের অসাধারণ আক্রমণ, (৫) কীট-পোকার এত উপদ্রব যে, সাধারণ জীবনযাত্রা কষ্ট-যাতনাপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং গুদামজাত দ্রব্য নষ্ট হইতেছিল, (৬) ব্যাঙের উপদ্রবেরও এত আধিক্য যে, ঘর-বাড়ী, হাঁড়ি-পাতিল, থালা-বাসন, ঘটি-বাটি, বিছানাপত্র সর্বদা ব্যাঙে পরিপূর্ণ থাকিত; যদ্দরুন সাধারণ জীবন যাপন সঙ্কটময় হইয়া গিয়াছিল (৭) যেকোন স্থান হইতে পানি পান ও ব্যবহার করিবার জন্য সম্মুখে আনিলেই পানি রক্তে পরিণত হইয়া যাইত।

এই সাতটি ঘটনা তাহাদের উপর আল্লাহ তাআলার গজবস্বরূপ ছিল এবং হযরত মূসার পক্ষে তাঁহার মোজেযা ছিল। এই সাতটি ভিন্ন তাহাদের সম্মুখে হযরত মূসার আরও দুটি প্রধান মোজেযা ছিল– (১) হযরত মূসার হাতের লাঠি অজগরে পরিণত হওয়া, (২) তাঁহার হাত বগলের নীচ হইতে বাহির করিলে তাহা উজ্জ্বল ঝক্ ঝক্ করা। এই নয়টি বিশেষ বিশেষ মোজেযা আল্লাহ তাআলা মূসা (আঃ)-কে দান করিয়াছিলেন ফেরআউন জাতির সম্মুখে তাঁহার সত্যতা প্রমাণের জন্য। এই সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বিবৃতি এই–

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ فَسْئَلْ بَنِىْ اِسْرَآئِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا ـ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ ....

অর্থ ঃ নিশ্চয় আমি মূসাকে স্পষ্ট নয়টি মোজেযা ও প্রমাণ দিয়াছিলাম; যখন তিনি বনী ইসরাঈলদের মধ্যে নবীরূপে আসিয়াছিলেন– সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ বনী ইসরাঈলদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে পার।

তখন ফেরআউন মূসাকে বলিয়াছিল, হে মূসা! তোমার প্রতি আমার ধারণা যে, যাদুর দরুন তোমার বুদ্ধির বিপর্যয় ঘটিয়াছে তাই তুমি নবুয়তের দাবী করিয়াছ)। মূসা (আঃ) বলিলেন, নিশ্চয় তুমি জান, এই ঘটনাবলী তিনিই ঘটাইয়াছেন যিনি সমস্ত আসমান যমীনের সৃষ্টিকর্তা। তিনি এই সব ঘটাইয়াছেন তোমাদের শুভ বুদ্ধি উদয়ের উদ্দেশে, কিন্তু হে ফেরআউন! (তোমাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হইবে বলিয়া দেখা যায় না, তাই) আমার নিশ্চিত ধারণা যে, তুমি ধ্বংসে পতিত হইবে। (পারা–১৫, রুকু–১২)

উল্লিখিত বিপদাপদ ও ঘটনাসমূহের দরুন ফেরআউনগোষ্ঠী হযরত মূসার প্রতি আকৃষ্ট হইত বটে, কিন্তু শুভ বুদ্ধি লইয়া নহে, বরং মোনাফেকী এবং শুধু জান বাঁচাইবার উদ্দেশ্য লইয়া। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বিবৃতি এই–

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ ـ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلٰى اَجَلٍ هُمْ بَالِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ـ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ ـ ......

"যখন তাহাদের উপর আযাব আসিল, তখন তাহারা বলিল, হে মূসা! আপনার পরওয়ারদেগারের নিকট আমাদের উদ্দেশে দোয়া করুন ঐ অবস্থার জন্য যাহার ওয়াদা তিনি আপনার নিকট করিয়াছেন (যে, আপনি দোয়া করিলে আযাব হটাইয়া দিবেন)। আপনি আমাদের হইতে আযাব হটাইয়া দিতে পারিলে নিশ্চয় আপনার প্রতি আমরা ঈমান আনিব এবং বনী ইসরাঈলকে আপনার সঙ্গে ছাড়িয়া দিব। (আল্লাহ বলেন– মূসার দোয়ায়) যখন আমি তাহাদের উপর হইতে আযাব দূর করিলাম, নির্ধারিত সময়ের জন্য–(যে পর্যন্ত তাহাদিগকে অবকাশ দিয়া দেখিবার ছিল); তখন তাহারা পূর্ব অঙ্গীকার ভঙ্গ করিল। ফলে আমি তাহাদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিলাম– এই যে, তাহাদিগকে ডুবাইয়া

মারিলাম এই উদ্দেশে যে, তাহারা আমার নিদর্শনসমূহকে, মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল এবং ঐ সবকে উপেক্ষা করিয়াছিল। (সূরা আরাফঃ পারা– ৯; রুকু– ৬)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ فَقَالَ اِنِّىْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔

আমি মূসাকে বিভিন্ন নিদর্শনসহ ফেরআউন ও তাহার দলবলের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমি সারা জাহানের প্রভু-পরওয়ারদেগারের প্রেরিত রসূল।

فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِاٰيٰتِنَا اِذَاهُمْ مِنْهَا يَضْحَكُوْنَ ۔

মূসা যখন আমার নিদর্শনসমূহ তাহাদের নিকট উপস্থিত করিলেন তখন তাহারা আশ্চর্যজনকভাবে ঐ সব উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিল।

وَمَا نُرِيْهِمْ مِنْ اٰيَةٍ اِلاَّ هِىَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا ۔ وَاَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۔

পূর্বেরটার চেয়ে পরেরটা বড়– এইরূপে নিদর্শনসমূহ দেখাইয়াছি ও তাহাদিগকে আযাবে ফেলিয়াছি এই উদ্দেশে যে, তাহারা ফিরিয়া আসিবে।

وَقَالُوْا يٰاَيُّهَا السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ ۔

আযাবে পতিত হইলেই মূসা (আঃ)-কে বলিত হে যাদুকর! আপনার পরওয়ারদেগারের নিকট আমাদের জন্য ভাল অবস্থার দোয়া করুন যাহার ওয়াদা তিনি আপনার নিকট করিয়াছেন; আমরা (বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলে) সৎপথে আসিয়া যাইব।

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ۔

(আল্লাহ বলেন, পক্ষান্তরে) যখনই আমি তাহাদিগকে বিপদমুক্ত করিয়াছি তখনই তাহারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করিত। (সূরা যুখ্‌রোফঃ পারা–২৫)

ফেরআউনের প্রতি এক ব্যক্তির বিশেষ নসীহত

ফেরাউন এবং তাহার দলবল ও পরিষদবর্গ হযরত মূসার ব্যাপার লইয়া ব্যতিব্যস্ত ছিল। একদা পরামর্শ সভায় ফেরআউন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিল যে, মূসার দলকে দুর্বল রাখার উদ্দেশে ছেলে সন্তান মারিয়া ফেলার এবং মেয়ে সন্তানকে দাসী বানাইয়া রাখার পূর্ববর্তী আইন বহাল রাখা হইবে এবং স্বয়ং মূসাকে হত্যা করা হইবে। এই কথা শ্রবণে ফেরআউন পরিবারেরই একজন লোক যে গোপনে মূসার প্রতি ঈমান রাখিত, সে ফেরআউনকে লক্ষ্য করিয়া এক বিশেষ যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিল। তাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে এই–

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۔ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهٰمٰنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ۔ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا اقْتُلُوْا اَبْنَاءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ وَاسْتَحْيُوْا نِسَآءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلاَّ فِىْ ضَلٰلٍ ۔

আমি মূসাকে আমার প্রদত্ত নিদর্শনসমূহ এবং সুস্পষ্ট প্রমাণ সহ পাঠাইয়াছিলাম– ফেআউন, হামান ও কারুন প্রমুখের প্রতি। তাহারা তাঁহাকে যাদুকর মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল। মূসা যখন আমার পক্ষ হইতে সত্যের আহ্বান লইয়া তাহাদের নিকট পৌঁছিলেন, তখন তাহারা সাব্যস্ত করিল যে, মূসার প্রতি যাহারা ঈমান রাখে

তাহাদের ছেলে সন্তান মারিয়া ফেলা এবং মেয়ে সন্তান জীবিত (দাসীরূপে) রাখা বহাল থাকুক। (এই অভিসন্ধি তাহারা করিল, কিন্তু রসূলের বিরুদ্ধে) কাফেরদের অভিসন্ধি নিষ্ফল হইতে বাধ্য।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِىْ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِى الْاَرْضِ الْفَسَادَ ـ

আর ফেরআউন বলিয়াছিল, তোমরা কেহ আমাকে এই সিদ্ধান্তে বাধা দিও না– আমি মূসাকে প্রাণে বধ করিয়া ফেলিব, সে তাহার প্রভুকে ডাকিয়া বাঁচিবার ব্যবস্থা করুক। আমার আশংকা হয়– সে তোমাদের প্রচলিত ধর্ম বিগড়াইয়া দিবে। অথবা দেশে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি করিবে।

وَقَالَ مُوْسٰى اِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّايُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ـ

এই হুমকির খবরে মূসা বলিয়াছিলেন, যিনি আমারও প্রভু, তোমাদেরও প্রভু, আমি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি প্রত্যেক স্বৈরাচার হইতে– যে হিসাব-নিকাশের দিনকে বিশ্বাস করে না।

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهُ وَآتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً اَنْ يَقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ وَقَدْ جَاۤءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ـ وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ـ وَاِنْ يَكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ يَعِدُكُمْ ـ اِنَّ اللّٰهَ لَايَهْدِىْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ـ

ফেআউন পরিবারের একটি লোক যে গোপনে ঈমান গ্রহণ করিয়াছিল, সে ফেরাউনের পরিষদমণ্ডলীকে বলিল, তোমরা কি একটি লোককে মারিতে চাও এই অপরাধে যে, সে বলে আমার প্রভু আল্লাহ? অথচ সে তোমাদের নিকট পরওয়ারদেগারের তরফ হইতে বহু দলীল-প্রমাণ নিয়া আসিয়াছে। আরও একটা কথা– যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে মিথ্যার পরিণাম তাহাকে ভুগিতে হইবে, আর যদি সে সত্য হয় তবে আযাবের যেসব সতর্কবাণী সে শুনাইতেছে তাহার কিছুটা তোমাদের উপর আসিবেই। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সীমা লঙ্ঘনকারী মিথ্যাবাদীকে (উদ্দেশ্য সাধনের শেষ প্রান্তে) পৌঁছিতে দেন না।

يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِيْنَ فِى الْاَرْضِ ـ فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْ بَّأْسِ اللّٰهِ اِنْ جَاۤءَنَا ـ

ঐ ব্যক্তি আরও বলিলেন, হে আমার জাতি! আজ তোমাদের হাতে রাজকীয় ক্ষমতা আছে, তোমরা দুনিয়াতে প্রভাব প্রতিপত্তিশালী, কিন্তু আল্লাহর গজব যদি আসিয়া পড়ে তবে আমাদের সাহায্যকারী কে আছে? (তোমাদের ক্ষমতা ত আল্লাহর মোকাবিলায় কিছুই না)।

قَالَ فِرْعَوْنُ مَا اُرِيْكُمْ اِلاَّ مَا اَرٰى وَمَا اَهْدِيْكُمْ اِلاَّ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ـ

ফেরাউন বলিল, আমি যাহা ভাল বুঝি তাহাই বলি এবং আমি তোমাদিগকে সঠিক পথেই চালাই।

وَقَالَ الَّذِىْ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ـ مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ ـ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ـ

মো'মিন ব্যক্তি সমগ্র জাতির প্রতি সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিল– হে আমার জাতি! আমার ভয় হয়, তোমরাও ঐরূপ দিনের সম্মুখীন হইয়া পড় না-কি যেরূপ দিনের সম্মুখীন হইয়াছিল বহু জাতি– নূহের জাতি, আ'দের জাতি, সামুদের জাতি, তাহাদের পরে আরও অনেকে। (প্রত্যেকেই নিজে ধ্বংস টানিয়া আনিয়াছিল নতুবা) আল্লাহর ইচ্ছাও হয় না বান্দাকে অত্যাচার করার।

وَيٰقَوْمِ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ - يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ - مَالَكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ - وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰه فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ -

হে আমার জাতি! আমি তোমাদের জন্য ভয় করি-(পুনর্জীবিত হইয়া উঠা, হিসাব-নিকাশের জন্য উপস্থিত হওয়া ইত্যাদি ভয়ঙ্কর ঘটনাবলী দৃষ্টে) ডাকাডাকি (হা-হুতাশ, চীৎকার, হৈ-হল্লা) হওয়ার দিনকে- যে দিন তোমরা বিচ্ছিন্নরূপে ছুটাছুটি করিবে, কিন্তু আল্লাহর আযাব হইতে রক্ষা পাইবার কোন আশ্রয় তোমাদের থাকিবে না। (সেই আযাব এড়াইয়া হেদায়াতের পথ ধর না কেন? বাস্তবিকই) যাহাকে আল্লাহ গোমরাহীর মধ্যে থাকিতে দেন (তাহা হইতে বাঁচাইয়া না লন) তাহাকে কেহ সৎপথে আনিতে পারে না)। (সূরা মোমেনঃ পারা- ২৪; রুকু- ৯)

ফেরআউনের ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِىْ صَرْحًا لَعَلِّىْ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّىْ لَاَظُنُّه كَاذِبًا -

(এই যুক্তিপূর্ণ আহ্বান এড়াইতে ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করিয়া) ফেরআউন তাহার প্রধান উজীরকে বলিল, হে হামান! আমার জন্য উঁচু মঠ তৈয়ার কর ত দেখি, তাহার সাহায্যে আসমানে পৌঁছাইতে পারি কি না এবং মূসার খোদার খোঁজ আনিতে পারি কি-না; আমি মূসাকে মিথ্যুকই মনে করি।

وكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ - وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلاَّ فِىْ تَبَابٍ

আল্লাহ তাআলা বলেন, ফেআউনের (ধৃষ্টতা) অসৎ কার্যাবলী (নফস-শয়তানের প্ররোচনায়) এইরূপেই তাহার চোখে সুন্দর দেখাইত এবং সে সৎপথ হইতে বিচ্যুত হইত। ফেআউনের প্রচেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে। (পারা- ২৪; রুকু- ৯)

ফেআউনের এই ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির উল্লেখ পবিত্র কোরআনের অন্যত্রও আছে-

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ - فَاَوْقِدْ لِىْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّىْ صَرْحًا لَعَلِّىْ اَطَّلِعُ اِلٰى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ -

ফেরাউন ঘোষণা দিল, হে আমার পরিষদমণ্ডলী! আমি ভিন্ন তোমাদের অন্য মা'বুদ আছে- ইহার খোঁজ আমার নাই। অতএব হে হামান! আমার জন্য পোক্তা ইট দ্বারা উঁচু ইমারত তৈয়ার কর, তাহাতে চড়িয়া মূসার খোদার খোঁজ আনিতে পারি না-কি? আমি ত মূসাকে মিথ্যাবাদীই মনে করিতেছি।

(সূরা কাছাছঃ পারা- ২০; রুকু- ৭)

মোমেন ব্যক্তির উদাত্ত আহ্বান

وَقَالَ الَّذِىْ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ - يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ - وَاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِىَ دَارُ الْقَرَارِ - مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰى اِلَّا مِثْلَهَا - وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

(ঐ মোমেন ব্যক্তি ফেরাউনের ধৃষ্টতাপূর্ণ কথায় দমিল না, সে পুনরায় আহ্বান করিল,) হে আমার জাতি! তোমরা আমার কথায় সাড়া দাও, আমি তোমাদিগকে সঠিক পথই দেখাইব।

হে আমার জাতি! ইহকালের অস্থায়ী জিন্দেগী অল্প দিনের মাত্র। নিশ্চয় আখেরাত বা পরকালই স্থায়ী চিরকালের বাসস্থান। যে কেহ পাপ করিয়াছে তাহাকে তাহার পাপের ধারা অনুসারে (আখেরাতে) শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। আর যেকোন পুরুষ বা মহিলা ভাল কাজ করিয়াছে এবং সে মোমেনও ছিল, তবে সে বেহেশতে স্থান লাভ করিবে, তথায় সে বে-হিসাব নেয়ামত ভোগ করিবে।

وَيٰقَوْمِ مَالِىٓ اَدْعُوكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِىْٓ اِلَى النَّارِ ـ تَدْعُوْنَنِىْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَالَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ ـ وَاَنَا اَدْعُوكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ـ

হে আমার জাতি! কি আশ্চর্য ও অনুতাপের কথা! আমি ত তোমাদের মুক্তির পথের আহ্বান জানাইতেছি; আর তোমরা আমাকে দোযখের দিকে ডাক (কি আশ্চর্যের কথা)! তোমরা আমাকে ডাকিতেছ আল্লাহদ্রোহিতা ও আল্লাহকে অস্বীকার করার প্রতি এবং মিছামিছি বস্তুকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করার প্রতি– অথচ আমি তোমাদিগকে ডাকি মহান আল্লাহর প্রতি. যিনি সর্বশক্তিমান, দয়ালু, ক্ষমতাশালী।

لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِىْٓ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِى الدُّنْيَا وَلَا فِى الْاٰخِرَةِ ـ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ـ فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ وَاُفَوِّضُ اَمْرِىْٓ اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ـ

সুনিশ্চিত কথা যে, যাহাদের পূজার প্রতি তোমরা আমাকে ডাক তাহারা দুনিয়া বা আখেরাত কোন দিক দিয়াই পূজা জপনার উপযুক্ত নহে। ইহাও সুনিশ্চিত যে, আমাদের সকলেই আল্লাহর দরবারে যাইতে হইবে। ইহাও সুশ্চিত যে, তখন স্বৈরাচারীরা দোযখবাসী হইবে। (আজ লক্ষ্য করিলে না!) ভাবী জীবনে তোমরা অবশ্যই আমার কথা স্মরণ করিবে, (কিন্তু সেই স্মরণে ফল হইবে না। সত্যের আহ্বানের দরুণ তোমরা আমার শত্রু হইবে; আমি ভীত নহি)। আমি আমার সব কিছু আল্লাহর হাওলা করিতেছি। নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাগণের হাল-অবস্থা নিরীক্ষণকারী।

فَوَقٰهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ـ

আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তিকে তাহাদের সমুদয় অপচেষ্টার কুফল হইতে বঁচাইয়া রাখিলেন। ফেরআউন গোষ্ঠীকে কঠিন আযাব ঘিরিয়া ধরিল, (তখনও আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে রক্ষা করিলেন)। (২৪ পারা– ৯,১০)

ফেরআউনের আস্ফালন

হযরত মূসার অপরাজেয় মোজেযা তদুপরি মোমেন ব্যক্তির যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা ইত্যাদি মিসরবাসীদের অন্তরে নিশ্চয় রেখাপাত করেছিল। ফেরাউনের অন্তরকেও যে, দুর্বল না করিয়াছিল এমন নহে, যার ফলে সে হযরত মূসার সত্যবাদিতার সুস্পষ্ট বিকাশে বেসামাল হইয়া তাঁহাকে প্রাণে বধ করার শুধু হুমকিই দিল; সেই জন্য কার্যকরী কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের সাহস করিতেছিল না।

কিন্তু আত্মম্ভরিতা ও স্বার্থান্ধতা মারাত্মক ব্যাধি। যে মানুষ তাহা জয় করিতে না পারে তাহার সম্মুখে যুক্তি-তর্ক, দলীল-প্রমাণ, এমনকি নিজের বিবেক-বুদ্ধিও ব্যর্থ হয়। ফেরাউনের অবস্থা তাহাই ছিল; সে ক্ষমতা ও প্রাধান্য বজায় রাখিতে নিজের খোদায়ী দাবী এবং হযরত মূসাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জোর প্রচার

চালাইল। পবিত্র কোরআনে এই বিষয়টিকেই সংক্ষেপে বলা হইয়াছে– فَحَشَر فَنَادى فقال انا ربكم الاعلى ফেরআউন জনসমাবেশের ব্যবস্থা করিল এবং এই ঘোষণা দিল যে, আমিই তোমাদের প্রধান প্রভু।

ধন-দৌলতের পূজারী, বল–ক্ষমতার মদে মত্ত দুরাচার স্বৈরাচারী ও ইহজীবনকেই সর্বশেষ লক্ষ্যস্থলরূপে গ্রহণকারীগণ সাধারণত যেই মাপকাঠিতে হক্ব ও বাতিল সত্য ও মিথ্যার বিচার করিয়া থাকে, ফেরআউনও মিসরবাসীদের সম্মুখে সেই মাপকাঠিই তুলিয়া ধরিল। সে বলিল, যেহেতু সব রকমের বল-ক্ষমতা ও ধন-দৌলত আমার আছে, তাই আমিই হইব হিরো, আমি হইব পূজারী আমার ব্যক্তিগত জীবন যতই কদর্য-কলুষময় জুলুম-অত্যাচার, অন্যায় অবিচার ও ব্যভিচারপূর্ণ সর্বোপরি স্বীয় সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, প্রভু-পরওয়ারদেগার হইতে যতই দূরবর্তী হউক না কেন, তাঁহার যতই নাফরমানীময় হউক না কেন। পক্ষান্তরে মূসার নিকট যেহেতু ঐ দুই জিনিস তথা ধন-দৌলত ও বল-ক্ষমতা নাই; সুতরাং তিনি কিছুই নহেন, তাঁহার মধ্যে অন্য গুণ-গরিমা যতই থাকুক না কেন।

ফেআউনের সেই বিভ্রান্তিকর বিবৃতির নকলই নিম্নের আয়াতে দেওয়া হইয়াছে।

وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِىْ قَوْمِهٖ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِىْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِىْ ـ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ـ اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ مَهِيْنٌ ـ وَلَا يَكَادُ يُبِيْنُ ـ فَلَوْلَا اُلْقِىَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْجَاءَ مَعَهُ الْمَلٰئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ ـ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ فَاَطَاعُوْهُ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ـ

ফেরাউন স্বজাতীয়দের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করিয়া বলিল, হে আমার জাতি! তোমরা কি দেখ না এবং চিন্তা কর না যে, সমগ্র মিসর রাজ্য আমারই এবং এইসব নদী-নহর আমারই অধিকারে প্রবাহমান? (মূসা কি আমার সমকক্ষ?) বরং আমি অতি উচ্চ এই বেটা হইতে; সে ত একজন নিকৃষ্ট লোক (তোত্‌লা) কথাবার্তাও বুঝাইয়া বলিতে সক্ষম নহে। (সে খোদার প্রতিনিধি বিশিষ্ট ব্যক্তি হইলে) তাহার হাতে স্বর্ণ-কঙ্কণ পরান হয় নাই কেন? (সেকালে শাহী প্রতিনিধি ব্যক্তিবর্গকে পদকরূপে স্বর্ণ-কঙ্কণ হস্তে পরান হইত)। কিম্বা (শাহী জুলুসের মত) তাহারা সঙ্গে ফেরেশতাগণের দল আসে নাই কেন? (ঐ সব উক্তি দ্বারা) ফেরআউন তাহার জাতিকে প্রভাবান্বিত করিয়া আয়ত্তে আনিয়া ফেলিল; তাহারা তাহারই অনুসারী হইল। বস্তুতঃ তাহার পূর্ব হইতেই ফাসেক জাতি ছিল। (পারা–২৫; রুকু–১১)

ফেরআউনের প্রতি হযরত মূসার বদ দোয়া

মূসা (আঃ) যখন দেখিলেন এবং একীন করিতে বাধ্য হইলেন যে, ফেরআউন ঈমান গ্রহণ করিবে না। তাহার কারণে তাহার পরিষদমণ্ডলী এবং মিসরবাসী সর্ব সাধারণও ঈমানের পথে আসিবে না। এমনকি ফেরাউনের গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া বনী ইসরাঈলগণও ঈমানের পথে আসিতে পারিবে না। তখন তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা হারুন (আঃ) এই দুর্ধর্ষ, পথের কাঁটা ফেরাউনের ধ্বংসের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়ার হাত উঠাইলেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁহার দোয়া গ্রহণ করিয়া নিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে জানাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই আদেশও করিলেন যে, দোয়া কার্যকরী হওয়া সম্পর্কে কোনরূপ ব্যতিব্যস্ততা, চাঞ্চল্য না দেখাইয়া নিজ কর্তব্য কাজে দৃঢ়রূপে নিয়োজিত থাকিবেন। এই বিষয়ের বিবরণ নিম্নের আয়াতে রহিয়াছে–

وَقَالَ مُوْسٰى رَبَّنَا اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالًا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ـ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ـ

মূসা আল্লাহর হুজুরে বলিলেন- হে পরওয়ারদেগার! ফেরআউন ও তাহার দলবলের ঐ ধন-দৌলত ও শান-শওকতের সাজ সরঞ্জাম আপনিই তাহাদিগকে জাগতিক জীবনে দিয়াছেন (ছিনাইয়া নেওয়ার ক্ষমতাও আপনার আছে)। হে পরওয়ারদেগার! (এই সব নেয়ামতের) ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, তাহারা লোকদেরকে আপনার পথ হইতে দূরে সরাইতেছে (এইরূপে নেয়ামতের ফল উল্টা ফলিতেছে)। সুতরাং হে পরওয়ারদেগার! তাহাদের ধন-দৌলত ধ্বংস করিয়া দিন। আর (মুখে মুখে) ঈমানের অঙ্গীকার করিয়া আযাবকে থামাইবার সুযোগ তাহারা পাইতে না পারে তাহার ব্যবস্থাস্বরূপ তাহাদের অন্তরকে কঠিন করিয়া দিন; যেন ভীষণ আযাব আসিয়া পড়ার পূর্বে তাহারা (মিছামিছি) ঈমানের কথা মুখেও না আনে।

قَالَ قَدْ أُجِيْبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلاَ تَتَّبِعَنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لاَيَعْلَمُوْنَ ـ

(মূসা (আঃ) দোয়া করিতেছিলেন; হারুন (আঃ) "আমীন" বলিতেছিলেন; তাই) আল্লাহ তাআলা উভয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমাদের দোয়া মঞ্জুর করা হইল। তোমরা নিজ কর্তব্য কাজে দৃঢ় থাক। (দোয়ার ফলের জন্য ব্যতিব্যস্ততা ও চাঞ্চল্য দেখাইয়া) অজ্ঞ লোকদের দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী হইও না।

(সূরা ইউনুসঃ পারা- ১১; রুকু- ১৪)

আলেমগণ বলিয়াছেন, এই দোয়া এবং তাহা গৃহীত হওয়ার সংবাদের পর দীর্ঘ ৪০ বৎসর মূসা ও হারুন (আঃ) তবলীগ কার্যে পূর্ণ মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং বিরুদ্ধ পার্টির উপর আল্লাহর গজব আসে নাই। দীর্ঘ ৪০ বৎসর পর এই দোয়ার ফল প্রকাশ পায়; ফেরআউন ও তাহার দলবল সমুদ্রে ডুবিয়া ধ্বংস হয়।

ফেরআউনের ধ্বংস কাহিনী

সুদীর্ঘ ৪০ বৎসরের (তফসীর রুহুল মাআ'নী– সূরা তোয়া-হার এক বর্ণনানুসারে ২০ বৎসরের) অধিক কাল মূসা ও হারুন (আঃ) ফেরআউন ও তাহার দলবলকে সত্যের ডাক শুনাইলেন। তাহারা সত্যের ডাকে সাড়া দিবে এইরূপ সদিচ্ছা উদয়ের আভাসও তাহাদের মধ্যে দেখা গেল না। সর্বদা সত্য উপেক্ষাই নহে শুধু, পরাজিত করার ষড়যন্ত্রেই তাহারা সর্বশক্তি ব্যয় করিতেছিল। তাই প্রয়োজন হইল মানব জাতির দেহ বা অন্ততঃ মিসরবাসী ও বনী ইসরাঈল জাতির সমষ্টিগত দেহবিশেষকে সুস্থ করা ও সুস্থ রাখার খাতিরে ফেরআউন গোষ্ঠীর অংশবিশেষকে অস্ত্রোপচারে বিচ্ছিন্নকরণ ও চিরতরে তাহার বিলুপ্তি ঘটান।

সেমতে আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে সেই অস্ত্রোপচার তথা গজব আসিল; ফেরআউন দলবলসহ ধ্বংস হইল, বিশ্বের বুক হইতে তাহাদের অস্তিত্ব চিরতরে মুছিয়া গেল। পবিত্র কোরআনের বহু আয়াতে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে–

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ـ

(ফেরআউন ও তাহার দলবল সত্যের বিরোধিতা ছাড়িল না–) তাই তাহাদের কর্মের সমুচিত শাস্তিদানের ব্যবস্থা করিলাম; তাহাদের সমুদ্রে ডুবাইয়া মারিলাম এই জন্য যে, তাহারা আমার নিদর্শন ও আদেশাবলীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল এবং ঐসবকে উপেক্ষা করিতেছিল। (পারা- ৯; রুকু- ৬)

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لاَيُرْجَعُوْنَ ـ فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ـ

(আল্লাহ বলেন,) ফেরআউন ও তাহার দলবল দেশের মধ্যে অনধিকার শ্রেষ্ঠত্ব চালাইয়াছিল এবং তাহাদের ধারণা ছিল যে, আমার নিকট তাহাদের ফিরিয়া আসিতে হইবে না। ফলে আমি ফেরআউনকে এবং

তাহার লোক-লস্করগুলিকে পাকড়াও করিলাম এবং সমুদ্র বক্ষে ডুবাইয়া মারিলাম। চিন্তা করিয়া দেখ, কি ঘটিয়া গেল স্বৈরাচারীদের পরিণাম। (পারা- ২০; রুকু- ৭)

فَلَمَّا اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِيْنَ - فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلاً لِّلْاٰخِرِيْنَ -

(আল্লাহ তাআলা বলেন,) ফেরআউন গোষ্ঠী যখন আমার ক্রোধানলে পতিত হওয়ার কার্য করিল তখন আমি তাহাদের কার্যের সমুচিত দণ্ড দিলাম। তাহাদের সকলকে একত্রে ডুবাইয়া মারিলাম এবং তাহাদিগকে করিয়া রাখিলাম পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত ও অগ্রণী- যাহাদেরকে দেখিয়া শিক্ষা হয়।

ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى - فَحَشَرَ فَنَادٰى فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى - فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى - اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى -

অতঃপর ফেরআউন (সত্যের ডাক হইতে) ফিরিয়া গিয়া ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। সকলকে একত্র করিয়া ঘোষণা দিল, "আমিই তোমাদের প্রধান প্রভু।" ফলে আল্লাহ তাহাকে পাকড়াও করিলেন ইহ-পরকালের আদর্শ শাস্তিদানে। বাস্তবিকই তাহার ঘটনায় উপদেশ রহিয়াছে ভয়-ভীতি সম্পন্ন লোকদের জন্য। (সূরা নাজেয়াতঃ পারা-৩০)

ইহকালে চূড়ান্ত আযাবের সঙ্গে পরকালের অভিশাপ

ফেরআউন ও তাহার দলবল ইহকালের চূড়ান্ত শাস্তি তথা ধ্বংসের সঙ্গে পরকালের দিক দিয়াও সাধারণ পাপীদের হইতে বিভিন্নরূপে চিরতরে অভিশাপ ও আযাবের সম্মুখীন হইয়া রহিল। যাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ-

وَاتْبَعْنَاهُمْ فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ -

সারা দুনিয়ার মানুষের মুখে তাহাদের প্রতি লা'নত চলিতে থাকিবে এবং কেয়ামতের দিন ত তাহারা অত্যন্ত দুরবস্থার সম্মুখীন হইবেই। (পারা-২; রুকু-৭)

وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ - اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا - وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ -

আর ফেরআউন গোষ্ঠীকে ঘেরাও করিয়া নিল কঠিন আযাব। প্রতিদিন সকাল-বিকাল তাহাদিগকে (দোযখের) আগুনের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। আর যেদিন হাশর-ময়দান কায়েম হইবে সেদিন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাগণকে আদেশ করিবেন- ফেরআউন গোষ্ঠীকে সর্বাধিক কঠিন আযাবে ঠেলিয়া দাও। (পারা- ২৪; রুকু- ১০)

ধ্বংসের বিস্তারিত ইতিহাস

ফেরআউন ও তাহার দলকে একত্রে ধ্বংস করিবার এক বৈচিত্র্যময় ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা করিলেন। আল্লাহ তাআলা মূসা (আঃ)-কে আদেশ করিলেন, সুযোগমতে এক রাত্রে বনী ইসরাঈলকে লইয়া মিসর হইতে চলিয়া যাইবেন।

মূসা (আঃ) একদা রাত্রি বেলা বনী ইসরাঈলগণকে লইয়া মিসর হইতে পলায়ন করিলেন। পলায়নের প্রারম্ভে হযরত মূসার পরিকল্পনায় কোন নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল ছিল কিনা এবং থাকিলে তাহা কোন্ স্থান ছিল, কোরআনে তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু কোরআনের বিভিন্ন বর্ণনায় স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে যে, মূসা (আঃ) বনী-ইসরাঈলকে নিয়া মিসর হইতে পলায়ন করিয়া "তুর" নামক পার্বত্য এলাকায় পৌঁছিয়াছিলেন। পলায়ন পথে বনী ইসরাঈলদের সম্মুখে একটি সমুদ্র উপস্থিত হইল। তাহারা সমুদ্র উপকূলে উপস্থিত, এমতাবস্থায় পিছন দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, ফেরআউন সৈন্য সামন্তসহ তাহাদিগকে পাকড়াও করিতে ছুটিয়া আসিতেছে। সেই মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা (মূসা (আঃ)-কে আদেশ করিলেন, আপনি স্বীয়-"আছা"-লাঠি দ্বারা সমুদ্রবক্ষে আঘাত করুন। মূসা (আঃ) তাহাই করিলেন। তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের পানি অস্বাভাবিকরূপে খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল; এক এক খণ্ডের উভয় পার্শ্বে পানি পর্বতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল- বহিয়া পড়িল না; এইভাবে সমুদ্রের মধ্যে মধ্যে পথ আবিষ্কৃত হইল। মূসা (আঃ) সঙ্গীগণকে লইয়া ঐ সব পথে সমুদ্র পার হইয়া আসিলেন। অতঃপর দোয়া করিলেন, এই পথ পুনঃ পানিভর্তি হইয়া যাউক; যেন ফেরআউন তাহাদের ন্যায় এই পারে আসিতে না পারে। আল্লাহ তাআলা মূসা (আঃ)-কে এই দোয়ায় বাধাদানে বলিলেন, সমুদ্রকে বর্তমান অবস্থার উপর থাকিতে দিবেন।

অতঃপর ফেরআউন তথায় পৌঁছিয়া নবআবিষ্কৃত পথ দেখিতে পাইয়া তাহা অতিক্রম করিতে লাগিল। মধ্যস্থলে পৌঁছিবা মাত্রই সমুদ্রের পানি স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়া গেল, ফেরআউনগোষ্ঠী ডুবিয়া মরিল। হযরত মূসার সঙ্গী বনী ইসরাঈলগণ কূলে দাঁড়াইয়া ফেরআউনগোষ্ঠীর এই দশা চাক্ষুষ দেখিতেছিল।

আলোচ্য ঘটনার সমুদ্রটির নাম কোরআন-হাদীছে উল্লেখ নাই, কিন্তু মিসর এলাকা- যথা হইতে মূসা (আঃ) যাত্রা করিয়াছিলেন এবং তুর পর্বত এলাকা- যথায় তিনি প্রথমে পৌঁছিয়াছিলেন, এই দুই এলাকার মধ্যে লোহিত সাগর তথা তাহার সুয়েজ উপসাগর শাখাটি বিদ্যমান, যে শাখা হইতে সুয়েজ খাল খনন করা হইয়াছে। লোহিত সাগরের এই অংশ প্রায় ৩০ মাইল প্রস্থ। এই উপসাগর ভিন্ন আর কোন সমুদ্র তথায় নাই, তাই সমস্ত তফসীরকারগণ লোহিত সাগরকেই উক্ত ঘটনার স্থলরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছেন। এই স্থলে লোহিত সাগর বলিতে তাহার ঐ অংশ উদ্দেশ্য যাহা সুয়েজ উপসাগর নামে পরিচিত।

আলোচ্য ঘটনাস্থলের মানচিত্র

স্কেল ১ ইঞ্চি = ১৮১ মাইল
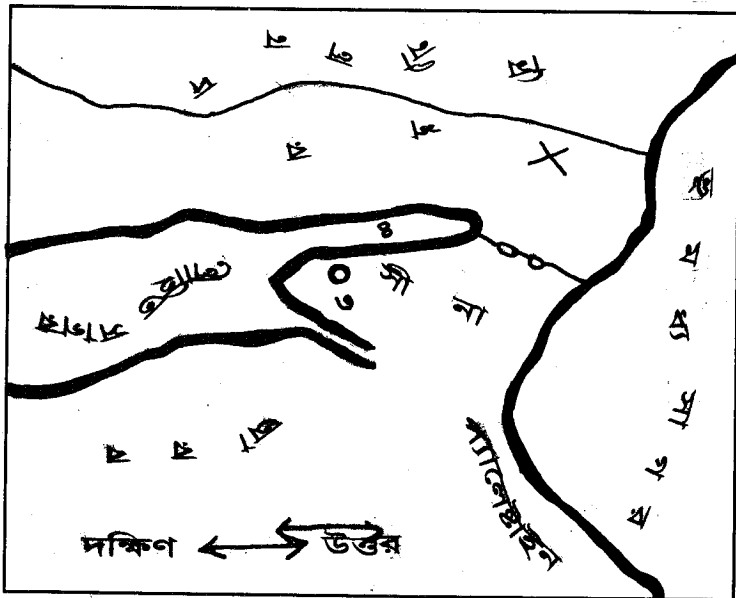
(১) তিমসাহ হ্রদ (২) মোররাত হ্রদ (৩) তুর পর্বত (৪) সুয়েজ উপসাগর । × চিহ্নিত স্থানটি বনী ইসরাঈলগণের আবাসভূমি–"জশন" বা "গোশেন" অঞ্চল।

মানচিত্রের বিবরণ

ভূগোল প্রসিদ্ধ লোহিত সাগরকে আরবীতে বাহ্‌রে আহ্‌মার (লাল সমুদ্র) এবং বাহ্‌রে কোলজুম বলা হয়। ইহা আরব সাগর হইতে আফ্রিকা ও এশিয়ার মধ্য দিয়া ভূমধ্য সাগরের দিকে প্রবাহিত হইয়াছে, কিন্তু ভূমধ্য সাগরের সঙ্গে মিলিত হয় নাই, বরং ১৩১০ মাইল, দৈর্ঘ্যে প্রবাহিত হইয়া অপেক্ষাকৃত সরু দুইটি উপসাগরে বিভিক্ত হইয়াছে; একটি উত্তর-পূর্ব দিকে কম-বেশ ১২৫ মাইল দৈর্ঘ্যে সাধারণতঃ প্রায় ১৫ মাইল প্রস্থে; তাহাকে আকাবা উপসাগর বলা হয়। অপরটি উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রায় ২০০ মাইল দৈর্ঘে এবং সাধারণতঃ ৩০ মাইল প্রস্থে, তাহাকে সুয়েজ উপসাগর বলা হয়। সুয়েজ উপসাগরের শেষ প্রান্ত হইতে ভূমধ্য সাগর পর্যন্ত ১০০০ মাইল স্থল পথ ছিল, অবশ্য এই ১০ মাইলের মধ্যে দুইটি হ্রদ ছিল– (১) তিমসাহ হ্রদ (২) মোররাত হ্রদ, কিন্তু এই হ্রদগুলির মধ্যেও স্থলভাগের বিরাট ব্যবধান ছিল– সুয়েজ উপসাগরের তীর ও প্রথমটির মধ্যে প্রায় ১৫ মাইল এবং প্রথম ও দ্বিতীয়টির মধ্যে প্রায় ১৫ মাইল এবং দ্বিতীয়টি হইতে ভূমধ্য সাগরের মধ্যে প্রায় ৩০ মাইল স্থল ভাগ ছিল। এই তিন খণ্ড ভূভাগের উপর খাল খননে হ্রদদ্বয়কে একত্রিত করিয়া ভূমধ্য সাগর পর্যন্ত সুয়েজ খাল তৈয়ার করা হইয়াছে। এই খালটিই ঐতিহাসিক "সুয়েজ খাল"। এই খাল দ্বারাই ভূমধ্যসাগর ও সুয়েজ উপসাগরের মধ্যে নৌপথের যোগাযোগ সৃষ্টি হইয়াছে।

আকাবা উপসাগর ও সুয়েজ উপসাগরের মধ্যবর্তী ত্রিভুজ আকারের যে স্থলভাগটি দেখা যায় তাহাই পার্বত্য মরু অঞ্চল বিশিষ্ট সাইনা বা সিনাই উপত্যকা।

সিনাই উপত্যকার দক্ষিণ প্রান্তে তথা মূল লোহিত সাগর হইতে সুয়েজ উপসাগরের উৎপত্তি উভয়ের সংযোগ স্থলের নিকটবর্তী সুয়েজ উপসাগরের তীরে "তূর" পর্বত অবস্থিত।

বনী ইসরাঈল ও হযরত মূসার অনেক ঘটনাবিশিষ্ট এই পর্বতটি পবিত্র কোরআনের অনেক জায়গায় "তুর" নামে ব্যক্ত হইয়াছে, আরবী মানচিত্রেও ইহাকে তুর নামে উল্লেখ করা হয়। বাংলা মানচিত্রে ইহাকে সাইনা পর্বত বলা হয়। ইহাও ভুল নয়, কারণ পবিত্র কোরআনেই ইহাকে তুরে সীনীন ও তুরে সাইনা নামেও অভিহিত করা হইয়াছে। তুর শব্দের আভিধানিক অর্থ পবর্ত, তাই তুরে সাইনা অর্থ সাইনা পর্বত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ মানচিত্র দৃষ্টে অবশ্য দেখা যায় যে, বনী ইসরাঈলদের মিসরস্থিত আবাসভূমি হইতে পূর্বদিকে "ফিলিস্তীন" ও "কেনান" এলাকার দিকে বিরাট স্থলভাগ ছিল। অতএব সেদিকের পথ অবলম্বন করিলে হযরত মূসা ও তাঁহার সঙ্গীদের সম্মুখে সমুদ্র আসিতই না বলিয়া একটি প্রশ্নের উদয় হইতে পারে। এমনকি এই বিষয়টি অবলম্বন করিয়াই কোন কোন অজ্ঞ লোক হযরত মূসার লাঠির দ্বারা সমুদ্র খণ্ডিত করার এই ঐতিহাসিক বিরাট মোজেযা অস্বীকার করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু উক্ত মোজেযার বিস্তারিত বিবরণ যেহেতু পবিত্র কোরআনের বহু সংখ্যক আয়াতে স্পষ্টরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাই এই শ্রেণীর অজ্ঞ লোকগুলি পবিত্র কোরআনের প্রতি অটুট ঈমানধারী মুসলিম সমাজের ভয়ে এই সম্পর্কীয় আয়াত সমূহের অপব্যাখ্যা ও অবাস্তব গোজামিল দিয়া সর্বসাধারণকে ধোকা দেওয়ার প্রয়াস পাইয়াছে। তদুপরি আলোচ্য ঘটনা লোহিত সাগরের কোন অংশে সংঘটিত হইয়াছিল তাহা না জানিয়া একটা মিথ্যা কল্পিত মানচিত্র সাজাইয়া ঘটনার ক্ষেত্র লোহিত সাগর হওয়া প্রসঙ্গটির প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়াছে। সুতরাং নিম্নে কতিপয় মোটা মোটা ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক সত্য তুলিয়া ধরা হইয়াছে, যদ্দ্বারা অবাস্তব ও কাল্পনিক বিষয়াবলীর অবসান হইবে।

(১) মূসা (আঃ) ও বনী ইসরাঈলগণ মিসর হইতে পলায়ন করিয়া ফিলিস্তীন ও কেনান এলাকার দিকে গিয়াছিলেন, ইহার কোন প্রমাণ কোরআন-হাদীছ বা ইতিহাস ভাণ্ডারের কোথাও কেহ দেখাইতে সক্ষম হইবে না। অতএব ঐরূপ কথার উপর ভিত্তি করিয়া পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যাকে বিকৃত করা এবং পূর্বাপর সমস্ত তফসীর বিশেষজ্ঞগণকে ভুল পথের পথিক সাব্যস্ত করা বোকামি বৈ আর কি হইতে পারে?

অধিকন্তু ফিলিস্তীন এলাকায় তখন বনী ইসরাঈলের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের বসবাস ছিল না। তথায় "আমালেকা" নামক এক দুর্ধর্ষ জাতির দখল ছিল। এই তথ্য পবিত্র কোরআনে (সূরা মায়েদা ঃ পারা– ৬;রুকু– ৮) স্পষ্টরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহার উল্লেখ সম্মুখে পাইবেন। এই তথ্য দৃষ্টে বনী ইসরাঈলদের মিসর ত্যাগকালে তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের কথা বলিয়া তাহাদের লক্ষ্যস্থল ফিলিস্তীন এলাকা সাব্যস্ত করা নিছক ধোকা।

সমুদ্রবক্ষে নব আবিষ্কৃত পথে বনী ইসরাঈলদের পার হইয়া যাওয়া এবং ঐ পথেই ফেরআউনগোষ্ঠীর ডুবিয়া মরা উভয়ের ইতিহাস কোরআনের বহু স্থানে বর্ণিত আছে। যথা–

وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ـ

হে বনী ইসরাঈল! স্মরণ কর, আমি তোমাদের জন্য সমুদ্রকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিলাম, সেমতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়া নিয়াছিলাম আর ফেরআউনগোষ্ঠীকে ডুবাইয়া দিয়াছিলাম– যাহা তোমরা চাক্ষুস দেখিতেছিলে।

وَجَاوَزْنَا بِبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّعَدْوًا ـ حَتّٰى اِذَا اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِىْ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْا اِسْرَائِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

আর আমি বনী ইসরাঈলগণকে সমুদ্র পার করাইয়া নিলাম; তাহাদের পিছে পিছে ধাওয়া করিল ফেরআউন ও তাহার লোক-লস্কর জুলুম-অত্যাচার করার উদ্দেশে। অবশেষে সে যখন ডুবিয়া যাইতেছিল তখন সে বলিল, আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, যাহার প্রতি বনী ইসরাঈলগণ ঈমান আনিয়াছে তিনি ভিন্ন আর কোন মা'বুদ নাই। আর আমি মুসলমানদের দলভুক্ত হইতেছি।

اٰلْئٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ـ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ـ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ـ

(আল্লাহ তাআলা ফেরেশতার মাধ্যমে তিরস্কার করিয়া বলিলেন,) এতক্ষণে! (ঈমানের কথা!) অথচ এতদিন পর্যন্ত নাফরমানীতেই কাটাইলে আর ফাসাদকারীদের দলভুক্ত থাকিলে! (আযাবে আক্রান্ত অবস্থায় ঈমান গৃহীত নহে)। অবশ্য তোমার লাশ উদ্ধার করিয়া নিব; (তাহা রক্ষিত থাকিবে) এই উদ্দেশে তুমি যেন তোমার পরবর্তী বিশ্ববাসীর জন্য শিক্ষণীয় নিদর্শনরূপে বিদ্যমান থাক; বস্তুতঃ মানব সমাজের অনেকেই

(২) মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলগণকে লইয়া মিশর ত্যাগ করার পর তাহাদের প্রথম উপস্থিতির স্থান সীনা পর্বত তথা কোহেতুর বা তুর-পর্বত এলাকা– ইহা সর্বস্বীকৃত ও সর্বসম্মত ঐতিহাসিক সত্য। এতদ্ভিন্ন এই সত্যের সমর্থনে পবিত্র কোরআনে কতিপয় তথ্যও পাওয়া যায়– (ক) মিসর ত্যাগ করতঃ ফেরাউনের কবল হইতে উদ্ধার পাওয়ার পর বনী ইসরাঈলদের জন্য শরীয়তরূপে আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে মূসা (আঃ) যে আসমানী কিতাব (তওরাত" পাইয়াছিলেন তাহা তুর পর্বতে যাইয়া লাভ করিয়াছিলেন। (খ) "তওরাত" প্রাপ্তির পর যখন বনী ইসরাঈলগণ তাহা গ্রহণ করিয়া নিতে গড়িমশি করিয়াছিল তখন "তুর পর্বত"কেই তাহাদের মাথার উপর উঠাইয়া ধরা হইয়াছিল এবং তাহার ভয় দেখাইয়া বলা হইয়াছিল যে, তওরাত গ্রহণ কর এবং গ্রহণ করার স্বীকৃতি দান কর। এই তথ্যদ্বয়ের প্রমাণ পবিত্র কোরআনের বহু জায়গায় বর্ণিত রহিয়াছে।

(৩) "তুর পর্বত" সুয়েজ উপসাগরের পূর্বকূলে অবস্থিত এবং তাহার অবস্থান সুয়েজ উপসাগরের গোড়ার দিকে তথা মূল লোহিত সাগর হইতে সুয়েজ উপসাগরের উৎপত্তিস্থলের নিকটবর্তী। অর্থাৎ তুর পর্বত এলাকা বরাবর সুয়েজ উপসাগরের পশ্চিমকূলস্থ মিসরের এলাকা বনী ইসরাঈলদের আবাসভূমি গোশেন অঞ্চল হইতে অনেক দক্ষিণে অবস্থিত। মানচিত্রের এই বিষয়গুলি ভালরূপে অনুধাবন করুন।

উল্লিখিত তথ্যসমূহ দৃষ্টে সুনিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলগণকে লইয়া মিসর ত্যাগ করতঃ ফিলিস্তীন বা কেনান এলাকায় উপস্থিত হন নাই, বরং বোধহয় তখন ঐ এলাকা উদ্দেশ্যেও করেন নাই। অতএব সেদিকের পথ অবলম্বন করার কথা একেবারেই অবাস্তব। তিনি মিসর ত্যাগ করতঃ উপস্থিত হইয়াছিলেন তুর পর্বত এলাকায়। তাঁহার এই উপস্থিতি ইচ্ছাকৃতও হইতে পারে। কারণ, এই এলাকাটি শুধু তাঁহার পূর্ব পরিচিতই ছিল না; বরং তাঁহার নিকট বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন শান্তিনিকেতনও ছিল– যেহেতু এই এলাকায়ই তিনি নবুয়তপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং এ স্থান হইতে নবুয়ত প্রাপ্ত হইয়া তিনি মিসর গমন করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, বরং তাঁহার নবুয়ত প্রাপ্তির ঘটনাকালে স্বয়ং আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে এই এলাকাটি بقعة مباركة বরকত তথা কল্যাণ ও মঙ্গলপূর্ণ অঞ্চল। وادي المقدس পাক-পবিত্র মহান প্রান্তর" নামে আখ্যায়িত হইয়াছিল, (হযরত মূসার নবুয়ত প্রাপ্তির আলোচনায় পবিত্র কোরআনের উদ্ধৃতিসমূহ দেখুন)। এই এলাকার এইসব বৈশিষ্ট্য ভুলিয়া যাওয়া হযরত মূসার পক্ষে কি সম্ভব ছিল? অতএব স্বাভাবিকরূপেই তিনি এই এলাকার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন এবং ফেরআউনের অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে নাজাত হাসিল করিয়া ফেরআউনের ক্ষমতা বহির্ভূত এই মঙ্গলময় পবিত্র এলাকায় আসিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন– এরূপ বলা হইলে নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক হইবে না।

আমার কুদরতের নিদর্শনসমূহ হইতে গাফেল থাকে।* (সূরা ইউনুসঃ পারা- ১১ রুকু- ১৪)

وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى ـ

আমি মূসার নিকট অহী পাঠাইয়াছিলাম, রাত্রি বেলা আমার বান্দা (বনী ইসরাঈলগণকে) লইয়া (মিসর হইতে) চলিয়া যাও; তারপর (পথিমধ্যে সমুদ্র আসিবে, তাহাতে লাঠি মারিয়া) তাহাদের জন্য সমুদ্রের মধ্যে শুষ্ক পথ করিয়া লইও ধরা পরিবার ভয়ও করিবে না, ডুবিয়া মরিবার আশঙ্কাও করিবে না। (সেমতে মূসা (আঃ) রাত্রের অন্ধকারে যাত্রা করিলেন)।

فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ـ وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ وَمَا هَدٰى ـ

অতপর ফেরআউন তাহার লোক-লস্কর লইয়া তাহাদের পিছনে ধাওয়া করিল এবং শেষ ফলে ভয়ঙ্কর সমুদ্র তাহাদিগকে ঘিরিয়া নিল। আর ফেরআউন তাহার জাতিকে পথভ্রষ্ট করিয়া ধ্বংসের পথে নিয়াছিল- তাহাদিগকে সুপথে পরিচালিত করে নাই। (পারা- ১৬; রুকু-১৩)

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ـ

মূসার নিকট আমি অহী পাঠাইয়াছিলাম, আমার বান্দাহ বনী ইসরাঈলগণকে লইয়া রাত্রে মিসর হইতে চলিয়া যাও। স্মরণ রাখিও, অবশ্যই তোমাদের পিছনে ধাওয়া করা হইবে। (মূসা (আঃ) রাত্রের অন্ধকারে যাত্রা করিয়া গেলেন। ফেরআউন সংবাদ পাইল)।

فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَائِنِ حٰشِرِيْنَ ـ اِنَّ هٰؤُلَاۤءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ ـ وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُوْنَ ـ وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ ـ

* ফেরাউনের লাশ সমুদ্রগর্ভ হইতে ভাসিয়া উঠিয়াছিল এবং ঢেউয়ের দ্বারা কূলে আসিবার পর তাহা রক্ষিত রহিয়াছিল। আজও তাহা মিসরের মিউজিয়ামে আছে। প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শুনিয়াছি, পানিতে ডুবিয়া মরার নিদর্শন এখনও তাহার লাশে বিদ্যমান রহিয়াছে।

আর ইহাও বলা যাইতে পারে যে, হযরত মূসার কোন নির্দিষ্ট ইচ্ছা ব্যতিরেকে তাঁহার তাড়াহুড়ার মধ্যে শুধু আল্লাহ নির্ধারিত গোপন ব্যবস্থা ও পরিকল্পনার বাধ্যবাধকতায় তিনি এই এলাকার প্রতি অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছিলেন।

আর একটি তথ্য ঃ তুর পর্বত এলাকার প্রতি আসিতে মিসরস্থিত বনী ইসরাঈলের আবাসভূমি গোশেন অঞ্চল হইতে পূর্ব দিকে কম-বেশ শতেক মাইল অগ্রসর হইয়া তারপর দক্ষিণ দিকে তুর পর্বত এলাকায় পৌঁছিলে এই পথে সমুদ্র আসিবে না অবশ্য, কিন্তু এই রাস্তায় যে পথ অতিক্রম করিতে হইবে তাহা মানচিত্রের সরল রেখারূপেই প্রায় ৩০০ মাইল। তদুপরি পর্বতমালার আবরণ বেষ্টনের দরুন যে তাহা আরও কতদূর দীর্ঘ হইতে পারে তাহা আল্লাহই জানেন। সর্বাধিক বড় কথা এই যে, ছয় লক্ষ নর-নারীকে লইয়া সেই জনশূন্য পানাহারের ব্যবস্থাবিহীন মরু পার্বত্য অঞ্চলটি সাধারণভাবে মানুষের জন্য অতিক্রমোপযোগী ছিল কিনা তাহাই কে জানে? পক্ষান্তরে গোশেন অঞ্চল হইতে তুর পর্বত এলাকায় পৌঁছিবার দ্বিতীয় পথ-গোশেন অঞ্চল হইতে সুয়েজ উপসাগরকে বামে রাখিয়া দক্ষিণ দিকে মিসর অঞ্চলের উপর দিয়া অগ্রসর হওয়ার পর সুযোগ সুবিধা মতে কোন স্থানে সুয়েজ উপসাগর পার হইয়া তুর পর্বত এলাকায় পৌঁছিয়া যাওয়া- এই পথটি প্রথম পথ অপেক্ষা দূরত্বের দিক দিয়াও কম এবং অতিক্রম করার দিক দিয়াও সহজসাধ্য; অবশ্য এই পথে শুধু অনধিক ৩০ মাইল প্রশস্ত সমুদ্র তথা সুয়েজ উপসাগর পার হইতে হইবে। সে যামানায়ও যেহেতু এই উপসাগরের পশ্চিম কূলের ন্যায় তাহার পূর্ব কূলেও আবাদি ছিল যেমন পবিত্র কোরআনের পারা- ৯;রুকু- ৬ -এর একটি বিবরণীতে আভাস পাওয়া যায়, অতএব তাহা পার হওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত থাকাই স্বাভাবিক।

সুতরাং যদি মূসা (আঃ) নিজস্ব পরিকল্পনারূপে তুর পর্বত এলাকার প্রতি অগ্রসর হইয়া থাকেন; তবে তিনি সুয়েজ উপসাগর পার হওয়ার ব্যবস্থা পাইবেন আশায় এই দ্বিতীয় পথেই অগ্রসর হইয়াছিলেন। আর যদি বলা হয় যে, হযরত মূসার গতিবিধি সবই একমাত্র আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত গোপন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণাধীনে চলিতেছিল, তবে ত আর কোন প্রশ্নই আসে না। কারণ, আল্লাহ তাআলা ত এই ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমেই ফেরআউন ও তাহার দলবলকে ডুবাইয়া মারার পরিকল্পনা নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন সেমতে মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলগণকে লইয়া রাত্রিবেলা পলায়নকালে তাড়াহুড়ার মধ্যে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছানুপাতিক সমুদ্র সম্মুখে আসিবার পথই অবলম্বন করিয়া বসিলেন।

অবিলম্বে ফেরআউন (লোক-লস্কর সংগ্রহের জন্য) শহরে-বন্দরে পেয়াদা পাঠাইল এই বলিয়া যে, মূসার দল আমাদের তুলনায় কম সংখ্যক, তাহারা আমাদের ক্রোধান্বিত করিয়াছে, অথচ আমরা অস্ত্রধারী বিরাট। (তাহাদেরকে পাকড়াও করা সহজ। অতঃপর লোক-লস্কর লইয়া ফেরআউন মূসার পেছনে ছুটিল)।

فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ - وَّكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ - كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ - فَاَتْبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ - فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ - قَالَ اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ -

আল্লাহ তাআলা বিশ্ববাসীকে বলেন, দেখ! ফেরআউন ও তাহাদের হোমরা-চোমরাগণকে পানির ঝরণা ও ফোয়ারায় সুসজ্জিত বাগ-বাগিচা, অগাধ ধন-সম্পদ ও জাঁকজমকপূর্ণ গৃহ-অট্টালিকা হইতে এইরূপে বাহির করিয়া আনিলাম (এবং তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া) ঐ সবের স্বত্বাধিকারী বানাইয়া দিলাম বনী-ইসরঈলগণকে। (ফেরাউনগোষ্ঠীর ধ্বংসের বিবরণ এই যে, মূসা (আঃ) রাত্রিবেলা বনী ইসরাঈলদেরসহ পলায়ন করিলেন;) ফেরআউন লোক লস্করসহ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের ধাওয়া করিল। (এবং দ্রুতগতির বাহনে তাহাদের নিকটবর্তী পৌঁছিয়া গেল। যখন উভয় দল পরস্পর দেখা যাইতে লাগিল, (এদিকে মূসার সম্মুখে সমুদ্র); তখন মূসার সঙ্গীগণ বলিল, আমরা ত ধরা পড়িয়া গেলাম। মূসা বলিলেন, কস্মিনকালেও নয়; আমার সঙ্গে আমার পরওয়ারদেগারের সাহায্য রহিয়াছে– তিনি আমাকে (প্রয়োজন মুহূর্তে) সুব্যবস্থার নির্দেশ দিবেন।

فَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ - فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ -

তৎক্ষণাৎ মূসার প্রতি অহী পাঠাইলাম (পূর্ব বিজ্ঞাপিত ব্যবস্থা এখনই প্রয়োগ কর) তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রের উপর আঘাত কর। (তিনি তাহা করিলেন) তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের পানি খণ্ড খণ্ড হইয়া এক একটা খণ্ড বড় বড় পর্বতের ন্যায় খাড়া রহিয়া গেল (মাঝে মাঝে শুষ্ক পথ সৃষ্টি হইল; মূসা (আঃ) সঙ্গীগণসহ ঐ সব পথে পার হইলেন)।

পবিত্র কোরআন সূরা ত্বা-হা পারা–১৬; রুকু–১৩-এর যে আয়াত সম্মুখে উদ্ধৃত ও অনূদিত হইতেছে তাহার সুস্পষ্ট মর্ম-দৃষ্টে বলিতে হয় যে– সমুদ্র সম্মুখে আসিবে সেই পথ অবলম্বন করা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা মূসা (আঃ)-কে পূর্বাহ্নেই অবগত করিয়াছিলেন এবং সমুদ্র পার হওয়ার জন্য তাহার মধ্যে পথ সৃষ্টি করাও অবগত করিয়াছিলেন। অতএব সব কিছু আল্লাহ তাআ-লার প্রকাশ্য নির্দেশ মোতাবেক অবগতির সহিতই হইয়াছিল; সুতরাং ফিলিস্তিন ও কেনান এলাকার পথ অবলম্বন করার কথা নিতান্তই অবান্তর।

সুপ্রসিদ্ধ তফসীর রূহুল মাআ'নীতে বলা হইয়াছে, সমুদ্রে শুষ্ক পথ করিয়া নেওয়া সম্পর্কে অহী পূর্বাহ্নে–রাত্রিবেলা রওয়ানা হইয়া যাওয়ার আদেশসম্বলিত অহীর সঙ্গেই হইয়াছিল, ইহাই অধিকাংশ তফছীরকারগণের অভিমত (খন্ড–১৬; পৃষ্ঠা–১৩৭)। তফসীরে বয়ানুল-কোরআন ছুরা শোয়া'রার মধ্যেও এই আয়াতের বরাত দানে বলা হইয়াছে যে, রাত্রিবেলা রওয়ানা হওয়ার আদেশ আসিবার সঙ্গেই সমুদ্রে পথ করিয়া নেওয়ার আদেশও ছিল।

ফলে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিল যে, মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলগণসহ সুয়েজ উপসাগর কূলে আসিয়া ঠেকিলেন; উপস্থিত পার হওয়ার কোন ব্যবস্থা পাইতেছিলেন না; এমতাবস্থায় দেখা গেল; ফেরআউন লোক-লস্করসহ দ্রুত আসিয়া পৌঁছিতেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে আল্লাহর উপস্থিত আদেশে লাঠির আঘাতে সমুদ্র খণ্ডিত হওয়ার মোজেযা সংঘটিত হইল। সমুদ্র বক্ষে নব আবিষ্কৃত পথ বহিয়া মূসা (আঃ) সঙ্গীগণসহ পার হইয়া আসিলেন। পিছে পিছে ফেরআউন দলবলসহ তথায় পৌঁছিল এবং হযরত মুছার অনুসরণে সেই নব আবিষ্কৃত পথেই অগ্রসর হইল। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে ,ঐ সমুদ্র তথা সুয়েজ উপসাগর কম-বেশ ৩০ মাইল প্রস্থ। যখন ফেরআউন ও তাহার দলবল সকলে পূর্ণরূপে সমুদ্রের মাঝে আসিয়া পড়িল তখনই আল্লাহর আদেশে সমুদ্র স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়া গেল, তাহারা সকলে ডুবিয়া ধ্বংস হইল।

ঘটনার এই বিবরণ শুধু যে, তফসীরকারগণ কর্তৃক বর্ণিত হইয়া আসিতেছে তাহাই নহে, বরং ঐতিহাসিকগণও তাহা বর্ণনা করিয়াছেন–(১) الكامل فى التاريخ আল-কামেল ১ম খণ্ড ১০৬ পৃষ্ঠা। ইহা ৭৫০ বৎসর পূর্বের স্বনামধন্য সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে আছীরের সঙ্কলিত ৪হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ।

(২) البداية والنهاية আল-বেদায়তু ওয়ান-নেহায়াহ্ ১ম খণ্ড, ২৭১ পৃষ্ঠা। ইহা ৬০৬ বৎসর পূর্বের সুপ্রসিদ্ধ মোফাচ্ছের; মোহাদ্দেছ ও ঐতিহাসিক আল্লামাহ এমাদুদ্দীন (রঃ) কর্তৃক সঙ্কলিত।

পূর্বে স্মরণ করানো হইয়াছে যে, "সুয়েজ উপসাগর" একটি ভৌগোলিক উপনাম মাত্র, বস্তুতঃ তাহা লোহিত সাগরেরই অংশবিশেষ। অতএব পূর্বাপর সমস্ত মুসলিম ঐতিহাসিকগণ এবং সমস্ত তফসীরকারগণ ঐকমত্যরূপে যাহা বলিয়া আসিতেছেন যে, ফেরআউন ও তাহার দলবল লোহিত সাগরে ডুবিয়া ধ্বংস হইয়াছিল, তাহাই বাস্তব ও অখণ্ডনীয়।

وَاَزْلَفْنَا ثُمَّ الْاٰخَرِيْنَ ـ وَاَنْجَيْنَا مُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ اَجْمَعِيْنَ ـ ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ـ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَّمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ـ

(আল্লাহ বলেন,) অপর দল– ফেরআউন গোষ্ঠীকেও তথায় পৌঁছাইলাম। মূসা ও তাঁহার সব সঙ্গীদের বাঁচাইয়া নিলাম; তারপর (সে পথেই) অপর দলকে ডুবাইয়া মারিলাম।

এই ঘটনার মধ্যে (উপদেশ লাভের) নিদর্শন রহিয়াছে, কিন্তু অনেক লোক এইরূপ ঘটনায় বিশ্বাসী নহে। জানিয়া রাখিও, নিশ্চয় তোমার পরওয়ারদেগার সর্বশক্তিমান ক্ষমতাশালী অতিশয় দয়ালু।

(পারা– ১৯; রুকু– ৮)

فَاَسْرِ بِعِبَادِىْ لَيْلًا اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ـ

আমার বান্দাগণকে লাইয়া রাত্রে রওয়ানা হও; শত্রু তোমাদের ধাওয়া করিবেই। (সমুদ্রে সৃষ্ট পথে পার হইয়া মূসা (আঃ) সেই পথ বিলুপ্তির দোয়া করিলে আল্লাহ বলিলেন)।

وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ـ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ ـ

সমুদ্রকে (উহাতে সৃষ্ট পথ এবং খন্ডিত পানি পর্বতের ন্যায় দাঁড়াইয়া) শান্ত অবস্থায় থাকিতে দাও। নিশ্চয় ফেরআউনের সম্পূর্ণ দলটি (এই পথেই) ডুবিয়া মরিবে।

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ـ وَزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ـ وَنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ـ كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ـ

(আল্লাহ তাআলা বিশ্ববাসীকে উপদেশ গ্রহণের-দৃষ্টিতে লক্ষ্য করার জন্য বলেন,) ঐ ফেরআউনগোষ্ঠী ঝরণা ও ফোয়ারায় সুসজ্জিত কত বাগ-বাগিচা, খেত-খামার, জাঁকজমকপূর্ণ গৃহ-অট্টালিকা এবং আরও কত ভোগ-বিলাসের সামগ্রী, যাহাতে তাহারা মত্ত ছিল– সেই সব তাহারা ছাড়িয়া ত ডুবিয়া মরিল;) আর কালক্রমে ঐ সবের মালিক বানাইয়া দিলাম অপর পক্ষ (বনী ইসরাঈলগণকে)।

(সূরা দোখান ঃ পারা– ২৫; রুকু–১৪)

মুক্তিলাভের পর বনী ইসরাঈল

পরাধীনতা এবং বিজাতীয় প্রভাব ও পরিবেশ মানুষের মন-মগজ, ভাবধারা ও চিন্তাধারা কিরূপে বিকৃত করিয়া ফেলে তাহার একটি প্রকৃত স্বরূপ বনী ইসরাঈলদের মরু জীবনের প্রাথমিক একটি ইতিহাসে দেখা যায়।

বনী ইসরাঈল নবীগণের বংশ ছিল, শেরক ও মূর্তি পূজা তাহাদের জাতীয় চরিত্রের বিপরীত ছিল। তাহাদের জাতীয় চরিত্র ছিল খাঁটি তওহীদ; কিন্তু দীর্ঘকাল ফেরআউনের দাসত্বে আবদ্ধ থাকিয়া এবং ফেরআউনের পূজারী মিসরীয়দের প্রভাবে ও পরিবেশে পরাধীন দুর্বলরূপে থাকিয়া তাহারা আপন-ভোলা, স্বজাতীয়তা বিবর্জিত, বিজাতীয় ভাবধারায় মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

কোন জাতি দীর্ঘকাল পরাধীন থাকিয়া যখন তাহার মন-মগজ ভাবধারা, চিন্তাধারা, বিকৃত হইয়া যায় তখন তাহাদের আভ্যন্তরীণ পরাধীনতার মানসিক ছাপ সাধারণ দৈহিক ছাপ হইতে বহুগুণে বেশী শক্ত ও কঠিন হইয়া যায়। তাই দেখা যায়, কালক্রমে ঐ জাতি বাহ্যিক ও দৈহিক মুক্তি ও লাভের পরও তাহাদের ভাবধারা চিন্তাধারা, বিজাতীয় কলুষে কলুষিত থাকিয়া যায়। যেমন, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ শরীরে পড়িলে তাহা দূরীভূত হইয়া গেলেও ছাপ তথা ঠোসা থাকিয়া যায়; ঠোসা দূর হইলেও আগুনে পোড়ার দাগ শরীরে বহু দিন থাকে।

সুতরাং কোন জাতি দুর্ভাগ্যবশত পরাধীনতার অভিশাপে পতিত হইলে তাহার কর্ণধারগণের উপর বিশেষ দায়িত্ব আসে জাতিকে পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত করার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে জাতির মন-মগজ, ভাবধারা চিন্তাধারাকে বিজাতীয় ছাপ মুক্ত করিতে অধিক যত্নবান হওয়া।

ফেরআউন নিজকে انا ربكم الاعلى আমি তোমাদের প্রধান প্রভু বলিত। অধিকন্তু মফস্বলের প্রত্যেক এলাকায় নিজের এক একটি প্রতিমূর্তি স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিল; মফঃস্বল এলাকার লোকগণ সেই প্রতিমূর্তির পূজা করিয়া থাকিত। বনী ইসরাঈলগণ ঐরূপ পরিবেশে দীর্ঘকাল পরাধীন থাকায় তাহাদের ভাবধারা চিন্তাধারা মূর্তিপূজার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া গিয়াছিল। তাই যখন তাহারা আল্লাহ তাআলার বিশেষ ব্যবস্থায় মুক্তিলাভ করিল, ফেরআউনগোষ্ঠী তাহাদের চোখের সামনে ডুবিয়া মরিল– এমতাবস্থায়ও তাহাদের মন-মগজ হইতে সেই বিজাতীয় প্রভাবপূর্ণ মূর্তি পূজার কথাই নির্গত হইল, নবীর সম্মুখে সেই দাবী পেশ করিল। তাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে এই–

وَجَاوَزْنَا بِبَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْ ـ قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ـ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ـ

(আল্লাহ তাআলা বলেন,) আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়া নিলাম। অতপর এমন একদল লোকের নিকট তাহাদের উপস্থিতি হইল যাহারা কতকগুলি মূর্তির পূজায় জড় ছিল। বনী ইসরাঈলরা বলিল, হে মূসা! আমাদের জন্যও এই ধরনের মা'বুদ বানাইয়া দিন তাহাদের যেরূপ মা'বূদ রহিয়াছে। মূসা (আঃ) বলিলেন, তোমরা বড়ই নাদান, জ্ঞানশূন্য লোক।

اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ـ

(মূসা (আ) আরও বলিলেন,) এই লোকগুলি যেসব কাজ করিতেছে তাহার মধ্যে এই কার্য ত নিতান্তই অবান্তর। তিনি আরও বলিলেন, আমি কি আল্লাহ ভিন্ন অন্য উপাস্য আনিতে পারি? অথচ এক আল্লাহ তোমাদিগকে সারা জাহানের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। (সূরা আরাফঃ পারা– ৯; রুকু– ৬)

তওরাতের জন্য হযরত মূসার তুর পর্বতে গমন

বনী ইস্রাঈলদের শুভ বুদ্ধির উদয় হইল তাহারা হযরত মূসার নিকট আবদার জানইল, এখন ত আমরা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিয়াছি। এখন আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে কোন হেদায়াত নামা– কিতাব পাইলে আমরা তদনুযায়ী আমল করিতে সক্ষম হইব। মূসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করিলেন। যাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ–

وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ـ وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِىْ فِىْ قَوْمِىْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ـ

আমি মূসাকে আশ্বাস দিলাম (কিতাব পাইতে তুর পর্বতে আসুন) ৩০ রাত্রের জন্য এবং আরও ১০ রাত্র বর্ধিত করিলাম; সেমতে তাঁহার প্রভুর নির্ধারিত সময় পূর্ণ ৪০ রাত্র হইল। যাত্রাকালে মূসা স্বীয় ভ্রাতা হারুনকে বলিয়া গেলেন, আমার স্থলে আপনি জাতির মধ্যে থাকিয়া সকল কার্য সমাধা করিবেন, তাহাদের সংশোধন করিবেন, স্বৈরাচারীদের অনুসরণে চলিবেন না।

وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ قَالَ رَبِّ اَرِنِىْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ـ

মূসা যখন আমার নির্ধারিত দিনগুলির জন্য তুর পর্বতে আসিলেন এবং তাঁহার প্রভু তাঁহার সঙ্গে কালাম করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, প্রভু! আমাকে দর্শন দান করুন- আমি স্বচক্ষে আপনাকে দেখার আকাঙ্খা রাখি।

قَالَ لَنْ تَرَانِىْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرَانِىْ ـ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ـ

আল্লাহ বলিলেন, (ইহজগতে) কস্মিনকালেও আমাকে দেখিতে সক্ষম হইবে না। আচ্ছা- সম্মুখস্থ পাহাড়টির প্রতি নজর কর; যদি উহা স্বস্থানে স্থির থাকিয়া যায় তবে ত আমাকে দেখিবে। যখন তাঁহার প্রভুর নূরের তাজাল্লি মাত্র ঐ পাহাড়ে পতিত হইল; শুধু তাহাতেই পাহাড়টি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল এবং মূসা চৈতন্যহীন হইয়া পড়িয়া গেলেন।

فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

মূসার চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে আরজ করিলেন, প্রভু! (ইহজগতে দৃষ্ট হওয়ার আকার-আকৃতি হইতে) আপনি পাক পবিত্র। (সেই দরখাস্ত করায়) আমি আপনার দারবারে ক্ষমাপ্রার্থী (ইহজগতে আপনার দিদার-দর্শন সম্ভব নহে)।

قَالَ يٰمُوْسٰى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِىْ وَبِكَلَامِىْ فَخُذْ مَا اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ـ

আল্লাহ তাআলা বলিলেন, হে মূসা আমি তোমাকে আমার পয়গাম্বরী দান করিয়া এবং কালামের পাত্র বানাইয়া লোকদের উপর বিশেষত্ব দান করিয়াছি। অতএব আমি তোমাকে যাহা দান করিতেছি তাহা সযত্নে গ্রহণ কর এবং আমার কৃতজ্ঞ হইয়া থাক।

وَكَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ ـ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ـ

আর আমি ত তাঁহার জন্য কতিপয় ফলকে লিখিয়া দিলাম সব রকমের নসীহত উপদেশ এবং (জীবন যাপনের) বিস্তারিত বিবরণ। অতএব (হে মূসা!) নিজেও তুমি বিশেষ দৃঢ়তার সহিত এই সবগুলি গ্রহণ কর এবং নিজ জাতিকেও আদেশ কর, তাহারা যেন এইসব উত্তম বিষয়াবলীকে দৃঢ়রূপে গ্রহণ করে। নাফরমান- ফেরাউনগোষ্ঠীর দেশ সত্বরই তোমাদের দেখার সুযোগ দিব। (দেখিবে তাহারা তাহাদের ধন-সম্পদ হইতে কিরূপে বিতাড়িত হইয়াছে!)।

হযরত মূসার যাওয়ার পর বাছুর পূজার কেলেঙ্কারী

মূসা (আঃ) যখন তুর পর্বতে উপস্থিত হইবার আহ্বান পাইয়াছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গী বনী ইসরাঈলদের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকেও সঙ্গে নেওয়ার কথা ছিল; কিন্তু মূসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার আহ্বানে সাড়া দেওয়ার প্রতি অধীরচিত্তে ছুটিয়া পড়িলেন। ভ্রাতা হযরত হারুনকে জাতির কর্ণধাররূপে নিজ স্থলাভিষিক্ত করিয়া "তুর" পানে রওয়ানা হইয়া গেলন। বনী ইসরাঈলের ব্যক্তিবর্গ পিছনে সঙ্গেই আছে ধারণা করিয়া মূসা (আঃ) এক মনে এক ধ্যানে তুর পর্বত পানে দৃষ্টি নিবদ্ধভাবে এদিক-ওদিক কোন লক্ষ্যই না করিয়া একরোখা সম্মুখপানে ধাবিত হইতেছিলন। বনী ইসরাঈলের ব্যক্তিবর্গ কিন্তু তাঁহার সঙ্গে যায় নাই।

বরং তাঁহারা চলিয়া যাওয়ার পর সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ বনী ইসরাঈল জাতি এক জঘন্য কেলেঙ্কারিতে জড়াইয়া পড়িল।

বনী ইসরাঈলদের মধ্যে "সামেরী" নামে এক মোনাফেক ঐ কেলেঙ্কারির উদ্যোক্তা ছিল। বনী ইসরাঈলদের নিকট কতকগুলি স্বর্ণের অলঙ্কার ছিল। সেইগুলি মিসরীয়দের নিকট হইতে তাহারা সাময়িক ধার আনিয়াছিল; মিসরে তাহাদের পরিত্যক্ত ধন সম্পদের বিনিময়রূপে বা যেকোন কারণে ঐ গুলি তাহারা নিয়া আসিয়াছিল; পবিত্র কোরআনে এই তথ্যের ইঙ্গিত রহিয়াছে।

এক দিকে হযরত মূসা তুর পর্বতের দিকে রওয়ানা হইয়াছেন অপর দিকে সামেরী সেই অলঙ্কারগুলি একত্রিত করার ব্যবস্থা করিল এবং সেগুলিকে আগুনে গলাইয়া উহা দ্বারা একটি 'গোশাবক' মূর্তি তৈয়ার করিয়া নিল।

সামেরীর নিকট আর একটি বস্তু ছিল– মূসা (আঃ) যখন মিসর হইতে আসিতেছিলেন তখন ফেরেশতা জিব্রীল (আঃ)-ও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন; ইহা নবীগণের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বিষয়। নবীগণের সাহায্য-সহায়তা ও বিপদ ক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা– ইহা আল্লাহর তরফ হইতে জিব্রাঈল ফেরেশতার উপর ন্যস্ত এবং তাঁহার একটি প্রধান কর্তব্য ছিল। হযরত ঈসার রক্ষক ও সহায়করূপে ফেরেশতা জিব্রীলের নিয়োজিত থাকা পবিত্র কোরআনেই বর্ণিত আছে। বদর, ওহুদ, আহযাব, বনু কোরায়যা ইত্যাদি জেহাদসমূহে জিব্রাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহায়তায় আসিয়াছিলেন, ইহা বোখারী শরীফ ইত্যাদি কিতাবের অনেক হাদীছে প্রমাণিত রহিয়াছে।

হাদীছ দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, হযরত জিব্রাঈলের ঘোড়া আছে; তিনি নবীগণের সাহায্য প্রয়োজনে ঘোড়া লইয়া অনেক ক্ষেত্রে আসিতেন। বোখারী শরীফের হাদীছে উল্লেখ আছে, বদরের জেহাদে ঘোড়া ও যুদ্ধাস্ত্র লইয়া হযরত জিব্রীলের উপস্থিতি রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রত্যক্ষ করা পূর্বক বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার ঘোড়ার নাম حيزوم "হাইযুম" বলা হইয়া থাকে। বদরের জেহাদে হাইযুম হাঁকাইবার শব্দ ছাহাবীগণ শুনিয়াছেন বলিয়া মুসলিম শরীফের হাদীছে বর্ণিত আছে। বোখারী শরীফেরই জন্য এক হাদীছে বর্ণিত আছে, "বনু কোরায়যা" গোত্রের উপর আক্রমণে যাত্রাকালে ছাহাবীগণ মদীনার "বনী গনম" সড়কে ধুলা উড়িতে দেখিয়াছেন যাহা অশ্বারোহী জিব্রাঈল বাহিনী অতিক্রমের দরুন ছিল।

মোট কথা–আপদ-বিপদে পয়গাম্বরগণের সাথে হযরত জব্রাঈলের সঙ্গ অবলম্বন এবং তাঁহার ঘোড়ায় আরোহণ এই সব তথ্য হাদীছ দ্বারা সুপ্রমাণিত।

মোফাস্‌সেরগণ লিখিয়াছেন, মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলকে লইয়া মিসর ত্যাগের সঙ্কটময় ঘটনায় জিব্রাঈল (আঃ) তাঁহার সঙ্গে ছিলেন এবং ঘোড়া আরোহিত ছিলেন। ঐ ঘোড়ার একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটিতেছিল– হযরত জব্রাঈলের ঘোড়ার পা যে স্থানে পতিত হইত সে স্থানে মরুভূমির মধ্যেও ঘাস-পাতা গজাইয়া উঠিত। হযরত জিব্রীল ও তাঁহার ঘোড়া সাধারণরূপে দৃষ্ট না হইলেও স্থানে স্থানে ঘাস-পাতা গজাইয়া উঠা দৃষ্ট ছিল এবং সামেরী তাহা লক্ষ্য করিতেছিল। সে এরূপ স্থান হইতে কিছু মাটি সঙ্গে রাখিয়াও দিয়াছিল এবং ধারণা করিয়াছিল যে, মৃত তথা ঘাস-পাতাবিহীন যমীন হঠাৎ সজীব ঘাস-পাতা বাহক হইয়া যাইতেছে! এই স্থানের মাটির আশ্চর্যজনক প্রতিক্রিয়া নিশ্চয় থাকিবে। এইরূপে একটা স্বাভাবিক মনোভাব লইয়া সে ঐ মাটি নিজের নিকট রাখিয়াছিল।

পূর্ববর্ণিত স্বর্ণের তৈয়ারী গোশাবক মূর্তিটি তৈয়ার করার পর সামেরীর মনে খেয়াল আসিল যে, আমার নিকট ত ঐ মাটি আছে যাহার ঘটনা ছিল– জীবনবিহীন বস্তুতে সজীবতার গুণাগুণ সৃষ্টি হওয়া; ঐ মাটি এই জীবনবিহীন বাছুর মূর্তিটার মধ্যে দিয়া দেখি কি হয়! মনের খামখেয়ালীর দ্বারাই সে উদ্বুদ্ধ হইল এবং সেই বাছুর মূর্তিটার মুখে ঐ মাটি রাখিয়া দিল।

আল্লাহর কুরতের লীলা– ঐ মাটি রাখিলে পর বাছুর মূর্তিটির মধ্যে একটা আশ্চর্যজনক অবস্থার সৃষ্টি হইয়া গেল যে, ঐ মূর্তিটি প্রকৃত গোশাবকের ন্যায় হাম্বা হাম্বা করিতে আরম্ভ করিল। মোনাফেক সামেরী উহাকে কেন্দ্র করিয়া বনী ইসরাঈলদের দ্বীন ঈমান নষ্ট করার সুযোগ গ্রহণ করিল। সে তাহাদিগকে বলিল, এই গোশাবকটিই বস্তুতঃ তোমাদের এবং তোমাদের নবী মূসারও প্রভু-পরওয়ারদেগার– মাবুদ উপাস্য। মূসা ভুল করিয়া উপাস্য মাবদের তালাশে তুর পর্বতে গিয়াছেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, বনী ইসরাঈলগণ দীর্ঘ পরাধীনতার জীবনে শেরক ও মূর্তিপূজকদের ভাবধারা ও রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছিল। এমনকি মূর্তি পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য তাহারা স্বয়ং হযরত মূসা সমীপে দাবীও পেশ করিয়াছিল, যাহার বিবরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে।

আপন ভোলা, বিজাতীয় ভাবধারায় নিমজ্জমান বনী ইসরাঈলগণ সহজেই সামেরীর খপ্পরে পড়িয়া গেল। তাহারা সকলে ঐ গোশাবকের পূজা আরম্ভ করিয়া দিল, এমনকি হারুন (আঃ) তাহাদিগকে শত বুঝাইয়াও নিবৃত্ত রাখিতে পারিলেন না। তাহারা পূর্ণ উদ্দ্যমে ঐ কেলেঙ্কারিতে মশগুল হইয়া গেল। তুর পর্বতে উপস্থিত মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ তাআলা তাঁহার জাতির অবস্থা জ্ঞাত করিলেন। জাতির জন্য আসমানী কিতাব লাভ করিলেন– সেই মুহূর্তে এই কেলেঙ্কারির সংবাদে হযরত মূসার আক্ষেপ অনুতাপের সীমা রহিল না। তিনি তথাকার কর্তব্য সমাপ্ত করিয়া আল্লাহ তাআলার কিতাব তওরাত শরীফ লাভ করতঃ স্বীয় জাতির প্রতি ক্রোধ ও অনুতাপ লইয়া তুর হইতে প্রত্যাবর্তন করিরেন।

প্রথমেই স্বীয় ভ্রাতা হযরত হারুনকে অভিযুক্ত করিলেন। কারণ, তাঁহাকেই নিজ স্থলাভিষিক্ত করিয়া গিয়াছিলেন, তাই ভাবিলেন যে, তাঁহার দুর্বলতায়ই হয় ত এই অঘটন ঘটিয়াছে। হারুন (আঃ) বলিলেন, আমি যথাসাধ্য বাধা প্রদান করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা আমার বাধা মানে নাই, বরং আমাকে হত্যা করিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছিল। অবশেষে আমি এ সম্পর্কে কিছু করিতে না পারিয়া জাতির সংহতি রক্ষা করতঃ আপনার অপেক্ষা করিতেছিলাম।

অতপর হযরত মূসা (আঃ) জানিতে পারিলেন যে, এই কেলেঙ্কারির মূল হইল সামেরী, অতএব তিনি সামেরীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। সে হযরত মূসার প্রভাব ও ভয়ে-আতঙ্কে কিছুই গোপন রাখিতে সক্ষম হইল না, সব কিছু খুলিয়া বলিয়া দিল। হযরত মূসা সকলকে এরূপ অযৌক্তিক হীনকার্যের উপর ভর্ৎসনা করিলেন। মোনাফেক সামেরী ত সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষামূলক শাস্তি ভোগে গজবে পতিত হইল; আর সর্বসাধারণ বনী ইসরাঈলদিগকে বিশেষরূপে তওবা করার আদেশ করা হইল এবং বাছুর-মূর্তিটাকে আগুনে পোড়াইয়া ছাই ভস্ম করিয়া দেওয়া হইল। এই ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ–

وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ـ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَلِمُونَ ـ

স্মরণীয় ঘটনা– আমি ওয়াদা দিয়াছিলাম মূসাকে চল্লিশ রাত্রের – (তুর পর্বতে ৪০ রাত্র ইবাদত-বন্দেগীতে কাটাও; কিতাব প্রদান করিব)। তারপর তোমরা একটা বাছুর মূর্তিকে মা'বুদরূপে অবলম্বন করিয়াছিলে; (কিতাবের জন্য) মূসার যাওয়ার পর। তোমরা গুরুতর অন্যায়কারী ছিলে।

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوَارٌ ـ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً ـ اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَلِمِينَ ـ

মূসার জাতি তাহার যাওয়ার পর তাহাদের স্বর্ণালঙ্কারগুলি দ্বারা একটা গোশাবকের মূর্তি বানাইল– এটা শুধু আকৃতিই ছিল (আত্মা উহাতে ছিল না; কেবল) গোশাবকের ন্যায় শব্দ উহাতে ছিল। তাহারা কি চিন্তা করিল না যে, ঐ বাছুর মূর্তিটা (মানুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট; মানুষ ত কথা বলিতে পারে, বাছুর মূর্তিটা ত)

কথাও বলিতে পারে না, তাহাদিগকে কোন পথ প্রদর্শনও করিতে পারে না। এমন অক্ষমকে মা'বুদরূপে গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা! বাস্তবিকই তাহারা বড় অন্যায়কারী ছিল।

وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسٰى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ـ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِىْ مِنْ بَعْدِىْ ـ اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ وَاَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗ اِلَيْهِ ـ

আর যখন মূসা অনুতাপ ও ক্রোধভরে স্বীয় জাতির নিকট ফিরিলেন তখন বলিলেন, তোমরা আমার যাওয়ার পর অত্যন্ত জঘন্য কাজে লিপ্ত হইয়াছ! আল্লাহর তরফ হইতে হুকুম-আহকাম আনিবার জন্য আমি গিয়াছিলাম, তাহার অপেক্ষাও করিলে না? এই বলিয়া তিনি তওরাত শরীফের খণ্ডগুলি ক্ষিপ্ততার সহিত রাখিয়া দিয়া স্বীয় ভ্রাতা হারুনের মাথার চুল ধরিয়া টানিয়া আনিলেন।

قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِىْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِىْ ـ فَلَا تُشْمِتْ بِىَ الْاَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِىْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ

হারুন (আঃ) বলিলেন, ভাই! জাতি আমাকে হাল্কা মনে করিয়াছে– আমার কথার মূল্য দেয় নাই, আমাকে ত তাহারা খুন করিতে প্রস্তুত ছিল (তুমিও কঠোরতা দেখাইলে শত্রুরা হাসিবে) অতএব শত্রুদলকে তুমি আমার প্রতি হাসাইও না এবং আমাকে অপরাধীদের দলভুক্ত গণ্য করিও না।

قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَلِاَخِىْ وَاَدْخِلْنَا فِىْ رَحْمَتِكَ ـ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ـ

মূসা (আঃ) বলিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমাকেও আমার ভ্রাতাকে ক্ষমা করুন এবং আপনার রহমতের আওতায় শামিল করুন, আপনি ত সর্বোপরি দয়ালু মেহেরবান।

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ـ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُفْتَرِيْنَ ـ

যাহারা বাছুর মূর্তিকে মা'বুদরূপে গ্রহণ করিয়াছে, নিশ্চয় তাহাদের অচিরেই পাকড়াও করিবে তাহাদের পরওয়ারদেগারের গজব এবং ইহকালেই তাহারা অপদস্থ হইবে। (আল্লাহ বলেন,) এইরূপ প্রতিফলই দিয়া থাকি আমি মিথ্যা প্রবঞ্চনাকারীদেরকে।

اَلَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ وَاٰمَنُوْا اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

আর যাহারা গোনাহের কাজ করার পর তওবা করে নেক আমল করে এবং ঈমানকে শুদ্ধ করিয়া নেয়, নিশ্চয় তোমার পরওয়ারদেগার ঐরূপ তওবা করিলে পর ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং রহম দান করিবেন। (পারা–৯; রুকু–৮)

وَمَا اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوْسٰى قَالَ هُمْ اُولَاۤءِ عَلٰۤى اَثَرِىْ وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى ـ

মূসা তুর পর্বতে পৌছাইলে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, (যাহাদেরকে সঙ্গে আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সেই) লোকদেরকে ছাড়িয়া দ্রুত চলিয়া আসিলেন কেন? মূসা (নিজের ধারণাবসে) বলিলেন, তাহারা আমার পিছনেই আছে। প্রভু হে! আমি যথাসত্বর আপনার আদিষ্ট স্থানে হাজির হইয়াছি আপনার সন্তুষ্টি লাভের জন্য।

قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْۢ بَعْدِكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِىُّ ـ

আল্লাহ বলিলেন, আপনি চলিয়া আসার পর (তাহারা আসে নাই, বরং) তাহাদের আমি পরীক্ষায় ফেলিয়াছি– সামেরী তাহাদের গোমরাহ করিয়া দিয়াছে।

فَرَجَعَ مُوْسٰى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ـ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ـ اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ اَمْ اَرَدْتُّمْ اَنْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِىْ ـ

(বিস্তারিত ঘটনা জ্ঞাত হইয়া) মূসা স্বীয় জাতির প্রতি অনুতাপ ও ক্রোধ ভরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, হে আমার জাতি! তোমাদের পরওয়ারদেগার কি তোমাদের নিকট একটি উত্তম ওয়াদা করিয়াছিলেন না (যে, "কিতাব" দান করিবেন)। তোমাদের সেই ওয়াদা পূরণের সময় কি ফুরাইয়া গিয়াছিল? না তোমরা ইচ্ছাই করিয়াছ যে, তোমাদের উপর তোমাদের পরওয়ারদেগারের গজব পতিত হউক, সে মতে তোমরা আমার নিকট প্রদত্ত অঙ্গীকার (তওহীদে দৃঢ় থাকিবে) ভঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছ?

قَالُوْا مَا اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَا اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنٰهَا فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِىُّ ـ

বনী ইসরাঈলরা বলিল, আপনার নিকট প্রদত্ত অঙ্গীকার আমরা সহজসাধ্যে ভঙ্গ করি নাই। কিন্তু ঘটনা এই যে, আমাদের উপর (মিসরবাসীদের) স্বর্ণালঙ্কারের বোঝার চাপ ছিল; অতএব (সামেরীর পরামর্শে) আমরা সেগুলিকে (আগুনে) ফেলিয়াছিলাম, তারপর সামেরীও ঐরূপে ফেলিয়াছে।

فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ـ فَقَالُوْا هٰذَا اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى فَنَسِىَ ـ

(সেইগুলি আগুনে গলাইয়া) সামেরী তাহাদের জন্য একটা বাছুরমূর্তি বানাইয়াছিল– এটা শুধু আকৃতিই, ছিল যাহাতে (আত্মা ছিল না) ছিল কেবল গোশাবকের ন্যায় শব্দ। সেই বাছুর মূর্তি সম্পর্কে (সামেরীর ধোকায়) তাহারা পরস্পর বলিল, ইহাই তোমাদের মা'বুদ এবং মূসা ও মা'বুদ। মূসা ভুল করিয়াছে। (মা'বুদের জন্য তুর পর্বতে গিয়াছে)।

اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ـ

(আল্লাহ বলেন,) তাহারা কি চিন্তা করিল না। এটা তাহাদের কথার উত্তর দিতেও অক্ষম, লাভ-লোকসানের মালিক হওয়ার কথাই নাই।

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ ـ فَاتَّبِعُوْنِىْ وَاَطِيْعُوْا اَمْرِىْ ـ قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ ـ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى ـ

হারুন (আঃ) তাহাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছিলেন, হে আমার জাতি! বাছুর মূর্তির দ্বারা তোমরা পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছ (এইটা প্রভু বা মা'বূদ হইতে পারে না)। তোমাদের প্রভু হইলেন একমাত্র তিনি, যিনি "রাহমান," অসীম দয়ালু-দাতা, করুণাময়। সুতরাং তোমরা আমার কথা মান এবং আমার আদেশের অনুসরণ কর। তাহারা হারুনকে বলিয়াছিল, আমরা কিছুতেই এই বাছুর মূর্তিকে ছাড়িব না– ইহার পূজায় লিপ্ত থাকিব যাবত না মূসা আমাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করেন।

قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْا ـ اَلَّا تَتَّبِعَنِ ـ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِىْ ـ

মূসা (আঃ) ভ্রাতা হারুনকে (ক্রোধভরে মাথার চুল ধরিয়া টানিয়া আনিলেন এবং থুতিতে হাত

লাগাইয়া মুখামুখি বসাইয়া) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে হারুন! জাতি যখন গোমরাহ হইতেছিল তখন আমার (নিকট পৌঁছার) পথ ধরিতে তোমার জন্য বাধা কি ছিল? তুমি আমার আদেশ লঙ্ঘন করিলে?

قَالَ يَابْنَؤُمَّ لاَ تَاخُذْ بِلِحْيَتِي وَلاَ بِرَاسِي - اِنِّي خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي اِسْرَائِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي -

হারুন (আঃ) বিনয়ভাবে বলিলেন, হে আমার মায়ের গর্ভজাত ভ্রাতা! আমার চুল-দাড়ি ছাড়িয়া দাও (এবং কথা শোন-) আমি আশঙ্কা করিয়াছি (তোমার নিকট গেলে কিছু লোক আমার সঙ্গে যাইবে, ফলে তাহাদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি হইবে); তুমি হয়ত বলিবে, বনী ইসরাঈলদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টির কাজ করিয়াছ, আমার আদেশ রক্ষা কর নাই- (আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম তাহাদের মধ্যে সুষ্ঠুতা বজায় রাখিবে)।

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِيْ - قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِيْ نَفْسِيْ -

মূসা (আঃ) (কেলেঙ্কারির মূল গুরুকে?) বলিলেন হে সামেরী! তোর ঘটনা কি? সে বলিল, অতীতে আমি একটি বস্তু লক্ষ্য করিয়াছিল যাহা সকলে লক্ষ্য করিয়াছিল না- (অর্থাৎ আল্লাহ প্রেরিত ফেরেশতা জিব্রীলের ঘোড়ার পদস্থানের অলৌকিক অবস্থা)। সেমতে আমি সেই প্রেরিত দূতের পদস্থান হইতে এক মুষ্টি মাটি লইয়াছিলাম; সেই মাটি-মুষ্টি আমি (বাছুর-মূর্তিটিতে) ফেলিয়াছিলাম, এইটা আমার মনের একটা পরিকল্পনা ছিল; (তাহা হইতেই মূল ঘটনার সৃষ্টি)।

قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لاَ مِسَاسَ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ - وَانْظُرْ اِلٰى اِلٰهِكَ الَّذِيْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا - لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِي الْيَمِّ نَسْفًا -

মূসা বলিলেন, দূর হইয়া যা- এই জিন্দেগীতে তোর এই দুর্ভোগ হইবে যে, ছুঁইও না, ছুঁইও না বলিতে হইবে, তদুপরি তোর জন্য শাস্তির আরও একটা নির্ধারিত সময় আছে পরকাল; যাহা এড়াইবার উপায় নাই। যেই মা'বুদকে কেন্দ্র করিয়া তুই ও তোর দল পূজা-পাট করিয়াছিল- এখনই দেখিবে, উহাকে জ্বালাইয়া ছাই-ভস্ম করিয়া দিব।

اِنَّمَا اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا -

তোমাদের সকলের মা'বুদ একমাত্র তিনি যিনি ভিন্ন মা'বুদ হওয়ার যোগ্য আর কেহ নাই, তিনি সর্বজ্ঞ সর্বজ্ঞানী। (পারা- ১৬; রুকু- ১৩, ১৪)

সামেরীর ইহকালীন দুর্ভোগের বিবরণ সম্পর্কে মোফাসসেরগণ লিখিয়াছেন যে, তাহাকে কেহ স্পর্শ করিলে স্পর্শকারী এবং সামেরী উভয়ের ভীষণ জ্বর আসিয়া যাইত, সুতরাং সে পাগলের ন্যায় মানুষ-জন হইতে দূরে ঝাড়-জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং মানুষ-জন দেখিলেই এইরূপ বলিতে থাকিত, ছুঁইও না- ছুঁইও না।

বাছুর পূজারীদের তওবা

সামেরী ইহকালীন গজবে পতিত হইল এবং বাছুর-মূর্তিটাকে পোড়াইয়া ছাই-ভস্ম করিয়া সমুদ্রে ফেলা হইল। অতপর মূসা (আঃ) বনী ইস্রাঈলের লোকগণকে তাহাদের এই মহাপাপ শেরেকের জঘন্যতা বুঝাইলেন এবং উহা হইতে তওবা করার উপদেশ দিলেন; তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিল। আল্লাহ তাআলা

তাহাদের এই মহাপাপের তওবা এইরূপ নির্ধারিত করিলেন যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে নিজের জীবন বিসর্জন দিতে হইবে। যেমন, বর্তমানে আমাদের শরীয়াতেও ব্যভিচার সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ আছে, নিজের জীবন বিসর্জন দেওয়া তথা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুবরণ করা।

ছাহাবী মা'য়েজ (রাঃ) এবং "গামেদিয়াহ" (রাঃ) নাম্নী ছাহাবী এইরূপ ঘটনায় স্বীয় জীবন বিসর্জন দেওয়ার জন্য طهرني يا رسول الله ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে পাক-পবিত্র করুন বলিয়া হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দরবারে নিজেকে পেশ করিয়াছিলেন। সেমতে হযরত (সঃ) তাঁহাদিগকে শরীয়তের নির্দেশ মতে প্রকাশ্যে জনসাধারণের প্রস্তরাঘাতে প্রাণে বধ করিয়াছিলেন। হযরত (সঃ) তাঁহাদের এই তওবার অনেক প্রশংসা করিয়াছেন।

তওবার ব্যবস্থাটি কঠিন ছিল বটে, কিন্তু বনী ইসরাঈলগণ তাহার জন্য শুধু প্রস্তুতই হইল না, বরং বাস্তবে পরিণত করিল। তাহাদের মধ্যে সত্তর হাজার লোক ঐ পাপে লিপ্ত হইয়াছিল। তাহারা সকলেই তাহাদের জীবন বিসর্জন দিয়াছিল; ফলে আল্লাহ তাআলা ঐরূপ তওবাকারীদের সেই মহাপাপ ক্ষমা করিয়া দিয়াছিলেন, যাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ—

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْا اِلٰى بَارِئِكُمْ ـ فَاقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ ـ

অর্থ ঃ স্মরণীয় ঘটনা— মূসা (আঃ) স্বীয় জাতিকে বলিয়াছিলেন, হে আমার জাতি! তোমরা বাছুর পূজা অবলম্বনে নিজেদেরই ক্ষতি করিয়াছ। তোমরা স্বীয় সৃষ্টিকর্তার প্রতি ধাবিতও হও খাঁটি তওবা কর এবং সেমতে তোমরা নিজেদের জীবন বিসর্জন দাও। এই ব্যবস্থা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার দরবারে তোমাদের পক্ষে সুফলদায়ক হইবে— তিনি তোমাদের তওবা কবুল করিবেন; নিশ্চয় তিনি তওবা কবুলকারী।

(পারা—১ ;রুকু—৬)

আল্লাহ তাআলা আরও বলিয়াছেন—

ثُمَّ اتَّخَذُوْا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ـ

"বনী ইসরাঈলদের অপর একটি ঘটনা যে, তাহাদের নিকট সত্য দ্বীনের দলীল প্রমাণ আসিবার পরেও তাহারা বাছুর পূজা অবলম্বন করিয়াছিল। সেইরূপ মহাপাপকেও (তাহাদের তওবার বদৌলতে) আমি ক্ষমা করিয়া দিয়াছিলাম।" (পারা— ৬;রুকু— ২)

তওরাত সম্পর্কে গড়িমসি, তাই ব্যবস্থা অবলম্বন

বাছুর পূজার কেলেঙ্কারির সমাপ্তি ঘটিল, সেই পাপে প্রত্যক্ষরূপে জড়িত ব্যক্তিরা তওবারূপে জীবন বিসর্জন দিল অতপর শান্ত পরিবেশে মূসা (আঃ) তওরাত শরীফ বনী ইসরাঈল জাতির সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। তাহাদের বেআদব প্রকৃতির কিছু লোক একটা গোঁড়ামিমূলক প্রশ্ন তুলিল যে, আল্লাহ তাআলা সরাসরি আমাদিগকে বলিয়া দিলে আমরা এই কিতাবে বর্ণিত আদেশ গ্রহণ করিতে পারি; নতুবা কিরূপে বুঝিতে পারি যে, ইহা বাস্তবিকই আল্লাহর কিতাব?

অনেক সময় আল্লাহ মানুষকে ঢিল দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। সেমতে মূসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার ইঙ্গিতক্রমে তাহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের প্রত্যেকের নিকট আল্লাহ তাআলা কিছু বলিবেন এটা ত দুরূহ কথা, তবে এইরূপ ব্যবস্থা কর যে, তোমাদের কতিপয় ব্যক্তি ব্যক্তিবিশেষকে নির্বাচিত করিয়া দাও; তাহারা আমার সঙ্গে তুর পর্বতে উপস্থিত হইবে; আল্লাহ তাআলা তাহাদিগকে বলিয়া দিবেন। তাহাই করা হইল—

তাহারা সত্তর জন লোক নির্বাচিত করিল। মূসা (আঃ) তাহাদিগকে লইয়া তুর পর্বতে উপস্থিত হইলেন– তাহারা তথায় নিজ কানে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ শুনিতে পাইল– আল্লাহ তাআলা বলিলেন–

انى انا الله لا اله الا انا ذو بكة اخرجتكم من ارض مصر فاعبدونى ولا تعبدوا غيرى -

"একমাত্র আমিই তোমাদের মা'বুদ বা উপাস্য, আমি ভিন্ন তোমাদের কোন মা'বুদ নাই। আমি পরম প্রতাপশালী, তোমাদিগকে মিসর দেশ হইতে বাহির করিয়া শত্রুমুক্ত করিয়াছি, অতএব তোমরা আমারই গোলামী কর– আমি ভিন্ন অন্য কাহারও গোলামী করিও না।"। (তফসীর আজিজী)

এই স্পষ্ট নির্দেশ শুনিবার পর তাহারা বলিতে লাগিল; যে নির্দেশ আমরা শুনিলাম তাহা যে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ তাহা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি যাবৎ প্রকাশ্যে আমরা আল্লাহ তাআলাকে না দেখি?

এত গোঁড়ামি? এত গোস্তাখী! আর কত ঢিল দেওয়া যাইতে পারে! এইবার তাহারা আল্লাহর গযবে পতিত হইল– ভীষণ গর্জন এবং বিদ্যুৎ তাহাদিগকে মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করিয়া দিল, সত্তর জন সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এখন মূসা (আঃ) চিন্তায় পড়িলেন যে, দুষ্টগণ ত নিজ দোষে ধ্বংস হইল; কিন্তু জাতিকে আমি এই ঘটনা বুঝাইতে পারিব না, তাহারা সমস্ত দোষ আমার উপর চাপাইবে। এই ভাবিয়া তিনি বিনয়ের সহিত আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করিলেন। আল্লাহ তাআলা হযরত মূসার দোয়ার বরকতে পুনরায় তাহাদিগকে জীবিত করিয়া দিলেন।

তুর পর্বত হইতে মূসা (আঃ) তাহাদিগকে লইয়া ফিরিলেন। তাহারা জাতির সম্মুখে কিছুটা সাক্ষ্য দিল। এখন বনী ইসরাঈলরা বলিতে লাগিল, আমরা এত কঠিন কঠিন বিধানের কিতাব গ্রহণ করিতে পারিব না।

যেসব ব্যক্তি সম্যক বাছুর পূজায় লিপ্ত হইয়াছিল তাহারা ত তওবাস্বরূপ জীবনদানে ইহজগত হইতে বিদায় হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু জাতির মধ্যে বহু লোক এমনও ছিল যাহারা সরাসরি পূজায় লিপ্ত হইয়াছিল না, তাই তাহারা সেই জীবন বিসর্জনের তওবার আওতায় পড়ে নাই; কিন্তু তাহাদের অন্তরে বাছুর পূজার প্রভাব বিদ্যমান ছিল। এই মহাপাপের যে প্রভাব ও আকর্ষণ তাহাদের অন্তরে ছিল, তাহার অভিশাপে তাহাদের এই দুর্ভাগ্য যে, তাহারা আল্লাহ তাআলার আদেশাবলীকে শিরোধার্য করিয়া নিতে গড়িমসি করিল। আল্লাহ তাআলা এক পর্বত খন্ডকে উপড়াইয়া তাহাদের মাথার উপর তুলিয়া ধরিলেন এবং নবীর মারফত বলিলেন, আমার প্রদত্ত কিতাব গ্রহণ কর, নতুবা রক্ষা নাই, এই পাহাড় তোমাদের উপর পতিত হইবে। তখন তাহারা ভীত ও সন্ত্রস্ততার প্রভাবে বলিল, আমরা গ্রহণ করিলাম; কিন্তু তাহাদের পরবর্তী অবস্থা ও কার্যকলাপ ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে, তাহারা খাঁটি অন্তরে গ্রহণ করে নাই।

অন্তর্যামী আল্লাহ তাআলা সব কিছু জানা সত্ত্বেও তাহাদিগকে ধ্বংস করেন নাই। প্রত্যেককে তাহার জীবন সময়ের অবকাশ দিয়াছেন; ইচ্ছা করিলে সংশোধন হইতে পারিবে। আল্লাহ তাআলা কতই না দয়ালু যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে পাঠাইয়া তাহাদের সেই সংশোধনের সুযোগ আরও প্রশস্ত করিয়াছেন। এই সবের বর্ণনায় পবিত্র কোরআনে অনেক আয়াত রহিয়াছে–

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ وَفِىْ نُسْخَتِهَا هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ -

(বাছুর পূজার কারণে সৃষ্ট) মূসার রাগ যখন থামিল, তখন তিনি তওরাত লিখিত খন্ডগুলি বনী ইসরাঈলকে বুঝাইতে হাতে নিলেন। তাহার বিষয়বস্তু ছিল হেদায়াত– সৎপথ প্রদর্শন এবং রহমত–কল্যাণময় তাহাদের জন্য যাহারা স্বীয় প্রভুর ভয়-ভক্তি রাখে।

وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلاً لِمِيْقَاتِنَا فَلَمَّا اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَاِيَّایَ ـ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاۤءُ مِنَّا ـ

(আর তওরাত সম্পর্কে আল্লাহর বাণী শুনিবার জন্য) মূসা স্বীয় জাতি হইতে সত্তর জন লোক মনোনীত করিলেন নির্দিষ্ট স্থান তুর পর্বতে উপস্থিত হওয়ার জন্য। (তথায় আল্লাহর বাণী শুনিবার পর আল্লাহকে দেখিবার প্রস্তাব করায়) যখন ভীষণ ভূকম্পনাকারে আল্লাহর গজব তাহাদিগকে পাকড়াও করিল এবং তাহারা ধ্বংস হইল তখন মূসা আল্লার দরবারে আরজ করিরেন, পরওয়ারদেগার! (ইহা সুস্পষ্ট যে, তাহাদের ঔদ্ধত্যতায়ই তাহাদের ধ্বংস করিয়াছেন নতুবা) আপনি সব সময়ই সর্বশক্তিমান– ইচ্ছা করিলে পূর্বে আমাকে এবং তাহাদিগকে– সকলকেই ধ্বংস করিতে পারিতেন। প্রভু! আপনি কি আমাকে সহ হালাক করিবেন আমাদের এই কতিপয় জ্ঞানশূন্য লোকের আচরণের দরুন? (এই অপরাধে তাহাদের সহিত আমারও ধ্বংস আসন্ন; কারণ, এই লোকদের মৃত্যুতে বনী ইসরাঈলরা আমাকে আসামী সাব্যস্ত করিবে এবং মারিয়া ফেলিবে)। (পারা– ৯; রুকু– ৯)

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ـ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ـ

একটি স্মরণীয় ঘটনা– যখন তোমরা বলিয়াছিলেন, হে মূসা! কিছুতেই আমরা তোমার কথায় বিশ্বাস করিব না (এই শ্রুত বাণী আল্লাহ তাআলার) যাবত না আমরা প্রকাশ্যে আল্লাহকে দেখিয়া নেই। তখন ভীষণ বজ্র ও বিদ্যুৎ তোমাদেরকে পাকড়াও করিয়াছিল। তোমরা নিজ চোখে গজবের আগমন দেখিতেছিলে। তারপর (মূসার দোয়ার ফলে) আমি তোমাদিগকে জীবিত করিয়াছিলাম তোমাদের সেই মৃত্যুর পর, তোমরা যেন আমার শোকরগুজারী কর। (সূরা বাকারাঃ পারা– ১; রুকু– ৬)

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ـ خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ

স্মরণ কর– আমি তোমাদের হইতে ওয়াদা অঙ্গীকার লইয়াছিলাম এবং সেই ব্যাপারে পাহাড়কে তোমাদের উপর তুলিয়া ধরিয়াছিলাম* আর আদেশ করিয়াছিলাম– আমি তোমাদেরকে, যে কিতাব দিয়াছি তাহা মজবুতরূপে গ্রহণ কর, তাহার নির্দেশাবলী অন্তরে গাঁথিয়া লও এবং তাহা মোতাবেক চল; তবে তোমরা হইতে পারিবে মোত্তাকী–পরহেজগার। (পারা– ১; রুকু– ৮)

---

* বহু সমালোচিত বাঙ্গালী পন্ডিত তফসীরকার এখানেও অপব্যাখ্যর উদগার করিয়াছেন। তিনি তাঁহার চিরাচরিত ফন্দি-ফেরেব এখানেও আঁটিয়াছেন, কতিপয় শব্দের বিচ্ছিন্ন উপঅর্থ হাতড়াইয়া সমাবেশ করতঃ গোঁজামিল দিয়াছেন।

তাহার বক্তব্য এই যে, পাহাড় উঠাইয়া আনিয়া তাহাদের মাথার উপর ধরা হইয়াছিল ইহা সত্য নহে, গল্প-গুজব মাত্র। তাহার মতে, আয়াতের মর্ম ও ঘটনার সত্য বিবরণ এই যে, পাহাড়টাকে নিজ স্থানে রাখিয়াই বনী ইসরাঈলদের দৃষ্টিতে তাহা প্রকাশমান করা হইয়াছিল মাত্র। পাঠকবর্গ! পণ্ডিতের তফসীর কিরূপ সত্য তাহা একটু চিন্তা করিলেই ধরা পড়িবে। এখানে তিনটি বাক্য আছে– (১) স্মরণ কর ঐ সময়টা যখন তোমাদের হইতে আমি অঙ্গীকার লইয়াছিলাম (২) আর তোমাদের উপর পাহাড় উঠাইয়াছিলাম (৩) আদেশ করিয়াছিলাম, যাহা আমি দিয়াছি তাহা শক্তভাবে ধর এবং স্মরণ রাখ।

এখন বিচার করুন ২ নং বাক্যটির মর্ম যদি এই হয় যে, "পাহাড়টাকে তোমাদের দৃষ্টিতে প্রকাশমান করিয়াছিলাম" তবে এই বাক্যটির পূর্বাপর তথা ১ নং ও ৩ নং বাক্যদ্বয়ের সঙ্গে সঙ্গতি কি হইবে এবং এই বাক্যত্রয়ের ধারাবাহিকতার তাৎপর্য কি হইবে?

অতপর পণ্ডিত সাহেব رفعنا রাফা'না ও فوقكم ফাওকাকুম শব্দের ব্যবহারিক অর্থ সম্পর্কে হাতড়ানি দেখাইয়াছেন। কিন্তু লক্ষ্য রাখিবেন যে, তিনি যেসব অর্থ দেখাইয়াছেন তাহা শব্দের মূল অর্থ নহে, বরং ব্যবহারিক অর্থ। আর ব্যবহারিক অর্থেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, رفعنا রাফানা ও فوقكم ফাওকাকুম শব্দদ্বয় বিচ্ছিন্ন ও ভিন্ন ভিন্ন আকারে ব্যবহারে যে অর্থ হইতে

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ـ خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ـ قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ـ وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ـ

আরও স্মরণ কর, তোমাদের হইতে ওয়াদা অঙ্গীকার লইয়াছিলাম এবং (তাহার জন্য) তোমাদের উপর পাহাড় তুলিয়া ধরিয়াছিলাম। আদেশ করিয়াছিলাম, যে কিতাব আমি তোমাদেরকে দিয়াছি তাহা দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর এবং মনোযোগের সহিত শুন। তাহারা বলিয়াছিল– শুনিলাম, কিন্তু আমল করিতে পারিব না। বস্তুতঃ তাহাদের অন্তরকে দখল করিয়া রাখিয়াছিল বাছুর পূজার (ন্যায় শেরেকী গোনাহের) আকর্ষণ তাহাদের কুফরী মনোভাবের দরুন। (পারা– ১; রুকু – ১১)।

وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْا اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ

একটি স্মরণীয় ঘটনা– আমি পাহাড় উঠাইয়া ধরিলাম তাহাদের উপর ছায়াবানের ন্যায়। তাহারা ভাবিয়াছিল, উহা তাহাদের উপর পতিত হইবে– এমতাবস্থায় তাহাদের আদেশ করা হইল, যে কিতাব আমি তোমাদেরকে দিয়াছি তাহা দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর এবং তাহার আদেশবালী অন্তরে গাঁথিয়া লও এবং সেই মোতাবিক চল; তোমরা মোত্তাকী হইতে পারিবে। (সূরা আ'রাফ ঃ পারা– ৯; রুকু– ১১)

অর্থাৎ পরাধীনতার যুগে বিজাতীয় প্রভাবে তাহাদের মধ্যে কুফরী ও মূর্তি পূজার মানসিকতা সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা মুখে এবং কার্যেও প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাদের মধ্য হইতে কিছু সংখ্যক, লোক যাহারা আত্মবিসর্জনদানে বিশেষ তওবার আদেশ বরণ করিয়াছিল তাহারা ভিন্ন অবশিষ্ট লোকগণ উক্ত কুফুরী ও শেরেকী মানসিকতা হইতে সাধারণ নিয়মেও খাঁটি এবং পরিপক্ক তওবা করে নাই। ফলে সেই অশুভ মানসিকতার জুলমত ও অন্ধকারময় প্রক্রিয়া তাহাদের অভ্যন্তরে গাঁথিয়া থাকে এবং তাহাই প্রতিক্রিয়ায় পদে পদে নাফরমানী ও গোঁড়ামি আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। যাহার একটি নমুনা তৌরাতে গ্রহণ করিয়া লওয়া সম্পর্কীয় আল্লাহর আদেশের ব্যাপারে কেলেঙ্কারীর উল্লেখিত ঘটনা। তদুপরি ময়দানে তীহ বা তীহ প্রান্তর সম্পর্কীয় পরবর্তী ঘটনাবলীও সেই নাফরমানী ও গোঁড়ামি মনোবৃত্তিরই আত্মপ্রকা, যেসবের বিবরণ পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

পারে উভয়ের মিলিত আকারের ব্যবহারেও ঐ অর্থ লইতে চাহিলে ভাষার মধ্যে তাহার নজির দেখাইতে হইবে। কারণ, ব্যবহারিক অর্থ ব্যবহারের আকার ও তাৎপর্যে সীমাবদ্ধ থাকে। লক্ষ্য করুন! "ধরা" শব্দটি "পায়ে ধরা" বাক্যে যে অর্থে ব্যবহার হয়, 'মাথা ধরা" বাক্যে সেই অর্থ ভুল হইবে।

অতএব পণ্ডিত সাহেব যে গোঁজামিল দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন– সেই প্রচেষ্টা সম্পন্ন হইবে না যাবত না তিনি رفعنا ও فوق শব্দদ্বয়ের মিলিত এবং فوق শব্দ كم কুম শব্দের সঙ্গে আবদ্ধ আকারে ব্যবহারে তাহার উদ্দেশ্য উপঅর্থের নজির আরবী ভাষায় দেখাইতে পারেন। পণ্ডিত সাহেবের জীবন ত খরচ হইয়াই গিয়াছে, তাঁহার দোস্ত-মদদগারদের জীবনও সম্পূর্ণ ব্যয় করিয়া আরবী ভাষায় ঐরূপ নজির বাহির করিতে সক্ষম হইবেন না।

পণ্ডিত সাহেব আলোচ্য বিষয়ের পরবর্তী সূরা আ'রাফের আয়াত খানার মধ্যে نتقنا নাতাক্না" শব্দের অর্থ সম্পর্কে কতকগুলি অভিধান গ্রন্থের নাম ভাঙ্গাইয়া ময়দান জয় করার চেষ্টা করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাহার এই প্রচেষ্টা নিছক ব্যর্থ। কারণ, কোরআনের তফসীর সম্পর্কে সর্বপ্রথম নির্ভর স্থল হইল হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) বা তাঁহার ছাহাবীগণের বক্তব্য; অবশ্য কোন আয়াত সম্পর্কে যদি আমাদের খোঁজে ঐ সম্পদ না থাকে তবে দ্বিতীয় নম্বরে আরবী অভিধান ও ব্যাকরণ ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করা হইবে।

ছাহাবীগণের ব্যাখ্যা তফসীর কার্যে প্রথম নম্বরের প্রমাণ; অভিধান ইত্যাদি দ্বিতীয় নম্বরের প্রমাণ। কারণ, অভিধান দ্বারা আমরা আরবী শব্দের অর্থ নির্ধারিত করিব; আর ছাহাবীগণ স্বয়ং আরবী-ভাষাভাষী এবং তাঁহাদের সম্মুখেই পবিত্র কোরআন নাযিল হইয়াছে– কোরআন রসূলের উপর নাযিল হইয়াছিল, ছাহাবীগণ তাঁহারই শার্গেদ।

তীহ প্রান্তরের ঘটনার সূচনা

ফেরআউন ধ্বংস হওয়ার পর বনী ইসরাঈলরা মিসরের স্বত্বাধিকারী হইয়া থাকিলেও তাহারা তথায় পুনর্বাসিত হয় নাই। আপন দেশ সিরিয়ায় যাওয়ার ইচ্ছায় বা আদেশে তাহারা অস্থায়ীভাবে 'সীনা' উপত্যকায় তুর পর্বতের এলাকায় বাস করিতেছিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে, বনী ইসরাঈলদের আসল বাসস্থান ছিল শাম তথা সিরিয়ায়। বনী ইসরাঈলদের মূল ইসরাঈল তথা ইয়াকুব (আঃ) শাম দেশেরই "কেনান" অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতামহ ইব্রাহীম (আঃ) ইরাক হইতে হিজরত করিয়া শাম দেশেই আসিয়াছিলেন।

বনী ইসরাঈলগণ মুক্ত হইয়া তুর অঞ্চলে বসবাসকালে তওরাত কিতাব তথা পূর্ণ শরীয়ত প্রাপ্ত হইল এবং তথায় দীর্ঘকাল কাটাইল। অতপর আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে তাহাদের প্রতি আদেশ আসিল, স্বীয় পৈত্রিক আবাসভূমি শাম দেশে যাওয়ার। সেই সময় শাম দেশ "আমালেকা" নামক এক দুর্ধর্ষ জাতির দখলে ছিল; তাহাদের সঙ্গে জেহাদ করিয়া ঐ দেশ উদ্ধার করার আদেশ হইল।

মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলগণকে লইয়া জেহাদ উদ্দেশে সিরিয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং বনী ইসরাঈলগণকে আশ্বাস দিলেন জেহাদ চালাইলে তোমরা সিরিয়া দেশ উদ্ধার করিতে পারিবে বলিয়া আল্লাহ তাআলা নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। বনী ইসরাঈলগণ বলিল, ঐ দেশ এক দুর্ধর্ষ জাতি কর্তৃক অধিকৃত; আমরা তাহাদের সঙ্গে জেহাদে পারিয়া উঠিব না, সুতরাং তাহারা ঐ দেশ হইতে বাহির হইয়া না গেলে আমরা তথায় যাইব না।

পথিমধ্যে এই বিভ্রাট ঘটায় মূসা (আঃ) তাহাদের মনোবল বৃদ্ধি করার একটি বিশেষ ব্যবস্থা করিলেন। বনী ইসরাঈলগণ বারটি গোত্রে বিভক্ত ছিল, প্রত্যেক গোত্রের এক একজন সর্দার ছিল, তাহাদিগকে "নকীব" বলা হইত। আলোচ্য ঘটনায় বস্তুতঃ বনী ইসরাঈলগণ আমালেকা জাতি সম্পর্কে নানারূপ গুজব ও অতিরঞ্জিত খবরে প্রভাবান্বিত ছিল, তাই মূসা (আঃ) বার গোত্রের বার সর্দারকে একত্র করতঃ তাহাদিগকে অগ্রগামী করিয়া পাঠাইলেন। তাহারা গোপনে আমালেকা জাতির সঠিক বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আসিয়া সর্বসাধারণ বনী ইসরাঈলকে জানাইবে, যেন তাহারা গুজবের প্রভাব হইতে মুক্ত হয়- এই আদেশ তাহাদের প্রতি ছিল।

বার সর্দারের দলটি সব কিছু হাল-অবস্থা ওয়াকেফ হইয়া স্থির করিল যে, স্বীয় জাতিকে তাহাদের মনোবল বৃদ্ধিকারক খবরই শুনান হইবে যে, তাহারা সাহস করিয়া জেহাদের জন্য অগ্রসর হইলে তাহাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত; কিন্তু শেষ পর্যন্ত বার জনের মাত্র দুই জন নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল রহিল এবং দশজনই তাহাদের সেই সিদ্ধান্ত বর্জনপূর্বক বিপরীত সংবাদ পৌঁছাইল। ফলে বনী ইস্রাঈলগণ একেবারে হাত-পা ছাড়িয়া দিল, এমনকি হযরত মূসার সঙ্গে বেআদবীপূর্ণ কথা বলিয়া পথিমধ্যে তাহারা বসিয়া পড়িল; সেই

দুঃখের বিষয়- পণ্ডিত সাহেব আলোচ্য আয়াতের তফসীর করিতে অভিধানের পাতা উল্টাইয়াছেন, কিন্তু ইহা দেখেন নাই যে, স্বয়ং হযরত রসুলুল্লার চাচাত ভাই বিশিষ্ট ছাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) যিনি সমগ্র উম্মতের মধ্যে প্রধানতম মোফাসসের তাঁহার হইতে আলোচ্য আয়াতের তফসীর স্পষ্টরূপে বর্ণিত রহিয়াছে। সেই তফসীর বড় বড় তফছীরের কিতাকে উল্লেখ আছে। প্রসিদ্ধ তফসীর ইবনে কাছীর- ২য় খণ্ড ২৬০ পৃষ্ঠায় আছে-

عن ابن عباس .... وابو ان يقروا بها حتى نتق الله الجبل فوقهم كانه ظلة قال رفعته الملائكة فوق رؤسهم -

অর্থঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলিয়াছেন, বনী ইসরাঈলগণ তওরাত শরীফ স্বীকার করিয়া লইতে চাহিল না, ফলে আল্লাহ তাআলা তাহাদের উপর পাহাড়কে "নাতক করিলেন তাহা তাহাদের উপর ছায়াবানের ন্যায় লট্‌কিয়া রহিল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) স্বয়ং তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, আল্লাহ তাআলার নির্দেশে ফেরেশতাগণ পাহাড়কে তাহাদের মাথার উপর তুলিয়া ধরিয়াছিলেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে এইরূপ স্পষ্ট তফসীর বর্ণিত হওয়ার পর "নাতক" শব্দের অর্থ অভিধান হইতে খয়রাত করা শুধু নিষ্প্রয়োজনই নহে, বরং ভুল পন্থাও বটে। কারণ, ইবনে আব্বাস (রাঃ) ছাহাবী আরবী ভাষাভাষী ছিলেন বিশেষত পণ্ডিত সাহেবের স্বীকারোক্তি অনুসারেই যখন "নাতক" শব্দের অর্থ "উঠাইয়া ধরা" অভিধানেও বিদ্যমান আছে তখন ত ঐ অর্থ বাদ দেওয়ার অর্থ হয় ছাহাবী ইবনে আব্বাসের তফসীর পণ্ডিত সাহেবের মনঃপূত নয়, তাই ঐ তফসীর গ্রহণ করিতে গড়িমসি; ইহা ত বনী ইসরাঈল-মার্কা স্বভাব।

কেলেঙ্কীরর এলাকাটিই ছিল “তীহ প্রান্তর”।

হযরত মূসা (আঃ) ভীষণ অনুতপ্ত ও মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন, এমনকি আল্লাহর দরবারে নিজেকে এবং ভ্রাতা হযরত হারুনকে পেশ করত স্বীয় জাতির বিরুদ্ধে বিচারপ্রার্থী হইলেন। আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলগণকে ইহকালীন আযাবে পতিত করিলেন, তাহারা ঐ মরু প্রান্তর অঞ্চলে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত দিশাহারা দিগভ্রান্তরূপে ঘূর্ণায়মান থাকিবে– এই অঞ্চল হইতে বাহির হইতে পারিবে না।

ঐ মরু অঞ্চলটি এই অর্থেই “তীহ প্রান্তর” নামকরণ হইয়াছে। “তীহ” অর্থ দিকভ্রান্তরূপে ঘূর্ণায়মান হওয়া। ঐ প্রান্তরটি পূর্বালোচিত সীনা উপত্যকার প্রশস্ত দিক তথা উত্তরাংশ– খাদ্য পানীয়, ঘাস-পাতা, তৃণ-লতাবিহীন বিশাল মরুভূমি।

এই বিবরণীর আলোচনায় পবিত্র কোরআনের বিবৃতি এই–

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا وَّاٰتٰكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ـ

স্মরণ কর, মূসা (আঃ) স্বীয় জাতিকে বলিয়াছিলেন, হে আমার জাতি! তোমাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ নেয়ামতসমূহ স্মরণ কর– আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কত কত নবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং (ফেরআউন হইতে মুক্ত করিয়া কত কত শহরের স্বত্বাধিকারদানে) তোমাদিগকে রাজ্যের মালিক বানাইলেন, আরও কত নেয়ামত তোমাদিগকে দান করিয়ানে! বর্তমান জগদ্বাসীদের আর কাহাকেও ঐরূপ দান করেন নাই।

يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِىْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ـ

হে আমার জাতি! তোমরা পূণ্যময় ভূখণ্ডে প্রবেশ কর (তথা সিরিয়া বা শাম দেশে–) যাহাকে আল্লাহ তোমাদের জন্য অবধারিত করিয়া রাখিয়াছেন (জেহাদ করিলেই তোমরা তাহা পাইয়া যাইবে)। খবরদার! জেহাদ হইতে পশ্চাৎপদ হইও না, অন্যথায় তোমাদের সর্বনাশ হইবে।

قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ـ وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ـ

তাহারা বলিল, হে মূসা! সে অঞ্চলে ত এক দুর্ধর্ষ পরাক্রমশালী জাতি বাস করে; আমরা কোন মতেই তথায় প্রবেশ করিব না যাবত না তাহারা তথা হইতে বাহির হইয়া যায়। হাঁ, যদি তাহারা তথা হইতে বাহির হইয়া যায় তবে পরে আমরা প্রবেশ করিব।

قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ـ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ـ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

দুই জন লোক যাহারা আল্লাহকে ভয় করিত– যাহাদেরকে আল্লাহ শুভবুদ্ধির নেয়ামত দিয়াছিলেন তাঁহারা তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, তোমরা তাহাদের সম্মুখে তাহাদের দ্বারদেশে উপস্থিত হও; তবেই তোমাদের বিজয় প্রতিষ্ঠিত হইবে (ভয় কর কেন)? তোমরা যদি প্রকৃত মুমিন হইয়া থাক তবে তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা স্থাপন কর।

قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ـ

এইবার তাহারা আরও দৃঢ়ভাবে বলিল, হে মূসা! যাবত ঐ জাতি সেই অঞ্চলে থাকিবে তাবত আমরা কিছুতেই কস্মিনকালেও তথায় প্রবেশ করিব না। সুতরাং তুমি যাও আর তোমার খোদা যাউক– তোমরা সেখানে যুদ্ধ কর ,আমরা ত এখানেই বসিয়া পড়িলাম।

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ لاَ اَمْلِكُ اِلاَّ نَفْسِیْ وَاَخِیْ فَافْرُقْ بَیْنَنَا وَبَیْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِیْنَ -

মূসা (আঃ) আল্লাহর হুজুরে বলিলেন, পরওয়ারদেগার! কাহারও উপর আমার কর্তৃত্ব নাই একমাত্র আমার জান ও আমার ভ্রাতা ব্যতীত; এখন তুমিই আমাদের এবং এই নাফরমান জাতির মধ্যে ফয়সালা করিয়া দাও।

قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَیْهِمْ اَرْبَعِیْنَ سَنَةً یَتِیْهُوْنَ فِی الْاَرْضِ - فَلاَ تَاسَ عَلَی الْقَوْمِ الْفٰسِقِیْنَ -

আল্লাহ তাআলা বলিলেন, তাহাদের কর্মফল ইহকালে এই ভোগ করিবে যে, ঐ পুণ্য ভূমি–পৈতৃক দেশ হইতে তাহারা বঞ্চিত হইল চল্লিশ বৎসরের জন্য; এই দীর্ঘকাল তাহারা এই মরু অঞ্চলেই দিগভ্রান্তরূপে ঘুরিতে থাকিবে। তুমি কিন্তু হে মূসা! এই নাফরমান জাতির দুরবস্থায় আক্ষেপ অনুতাপ করিও না। (পারা– ৬; রুকু– ৯)

তীহ প্রান্তরে দয়াল মা'বুদের অসীম দয়া

ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, বনী ইসরাঈলগণ তীহ প্রান্তরে শাস্তি ভোগস্বরূপ আবদ্ধ ছিল। আর মূসা (আঃ)ও তথায় তাহাদের সঙ্গেই ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন তাহাদের রক্ষক ও পরিচালকরূপে। সেই মরুভূমিতে পানাহারের ব্যবস্থা ছিল না, বরং সূর্যের উত্তাপ হইতে মাথা ঢাকিবারও কোনরূপ ব্যবস্থার নাম-নিশানা পর্যন্ত তথায় ছিল না। সুতরাং তাহারা তথায় তিনটি জিনিসের অভাবে ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হইয়া পড়িল (১) পানীয়, (২) খাদ্য, (৩) ছায়া।

মূসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার দরবারে ঐ সব অভাব সম্পর্কে দোআ করিলে রহমানুর রহীম আল্লাহ তাআলার করুণা দৃষ্টি সেই শাস্তি ভোগরত জাতির প্রতিও উন্মুক্ত হইল; তাহাদের প্রত্যেকটি অভাবেরই সুব্যবস্থা হইল। পানির জন্য আল্লাহ তাআলা বারটি ঝর্ণা সৃষ্টি করিলেন, খাদ্যের জন্য মান্ন-সালওয়ার ব্যবস্থা করিলেন আর ছায়ার জন্য তাহাদের উপর মেঘমালা সৃষ্টি করিলেন।* ঐ সব ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ

পানির ব্যবস্থা

وَاِذِ اسْتَسْقٰی مُوْسٰی لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرْ - فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَیْنَا قَدْعَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِی الْاَرْضِ

---

* কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এইসব ঘটনা তীহ প্রান্তর সম্পর্কীয় নহে, বহু পূর্বের ঘটনা– যখন বনী ইসরাঈলগণ সাগর পার হওয়ার পর তুর পর্বতের অনাবাদ অঞ্চলে অবস্থান করিতেছিল।

পূর্বালোচিত পণ্ডিত সাহেব স্বীয় তফসীরুল কোরআনে এস্থানেও কতকগুলি অপদার্থ অপব্যাখ্যার সমাবেশ করিয়াছেন। সরলপ্রাণ মুসলমান! শুধু এইতটুকু স্মরণ রাখিবেন যে, আমরা যে তাফসীর বর্ণনা করিয়াছি তাহা হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ছাহাবীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তফসীরকার ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে সমস্ত তফসীরের কিতাবে বর্ণিত রহিয়াছে। (তফসীর ইবনে কাসীর ১ম খণ্ড– ১০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

مُفْسِدِيْنَ ـ

একটি স্মরণীয় ঘটনা– মূসা পানীয় ব্যবস্থার দো'য়া করিলেন স্বীয় জাতির জন্য। আমি আদেশ করিলাম, তোমার লাঠিখানা পাথরটির উপর মার, ফলে সেই পাথর হইতে বারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হইল। তাহাদের বার গোত্রের প্রত্যেকে নিজ নিজ পানীয় স্থান নির্ধারিত করিয়া নিল। (আল্লাহ তাআলা সতর্ক করিয়া দিলেন), তোমরা আল্লার নেয়ামত– খাদ্য-পানীয় ভোগ কর, দুনিয়াতে ফাসাদ করিয়া বেড়াইও না।

(পারা– ১; রুকু– ৭)

খাদ্য ও ছায়ার ব্যবস্থা

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ـ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ـ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ـ

আর আমি মেঘমালাকে তোমাদের উপর ছায়াদানে নিয়োজিত করিলাম এবং (খাওয়ার জন্য) মান্ন ও বটের পাখি আমদানী করিলাম। (বলিয়াছিলাম,) তোমরা আমার নেয়ামত খাও (নাফরমানী করিও না; কিন্তু সেই অবস্থায়ও তাহারা নাফরমানী করিয়াছিল; নাফরমানী করায়) আমার কোন ক্ষতি করে নাই, বরং নিজেদেরই ক্ষতি করিয়াছে। (পারা– ১; রুকু– ৬)

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ـ وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اِذِ اسْتَسْقٰهُ قَوْمُهٗ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ـ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ـ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ـ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ـ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ـ

আল্লাহ তাআলা আরও বলিয়াছেন– আমি বনী ইসরাঈলকে ১২টি গোত্রে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম। (যদদ্বারা তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় ছিল)। যখন তাহারা মূসার নিকট পানীয়ের ব্যবস্থা চাহিল তখন আমি মূসার নিকট এই মর্মে অহী পাঠাইলাম যে, তুমি তোমার লাঠিকে ঐ পাথরটির উপর মার, ফলে ঐ পাথর হইতে বারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হইয়া পড়িল। প্রত্যেক গোত্রের লোকজন নিজ নিজ ঘাট নির্ধারিত করিয়া জানিয়া নিল। আরও আমি মেঘমালা দ্বারা তাহাদের ছায়া দিয়াছিলাম এবং খাদ্যের জন্য তাহাদের নিকট মান ও বটের পাখীর বিপুল সমাবেশ করিয়াছিলাম* আমি তাহাদিগকে বলিয়াছিল, তোমরা আমার প্রদত্ত এই উত্তম রেজেক খাও (এবং শোকরগুজারী কর, নাফরমানী করিও না, কিন্তু তাহারা নাফরমানী করিল), তাহারা আমার ক্ষতি করে নাই, নিজেদের ক্ষতি করিয়াছিল।

(সূরা আ'রাফ ঃ পারা– ৯;রুকু– ১০)

---

*"মান্ন" এক প্রকার বৃক্ষ হইতে নির্গত মিষ্ট খাদ্য বস্তু। ঐ অঞ্চলে উক্ত বৃক্ষ বিদ্যমান ছিল এবং লক্ষ লক্ষ বনী ইসরাঈলদের জন্য আল্লাহর বিশেষ কুদরতে তখন ঐ বৃক্ষসমূহ হইতে অসাধারণ পরিমাণে তাহা নির্গত হইতে লাগিল। কিম্বা ঐ জিনিস বৃক্ষ ব্যতিরেকে রাত্রি বেলা আল্লাহর কুদরতে আকাশ হইতে শিশিরের ন্যায় বর্ষিত হইয়া যমীনের উপর জমাট বাঁধিয়া থাকিত।

"সালওয়া" বটের পাখী ইহাও আল্লাহ তাআলার বিশেষ কুদরতে ঝাঁকে ঝাঁকে তথায় উড়িয়া আসিয়া সহজ সুলভরূপে বনী ইসরাঈলদের হস্তগত হইত।

আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি উপেক্ষা ও বেআদবী

আল্লাহ তাআলার অসীম দয়া ছিল যে, বনী ইসরাঈলদিগকে তাহাদের আযাব ভোগ অবস্থায় মান্না সালওয়ার ন্যায় নেয়ামত তাহাদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে দান করিতেছিলেন, কিন্তু তাহারা তাহা উপেক্ষা করিল। তাহারা হযরত মূসার নিকট দাবী জানাইল, আমরা সব সময় হালুয়া জাতীয় মিঠাখানা ও গোশ্ত খাইতে খাইতে খানার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি; আমাদের জন্য শাক-সব্জি, তরী-তরকারী খাদ্যের ব্যবস্থা করুন। তাহাদের এই দাবীতে মূসা (আঃ) অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন এবং আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মোতাবেক তাহাদিগকে কোন শহরে প্রবেশ করার পরামর্শ দিলেন। তীহ প্রান্তর এলাকায় দূর প্রান্তে কোন উপশহর ছিল। হযরত মূসা (আঃ) তাহাদিগকে তাহা প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। এই তথ্যসমূহের বিবরণ পবিত্র কোরআনে এই–

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ـ

হে বনী ইস্রাঈল! একটি স্মরণীয় ঘটনা– তোমরা বলিয়াছিলে, হে মূসা! আমরা কিছুতেই এক রকম খাদ্যের উপর ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে পারিব না। অতএব আপনি অপনার প্রভুর নিকট দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদের জন্য যমীনের উদ্ভিদজাত শাক-শব্জী, খিরা-কাঁকড়, গম-যব, ডাল-মটর, পেঁয়াজ-রসুনের ব্যবস্থা করিয়া দেন।

قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ ـ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ـ

মূসা (আঃ) বলিলেন, তোমরা কি উত্তম বস্তু পরিবর্তন করিয়া নিকৃষ্ট বস্তু চাহিতেছ? তবে তোমরা কোন শহরে অবতরণ কর, তথায় তোমাদের প্রস্তাবিত বস্তু পাইতে পারিবে। (সূরা বাকারাহঃ পারা–১; রুকু–৭)

তীহ-প্রান্তরে আবদ্ধ জীবন সমাপ্তির পর

বনী ইস্রাঈলগণ তীহ্-প্রান্তরে আবদ্ধ ছিল চল্লিশ বৎসরের জন্য এবং পুণ্য ভূমি তথা তাহাদের পৈতৃক দেশ শাম বা সিরিয়ায় তাহদের প্রবেশ ঐ চল্লিশ বৎসরের জন্য মুলতবী হইয়া গিয়াছি। যখন সেই চল্লিশ বৎসরের মেয়াদ শেষ হইল তখন পুনরায় তাহাদিগকে সেই পৈত্রিক দেশ দখল করার আদেশ করা হইল। ইতিপূর্বে তীহ প্রান্তরে অবস্থানকালেই হযরত মূসা ও হযরত হারুণের ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছিল এবং হযরত "ইউশা" নবী হইয়াছিলেন। এইবার বনী ইসরাঈলগণ হযরত ইউশার সঙ্গে থাকিয়া আমালেকা জাতির বিরুদ্ধে জেহাদ পরিচালনা করিল। ঐ দেশ জয় হইল; কিন্তু ঐ দেশের রাজধানী বাইতুল মোকাদ্দাস শহরে প্রবেশ করা সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা তাহাদিগকে কয়েকটি বিশেষ আদেশ দান করিলেন। দুর্ভাগ্যের কথা যে, বনী ইস্রাঈলগণ তাহাদের চিরাচরিত অভ্যাসের বশে সেই আদেশের বরখেলাফ করিল, ফলে তাহাদের উপর আল্লাহর গজব আসিল। এই সবের বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ–)

وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا ۔ وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ۔

স্মরণ কর, আমি আদেশ করিয়াছিলাম, তোমরা এই (শহর) এলাকায় প্রবেশ কর; অবাধে এই এলাকাকে তোমরা নিজেদের খাদ্যখাদক যোগাইতে ব্যবহার করিতে পারিবে। আর তোমাদের প্রতি নির্দেশ– শহরের প্রবেশদ্বার অতিক্রমকালে (আল্লাহর শোকরগুজারী ও তাঁহার প্রতি অগাধ আনুগত্য আত্মনিবেদনের স্বাক্ষরস্বরূপ) শির নত করিয়া উহা অতিক্রম করিবে, আর বলিবে, হে পরওয়ারদেগার! আমাদের সমস্ত গোনাহ-খাতা মাফ করিয়া দিন। (এই কাজ করিলে) আমি তোমাদের গোনাহ-খাতা মাফ করিয়া দিব এবং খাঁটি লোকদের অতিরিক্ত আরও দিব।

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ۔

ঐ স্বৈরাচারীরা আদেশকৃত কথার পরিবর্তে অন্য কথা বলিল। ফলে আমি যালেমদের উপর আসমান হইতে আযাব পাঠাইলাম; যেহেতু তাহারা আমার আদেশ লংঘন করিতেছিল।

(সূরা বাকারাহ ঃ পারা– ১, রুকু–৫)

১৬৪১। হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, বনী-ইসরাঈলগণকে আদেশ করা হইয়াছিল, (প্রস্তাবিত) শহরে প্রবেশ করাকালীন (নম্রতা ও আনুগত্যের নিদর্শনে) নতশিরে মাথা ঝুঁকাইয়া প্রবেশ করিবে এবং (নিজেদের ক্রটি-বিচ্যুতি ও গোনাহের ভয়ে ভীত হইয়া) মুখে বলিবে "হেত্তাতুন" হে খোদা! আমাদের গোনাহ মাফ করিয়া দাও। "কিন্তু তাহারা (এতই গোঁড়া ছিল যে, হয়ত ঐ সব আদেশ ও বিধি-বিধানকে মোল্লাদের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি সাব্যস্ত করিয়া পূর্ণামাত্রায় উহার বিরোধিতা করিল। এমনকি স্বেচ্ছায় শির নত করা ত দূরের কথা, শহরের প্রবেশদ্বার সঙ্কীর্ণ ও নীচ হওয়ায় শির নত হওয়ার বাধ্যতা এড়াইতে নিতম্বের উপর ভর করিয়া চলিল, তবুও শির নত হইতে দিল না। এবং আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন, "হেত্তাতুন অর্থাৎ ক্ষমা চাই" বলিতে; তাহারা উহার পরিবর্তে "হাব্বাতুন ফি-শা'রাতিন" (বা "হেন্তাতুন" অর্থাৎ খাওয়ার জন্য) "যবের দানা (বা গম ইত্যাদি তথা ডাল-ভাতের ব্যবস্থা) চাই" বলিল।*

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ বনী ইসরাঈলরা আল্লাহ তা'আলার আদেশাবলীর এরূপ চরম বিরোধিতা করায় তাহাদের উপর প্লেগের মহামারী ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

পাঠক! বনী ইসরাঈলরা গোঁড়া প্রকৃতির অবাধ্য স্বভাবের ত ছিলই, তদুপরি পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ থাকিয়া বিজাতীয় প্রভাবে তাহাদের অন্তঃকরণ বিকৃত হইয়া গিয়াছিল– আল্লাহ ও রসূলের প্রতি অগাধ

* আল্লাহ তা'আলার আদেশের বিপরীত এইরূপ চুলে-চুলে ও অক্ষরে-অক্ষরে নাফরমানী করা বড়ই আশ্চর্যজনক মনে হয়। কিন্তু জাতির মধ্যে যখন আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ উপেক্ষা করার প্রবণতা ব্যাপক হইয়া পড়ে তখন চুলে-চুলে, অক্ষরে-অক্ষরে আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধের বিপরীত চলা অতি সাধারণ ও স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। বর্তমান মুসলিম জাতির অবস্থা দেখিলে ঐরূপ নাফরমানীর অনেক নমুনাই নজরে পড়িবে। যথা– শরীয়তের আদেশ দাড়ি বেশী করিয়া রাখ এবং মোছ ফেলিয়া দাও, জাতি ইহার বিপরীত চলিয়াছে– দাড়ি ফেলিয়া দাও, মোছ রাখ। মোছ সম্পর্কে হুকুম এই যে, উভয় পার্শ্ব রাখিলেও নাক বরাবর অব্যশই ফেলিবে; জাতি ইহার বিপরীত চলিয়াছে– উভয় পার্শ্ব ফেলিয়া নাক বরাবর রাখিয়া দিবে। তদ্রূপ শরীয়তের বিশেষ অলজ্ঘনীয় আদেশ, পরিধেয় বস্ত্র এত লম্বা পরিবে না যে, পায়ের গিঁটের নীচে চলিয়া যায় এবং এত খাট পরিবে না যে, হাঁটুর উপরে উঠে। জাতির ফ্যাশন হইল– লম্বা পরিলে এত লম্বা যে, পায়ের গিঁটের নীচে অবশ্যই যাওয়া চাই এবং খাট পরিলে হাঁটুর উপরে হাফপ্যান্ট পরিবে। হাঁটু হইতে পায়ের গিঁট পর্যন্ত এক হাত পরিমাণ জায়গা রহিয়াছে; ইহার মধ্যে ফ্যাশনের স্থান হয় নাই; ফ্যাশন রহিয়াছে উহার চার আঙ্গুল নীচে তথা গিঁটের নীচে, অথবা চার আঙ্গুল উপর তথা হাঁটুর উপরে। আমাদের এই অবস্থা কি বনী ইসরাঈলদের গোঁড়ামির তুলনায় কম ?

আনুগত্য, পূর্ণ শ্রদ্ধা ও নম্রতা তাহাদের অন্তর হইতে মুছিয়া গিয়াছিল– যাহার ফলে তাহাদের দুর্ভোগও অনেকই ভুগিতে হইয়াছিল। পূর্বালোচিত ধারাবাহিক ঘটনাবলীতে তাহাদের ঐ স্বভাবের অনেক নজির পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের ঐ স্বভাবের পরিচায়ক আরও দুইটি ঘটনা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে।

গরু জবাই করার ঘটনা

কোন এক সময়ের ঘটনা– বনী-ইসরাঈলদের মধ্যে একটি গুপ্ত খুন হইয়াছিল। নিহত ব্যক্তি নিঃসন্তান ছিল, তাহার অগাধ ধন-সম্পত্তি ছিল এবং তাহার একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিল এক ভাতিজা। যথাসত্বর উত্তরাধিকার লাভ করার জন্য ঐ ভাতিজা তাহাকে গোপনে খুন করিয়া পার্শ্ববর্তী অন্য এক গ্রামে লাশ রাখিয়া আসিয়াছিল এবং ঐ গ্রামবাসীদের উপরই খুনের দোষ চাপাইল। ফলে তাহাদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইল যাহার মীমাংসার কোন পথ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছিল না। তাহারা এই ঘটনা হযরত মূসার দরবারে পেশ করিল। মূসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার নির্দেশে তাহাদিগকে বলিলেন, একটা গরু জবাই করিয়া উহার কোন একটি অংশ কাটিয়া নিহত ব্যক্তির শরীর স্পর্শ করিলেই নিহত ব্যক্তি মুহূর্তের জন্য জীবিত হইয়া হত্যাকারীর নাম বলিয়া দিবে।

বনী ইসরাঈলগণ গরু জবাই করা সম্পর্কে কেলেঙ্কারির পথ অবলম্বন করিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা করা হইল এবং হযরত মূসার আদেশানুসারে কার্য করার ফলে নিহত ব্যক্তি জীবিত হইয়া হত্যাকারীর নাম প্রকাশ করিয়া দিল।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া বিশ্ববাসীর জন্য এই ঘটনাকে একটি বিশেষ নজিররূপে তুলিয়া ধরিয়া বলিয়াছেন, "এই ঘটনাটি মৃতকে পুনর্জীবিত করার একটি নজির– এইরূপেই আদি-অন্তের সমস্ত মৃতগণকে আল্লাহ তাআলা জীবিত করিয়া তুলিবেন। তিনি ইহজগতে স্বীয় কুদরতের দুই এটা নজির-নমুনা দেখাইয়া থাকেন, যেন তোমরা ইহার দ্বারা পরকালে পুনঃ জীবিত হওয়াকে বুঝিতে পার।"

وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ - فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ -

স্মরণীয় ঘটনা– তোমরা একটি মানুষকে গোপনে হত্যা করিয়া পরস্পরকে দোষারোপ করিতেছিলে; এদিকে আল্লাহর ইচ্ছা হইল তোমাদের গোপন তথ্য প্রকাশ করিয়া দেওয়া। সুতরাং আমি (আল্লাহ) আদেশ করিলাম, একটি (জবাই করা) গরুর কোন অংশের দ্বারা নিহত ব্যক্তিকে স্পর্শ কর (সে জীবিত হইয়া ঘটনা বলিয়া দিবে)। এইরূপেই আল্লাহ মৃতগণকে জীবিত করিবেন। আর আল্লাহ তোমাদিগকে দেখাইয়া থাকেন স্বীয় কুদরতের নিদর্শনসমূহ, যেন তোমরা উপলব্ধি করিতে পার।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖٓ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً - قَالُوْٓا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا - قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ -

স্মরণ কর, মূসা (আঃ) বলিয়াছিলেন, স্বীয় জাতিকে (ঐ হত্যাকান্ডের তথ্য জানিবার জন্য) আল্লাহ তা'আলার আদেশ এই যে, তোমরা একটি গরু জবাই কর। তাহারা বলিল, আপনি কি আমাদের সঙ্গে বিদ্রূপ করিতেছেন? মূসা বলিলেন, আমি আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করি অজ্ঞের ন্যায় কাজ করা (তথা আল্লাহর নামে কথা বলিয়া বিদ্রূপ করা) হইতে।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ - لَا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذٰلِكَ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ - قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا - قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ

তাহারা বলিল, হে মূসা! আপনার প্রভুর নিকট দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদিগকে বলিয়া দেন ঐ গরুটা কি বয়সের হইবে। মূসা বলিলেন, আল্লাহ বলিতেছেন, গরুটা বুড়া বা কম বয়সের জওয়ান হইলে চলিবে না– মধ্যবর্তী বয়সের হইতে হইবে। (অধিক প্রশ্ন না করিয়া) আদিষ্ট কার্য সম্পন্ন করিয়া নাও। (কিন্তু গড়িমসির ভাব ধরিয়া) তাহারা বলিল, আপনার প্রভুর নিকট দোয়া করুন যেন আমাদিগকে বলিয়া দেন, গরুটা কি রঙ্গের হওয়া চাই। মূসা (আঃ) বলিলেন, আল্লাহ বলিতেছেন, গরুটা হলুদ হইবে– খুব গাঢ় হলুদ, দেখিতে সুন্দর।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ اِنَّ الْبَقَرَةَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا ـ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ ـ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْاَرْضَ وَلَا تَسْقِى الْحَرْثَ ـ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيْهَا قَالُوا الْئٰنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ـ فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ـ

তাহারা বলিল, আপনার প্রভুর নিকট দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদের বলিয়া দেন গরুটা কি ধরনের হইবে? গরুটা ত আমাদের পক্ষে অনির্দিষ্ট রহিয়া গিয়াছে। এইবারে আমরা ইন্‌শা আল্লাহ উহাকে চিনিয়া লইতে পারিব। মূসা বলিলেন, আল্লাহ বলিতেছেন, গরুটা এইরূপ হইবে যে, জমি চাষ করে নাই এবং জমিনে পানিও দেয় নাই, তদুপরি সব রকম দোষমুক্ত হইতে হইবে এবং উহার সর্বশরীর এক রঙ্গের হইতে হইবে। তাহারা বলিল, এইবার আপনি পূর্ণ বিবরণ আনিয়াছেন। অতপর তাহারা ঐরূপ গরু জবাই করিল। (তাহাদের প্রশ্নোত্তরে এমন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল যে,) মনে হইতেছিল না তাহারা উহা সামাধা করিতে পারিবে। (পার– ১, রুকু– ৮)

* উল্লিখিত বিভিন্ন প্রশ্ন বস্তুতঃ বনী-ইসরাঈলদের গোঁড়ামীর প্রতিফলন ছিল; নতুবা হযরত মূসার উক্তি সুস্পষ্ট ছিল। যেকোন বয়সের ও রঙ্গের যে কোন একটি গরু জবাই করিলেই আদেশ পালন হইয়া যাইত। কিন্তু নবীর আদেশ পালনে টালবাহানা করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল; খাট বিষয়কে দীর্ঘায়িত করিয়া গা বাঁচাইবার বাহানা তাহারা খুঁজিতেছিল।

আল্লাহ তাআলাও তাহাদের শায়েস্তা করার জন্য প্রত্যেক প্রশ্নের উপর এক এক শর্ত আরোপে গরুটিকে এমন পর্যায়ে পৌঁছাইলেন যে, উহা পাওয়াই কঠিন হইয়া পড়িল। অবশেষে বহু পরিশ্রম ও অগাধ ধন ব্যয়ে উহা লাভ করা গেল। প্রশ্ন উত্থাপন না করিলে একটি সাধারণ গরু দ্বারাই উদ্দেশ্য সফল হইত। হযরত মূসার প্রথম উক্তির মর্ম তাহাই ছিল।

হযরত মূসার প্রতি অপবাদ

বনী-ইসরাঈলরা বড় গোঁড়া ছিল; তাহারা অতি সামান্য ব্যাপার লইয়াও পয়গম্বরের প্রতি পর্যন্ত অপবাদ রটাইতে কুণ্ঠিত হইত না। কোন এক সময়ের ঘটনা– বনী-ইসরাঈলদের একটি বর্বরতা এই ছিল যে, তাহারা প্রকাশ্যে উলঙ্গ হইয়া গোসল করিত। মূসা (আঃ) ঐরূপ করিতেন না, তিনি পূর্ণ পর্দার মধ্যে গোসল করিতেন। হযরত মূসার এই আবশ্যকীয় কার্যকে ভিত্তি করিয়া তাহার অপবাদ রটাইল যে, মূসার শরীরের গোপন অংশে কোন ঘৃণিত রোগ আছে; সেই জন্যই সে অন্যের সম্মুখে উহা খুলিতে সঙ্কোচ বোধ করেন। এই পন্থায় তাহারা হযরত মূসাকে লোক সমক্ষে হেয় করার চেষ্টা করিল এবং তাঁহার প্রতি লোকদের ঘৃণা সৃষ্টি করিয়া জনগণকে তাঁহার হইতে বিচ্ছিন্ন রাখার ফন্দি করিল।

মূসার মাধ্যমে লোকদের মধ্যে হেদায়াত প্রচারের ব্যাপারে উক্ত ঘটনা বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিল। ঐ অপবাদটি এক প্রকার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আকার ধারণ করিয়া বসিল। সুতরাং দয়াময় আল্লাহ তাআলা সাধারণ বান্দাদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাহাদের হেদায়াতপ্রাপ্তির পথ হইতে ঐ কন্টক দূরীভূত করারও ব্যবস্থা

করিলেন; হেদায়াত লাভ করিতে পয়গম্বরের শরণাপন্ন না হওয়ার পক্ষে যেন কাহারও জন্য কোন অজুহাতের অবকাশ বাকী না থাকে।

একদা মূসা (আঃ) নির্জনে গোপন স্থানে একটি পাথরের উপর স্বীয় কাপড় রাখিয়া গোসল করিতেছিলেন। অকস্মাৎ ঐ পাথরটি তাঁহার কাপড় লইয়া ছুটিয়া চলিল। মূসা (আঃ) তাড়াহুড়া ও ব্যতি-ব্যস্ততার মধ্যে পাথরের এই ঘটনায় স্তম্ভিত অবস্থায় কাপড় উদ্ধারের জন্য উহার পিছনে দৌড়াইলেন। আল্লাহর এমনই কুদরত যে, নিজের বস্ত্রহীন অবস্থার প্রতি হযরত মূসার লক্ষ্য রহিল না। পাথরটি সোজাসুজি একদল অপবাদকারী বনী-ইসরাঈলের সম্মুখে আসিয়া থামিল। মূসাও উহার পিছনে পিছনে দৌড়াইয়া তাহাদের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং পাথর হইতে স্বীয় কাপড় উঠাইয়া পরিধান করিলেন। আল্লাহ্র কুদরতের লীলায় আকস্মিক ঘটনার মাধ্যমে অপবাদকারীদের মিথ্যা প্রকাশিত হইয়া গেল।

বাস্তবিকই রহমানুর রহীম আল্লাহ তাআলা কত দয়ালু দয়াময় যে, স্বীয় বান্দাদের হেদায়াত প্রাপ্তির জন্য কত ছোট ছোট প্রতিবন্ধকতা দূর করার প্রতিও কিরূপে বিশেষ দৃষ্টি দান করিয়া থাকেন। এই ঘটনা তাহারই একটি নজির। পবিত্র কোরআনেও এই ঘটনার ইঙ্গিত রহিয়াছে। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا وكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ـ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাহাদের মত হইও না যাহারা মূসাকে মর্মাহত করিয়াছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তাঁহাকে তাহাদের অপবাদ হইতে অব্যাহতি দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আর মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট অতি বড় উচ্চ মর্যদাসম্পন্ন ছিলেন।

১৬৪২। হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, হযরত মূসা (আঃ) অতিশয় হায়াদার-লজ্জাশীল ছিলেন; স্বীয় শরীর সর্বদা সম্পূর্ণ আবৃত রাখিতেন– তাঁহার শরীর খোলা অবস্থায় কেহ দেখিতে পারিত না; তহাতে তিনি লজ্জাবোধ করিতেন।

এই ব্যাপারটিকে ভিত্তি করিয়া বনী-ইসরাঈলদের একদল লোক হযরত মূসাকে কষ্ট দিল– তাহারা এই অপবাদ রটাইল যে, মূসার শরীরে নিশ্চয় কোন আয়েব বা গোপন দোষ আছে, তাই তিনি স্বীয় শরীরকে ঢাকিয়া রাখায় বিশেষ তৎপর। (তাহারা হযরত মূসা (আঃ) সম্পর্কে অপবাদ রটাইয়াছিল যে, তাঁহার গুপ্ত শরীরাংশে শ্বেত রোগ কিংবা একশিরা বা কোড়লের রোগ অথবা অন্য কোন ঘৃণিত রোগ আছে)।

আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হইল স্বীয় রসূল মূসা সম্পর্কে এই অপবাদ মুছিয়া দিবেন। হযরত মূসা একদিন একাকী নির্জন স্থানে স্বীয় কাপড়-চোপড় একটি পাথরের উপর রাখিলেন এবং গোসল করা আরম্ভ করিলেন। গোসল শেষ করিয়া যখন ঐ কাপড় লইবার জন্য অগ্রসর হইলেন, তখন ঐ পাথর তাঁহার কাপড় লইয়া ছুটিয়া চলিল। হযরত মূসা (আঃ) সত্বর স্বীয় লাঠি হাতে লইয়া পাথরকে ধাওয়া করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, হে পাথর আমার কাপড়! হে পাথর আমার কাপড়! এমনকি (আশ্চর্যজনক পরিস্থিতি ও অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ততার মধ্যে তাঁহার লক্ষ্য একমাত্র পাথর ও কাপড়ের প্রতি নিবদ্ধ হইয়া গেল; বস্ত্রহীন হওয়ার খেয়াল রহিল না।) ঐ পাথর দৌড়িয়া বন-ইসরাঈলদের একটি মজলিসে আসিয়া থামিল; মূসা (আঃ) ও তথায় পৌঁছিলেন এবং তাড়াতাড়ি কাপড় লইলেন। মুহূর্তের জন্য উপস্থিত লোকগণ তাঁহাকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখিয়া ফেলিল এবং তাহাদের সাক্ষ্যে প্রমাণিত হইয়া গেল যে, হযরত মূসার শরীর আল্লাহপ্রদত্ত সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ এবং সব রকম দোষমুক্ত।

হযরত মূসা যথাসত্বর কাপড় পরিয়া স্বীয় লাঠি দ্বারা পাথরকে আঘাত করিতে লাগিলেন, ফলে পাথরের গায়ে আঘাতের ৪/৫ টা রেখা পড়িয়া গেল। এই ঘটনাই হইল এই আয়াতের উদ্দেশ্য– (আয়াতটি উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে)।

১৬৪৩। হাদীছ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন এক উপলক্ষে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কিছু চিজ-বস্তু কতিপয় লোকের মধ্যে বন্টন করিলেন। সেই বন্টন উপলক্ষ করিয়া এক (মোনাফেক) ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, এই বন্টন কার্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছা করা হয় নাই (নিজ স্বার্থের প্রতি লক্ষ রাখা হইয়াছে)।

আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, আমি ঐ ব্যক্তির এইরূপ উক্তি শুনিতে পাইয়া তাহা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট প্রকাশ করিয়া দিলাম। হযরত (সঃ) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন, এমনকি তাঁহার চেহারার উপর অসন্তুষ্টির ভাব পরিলক্ষিত হইল। অতপর তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ মূসাকে বিশেষ বিশেষ রহমত দান করুন; তাঁহাকে ত আরও অধিক কষ্ট দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তিনি ধৈর্যধারণ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীছে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সর্বশেষ উক্তিটি আলোচ্য ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত ছিল।

কারুনের ঘটনা

দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ধনপতি এবং সর্বপ্রসিদ্ধ কৃপণ "কারুন" বনী-ইসরাঈল বংশধর এবং হযরত মূসারই চাচাত ভাই ছিল। ফেরাউনের আমলে বনী-ইসরাঈলদেরকে শোষণ করার জন্য ফেরআউন তাহাদের স্বজাতীয় কারুনকে তাহাদের উপর শোষণের ঠিকাদার নিযুক্ত করিয়াছিল। হযরত মূসার আবির্ভাবে ফেরআউন ধ্বংস হইল, বনী-ইসরাঈলগণ হযরত মূসার আশ্রয় পাইল। ফলে কারুনের আয়-আমদানীর পথ রুদ্ধ হইয়া গেল, তাহার প্রভাব-প্রতিপত্তি স্তিমিত হইয়া আসিল। এই আক্রোশে হযরত মূসার প্রতি তাহার অন্তরে শত্রুতা জন্মিল, কিন্তু মোনাফেকীর সহিত ঈমান প্রকাশ করিয়া সে ভক্ত সাজিয়া থাকিল। হযরত মূসার সম্মান ও প্রাধান্য বৃদ্ধিতে কারুনের অন্তর-অগ্নিও বৃদ্ধি পাইতেছিল। সময় সময় সে ধন-দৌলতের গরিমা দেখাইয়া স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাকল্পে জাঁকজমকের প্রদর্শনী করিয়াও ব্যর্থ হইত। মূসা (আঃ) তাহাকে শরীয়তের হুকুম-আহকামের প্রতি আহবান করায়, বিশেষতঃ যাকাতের হুকুম এবং আল্লাহর রাস্তায় ধন ব্যয় করার আদেশে হযরত মূসার প্রতি তাহার চরম শত্রুতার সৃষ্টি হইল। সে হযরত মূসাকে কলঙ্কিত করার এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করিল। এক নারীকে ধন-দৌলতের লালসা দেখাইয়া সম্মত করিল যে, সে কোন জনসভার মধ্যে সর্বসমক্ষে হযরত মূসার প্রতি ব্যভিচারের মিথ্যা তোহ্‌মত লাগাইবে। সেমতে একদিন মূসা (আঃ) এক জনসভায় ওয়াজ-নসিহত ফরমাইতেছিলেন, কারুন ঐ নারীটিকে তথায় উপস্থিত করিয়া তাহার দুশ্চক্রান্ত সিদ্ধ করার ব্যবস্থা করিল। ঐ নারী হযরত মূসার প্রতি অপবাদ লাগাইল। মূসা (আঃ) ঐ নারীকে আল্লাহর গজবের ভয় দেখাইয়া কসম খাইতে বলিলেন, ঐ নারীটি ভয় পাইয়া তাহার দাবী যে মিথ্যা তাহা স্বীকার করিল এবং কারুনের চক্রান্ত ফাঁস করিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়া দিল।

ঘটনা শ্রবণে ভীষণ জালালী তবিয়তের আজিমুশশান জলীলুল কদর পয়গাম্বর হযরত মূসা (আঃ) ভাবিলেন, এইরূপ ঘটনার দ্বারা তাঁহার প্রতি সর্বসাধারণের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইতে পারে উহা তাহাদের পক্ষে ভীষণ মারাত্মক এবং তাহাদের হেদায়াতের পথ রুদ্ধকারী হইবে। সুতরাং তাঁহার ক্রোধের সীমা রহিল না। এমনকি হযরত মূসা ঐরূপ কুচক্রী কারুনের প্রতি বদ দোয়া করিলেন। ফলে আল্লাহ তাহাকে তাহার ধন-দৌলত ও বাড়ী-ঘরসহ যমিনে ধসাইয়া দিলেন। পবিত্র কোরআনেও কারুনের এই ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে–

اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ ـ وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَا اِنَّ مَفَاتِحَهٗ
لَتَنُوْاُ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ ـ اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ـ وَابْتَغِ

فِيْمَا اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ـ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ـ

নিশ্চয় কারুন মূসার জাতির একজন ছিল; সে অহঙ্কার ও গর্বে তাহাদের উপর গরিমা ও প্রাবল্য দেখাইত। আর আমি তাহাকে এত অধিক ধন-ভাণ্ডার দান করিয়াছিলাম যে, যাহার চাবিসমূহ শক্তিশালী লোকের একটা দল অতি কষ্টে উঠাইতে পারিত। ঐ ঘটনাটি স্মরণীয়, যখন কারুনের জাতি কারুনকে বলিল, তুমি অহঙ্কার করিও না। আল্লাহ প্রদত্ত ধন-দৌলত দ্বারা আখেরাতের জগতে শান্তি লাভের ব্যবস্থা কর এবং দুনিয়ার ধন-দৌলত হইতে আখেরাতের জন্য স্বীয় অংশ লইয়া যাওয়ার কথাও ভুলিও না। আর আল্লাহ ধন-দৌলত দ্বারা তোমার উপকার করিয়াছেন, তদ্রূপ তুমিও আল্লাহর বান্দাদের উপকার কর, দেশে বিপর্যয় ও অশান্তি ঘটাইও না; নিশ্চয় জানিও– আল্লাহ তাআলা ফাছাদকারীদের পছন্দ করেন না।

قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ ـ اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّاَكْثَرُ جَمْعًا ـ وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ـ

কারুন বলিল, (আমার প্রতি আল্লাহর কি উপকার!) ধন-দৌলত ত আমার নিজস্ব জ্ঞান-গুণের দ্বারা লাভ হইয়াছে! (আল্লাহ বলেন, সে এত বড় দম্ভের কথা বলিল! তাহার ভয় হইল না?) সে কি জানে না, আল্লাহ তাহার পূর্বে অনেককে ধ্বংস করিয়াছেন যাহারা তাহার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, অধিক ধন-জনের অধকারী ছিল? আর (আখেরাতে ত আযাব আছেই। আল্লাহ তাহাদের সব অপরাধ জ্ঞাত আছেন;) অপরাধীদের অপরাধ জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হইবে না।

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِىْ زِيْنَتِهٖ ـ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوْتِىَ قَارُوْنَ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ـ وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ـ وَلَا يُلَقّٰهَا اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ ـ

(এক দিনের ঘটনা–) কারুন বিশেষ সাজ-সজ্জা ও জাঁকজমকের সহিত তাহার জাতির দৃষ্টি আকর্ষণে বাহির হইল। যাহারা দুনিয়াভিলাষী ছিল তাহারা বলিতে লাগিল, হায়! যদি কারুনের ন্যায় ধন-দৌলত আমাদেরও হইত! বাস্তবিকই কারুন বড় ভাগ্যবান। পক্ষান্তরে তাহারা ঐ লোকগুলিকে বুঝাইয়া বলিল যাহারা ছিল প্রকৃত জ্ঞানী– তোমরা কি সর্বনাশের কথা বলিতেছ! জানিয়া রাখিও, যে ব্যক্তির ঈমান ও নেক আমল আছে তাহার পক্ষে আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিফল (কারূনের ধন–সম্পদ অপেক্ষা বহুগুণে) উত্তম হইবে অবশ্য ঐ প্রতিফল একমাত্র তাহারাই লাভ করিবে যাহারা (স্বীয় মাবুদের সন্তুষ্টির-পথে স্থির, দৃঢ়পদ ও) ধৈর্যধারণকারী হইবে।

فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ـ وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ ـ لَوْلَا اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ـ

অতপর আমি আল্লাহ কারুনকে তাহার মহলসহ যমিনে ধসাইয়া দিলাম। কোন দল খাড়া হইল না যাহারা আল্লাহর মোকাবিলায় তাহার সাহায্য করিতে পারে। আর সে নিজেও জান বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিতে

পারিল না। ইতিপূর্বে যাহারা কারুনের ন্যায় হওয়ার আরজ-আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল, আজ তাহারা বলিতে লাগিল, বাস্তবিকই (ধন-দৌলতের আধিক্য ভাগ্যবান হওয়ার প্রমাণ নহে, ধন-দৌলতের ব্যাপারটা শুধুমাত্র আল্লাহর ইচ্ছার উপর ন্যস্ত,) আল্লাহ (তাঁহার হেকমতে) স্বীয় বান্দাদের মধ্য হইতে যাহার পক্ষে ইচ্ছা করেন রিযিক প্রশস্ত করেন, যাহার পক্ষে ইচ্ছা করেন সঙ্কীর্ণ করিয়া দেন। (তাহারা আরও বলিল,) যদি আল্লাহর করুণা আমাদের প্রতি না হইত, তবে নিশ্চয় আমাদিগকেও (কারূনের সঙ্গে) ধসাইয়া দিতেন; (আমরা কারুনকে ভাগ্যবান মনে করায় অপরাধী ছিলাম। এখন বুঝিতে পারিলাম,) বাস্তবিকই শেষ পরিণামে কাফেরদের সফলতা লাভ হয় না। (সূরা কাসাস-পারা ২০, রুকু ১১)

হযরত মূসা ও হযরত খিজিরের ঘটনা

এই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ সম্বলিত সুদীর্ঘ হাদীছ প্রথম খন্ডে ৯৭নং হাদীছরূপে অনূদিত হইয়াছে। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র কোরআনেও ১৫-১৬ পারায় উল্লেখ আছে। যাহার তফসীর উল্লিখিত হাদীছের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

১৬৪৪। হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "খাজের"কে খাজের নামে আখ্যায়িত করার সূত্র এই ছিল যে, তিনি একদিন ঘাস-পাতাবিহীন এক স্থানে বসিয়াছিলেন, হঠাৎ ঐ স্থানটি সবুজ লক-লকে ঘাসে আচ্ছাদিত হইয়া গেল।

ব্যাখ্যা ঃ আরবী ভাষায় খাজরা শব্দের অর্থ "সবুজ"। এই ধাতু হইতেই "খাজের" শব্দ গৃহীত। আরবী ব্যাকরণ সূত্রে শব্দটি "খাজের" হওয়াই অবধারিত; অবশ্য সাধারণ প্রচলন সূত্রে "খিজির" বলাকেও শুদ্ধ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

হযরত খিজিরের আসল নাম "বাল্ইয়া।" তিনি কোন্ সময় হইতে দুনিয়াতে আছেন সে সম্পর্কে কাহারও মত এই যে, ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের সময় হইতে তাঁহার আবির্ভাব। দুনিয়াতে কতদিন ছিলেন বা এখনও আছেন কিনা এ সম্পর্কে বহু মতভেদ আছে। তিনি নবী বা রসূল কিনা– সে সম্পর্কেও মতানৈক্য রহিয়াছে। অবশ্য কোরআন-হাদীছদৃষ্টে এতটুকু অবধারিত যে, তিনি আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভকারী একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। সৃষ্ট জগতের গুপ্ত রহস্যের বহু তথ্য-জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে দান করিয়াছেন।

হযরত রসূলুল্লাহর সঙ্গে মূসার মোলাকাত

রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মে'রাজে গিয়াছিলেন তখন বিশিষ্ট রসূলগণের মধ্যে হযরত মূসা এবং হযরত হারুনের সঙ্গেও তাঁহার মোলাকাত হইয়াছিল।

হযরত হারুনের সঙ্গে পঞ্চম আসমানে মোলাকাত হইয়াছিল বলিয়া বোখারী শরীফে উল্লেখ আছে। হযরত মূসার সঙ্গে ষষ্ঠ আসমানে মোলাকাত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। ইহাও উল্লেখ আছে যে, প্রত্যাবর্তনকালে পুনঃ হযরত মূসার সঙ্গে মোলাকাত হইয়াছিল। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় উম্মতের জন্য দিবারাত্রে পঞ্চাশ ওয়াক্ত ফরয নামাযের হুকুম লইয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, কিন্তু হযরত মূসার পুনঃ পুনঃ অনুরোধে নয় বার আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থিত হইয়া পাঁচ পাঁচ ওয়াক্ত কম করিতে করিতে সর্বশেষ আল্লাহ তাআলা পাঁচ ওয়াক্ত মোকাররার করিয়া দেন। কিন্তু এই পাঁচ ওয়াক্তের মধ্যেই পঞ্চাশ ওয়াক্তের সওয়াব দানের ঘোষণা দ্বারা পঞ্চাশের তাৎপর্য বজায় রাখেন। বিস্তারিত বিবরণের হাদীছ পঞ্চম খন্ডে মে'রাজ শরীফের বয়ানে উল্লেখ হইবে।

১৬৬৫। হাদীছ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের আকৃতি অনুমান করিতে তোমরা তোমাদের পয়গম্বরের (তথা আমার) প্রতি দৃষ্টি কর। আর মূসা (আঃ) ছিলেন বাদামী বর্ণের, তাঁহার দেহের মাংস জমাট বাঁধা, খুব মজবুত ছিল। একটি লাল উট যাহার নাকের দড়ি খেজুর গাছের ছোবড়ার তৈয়ারী, উহার উপর আরোহণ করিয়া তিনি হজ্জের সফর করিয়াছিলেন। তখন পর্বত পথ অতিক্রমে নিচের দিকে অবতরণকালে তিনি যে, হজ্জের তলবিয়া ও তকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া যাইতেছিলেন সেই দৃশ্য আমি যেন এখনও দেখিতেছি। (পৃষ্ঠা-৪৭৩)

ব্যাখ্যা ঃ ইহুদীদের কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাস, মুসলমানদের কেবলা কা'বা শরীফ। কা'বা শরীফ শ্রেষ্ঠ, হজ্জ চিরকাল কা'বা শরীফেই হইয়াছে; সমস্ত নবীগণ কা'বা শরীফেই হজ্জ করিয়াছেন। ইহুদীরা মুসলমানদের কেবলার এই বৈশিষ্ট্য খন্ডনে মিথ্যা দাবী করিত যে, তাহাদের নবী মূসা (আঃ) হজ্জ করেন নাই। তাহাদের এই দাবী মিথ্যা প্রমাণিত করিতে হযরত মূসা (আঃ) কর্তৃক হজ্জের তলবিয়া পড়িতে কা'বা শরীফের দিকে আসিবার অতীত দৃশ্য আল্লাহ তাআলা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বিশেষ কুদরতে অবলোকন করাইয়াছেন। আলোচ্য হাদীছে হযরত (সঃ) তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। যেরূপ ৬৯৭ নং হাদীছে হযরত (সঃ) মূসা আলাইসিস সালামের সমাধির বর্ণনাও এইভাবে দিয়াছেন।

হাশরের মাঠে হযরত মূসা

হাশরের মাঠে হিসাব আরম্ভ হইবার পূর্বে হাশর মাঠের বিভীষিকাপূর্ণ অবস্থায় যখন মানুষ অস্থির হইয়া পড়িবে এবং বিভিন্ন পয়গম্বরগণের খেদমতে উপস্থিত হইয়া সুপারিশ কামনা করিবে, তখন ইব্রাহীম (আঃ) তাহাদিগকে হযরত মূসার নিকট উপস্থিত হওয়ার পরামর্শ দিবেন। সকলে হযরত মূসার নিকট উপস্থি হইয়া বলিবে, হে আল্লাহর রসূল মূসা! আপনাকে আল্লাহ তাআলা রসূল বানাইয়া অতঃপর আপনার সঙ্গে কালাম করিয়া আপনাকে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী করিয়াছিলেন; আপনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমাদের জন্য সুপরিশ করুন। তখন তিনি মিসরে অবস্থানকালে এক কিব্‌তীকে মারিয়া ফেলার অপরাধ উল্লেখ করিয়া স্বীয় ভয়-ভীতি প্রকাশ করতঃ তাহাদিগকে হযরত ঈসার নিকট উপস্থিত হওয়ার পরামর্শ দিবেন। এই সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের হাদীছ ইনশা আল্লাহ তা'আলা হাশরের বিবরণে উল্লেখ হইবে।

হযরত শোআ'য়ব (আঃ)

শোআ'য়ব আলাইহিস সালামের আবির্ভাবকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিক এবং মোফাসেসর ও মোহাদ্দেছগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। একজন লেখকের বয়ান মতে দেখা যায়, হযরত শোআ'য়বের আবির্ভাব হযরত মূসার আবির্ভাবকালের অনেক পরে, প্রায় ৭০০ বৎসরের ব্যবধানে।

(কাছাছুল কোরআন ১-৩৩৫)।

আবার অনেকের মত উহার সম্পূর্ণ বিপরীত তাঁহারা বলেন, হযরত শোআ'য়েবের আবির্ভাব হযরত মূসার অনেক পূর্বে ছিল হযরত লূত আলাইহিস সালামের নিকটবর্তীকালে কাছাছুল কোরআন ১-৩৩৫)।

এই মতামতদ্বয় সূত্রে ইহা সুস্পষ্ট যে, মূসা (আঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে মিসর দেশে একটি হত্যাকান্ডের আসামী হইয়া মিসর ত্যাগ করত "মাদইয়ান" অঞ্চলে উপস্থিত হইবার পর যে বৃদ্ধের ঘরে আশ্রয় পাইয়াছিলেন এবং অবশেষে সেই বৃদ্ধ হযরত মূসার শ্বশুর হইয়াছিলেন– সেই বৃদ্ধ হযরত শোআ'য়ব নহেন; অন্য কোন ব্যক্তি ছিলেন। পবিত্র কোরআনে উক্ত ঘটনার উল্লেখ আছে, যাহার বিস্তারিত বিবরণ হযরত মূসার বয়ানে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু কোরআনে সেই লোকটির নাম ও পরিচয় প্রকাশ করা হয় নাই। হাদীছ ভান্ডারেও কোন বিবরণ আসে নাই। পবিত্র কোরআনে তাঁহাকে শুধু شَيْخٌ كَبِيْرٌ "শায়খুন-কবীর" তথা অধিক বয়সের বৃদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

বিশিষ্ট তফসীরকার ইবনে কাসীর ও ইবনে জরীর এই ব্যক্তি সম্পর্কে নির্দিষ্টরূপে কিছু বলা হইতে বিরত থাকার পথ অবলম্বন করিয়াছেন। অনেকে দৃঢ়তার সহিতই বলিয়াছেন যে, এই ব্যক্তি হ্যরত শোআ'য়ব (আঃ) ছিলেন। হাসান বসরী (রঃ), ইমাম মালেক (রঃ) প্রমুখ আলেমগণের মত এবং সাধারণ্যে প্রচলিত মত ইহাই যে, হযরত মূসার শ্বশুর ঐ বৃদ্ধ হযরত শোআয়েবই ছিলেন। এই সূত্রে ইহা অবধারিত যে, উভয়ের সময়কাল লাগালাগিই ছিল এবং হযরত শোআ'য়ব "মাদ্ইয়ান" ও "আইকাহ্"-বাসীদের নবী ছিলেন, আর হযরত মূসা (আঃ) বনী-ইসরাঈলদের প্রতি রসূলরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

হযরত শোআ'য়ব ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের বংশধরই ছিলেন। ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের তিন স্ত্রী ছিলেন। (১) ছারাহ্ (আঃ) যাঁহার গর্ভের ইসহাক (আঃ) ছিলেন এবং তাঁহারই পুত্র ছিলেন ইয়াকুব (আঃ), যাঁহার নাম "ইসরাঈল" ছিল। তাঁহার হইতে বনী ইসরাঈলের বংশধর। (২) হাজেরাহ (আঃ) যাঁহার গর্ভে ইসমাঈল (আঃ) এবং তাঁহার বংশের মধ্যে একমাত্র নবী আমাদের পয়গম্বর হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হইয়াছেন, যাঁহার উপর নবুয়তের সেলসেলাহ শেষ হইয়াছে। (৩) "কতুরা" (আঃ) তাঁহার গর্ভে হযরত ইব্রাহীমের ছয় ছেলে ছিল। একজনের নাম ছিল "মাদ্ইয়ান"। তাঁহার বংশধর যে অঞ্চলে বসবাস করিতেছিল উহার নাম তাঁহারই নামানুসারে "মাদ্ইয়ান" ছিল। সেই মাদ্ইয়ানের বংশেই হযরত শোআ'য়বের জন্ম। প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ মতামত অনুসারে হযরত শোআ'য়বের প্রপিতামহ ছিলেন "মাদইয়ান"। এই সূত্রে হযরত শোআ'য়বের নসব তিন জনের মাধ্যমে হযরত ইব্রাহীমের সঙ্গে মিলিত হয়।

(তফসীর হক্কানী, ৪-১৪৪ দ্রঃ)

ভৌগলিক বিবরণ

কম-বেশ ১২৫ মাইল দীর্ঘ আকাবা উপসাগরের পূর্বকূল এবং তৎসংলগ্ন লোহিত সাগরের উপকূলীয় অংশবিশেষসহ ফিলিস্তিন ও আরবের মধ্যবর্তী উপকূলীয় বিস্তীর্ণ এলাকাই "মাদইয়ান" অঞ্চল। উহার কেন্দ্রীয় শহরকে মাইদয়ান বলা হয়, যাহা লোহিত সাগর হইতে আকাবা উপসাগরের উপৎপত্তিস্থলের সন্নিকটস্থ এলাকায়ই অবস্থিত ছিল। হযরত শোআ'য়ব (আঃ) নিশ্চয়ই এই কেন্দ্রীয় শহর মাদইয়ানেরই বাসিন্দা ছিলেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক বলিয়াছেন–

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِىْ أُمِّهَا رَسُوْلاً ... .

"আপনার প্রভু কোন বস্তিকে ধ্বংস করেন নাই যাবত না উহার কেন্দ্রীয় শহরে রসূল পাঠাইয়াছেন, যিনি এলাকাবাসীকে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন (এবং তাহারা উহা উপক্ষো করিয়াছে)।

(পারা ২০ রুকু ৯)

কাহারও মতে, মাদইয়ান এলাকার বিস্তার আরও উত্তরে জর্দানস্থিত মাআ'ন পর্যন্ত ছিল। সেমতে হযরত লূতের উম্মতের ধ্বংস প্রাপ্ত বস্তি অঞ্চল- "মরু সাগর" এলাকার কাছাকাছি পর্যন্ত মাদইয়ানের বিস্তার ছিল।

পবিত্র কোরআনেও উল্লেখ রহিয়াছে, وما قوم لوط منكم ببعيد হযরত শোআ'য়ব (আঃ) স্বীয় জাতিকে আল্লাহর আযাব ও গযব হইতে সতর্ককরণার্থে চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন, "লূতের উম্মতগণ তোমাদের হইতে অধিক ব্যবধানে নহে"– তোমরা উহার অবস্থা দেখিয়া উপদেশ গ্রহণ কর। অবশ্য হযরত শোআ'য়বের যুগও হযরত লূতের যুগের নিকটবর্তীই ছিল।

এই মাদ্ইয়ানবাসীদের প্রতি শোআ'য়ব (আঃ) রসূলরূপে প্রেরিত ছিলেন, যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআনে আছে। কোন কোন আয়াতে হযরত শোআ'য়বকে "আইকাহ্'বাসীদের রসূলও বলা হইয়াছে। এ স্থলে ঐতিহাসিক ও তফসীরকারগণের মতভেদ হইয়াছে। এক মত এই যে, "মাদ্ইয়ান" ও "আইকাহ্" ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল; শোআ'য়ব (আঃ) উভয় অঞ্চলবাসীর প্রতি রসূল ছিলেন। অপর মত এই যে, মাদ্ইয়ান অঞ্চলকেই

"আইকাহ্" বলা হইত। "আইকাহ্" অর্থ বন বা জঙ্গল– যে স্থানে গাছ-পালা ও বৃক্ষাদির আধিক্য হয়। মাদ্ইয়ান অঞ্চলটি উপকূলবর্তী এলাকা হওয়ায় তথাকার মাটি আর্দ্রতাপূর্ণ ছিল এবং তথায় ঘন বন-জঙ্গল ছিল, এই সূত্রে ঐ মাদইয়ানকেই "আইকাহ্" বলা হইত।

মাদ্ইয়ানবাসীর অবস্থা

শেরেক ও মূর্তি পূজা তাহাদের মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। শেরেক ও মূর্তি পূজার পর এই জঘন্যতম দুষ্কৃতিও তাহাদের অভ্যাসে পরিণত হইয়া গিয়াছিল যে, লেন-দেনের মধ্যে মাপিয়া লইতে হেরফের করিয়া বেশী লইত এবং দিতে কম দিত। ইহা এক জঘন্যতম অপরাধ, এই অপরাধের পরিণাম অতি ভয়াবহ; যাহার সম্পর্কে আমাদের পবিত্র কোরআনেও ঘোষণা রহিয়াছে–

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ - وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ -

"ভীষণ শাস্তি ও দুরবস্থার সম্মুখীন ঐ ব্যক্তিগণ যাহারা লোকদের নিকট হইতে আদায় করার সময় পুরাপুরা আদায় করে, অথচ লোকদিগকে পাত্র বা পাল্লা-বাটখারা দ্বারা মাপিয়া দিবার সময় তাহাদের প্রাপ্য হইতে কম দেয়।" এই অপরাধ মাদ্ইয়ানবাসী সমগ্র জাতির দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত হইয়াছিল; তদুপরি তাহারা রাহাজানি ও ডাকাতির অভ্যাসেও অভ্যস্ত ছিল। হযরত শোআ'য়ব (আঃ) তাহাদিগকে বহু রকমে বুঝাইলেন এবং সৎপথে আনিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহারা উল্টা হযরত শোআ'য়াবকে ভীতি প্রদর্শন পূর্বক তাঁহাকে তাহাদের পথের পথিক হইতে বলিল। অন্যথায় তাঁহাকে এবং তাঁহার সঙ্গীগণকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার হুমকি দিল। তাঁহার বিরুদ্ধে নানারূপ মিথ্যা প্রোপাগান্ডাও আরম্ভ করিয়া দিল, ফলে তাহাদিগকে আল্লাহ তাআলা পাকড়াও করিলেন, তাহাদের উপর আল্লাহর গযব নামিয়া আসিল, অতপর সব ধ্বংস হইয়া গেল।

মাদ্ইয়ানবাসীর উপর আল্লাহর গযব

পবিত্র কোরআনে ঐ জাতির ধ্বংস সম্পর্কে বিভিন্ন আযাবের উল্লেখ আছে– (১) ভয়াবহ ভূচাল ভূ-কম্পন এবং (২) ভয়ানক গর্জন ও বিকট আওয়াজ। এতদ্ভিন্ন আরও একটি আযাবের উল্লেখ রহিয়াছে– فاخذهم عذاب يوم الظلة "হযরত শোআ'য়বের বিদ্রোহীগণকে মেঘ-খন্ডের আযাব পাকড়াও করিল।" মেঘ-খন্ডের আযাবের বিবরণে বর্ণিত আছে– ঐ লোকদের উপর আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে অস্বাভাবিক গরম ও উত্তাপ আবর্তিত হইল। সেই গরম ও উত্তাপে তাহারা ছুটাছুটি করিতেছিল, হঠাৎ প্রত্যেক এলাকায় এক একটি মেঘ-খন্ডের আবির্ভাব হয় এবং উহা হইতে শীতল বাতাস প্রবাহিত হয়। সমস্ত লোক ঐ মেঘ খন্ডের নীচে জমায়েত হয়। তৎক্ষণাৎ উহা হইতে প্রবল বেগে অগ্নি বর্ষিত হইয়া মুহূর্ত মধ্যে কাফেরগোষ্ঠী জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই-ভষ্ম হইয়া গেল।

পবিত্র কোরআনে যে স্থানে উপরোক্ত আযাবের উল্লেখ আছে তথায় হযরত শোআ'য়বের বিদ্রোহীগণকে اصحاب الايكة বন-জঙ্গলবাসী" বলা হইয়াছে। اصحاب مدين মাদইয়ানবাসী আর اصحاب ايكة আইকাহ্ বা বনবাসী দুইটি জাতির নাম, না এক জাতির নাম এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মতভেদ বর্ণিত হইয়াছে। দুই জাতি হইলে মাদ্য়নবাসীদের উপর প্রথমোক্ত দুই প্রকারের আযাব আসিয়াছিল, আর তৃতীয় আযাব আসিয়াছিল আইকা্বাসীদের উপর। উভয় নামে একই জাতি হইলে তিন প্রকারের আযাব তাহাদের উপরে এইরূপে আসিয়াছিল যে, প্রথমে ভয়ানক ভূকম্পন ও ভীষণ তর্জন-গর্জন দ্বারা তাহাদের মধ্যে

ত্রাসের সৃষ্টি করা হইয়াছিল যাহাতে তাহারা ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া ভীষণ উত্তাপের দরুন বাড়ী-ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায় মেঘখন্ড আসিয়া তাহাদের উপর অগ্নিবর্ষণ করে এবং নিজেদের দেশ-খেশের মধ্যে থাকাবস্থায়ই তাহারা ধ্বংস হইয়া যায়।

তলদেশ হইতে ভূকম্পন আর উর্ধ্বদেশ হইতে বিকট আওয়াজ ও গর্জন ও এবং অগ্নিবর্ষণ- এই সবের মধ্যে কাফের ও আল্লাহ-রসূলের বিদ্রোহীগণ ভূপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেল। পর দিন মনে হইতেছিল– এই দেশে যেন কোন বসবাসকারীর অস্তিত্বই ছিল না। আল্লাহ তাআলার ক্রোধানলে পতিত লোকদের পরিণাম এইরূপই হয়। পবিত্র কোরআনের বর্ণনায় ঐ জাতির ইতিহাস–

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۔ قَالَ يَٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۔

অর্থ ঃ মাদইয়ানবাসীর প্রতি তাহাদের বংশধর এক ভাই– শোআ'য়বকে রসূলরূপে পাঠাইয়াছিলাম। তিনি তাহাদিগকে আহবান জানাইয়াছিলেন, হে আমার জাতি! আল্লাহর গোলামী ও বন্দেগী কর, তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন মা'বুদ নাই; এই দাবীর উপর উজ্জ্বল প্রমাণ আমার মারফত তোমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে, সে মতে তোমরা (আল্লাহর আদেশ পালন পূর্বক) দেয়ার সময় মাপে ও ওজনে পুরাপুরি দিও; আর লোকদের তাহাদের প্রাপ্য কম দিও না এবং দেশে শান্তির পর (আল্লাহদ্রোহিতা এবং ঠকাঠকি ও চুরি-ডাকাতির দ্বারা) অশান্তি সৃষ্টি করিও না। ইহা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস কর। আর রাস্তা-ঘাটে বসিয়া ঈমানের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তিগণকে ভীতি প্রদর্শন করিও না এবং আল্লাহর পথে বাধার সৃষ্টি করিও না, উহার মধ্যে বক্রতা দেখাইবার চেষ্টা করিও না। আর এই বিশেষ নেয়ামত স্মরণ কর যে, তোমরা সংখ্যায় নগণ্য ছিলে, তিনি তোমাদিগকে সংখ্যাগুরু করিয়াছেন। আর তোমরা বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় চোখ দিয়া দেখ, নাফরমান ফাসাদকারীদের পরিণাম কি হইয়াছে !

وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا ۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۔

এত বুঝান সত্বেও যদি তোমাদের শুধু একদল ঈমান আনিয়াছে অপর দল ঈমান আনে নাই, তবে (তাহাদের আল্লাহই যাহা করেন করিবেন;) তোমরা ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা কর– যাবত না আল্লাহ আমাদের মধ্যে তথা ঈমান গ্রহণকারী ও বর্জনকারীদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দেন, তিনিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَٰشُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۔ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ۔ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا ۔ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۔ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ۔

সর্দার শ্রেণীর লোকগণ হুমকি দিল যে, হে শোআ'য়ব! তোমার সমস্ত দলবলসহ যদি আমাদের পথের পথিক না হইয়া যাও তবে নিশ্চয় আমরা তোমাদের সকলকে আমাদের দেশ হইতে তাড়াইয়া দিব। শোআ'য়ব (আঃ) বলিলেন, তোমাদের পথ আমাদের নজরে অত্যন্ত ঘৃণিত ও জঘন্য, তবুও কি তোমরা আশা কর আমরা তাহা গ্রহণ করিব? আল্লাহ আমাদিগকে তোমাদের পথ হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। এর পরও যদি আমরা সেই পথের পথিক হই, তবে আমরাও (তোমাদের ন্যায়) আল্লাহ সম্পর্কে মনগড়া মিথ্যা মতবাদ পোষণকারী সাব্যস্ত হইব। আমাদের সম্পর্কে এই সম্ভাবনা মোটেই নাই যে, আমরা তোমাদের পথের পথিক হইব। অবশ্য যদি আমাদের মালিক আল্লাহ তাহা চাহেন, (কিন্তু আল্লাহ ঐরূপ চাহেন না। কারণ) আমাদের প্রভু আল্লাহ সব কিছু সম্পর্কে অবহিত। আমরা সেই আল্লাহর উপর ভরসা করিলাম। প্রভু হে! আমাদের ও আমাদের জাতির মধ্যে শেষ ফয়সালা করিয়া দাও, তুমিই উত্তম ফয়সালাকারী।

وَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ـ

কাফের সর্দাররা ইহাও প্রচার করিল যে, হে দেশবাসী! যদি তোমরা শোআ'য়বের অনুসরণ কর তবে তোমরা ভয়ানক ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হইবে।

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ـ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ـ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ ـ

পরিণামে প্রচন্ড ভূ-কম্পন তাহাদেরকে ঘিরিয়া ধরিল, ফলে তাহারা নিজ নিজ ঘরে (বা নিজ দেশেই) উপুড় হইয়া মরিয়া রহিল; সারাদেশ নীরব নিস্তব্ধ হইয়া গেল– যেন তথায় ঐ দেশবাসীর বসবাসই ছিল না। যাহারা শোআ'য়বকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছিল তাহারা ভীষণ ক্ষতি ও ধ্বংসের সম্মুখীন হইল।

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ـ

অতপর হযরত শোআ'য়ব ঐ অঞ্চল ত্যাগ করিলেন, তাহাদের প্রতি ফিরিয়াও চাহিলেন না এবং অনুতাপ আক্ষেপে বলিলেন, হে আমার জাতি! তোমাদিগকে পরওয়ারদেগারের সমুদয় বিষয়াবলী পৌঁছাইয়া দিয়াছিলাম এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত কর নাই; এখন তোমাদের ন্যায় কাফেরদের ব্যাপারে আক্ষেপ অনুতাপ কিরূপে আসিতে পারে?

(৮ পারার শেষের ৯ পারা আরম্ভ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ মাদ্ইয়ান ও আইকাহ্বাসী কাফেরদের উপর আল্লাহর গযব আসিয়াছিল, কিন্তু মোমেনগণ অক্ষত রহিয়াছিল। কাফেরদের ধ্বংস হওয়ার পর হযরত শোআ'য়ব (আঃ) ঐ অঞ্চল ত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছিলেন সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। কাহারও মতে হযরত শোআ'য়ব অবশিষ্ট মোমেনগণকে লইয়া "আদন" হইতে পূর্বে অবস্থিত আরব সাগরের উত্তর উপকূলে "হায্রামাউত" অঞ্চলে চলিয়া আসিয়াছিলেন। এমনকি বর্তমানেও তদঞ্চলে শোআ'য়বের কবর নামে একটি কবর বিদ্যমান আছে। (কাছাছুল কোরআন)

"রুহুল মাআনী" তফসীরে আছে– হযরত শোআ'য়ব মোমেনগণকে লইয়া মক্কায় চলিয়া আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার কবরও তথায়ই অবিস্থত।

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ـ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِنِّىْ اَرٰكُمْ بِخَيْرٍ وَاِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ ـ وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا

الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ـ بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ـ وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ـ

মাদ্‌ইয়ানবাসীদের প্রতি তাহাদেরই এক ভ্রাতা শোআয়বকে রসূলরূপে পাঠাইয়াছিলাম। তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, হে আমার জাতি! এক আল্লাহর বন্দেগী ও দাসত্ব কর: তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন মাবুদ নাই। আর মাজে ওজনে কম দিওনা; তোমরা স্বচ্ছলতার মধ্যে আছ, তোমাদিগকে ভাল অবস্থায়ই দেখিতেছি: (অন্যকে ঠকাইবার প্রয়োজন হয় না। ঐ অভ্যাস ত্যাগ না করিলে) আমি তোমাদের উপর সর্বগ্রাসী আযাবের আশঙ্কা করিতেছি। হে আমার জাতি! লোকদিগকে মাপে-ওজনে তাহাদের পূর্ণ প্রাপ্য দিও; (চুরি ডাকাতি, ঠগবাজি ইত্যাদি দ্বারা) দেশে অশান্তি সৃষ্টি করিও না। এই সব অবৈধ উপায় ত্যাগ করতঃ হক হালালীরূপে আল্লাহর দান যাহা কিছু থাকে তাহাই তোমাদের পক্ষে উত্তম; তোমরা যদি বিশ্বাস কর তবে আমার কথা গ্রহণ কর (সত্য পথ দেখাইলাম- ইহাই আমার দায়িত্ব)। আমি তোমাদের উপর চৌকিদার নহি।

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِىْ اَمْوَالِنَا مَانَشٰؤُ ـ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ـ

তদুত্তরে তাহারা বলিল, হে শোআ'য়ব! মনে হয় তোমার নামায-রোজা তোমাকে এই শিক্ষা দেয় যে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের পূজনীয় দেব-দেবীকে ছাড়িয়া দেই এবং আমরা নিজেদের ধন-সম্পত্তির মধ্যে নিজেদের ইচ্ছানুসারে তছরুপ না করি। তুমি যেন একটা জ্ঞান বুদ্ধির বস্তা।

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَرَزَقَنِىْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ـ وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَا اَنْهٰكُمْ عَنْهُ ـ اِنْ اُرِيْدُ اِلاَّ الْاِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلاَّ بِاللّٰهِ ـ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ـ

শেআ'য়ব্ (আঃ) বলিলেন, হে আমার জাতি! বল ত দেখি- আমি (আমার দাবীতে) যদি আমার প্রভু হইতে প্রাপ্ত দলিল প্রমাণের উপর অধিষ্ঠিত হইয়া থাকি এবং তাঁহার হইতে এক বিশেষ সম্পদ (তথা নবুয়ত) প্রাপ্ত হইয়া থাকি (এমতাবস্থায় আমি উহার প্রচাহ্ন না করিয়া পারি কি? উহা প্রত্যাখ্যান করার পরিণাম তোমাদের কি হইবে)? আর আমি তোমাদের যাহা নিষেধ করি নিজেও আমি উহার বিপরীত করি না। আমি যথাসাধ্য সংশোধন ও শান্তি আনয়নেরই চেষ্টা করি এবং সব কিছুর সামর্থ আল্লাহর তরফ হইতেই পাই। তাঁহারই উপর আমার ভরসা ও তাঁহার প্রতিই আমি রুজু হই।

وَيٰقَوْمِ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىْ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِثْلُ مَا اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ـ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ـ وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ ـ اِنَّ رَبِّىْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ـ

হে আমার জাতি! আমার প্রতি শত্রুতায় তোমরা এমন কোন অপরাধ করিও না, যাহার ফলে তোমাদের উপর ঐ প্রকারের আযাব আসিয়া পড়ে যেরূপ আযাব নূহের জাতি, হুদের জাতি এবং সালেহ্-এর জাতির উপর পড়িয়াছিল; আর লূত-জাতির দেশ বা কাল ত তোমাদের হইতে অধিক দূরে নহে (তাহাদের অবস্থা তোমাদের চোখের সম্মুখেই রহিয়াছে)। আর তোমরা তোমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের দরবারে (পূর্বকৃত অপরাধ সমূহের জন্য) ক্ষমা প্রার্থনা কর, তারপর (আগামীতে) একমাত্র সেই প্রভুর প্রতিই ধাবিত হও; নিশ্চয় আমার (ও তোমাদের সেই) প্রভু অতি দয়ালু ও স্নেহবান।

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ـ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ وَمَا اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ـ

তাহারা বলিল, হে শোআ'য়ব তোমার অনেক কথাই যুক্তিহীন– আমাদের বুঝে আসে না। আর তুমি ত আমাদের মধ্যে দুর্বল হিসেবেই বিবেচিত, তোমার গোষ্ঠী-জ্ঞাতি (আমাদেরই দলভুক্ত); তাহাদের খাতিরদারীর খেয়াল না হইলে আমরা তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিয়া ফেলিতাম; আর আমাদের উপর তো তোমার কোনই প্রভাব নাই।

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِيْ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ ـ وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ـ اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ـ

শোআ'য়ব (আঃ) বলিলেন, হে আমার জাতি! আমার গোষ্ঠী-জ্ঞাতি কি তোমাদের নিকট আল্লাহ অপেক্ষা অধিক গুরুত্বের? (তোমরা গোষ্ঠী-জ্ঞাতির সম্ভ্রম কর,) অথচ মহান আল্লাহকে পিছনে ফেলিয়া রাখিয়াছ! নিশ্চয়ই আমার প্রভু তোমাদের সমস্ত কার্যাবলীর পূর্ণ খবর রাখেন।

وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ـ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ يَاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوْا اِنِّيْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ـ

হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের অবস্থার উপর কাজ করিয়া যাইতে থাক, আমি আমার অবস্থার উপর কাজ করিয়া যাইব। সত্বরই জানিতে পারিবে অপদস্থকারী আযাব কাহার উপর পতিত হয় এবং কে মিথ্যাবাদী। তোমরাও অপেক্ষা কর আমিও অপেক্ষায় আছি।

وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ـ كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ـ اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ ـ

যখন (ঐ বিদ্রোহীদের ধ্বংস সম্পর্কে আমার আদেশ উপস্থিত হইল তখন আমি শোআ'য়ব ও তাঁহার সঙ্গী মোমেনগণকে আমার বিশেষ রহমতে বাঁচাইয়া নিলাম। আর স্বৈরাচারীদের পাকড়াও করিল এক বিকট গর্জন; ফলে তাহারা ধ্বংস হইয়া গেল এবং দেশ-খেশের মধ্যেই নিজ নিজ বাড়ীতে উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল (কেউ কাহারও সাহায্য করিতে পারিল না। তাহারা ধ্বংস হইয়া সারাদেশ নীরব নিস্তব্ধ হইয়া গেল); যেন এই দেশে তাহাদের বসবাসই ছিল না। হে বিশ্ববাসী! দেখ– মাদ্‌ইয়ানবাসীও তদ্রূপ ধ্বংস হইয়া গেল যেরূপভাবে ছামুদ জাতি ধ্বংস হইয়াছিল। (সূরা হুদ পারা ১২ রুকু ৮)

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ـ

আর আমি মাদ্‌ইয়ানবাসীদের প্রতি তাহাদেরই জ্ঞাতি শোআ'য়বকে রসূলরূপে পাঠাইয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, হে আমার জাতি! এক আল্লাহর দাসত্ব কর এবং পরকালের ভয় রাখিয়া চল, দেশের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি করিয়া বেড়াইও না।

فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ـ

মাদ্‌ইয়ানবাসী শোআ'য়বকে অমান্য করিল; ফলে ভয়াবহ ভূ-কম্পন তাহাদিগকে পাকড়াও করিল, পরিণামে তাহারা নিজেদের বাড়ী-ঘরে উপুড় হইয়া মরিয়া রহিল। (পারা ২০ রুকু ১৬)

كَذَّبَ اَصْحَابُ الْـئَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ - اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلاَ تَتَّقُوْنَ - اِنِّى لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ - فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ - وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلاَ تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ - وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ - وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاۤءَهُمْ - وَلاَ تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ - وَاتَّقُوا الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ - قَالُوْا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ - وَمَا اَنْتَ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ - فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاۤءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ -

"আইকাহ্‌" (অরণ্য) বাসী সমস্ত রসূলগণের আদর্শ অমান্য করিয়াছিল; যখন শোআ'য়ব (আঃ) তাহাদের বলিয়াছিলেন, তোমরা ভয় ও সতর্কতা অবলম্বন কর না কেন? আমি তোমাদের জন্য সত্যবাদী রসূল রূপে আসিয়াছি। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করিয়া চল এবং আমার অনুসরণ কর। আর এই তবলীগ কার্যের কোন প্রকার প্রতিদান আমি তোমাদের নিকট চাহি না, আমার প্রতিদান তো একমাত্র সারা জাহানের প্রভুর নিকট রহিয়াছে।

তোমরা মাপে-ওজনে পুরাপুরি দিও কম দিও না; শুদ্ধ ও সঠিক মাপযন্ত্রের দ্বারা মাপিও, লোকদিগকে কম দিও না তাহাদের প্রাপ্য হক। আর দেশে অশান্তির সৃষ্টি করিয়া বেড়াইও না। আর অন্তরে ভয় রাখিয়া চল ঐ প্রভু-পরওয়ারদেগারের, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদের এবং তোমাদের বাপ-দাদা পূর্বপুরুষদেরকে। তাহারা বলিল, নিশ্চয় তুমি জাদুগ্রস্ত (হইয়া এই সব বলিতেছ)। তুমি ত আমাদেরই মত একজন মানুষ (রসূল হওয়ার দাবী সম্পর্কে) আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি। আমাদের এইসব ধারণা যদি অবাস্তব হয় এবং বস্তুতঃ তুমিই সত্যবাদী হও, তবে আকাশ ভাঙ্গিয়া উহার বড় বড় খন্ড আমাদের উপর ফেলিয়া আমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দাও।

قَالَ رَبِّىْ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ - فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ -

শোআ'য়ব (আঃ) বলিলেন, (আযাবের ক্ষমতাবান) আমার প্রভু-পরওয়াদেগার ভালরূপ জ্ঞাত আছেন যাহা কিছু তোমরা করিতেছ (তাঁহার নির্ধারণ অনুযায়ী আযাব আসিবেই)। তাহারা শোআ'য়বকে অমান্য করিল; ফলে মেঘখন্ডের ঘটনার আযাব তাহাদেরকে পাকড়াও করিল, নিশ্চয় উহা ছিল এক ভীষণ ও ভয়াবহ দিনের আযাব।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَّمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ - وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ -

নিশ্চয়ই এই ঘটনায় বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ রহিয়াছে। (তাহাদের উপর এই জন্যই আযাব আসিয়াছিল যে,) তাহাদের অধিকাংশই আল্লাহ ও রসূলের অবাধ্য ছিল। নিশ্চয়ই তোমার প্রভু সর্ব ক্ষমতার অধিকারী; (তাঁহার কার্যে বাধার সৃষ্টি করা যায় না) এবং অত্যন্ত দয়ালু (তাই কোন সময় আযাব বিলম্বে আসে বা ইহজগতে আযাব আসেও না)।

হযরত ইউনুস (আঃ)

হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের বংশ পরিচয়ের কোন তথ্য ইতিহাস ভান্ডারে নাই। এ সম্পর্কে শুধু দুইটি কথাই পাওয়া যায়– (১) বোখারী শরীফের এক হাদীছে উল্লেখ আছে, হযরত ইউনুসের পিতার নাম "মাত্তা" ছিল। (২) বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যে প্রমাণিত হয়, হযরত ইউনুস (আঃ) বনী ইসরাঈল বংশীয় নবী ছিলেন।

হযরত ইউনুসের সময় কাল সম্পর্কে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার ইবনে হাজার (রঃ) কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাবলী দৃষ্টে মনে হয়– হযরত ইউনুসের আবির্ভাবকাল খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে ছিল। (কাছাছুল কোরআন ২০২)

কোন কোন ইতিহাস বিশারদ তফসীরকার বিভিন্ন তথ্য-দৃষ্টে মন্তব্য করিয়াছেন– হযরত ইউনুসের আবির্ভাব খৃস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালে ছিল।

ইরাকের সুপ্রসিদ্ধ অঞ্চল "মাওসেল" (বর্তমান তৈল সমৃদ্ধ "মুসল" নামীয় এলাকা) এই অঞ্চলে "দিজলা" (তাইগ্রীস) নদের তীরবর্তী তৎকালীন রাজধানী, সুপ্রসিদ্ধ শহর "নিনওয়া" অঞ্চলের নবী ছিলেন হযরত ইউনুস (আঃ)।

হযরত ইউনুসের একটি বিশেষ ঘটনা পবিত্র কোরআনের একাধিক স্থানে উল্লেখ হইয়াছে। উহার বিবরণ এই যে, এক লক্ষ বিশ হাজার লোকের আবাদী অঞ্চল "নিনওয়া" এলাকার নবী হইয়া হযরত ইউনুস (আঃ) তথাকার অধিবাসীগণকে তাহাদের চিরাচরিত শেরেক– মূর্তি ও দেব-দেবীর পূজা ত্যাগ করার এবং আল্লাহ তা'আলার দ্বীন গ্রহণ করার প্রতি আহবান জানাইলেন। দীর্ঘ সাত বৎসরকাল তাহাদিগকে তবলীগ করিলেন, কিন্তু তাঁহার আহবানে দেশবাসী মোটেই কর্ণপাত করিল না। হযরত ইউনুস (আঃ) তাহাদিগকে আল্লাহর গযব ও আযাবের সতর্কবাণী শুনাইলেন, কারণ আল্লাহর দ্বীনের ও আল্লাহর নবীর সঙ্গে বিদ্রোহ করিলে পরিণামে আল্লাহর আযাব আসিয়া থাকে। ইউনুস (আঃ) নিনওয়াবাসীকে শত রকমে বুঝাইলেন, ভয় দেখাইলেন, সতর্ক করিলেন, কিন্তু আযাব আসিতে বিলম্ব হইল, তাই তাহারা তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও করিল না। হযরত ইউনুস (আঃ) তাহাদের প্রতি ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া "নিনওয়া" ত্যাগ কল্পে তথা হইতে অন্যত্র যাত্রা করিলেন।

এ স্থলেই হযরত ইউনুস (আঃ)-এর একটু ভুল হইয়া গেল একজন নবীর পক্ষে এক দেশ ত্যাগ করতঃ অন্য দেশে চলিয়া যাওয়া, বিশেষতঃ যেই দেশে তবলীগ করার সেই জন্য নবী আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে আদিষ্ট হন, সেই দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়া নবীর পক্ষে কোন অবস্থাতেই সঙ্গত হয় না, যাবত না আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে স্পষ্ট অনুমতি লাভ করিয়া নেন। ইহা একটি বাস্তব নিয়ম এবং সব নবীগণই এই রীতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন।

আমাদের হযরত রসূলে করীম (সঃ) দীর্ঘ তের বৎসরকাল মক্কা নগরীতে অসহনীয় দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত অবস্থায় দিন কাটাইলেন। এমনকি ছাহাবীগণকে হিজরত তথা মক্কা ত্যাগ করতঃ আবিসিনিয়ায় চলিয়া যাওয়ার অনুমতি দিলেন, পরে মুসলমানদের হিজরত স্থলরূপে খেজুর গাছের দেশ স্বপ্নে দেখিয়া তাহাদিগকে মদীনায় হিজরত করার অনুমতিও দিয়াছিলেন, কিন্তু নিজে মক্কা হইতে হিজরত করেন নাই। এমনকি এ সম্পর্কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি ইহাই বলিয়াছেন যে, আমি পরওয়ারদেগারের তরফ হইতে এখনও মক্কা ত্যাগ করার অনুমতি পাই নাই, তবে (অবস্থাদৃষ্টে) আশা করি অনুমতি আসিয়া যাইবে। এই প্রতীক্ষায় তিনি আবু বকর (রাঃ)-কে হিজরত হইতে বারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং আবু বকর এই উদ্দেশে বিশেষ দুইটি উট যত্নের সহিত পুষিয়া রাখিয়াছিলেন। হঠাৎ একদিন আকস্মিকরূপে উত্তপ্ত দ্বিপ্রহরে হযরত

(সঃ) আবু বকরের গৃহে তশরীফ আনিলেন এবং বিশেষ গোপনীয়তার মধ্যে প্রকাশ করিলেন যে, মক্কা ত্যাগ করতঃ মদীনায় চলিয়া যাওয়া সম্পর্কে পরওয়ারদেগারের তরফ হইতে আমার জন্য অনুমতি আসিয়া গিয়াছে। এই অবস্থার পরে রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা ত্যাগপূর্বক মদীনাপানে হিজরত করিয়াছিলেন।

অন্যান্য নবীগণের ইতিহাসেও এই রীতিই পরিলক্ষিত হয়। হযরত লূত (আঃ) তাঁহার দেশবাসীর দ্বারা কতই না নির্যাতিত হইতেছিলেন! কিন্তু আল্লাহ তা'আলার স্পষ্ট আদেশ না আসা পর্যন্ত ঐ দেশ ত্যাগ করেন নাই।

হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের এখানেই ভুল হইল যে, আল্লাহ তা'আলার অনুমতির প্রতীক্ষা না করিয়া ঐ দেশ ত্যাগ করিবার উদ্দেশে তথা হইতে রওয়ানা হইয়া পড়িলেন। হযরত ইউনুসের কার্যের সপক্ষে যুক্তির অভাব ছিল না। কারণ, দীর্ঘ সাত বৎসরের তবলীগেও তাহাদের মধ্যে কোনই পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় নাই এবং তাহাদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত বা আল্লাহ তা'আলার বিজ্ঞপ্তি অনুসারেও তাহাদের উপর আযাব অত্যাসন্ন হইয়াছিল। এমনকি আযাব আসিয়া পড়ার অবকাশস্বরূপ আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতেই যে, তিন দিন নির্ধারিত করা হইয়াছিল সেই তিন দিনের পূর্ণ দুই দিন গত হইয়া তৃতীয় দিনের মধ্যরাত্র আসিয়া গিয়াছিল, তবুও দেশবাসীর অবস্থার কোন পরিবর্তনই আসে নাই। এমতাবস্থায় ঐ অঞ্চলে অবস্থান করার কোন সুফল বা কার্যকারিতা দেখা যাইতেছিল না। এইসব ভাবিয়াই হয়ত হযরত ইউনুস (আঃ) ঐ দেশ ত্যাগে অন্যত্র রওয়ানা হইয়াছিলেন এবং ইহা যুক্তিযুক্তই মনে হয়। কিন্তু নবীগণের সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে এমন পর্যায়ের থাকে, যাহা সাধারণ সম্পর্কের অনেক ঊর্ধ্বে নবীগণের উপর অতি সূক্ষ্ম বিষয়কেও যাচাই-বাছাই করা কর্তব্য হয়, তাঁহাদিগকে চুলচেরা পদ্ধতিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয়।

بود ادم دیدء نور قدیم # موئے در دیده بود کوه عظیم ـ

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার দরবারে নবীগণের মর্যাদা মানব দেহের চোখ তুল্য; চোখের মধ্যে অতি সামান্য একটি লোম বা বালুকণাও পাহাড় সমতুল্য হইয়া দাঁড়ায়। তদ্রূপ নবীগণের মামুলী ত্রুটিও আল্লাহর দরবারে অনেক বড় বিবেচিত হয়– যে, এত বড় মর্যাদার অধিকারী হইয়া এতটুকু ত্রুটিই বা কেন করা হইল?

এই দৃষ্টিতেই আল্লাহ তাআলা হযরত ইউনুস (আঃ)-কে তাঁহার উক্ত ত্রুটির জন্য গেরেফত করিলেন– তাঁহাকে ভুলের মাসুলদানে পতিত করিলেন।

রাত্রিকালে ইউনুস (আঃ) "নিনওয়া" হইতে বাহির হইয়া পথ চলিতে লাগিলেন। নিনওয়ার অনতিদূরেই দিজলা– তাইগ্রীস নদী (মানচিত্রের বিবরণে পূর্বেই বলা হইয়াছে, "নিনওয়া" দিজলা নদীর তীরবর্তী এলাকায় অবস্থিত)। ইউনুস (আঃ) নদী পার হওয়ার জন্য অন্যান্য লোকের সঙ্গে নৌকায় আরোহণ করিলেন।*

নৌকাটি তীর হইতে দূরে আসার পরই উহা ডুবিয়া যাওয়ার উপক্রম হইল। নৌকাটি যেরূপে আকস্মিক বিপদে পতিত হইল, তাহাতে ঐ দেশীয় লোকদের সাধারণ রেওয়াজ অনুসারে নৌকার মাঝি বলিল, আরোহীদের মধ্যে কোন একজন পলাতক গোলাম আছে; যে স্বীয় মনিবের অনুমতি ছাড়া পালাইয়া আসিয়াছে। সুতরাং সেই গোলামকে নৌকা হইতে ফেলিয়া না দিলে নৌকা রক্ষা করা সম্ভব হইবে না; অচিরেই নৌকা ডুবিয়া সকল আরোহীই ধ্বংস হইবে।

---

* ইউনুস আলাইহিস সালামের উল্লিখিত বিবৃত নৌকার ঘটনা কোথায় ঘটিয়াছিল সে সম্পর্কে তওরাতে ভূমধ্যসাগরের নাম উল্লেখ আছে। পবিত্র কোরআনে বা হাদীছে এ সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট নাম উল্লেখ নাই। অবশ্য তফসীরকারগণের সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ তফসীর রুহুল মাআ'নী ২৩-১৪৫ পৃষ্ঠায় স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে যে, ঘটনাস্থল দিজলা– তাইগ্রীস নদী ছিল। ১২৭০ হিঃ সনে মৃত তথা মাত্র শতাধিক বৎসর পূর্বের এই তফসীরকার শেখ মুহাম্মদ আলুসী বাগদাদী তথায় ইহাও লিখিয়াছেন যে, "আমি নিজে দিজলা নদের মধ্যে অনেক বড় বড় বিরাট আকারের মাছ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।" বর্তমানের দিজলা নদ তখন অনেক বড় ছিল। ইউনুস (আঃ)-এর যুগে কত বড় ছিল এবং তাহাতে কত বড় বড় মাছ ছিল তাহা আল্লাহ তাআলাই জানেন।

এই মতামতটি অগ্রগণ্য মনে হয়। কারণ ভূগোল ও মানচিত্র দৃষ্টে দেখা যায়, নিনওয়া শহর দিজলা নদের তীরবর্তী এলাকায় অবস্থিত ছিল, উহা ভূমধ্য সাগরের ধারে-কাছেও নহে।

একজন বিশিষ্ট আলেমের লিখিত পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যায় ফোরাত নদীর নাম দেখা গেল এবং তিনি উল্লিখিত তফসীর রুহুল মাআ'নীরই বরাত দিয়াছেন। আমরা তফসীর রুহুল মাআ'নীকে বিশেষরূপে বার বার দেখিলাম, কিন্তু তথায় "ফোরাত" শব্দই নাই, বরং একাধিকবার দিজলা নদেরই নাম রহিয়াছে; মনে হয় উহা ছাপার ভুল।

অধুনা এই শ্রেণীর বিষয়াবলীর বিশেষ গবেষক একজন প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকারও দিজলা নদের নামই উল্লেখ করিয়াছেন।

ইউনুস (আঃ) ঘটনার সূচনা ও মর্ম বুঝিয়া ফেলিলেন। ঘটনার বিবরণ দানকারী কোন কোন বর্ণনাকারের মতে মাল্লাদের উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে স্বয়ং হযরত ইউনুসই অগ্রসর হইয়া বলিলেন, সেই পলাতক গোলাম আমিই, অতএব আমাকেই দরিয়ায় ফেলিয়া দাও। উপস্থিত লোকগণ মূল ঘটনা অবগত ছিল না; তাহারা হযরত ইউনুসের ন্যায় এমন একজন সুধী মানুষকে নদীতে ফেলিবে তাহা গ্রহণ করিতে পারিল না। যাই হউক–

অবশেষে ব্যালট প্রথায় অপরাধীর নাম বাহির করার ব্যবস্থা করা হইল, তাহাতে হযরত ইউনুসের নামই প্রকাশ পাইল। এমনকি তিন বার ঐ ব্যবস্থা করা হইল; প্রত্যেক বারই হযরত ইউনুসের নামই আসিল। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হইয়া সকলে তাঁহাকেই দরিয়ায় ফেলিয়া দিল। উপস্থিত একটি বিরাট মাছ তাঁহাকে আস্ত গিলিয়া ফেলিল।

আল্লাহ তাআলার কুদরত অসীম শিশু সন্তান মায়ের পেটে জরায়ুর ভিতর ঝিল্লি বা পর্দার আবরণের মধ্যে জীবিত থাকে– শুধু এক দুই দিন নহে, কয়েক মাস জীবিত থাকে; তদ্রূপ ইউনুস (আঃ) ঐ মাছের পেটে জীবিত ও অক্ষত রহিলেন।

ইউনুস (আঃ) মাছের পেটের ভিতর নিজেকে জীবিত পাইয়াই আরম্ভ করিলেন আল্লাহ তয়ালার দরবারে কান্না-কাটি, আবেদন-নিবেদন, তওবা-এস্তেগফার, স্বীয় ত্রুটির উপর অনুতাপ-অনুশোচনা। তাঁহার বিশেষ জপনা ছিল– لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

অর্থাৎ "হে খোদা! একমাত্র আপনিই আমার প্রভু, আপনিই আমার মা'বুদ ও মকসুদ-মতলুব; আপনি ছাড়া কেহ মা'বুদ ও মকসুদ-মতলুব হইতে পারে না। আপনি পাক-পবিত্র (আপনার কোন কার্যে দোষ-ত্রুটির লেশমাত্র থাকিতে পারে না;) বস্তুতঃ আমিই অপরাধী (আপনি আমাকে ক্ষমা করুন)।"

তফসীরকারগণের কাহারও মতে তিন দিন কাহারও মতে দীর্ঘ চল্লিশ দিন মাছের পেটের ভিতর তওবা-এস্তেগফারের মধ্যে অতিবাহিত হইল। আল্লাহ তাআলা হযরত ইউনুসের ত্রুটি মার্জনা করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিপদ মুক্তির ব্যবস্থা করিলেন। আল্লাহর আদেশে ঐ মাছটি কোন এক চরের মধ্যে বমি করিয়া হযরত ইউনুসকে ফেলিয়া গেল। আলো-বাতাসবিহীন আবদ্ধ স্থানে থাকিয়া তাঁহার শরীর নবজাত শিশুর শরীরের ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। এমতাবস্থায় তিনি এক বালুচরে পতিত হইলেন– যেখানে পানাহারের কোন বস্তু ছিল না, এমনকি সূর্যের উত্তাপ হইতে ছায়া লাভেরও কোন উপায়-উপকরণ তথায় মোটেই ছিল না।

আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতে তথায় কদু-কুমড়া গাছের ন্যায় বড় বড় পাতার একটি উচু বৃক্ষ জন্মিল। ইউনুস (আঃ) ঐ গাছের বড় বড় পাতার ছায়ায় আশ্রয় পাইলেন এবং উহার ফল দ্বারা তাঁহার পানাহারের আবশ্যক পূরণ করিতে লাগিলেন। কিছু দিনের মধ্যে তাঁহার শরীর পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিল।

নিনওয়াবাসীদের অবস্থা

হযরত ইউনুস (আঃ) রাত্রিকালে নিনওয়া হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন; পর দিন ভোরবেলা হইতেই আল্লাহ তা'আলার গযব ও আযাবের ঘনঘটা ও নিদর্শন পরিলক্ষিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসী হযরত ইউনুসের সতর্কবাণী স্মরণ করিল, এবং তাঁহার সত্যবাদিতার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া তাঁহার তালাশে ছুটাছুটি করিল, কিন্তু তাঁহাকে পায় কোথায়? তিনি ত শহর হইতে চলিয়া গিয়াছেন।

হযরত ইউনুসকে না পাইয়া দেশবাসী অধিক আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িল এবং সকলে সমবেতভাবে বাড়ী-ঘর, আরাম-আয়েশ ত্যাগপূর্বক ময়দানে একত্রিত হইয়া পরওয়ারদেগারের দরবারে চীৎকার করিয়া কান্না-কাটি করিতে লাগিল। এমনকি পশুপালগুলিকে ঘাস-পানিবিহীন রাখিয়া এবং শিশু সন্তানগুলিকে মায়ের বুক হইতে পৃথক করিয়া রাখিল। একদিকে সেই সব নিষ্পাপদের চীৎকার, অপর দিকে অপরাধীদের

তওবা-এস্তেগফারের চীৎকার; ফলে তৎক্ষণাত করুণাময় আল্লাহ তাআলার রহমত তাহাদের প্রতি নাযিল হইল এবং অত্যাসন্ন গযব ও আযাব তাহাদের উপর হইতে হটিয়া গেল। আল্লাহ ও রসূলের বিরোধিতা হইতে তওবা-এস্তেগফারের উপর খাঁটি এবং পরিপক্করূপে পদস্থিতি হাসিল করায় তাহারা আযাব হইতে রক্ষা পাইয়া আল্লাহ তা'আলার নিকট করুণার পাত্র হইয়া গেল।

একদিকে নিনওয়াবাসী সৎপথাবলম্বী হইয়া আল্লাহ তা'আলার করুণার পাত্র হইল, অপরদিকে হযরত ইউনুস (আঃ) ত্রুটি মার্জিত অবস্থায় বালুচরের মধ্যে বল-শক্তি ও স্বাস্থ্য পুনঃ ফিরিয়া পাইলেন। আল্লাহ হযরত ইউনুস (আঃ)-কে নিনওয়া শহরে প্রত্যাবর্তনের আদেশ করিলেন। তিনি তথায় ফিরিয়া আসিলেন। দেশবাসী তাঁহাকে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত অভ্যর্থনা করিল এবং পূর্ণ আনুগত্যের সহিত তাঁহাকে বরণ করিয়া লইল। হযরত ইউনুস (আঃ) জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ঐ শহরবাসীদের কল্যাণে নিয়োজিত থাকিয়া তথায়ই ইহকাল ত্যাগ করিলেন। বাগদাদ শহর এলাকায়ই এখনও তাঁহার সমাধিস্থল বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহা যিয়ারতের সৌভাগ্য নরাধমের হইয়াছে। মূল ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ–

وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ـ اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ـ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ ـ فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ ـ فَلَوْلاَ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ـ لَلَبِثَ فِىْ بَطْنِهٖ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ـ فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَاۤءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ ـ وَاَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ ـ وَاَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ ـ فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ـ

নিশ্চয় ইউনুস রসূলরূপে প্রেরিতগণের দলভুক্ত ছিলেন। তখনকার ঘটনা একটি স্মরণীয় ঘটনা– যখন ইউনুস (তাঁহার নিযুক্তি স্থান বিনানুমতিতে ত্যাগ করতঃ পথ অতিক্রম করাকালে) একটি বোঝাই নৌকার নিকট পৌঁছিলেন, অতপর লটারি ব্যবস্থায় শরীক হইলেন; ফলে তিনি-ই অপরাধী সাব্যস্ত হইলেন এবং একটি মাছ তাঁহাকে গিলিয়া ফেলিল; তখন তিনি অনুতপ্ত ছিলেন। যদি তিনি সেই অবস্থায় তসবীহ– আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা জপনে লিপ্ত না হইতেন, তবে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত তাঁহাকে মাছের পেটেই থাকিতে হইত। তারপর আমি তাঁহাকে (মাছের পেট হইতে) একটা চিজ বস্তুহীন উন্মুক্ত বালুচরে ফেলিয়া দিলাম, তিনি তখন স্বাস্থ্যহীনতায় রুগ্ন অবস্থায় ছিলেন। আর আমি (তাঁহার ছায়া ও পানাহারের উদ্দেশে) গুল্মজাতীয় একটি গাছ সৃষ্টি করিয়া দিলাম এবং তাঁহাকে পুনঃ প্রেরণ করিলাম এক লক্ষ, বরং তারও অধিক লোকের (আবাদী স্থান নিনওয়া শহরের) প্রতি। সেই দেশীয় লোকগণ পূর্ণ ঈমান আনিল, ফলে আমি তখনকার আযাবে তাহাদিকে ধ্বংস না করিয়া একটি সময়কাল (জীবনের দিনগুলি) পর্যন্ত ইহকালের সুখ ভোগের সুযোগ দিলাম।

(পারা–২৩, রুকু–৯)

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ ـ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

মাছের ঘটনায় পতিত নবীর কথা স্মরণ কর– যখন তিনি (তাঁহার নিয়োগস্থলের লোকদের প্রতি) রাগ করিয়া (আমার অনুমতি ব্যতিরেকে তথা হইতে) চলিয়া গেলেন তাঁহার ধারণা ছিল যে (এতটুকু ত্রুটির জন্য) আমি তাঁহার উপর কড়াকড়ি করিব না– (তাঁহাকে অভিযুক্ত করিব না, কিন্তু ঘটনা তাঁহার ধারণার বিপরীত হইল– আমি তাঁহাকে ঐ ত্রুটির জন্য অভিযুক্ত করিলাম। তিনি মাছের ঘটনায় পতিত হইলেন)। অতপর তিনি (রাত্রের অন্ধকার, নদীগর্ভের অন্ধকার, মাছের পেটের অন্ধকার– এই তিন) অন্ধকারে থাকিয়া জপনা করিলেন, হে আল্লাহ! তুমি ভিন্ন কোন মা'বুদ, মাকসুদ ও মাতলুব নাই; তুমি পাক-পবিত্র (বিনা অপরাধে তুমি শাস্তি দিও না)। বস্তুতঃ আমি অপরাধীদের দলভুক্ত হইয়াছিলাম।

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَالِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ـ

এই জপনার ফলে আমি তাঁহার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাহাকে যন্ত্রণাময় অবস্থা হইতে মুক্তি দিলাম। আমি আমার খাঁটি অনুগতগণকে এইরূপেই বিপদমুক্ত করিয়া থাকি।

(সূরা আম্বিয়া রুকু–৬ পারা– ১৭)

فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيْمَانُهَا الاَّ قَوْمَ يُوْنُسَ ـ لَمَّا اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ـ

যত দেশ আল্লাহর গযবে পতিত হইয়াছে কোন দেশই এমন পরিস্থিতিতে ঈমান আনিয়াছিল না যে, তাহাদের ঈমান তাহাদিগকে উপকার করিতে পারে; হাঁ– ইউনুসের জাতির ঘটনা এই ছিল যে, (আযাব আসিয়া যাওয়ার পূর্বক্ষণে আযাবের লক্ষণ দেখিয়াই) যখন তাহারা ঈমান গ্রহণ করিয়া নিল তখন অপদস্থকারী আযাব তাহাদের হইতে আমি হটাইয়া দিলাম; এবং তাহাদিগকে ইহজীবনের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সুখ ভোগের সুযোগ দিলাম (আখেরাতে তাহাদের পরবর্তী অবস্থার হিসাব অনুসারে ব্যবস্থা করা হইবে)।

(রুকু– ১১, পারা– ১৫)

اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ ـ لَوْلاَ اَنْ تَدٰرَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ ـ فَاجْتَبٰهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ـ

ইউনুস ভীষণ চিন্তামগ্ন অবস্থায় প্রভুকে ডাকিলেন। যদি তাঁহার প্রভুর বিশেষ করুণা তাঁহার সাহায্য না করিত তবে তিনি বালু চরেই দুরবস্থায় পতিত হইয়া থাকিতেন। (কিন্তু তওবা এস্তেগফারের ফলে) তাঁহার প্রভূ তাঁহাকে বিশিষ্ট মর্যাদা দান করিলেন এবং তাঁহাকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণদের শ্রেণীভুক্তরূপেই বহাল রাখিলেন।

(পারা– ২৯ রুকু– ৪)

হযরত ইউনুসের ইতিহাসে শিক্ষণীয় বিষয়

এই ইতিহাসে দুইটি উত্তম শিক্ষা আছে। প্রথম এই যে, তওবা-এস্তেগফার তথা আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন দ্বারা দুর্যোগ-দুর্ভোগ, আপদ-বিপদ ও আল্লাহর গযব সহজে দূর হয়; যেরূপ নিনওয়াবাসীদের হইয়াছিল।

দ্বিতীয় এই যে, যত মর্যাদাবান মানুষই হউক না কেন তাহাকে আল্লাহ তা'আলার পূর্ণানুগত্যের সহিত চলিতেই হইবে। এই ব্যাপারে ত্রুটি বিপদ টানিয়া আনিবে; ইহাতে কাহারও ব্যক্তিত্ব বা কোন সম্বন্ধ ব্যতিক্রমের ছিদ্র পথ সৃষ্টি করিতে পারে না। বরং যে যত বেশী নৈকট্যলাভকারী হইবে তাহার পক্ষে তত বেশী আশঙ্কার কারণ থাকিবে। হযরত ইউনুস (আঃ) আল্লাহ তাআলার পয়গম্বর– নিষ্পাপ ছিলেন, তবুও তাঁহার সামান্য ত্রুটি– যাহা গোনাহ পর্যায়ের ছিল না– শুধু ত্রুটি পর্যায়ের ছিল, উহার উপর কত বড় ঘটনা ঘটিয়া গেল!

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ হযরত ইউনুস (আঃ) আল্লাহ তা'আলার পয়গম্বর ছিলেন। পয়গম্বরের মর্তবা অনেক বড়, তাই তাঁহার সামান্যতম ত্রুটি আল্লাহ তা'আলার দরবারে অনেক বড় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। উহারই পরিপ্রেক্ষিতে পবিত্র কোরআনে হযরত ইউনুস (আঃ) সম্পর্কে ঐ ধরনেরই কোন কোন বাক্য ও শব্দ আল্লাহ তা'আলা ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন– ২৯ পারার ৪র্থ রুকুর আয়াতে আছে– ولا تكن كصاحب الحوت "আপনি মাছের ঘটনায় পতিত নবীর মত করিবেন না।" রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে সতর্ক করতঃ ইউনুস আলাইহিস সালামের প্রতিই আল্লাহ তাআলা এই ইঙ্গিত করিয়াছেন। সুতরাং কোন স্বল্প

জ্ঞান ও স্বল্প বুদ্ধির মানুষই ইউনুস আলাইহিস সালামের উচ্চ মর্যাদার বিপরীত কোন ধারণা পোষণ করিতে পারে। অথচ ঐরূপ ধারণা ঈমান ধ্বংসকারী,* তাই রসূল্লাহ (সঃ) স্বীয় উম্মতকে কঠোর ভাষায় সতর্ক করিয়াছেন। এমনকি স্বয়ং উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তুলনামূলকভাবে হযরত ইউনুসের উচ্চ মর্যাদাহানিকররূপে আমাকে উচ্চ শ্রেণীর এবং হযরত ইউনুসকে নিম্ন শ্রেণীর বলা হইলে বা ঐরূপ ধারণা করা হইলে তাহাও মস্ত বড় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। এই ধরনের তুলনামূলক তারতম্য কখনও করা যাইবে না। নিম্নের হাদীছে এই বিষয়টিকেই রসূলুল্লাহ (সঃ) বিভিন্ন উপলক্ষে ব্যক্ত করিয়াছেন–

১৬৬৪। হাদীছ ঃ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَيَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ اِنِّىْ خَيْرٌ مِّنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى

অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, খবরদার! তোমাদের কেহ যেন আমাকে উল্লেখ করিয়াও এইরূপ না বলে, আমি উচ্চ শ্রেণীর আর মাত্তার পুত্র ইউনুস নিম্ন শ্রেণীর।

ব্যাখ্যা ঃ তুলনামূলকভাবে এইরূপ উক্তি ইউনুস আলাইহিস সালামের মর্যাদাহানিকর হইবে, তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়াছেন; নতুবা প্রকৃত প্রস্তাবে নবী ও রসূলগণের মর্তবায় তারতম্য আছে; আল্লাহ তাআলা স্বয়ং পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন–

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ـ

"আমি রসূলগণের মধ্যে পরস্পর ফযিলত মর্তবার তারতম্য রাখিয়াছি।"

তাই বলিয়া কোন নবীর মর্যাদাহানিকর তুলনা ও উক্তি কখনও জায়েয হইবে না।

হযরত দাউদ (আঃ)

হযরত দাউদের সময়কাল ও স্থান

বনী ইসরাঈলগণ সীনাই উপত্যকাস্থিত তীহ্ প্রান্তরে চল্লিশ বৎসর আবদ্ধ থাকাকালেই হযরত মূসা ও হযরত হারুনের ইন্তেকাল হইয়া যায়। তারপর হযরত মূসার বিশিষ্ট প্রতিনিধি হযরত ইউশা নবী হন এবং তাঁহার পরিচালনায় বনী-ইসরাঈলগণ তাহাদের পৈতৃক ভূমি আরদ্ মোকাদ্দাস তথা ফিলিস্তিন জয় করিতে সমর্থ হয় এবং তাহারা ফিলিস্তিনের বিস্তীর্ণ এলাকায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করিয়া লয়। তথায় হযরত ইউশার পর হযরত কালব, তাঁহার পর হযরত হি'যকীল, তাঁহার পর হযরত ইল্ইয়াস তাঁহার পর হযরত ইয়াসা' প্রমুখ নবী বনী ইসরাঈলদিগকে পরিচালিত করেন। (রুহুল মাআনী – ২- ১৬৫) এইভাবে হযরত মূসার পর তিন বৎসরের অধিককাল অতিবাহিত হইয়া যায়।

হযরত মূসার পর চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফিলিস্তিন ও মিসরের মধ্য ভাগে ভূমধ্য সাগরের উপকূল অঞ্চলে বসবাসকারী দুর্ধর্ষ "আমালেকা" জাতির এক পরাক্রমশালী অত্যাচারী রাজা "জালুতের" পুনঃ আক্রমণ চলে ফিলিস্তিনের উপর। এই আক্রমণে বনী ইসরাঈলগণ অত্যাচারী জালুত রাজার হাতে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমনকি তাহাদের বিশেষ পাক-পবিত্র বস্তু "তাবুতে-সকীনা– শান্তির সিন্দুক" যাহার মধ্যে তওরাতের মূল পাণ্ডুলিপি, হযরত মূসার আ'ছা বা অলৌকিক লাঠি এবং হযরত মূসা ও হারুনের জামা ইত্যাদি বিভিন্ন বরকতের বস্তু রক্ষিত ছিল, সেই সিন্দুক পর্যন্ত শত্রুগণ লুট করিয়া নিয়া গিয়াছিল। বনী

* বাদশার ছেলে শাহজাদা কোন ত্রুটি করিলে মুরুব্বি স্বয়ং বাদশাহ শাহজাদাকে তাম্বীহ করিতে পারেন, শাহজাদাকে তাঁহার মর্যাদানুরূপ সংশোধন করিবার উদ্দেশে নিজে শাস্তিও দিতে পারেন, রাগও করিতে পারেন, কিন্তু তাহা দেখিয়া কোন চাপরাশি বা প্রজা যদি শাহজাদার প্রতি মানহানিকর ব্যবহার করে তবে তাহা কি কখনও বরদাশত করা যাইবে?

ইসরাঈলদের এই দুর্দিনে শিমবীল (আঃ) তাহাদের নবী হইলেন। তিনি খৃস্টপূর্ব ১১ শতাব্দী হইতে ১০ম শতাব্দীরও অংশবিশেষ পর্যন্ত ছিলেন। হযরত শিমবীলের সময়েও বনী-ইসরাঈলদের উপর জালুত রাজার অত্যাচার অব্যাহত ছিল।

এই জালুত রাজার বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্যই বনী ইসরাঈল সরদারগণ তাহাদের নবী শিমবীল আলাইহিস সালামের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিল যে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ বা নেতা মনোনীত করিয়া দেন, যাহার পরিচালনায় আমরা সমবেতভাবে সুশৃঙ্খল ও সংঘবদ্ধরূপে আমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদ করিব। অতপর শিমবীল (আঃ) বলিলেন, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য "তালুত" নামক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নেতা মনোনীত করিয়াছেন। এই মনোনয়নে তাহারা আপত্তি করিল, কিন্তু তাহাদের আপত্তি অগ্রাহ্য হইল। তালুতের প্রতি যে, আল্লাহ তা'আলার বিশেষ করুণার দৃষ্টি রহিয়াছে তাহার নিদর্শনস্বরূপ বনী ইসরাঈলদের হারান ধন "তাবুতে সকিনাহ্" শান্তির সিন্দুক" আল্লাহ তাআলার কুদরতে ফেরেশতাগণ কর্তৃক শত্রু কবল হইতে বনী ইসরাঈলদের নিকট প্রত্যর্পিত হইল। অবশেষে তালুতের পরিচালনাধীনে সৈন্য বাহিনী রওয়ানা হইল জালুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। পথিমধ্যে বনী ইসরাঈল বাহিনী এক পরীক্ষার সম্মুখীন হইল। মাত্র ৩১৩ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রণক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইল। রণক্ষেত্রে শত্রু সেনার মুখোমখি হইয়া সকলে আল্লাহ তাআলার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। প্রতাপশালী রাজা তালুত স্বয়ং রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল, সে ছিল নিতান্ত দুর্ধর্ষ বাহাদুর যোদ্ধা; তার সম্মুখে যাইতে কেহ সাহস করিতে ছিল না।

তালুতের সেই সৈন্যদলের মধ্যে দাউদ (আঃ)-ও শামিল ছিলেন। দাউদ তখন নবুয়ত প্রাপ্ত হন নাই, বরং তখন তাঁহার কোন বিশেষ প্রসিদ্ধিও ছিল না।

রণক্ষেত্রে রাজা জালুত হুঙ্কার মারিতেছিল, কেহই তাহার দিকে অগ্রসর হইতে ছিল না; দাউদ তাহার মোকাবিলায় অগ্রসর হইলেন এবং পাথর নিক্ষেপ করিলেন। পাথরের আঘাতে রাজা জালুত নিহত হইল, শত্রুদল পরাজিত হইল।

মুষ্টিমেয় তালুত বাহিনীর এই বিরাট সাফল্যের বাহ্যিক অসিলা ছিল দাউদের অসীম সাহসিকতা এবং তাঁহার বীরত্ব। এই ঘটনায়ই দাউদের প্রসিদ্ধি লাভ হইল। আল্লাহ তাআলার প্রিয় ত তিনি ছিলেনই, এখন তিনি জনপ্রিয়ও হইলেন।

আল্লাহ তাঁহাকে হযরত শিমবীল আলাইহিস সালামের পরে নবুয়ত দান করিলেন এবং তালুতের স্থলে তিনিই বনী ইসরাঈলদের বাদশাহও মনোনীত হইলেন। হযরত দাউদ (আঃ) একাধারে বনী ইসরাঈলদের নবীও হইলেন এবং বাদশাহও হইলেন।

ঐতিহাসিকদের মতে তালুতের সময়কাল খৃস্টপূর্ব ১০ম শতাব্দীর মধ্যে ছিল। তখন বনী ইসরাঈলগণ ফিলিস্তিনে বসবাসকারী ছিল। এই তথ্যের দ্বারা দাউদের সময়কাল এবং আবির্ভাবস্থল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করা সহজ। ঘটনার বিবরণ কোরআনে নিম্নরূপ–

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى اِذْ قَالُوْا لِنَبِىٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ـ قَالُوْا وَمَا لَنَآ اَلَّا نُقَاتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا ـ

জান কি? বনী ইসরাঈলদের ঘটনা যাহা মূসার পরে ঘটিয়াছিল? যখন তাহারা তৎকালীন নবী (শিমবীল আঃ)-কে বলিয়াছিল যে, আপনি আমাদের জন্য একজন বাদশাহ– নেতা মনোনীত করিয়া দিন যাহার পরিচালনাধীনে আমরা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিব। নবী বলিলেন, এরূপ আশঙ্কা ত নাই যে, তোমাদের নেতা মনোনীত করিয়া তোমাদের উপর জেহাদ ফরয হইলে তোমরা জেহাদে অগ্রসর না হও? তাহারা বলিল,

আমাদের জন্য জেহাদ না করার কি কারণ থাকিতে পারে? শত্রুগণ কর্তৃক আমরা সন্তান-সন্ততি ও ঘর-বাড়ী হারাইয়াছি। فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلاَّ قَلِيْلاً مِّنْهُمْ ـ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ـ

অতপর যখন (নেতা মনোনীত করিয়া) তাহাদের উপর জেহাদ ফরয করা হইল, তখন তাহারা অল্পসংখ্যক ব্যতীত সকলে জেহাদ হইতে ফিরিয়া রহিল। (যাহার বিবরণ সম্মুখে আছে) এই ধরনের জালেম- অন্যায়কারীদের সম্পর্কে আল্লাহ সব অবগত রহিয়াছেন।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ـ قَالُوْا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ـ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ـ وَاللّٰهُ يُؤْتِى مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَاۤءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ـ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖۤ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰۤئِكَةُ ـ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিলেন, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই তোমাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন তালুতকে বাদশাহ ও নেতারূপে। তাহারা বলিল, তালুত আমাদের নেতা কিরূপে হইতে পারে? আমরা তাহার তুলনায় নেতৃত্বের অধিক উপযুক্ত। তালুতের ত টাকা-পয়সার সচ্ছলতাও নাই। নবী বলিলেন, তাহাকে ত আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর প্রাধান্য দান করিয়া মনোনীত করিয়াছেন, আর তাহাকে দৈহিক গঠনে, শক্তিতে ও জ্ঞান-বুদ্ধিতে আধিক্য দিয়াছেন। অধিকন্তু আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন রাজত্ব দান করিয়া থাকেন, আল্লাহ সর্বাধিকারী, সর্বজ্ঞ। (নিজ বিজ্ঞতায় নেতা বানাইবেন)। নবী তাহাদিগকে আরও বলিলেন, তালুতের বাদশাহ ও নেতা মনোনীত হওয়ার বাহ্যিক নিদর্শন এই যে, তোমাদের প্রভুর বিশেষ কুদরতে তোমাদের নিকট আসিয়া যাইবে "তাবুতে সকিনা"- শান্তির সিন্দুক যাহাতে রহিয়াছে মূসা ও হারুনের পরিত্যক্ত বস্তু। ঐ সিন্দুককে তোমাদের নিকট নিয়া আসিবেন * ফেরেশতাগণ। এই ঘটনায় (তালুত আল্লাহর মনোনীত হওয়ার) বড় নিদর্শন রহিয়াছে। যদি তোমরা সত্য সত্যই মোমেন হও (তবে ইহা স্বীকার করিবে)।

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ـ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ـ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّىْ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّىْۤ اِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِّيَدِهٖ

অতপর যখন তালুত সৈন্যদল লইয়া অগ্রসর হইলেন তখন সঙ্গীগণকে বলিলেন, আল্লাহ তোমাদিগকে একটি নদী দ্বারা পরীক্ষা করিবেন- (শত পিপাসা হইলেও উহার পানি পেট পুরিয়া পান করা নিষিদ্ধ), অতএব যে কেহ উহার পানি পান করিবে সে আমার সঙ্গী হইবে না, আর যে পানি মুখেও লইবে না সে আমার সঙ্গী হইবে, অবশ্য যে শুধু এক অঞ্জলি পান করিবে (সেও সঙ্গী হইবে)।

فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلاَّ قَلِيْلاً مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ قَالُوْا لاَطَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ـ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ ـ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ـ

* অর্থাৎ আল্লাহর কুদরতে ফেরেশতাদের মাধ্যমে উহা তোমাদের নিকট পৌছিয়া যাইবে। কথিত আছে- আল্লাহর কুদরতে এরূপ হইল যে, শত্রুগণ ঐ সিন্দুক যথায়ই রাখে তথায়ই মহামারী রোগ দেখা দেয়, ফলে কোথাও রাখিতে বা কেহ উহার নিকট যাইতে রাজি হয় না। অবশেষে তাহারা ঐ সিন্দুককে গাড়ী ইত্যাদির কৌশলে দুইটি গরুর ঘাড়ে উঠাইয়া চালক ছাড়া গরুদ্বয়কে মরু অঞ্চলের দিকে তাড়াইয়া দিল, তখন ফেরেশতাগণ গরুদ্বয়কে হাঁকাইয়া বনী ইসরাঈলদের নিকট লইয়া আসিলেন।

(মরু অঞ্চলের প্রখর উত্তাপে পিপাসাতুর অবস্থায় ঐ নদীর নিকটে পৌঁছিয়া তাহারা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইল।) তাহাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলেই পেট পুরিয়া পানি পান করিল। (এই অকৃতকার্য দল তথায়ই হাত-পা ছাড়িয়া বসিয়া পড়িল, নদী পার হইল না)। অতপর যখন তালুত কৃতকার্য মোমেনগণকে সঙ্গে লইয়া নদী পার হইলেন তখন দুর্বল ঈমানের লোকগণ (–যাহারা এক অঞ্জলী পানি পান করিয়াছিল) বলিল, আমাদের (সংখ্যা কম হইয়া যাওয়ায়) আজ জালুৎ রাজা ও তাহার সৈন্যদলের সম্মুখীন হওয়ার শক্তি আমাদের হইবে না। পক্ষান্তরে পক্ক মোমেনগণ যাহারা অন্তরে জাগরুক রাখে যে আল্লাহর সন্নিধ্যে অবশ্যই হাজির হইতে হইবে (–যাহারা পানি মুখে না লাগাইয়া পূর্ণ কৃতকার্য হইয়াছিল) তাহারা বলিল, কতবার দেখা গিয়াছে, ছোট দল আল্লাহর হুকুমে বড় দলের উপর জয়ী হইয়াছে। আল্লাহর সাহায্য ত একমাত্র ধৈর্য্যশীলদের সঙ্গে থাকে।

وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ـ

যখন তাহারা জালুত ও তাহারা জালুৎ ও তাহার সৈন্যদলের মোকাবিলায় রণাঙ্গণে খাড়া হইল তখন তাহারা এইরূপ দোয়া করিল, হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! আমাদিগকে পূর্ণ ছবর ও ধৈর্যের তওফিক দান করুন, আমাদের কদম মজবুত করুন এবং কাফের জাতির উপর আমাদিগকে জয়যুক্ত করুন।

فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ـ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ ـ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ـ

আল্লাহর হুকুমে তালুতের মুষ্ঠিমেয় দল জালুতের বৃহৎ দলকে পরাজিত করিল এবং (হযরত) দাউদ রাজা জালুতকে মারিয়া ফেলিল। আর আল্লাহ দাউদকে রাজত্ব এবং পরিপূর্ণ জ্ঞান-বিদ্যা (তথা নবুয়ত) দান করিলেন, অধিকন্তু আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছা মতে তাঁহাকে বিভিন্ন শিক্ষা দান করিলেন, (যেমন বিশেষ হস্তশিল্প ইত্যাদি)।

হযরত দাউদের বংশ

হযরত দাউদ (আঃ) বনী-ইসরাঈল বংশের ছিলেন। ইসরাঈল তথা হযরত ইয়াকুবের "ইয়াহুদা" নামক পুত্রের সঙ্গে নয়জন পিতা-পিতামহের মাধ্যমে হযরত দাউদ মিলিত হন। (কাছাছোল কোরআন ১–৫৫)

হযরত দাউদের বৈশিষ্ট্য

প্রত্যেক নবীকেই আল্লাহ তা'আলা বৈশিষ্ট্য দান করিয়া থাকেন যাহা তাঁহার মো'জেজা রূপে গণ্য হইয়া থাকে। কারণ, উহা সাধারণতঃ অলৌকিক হয়। দাউদ (আঃ)-কেও আল্লাহ তাআলা বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিলেন, পূর্বোল্লিখিত আয়াতে وعلمه مما يشاء অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নিজ ইচ্ছামতে বিভিন্ন বিষয় দাউদকে শিক্ষা দিয়াছেন" বলিয়া এই তথ্যের প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে হযরত দাউদের দুইটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে। প্রথমটি এই যে, আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদকে আসমানী কেতাব "যবুর" তেলাওয়াত করিতে এবং আল্লাহ তা'আলার "তছবীহ" পড়িতে এইরূপ খোশ লেহান– মধুর সুর এবং এই রূপ আকর্ষণীয় তাছীর দান করিয়াছিলেন যে, তিনি যবুর তেলাওয়াত করিলে বা তছবীহ পড়িলে ঝাড়-জঙ্গল, গাছ-পালা হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী আসিয়া তাঁহার নিকটে জমায়েত হইত এবং হযরত দাউদের যবুর তেলাওয়াত বা তছবীহ পড়া শ্রবণে অভিভূত হইয়া তাঁহার সঙ্গে পাখী সমূহও মধুর স্বরে তছবীহ পড়িত। এমনকি, হযরত দাউদের পড়ার আওয়াজে পাহাড়ও

ঠিক থাকিতে পারিত না, তাঁহার সঙ্গে তছবীহ পড়ার ধ্বনি করিয়া উঠিত।

দ্বিতীয়টি এই যে, রাসায়নিক দ্রব্য বা কোন উপায়-উপকরণের সাহায্য ব্যতিরেকে শুধু হযরত দাউদের হাতের স্পর্শে লৌহ নরম হইয়া যাইত; তিনি ঐসব উপকরণ ছাড়াই বিভিন্ন লৌহ-দ্রব্য হাতে তৈরী করিতেন। এইসব বিষয়াবলীর বর্ণনা পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ–

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ـ وَكُنَّا فَعِلِيْنَ ـ وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَاْسِكُمْ ـ فَهَلْ اَنْتُمْ شَاكِرُوْنَ ـ

পর্বতমালাকে এবং পাখী দলকে দাউদের অনুসরণকারী সাথী বানাইয়া দিয়াছিলাম– ঐ গুলি দাউদের সঙ্গে তছবীহ– (আমার) মহিমা-জপ করিত। (এই বিষয়টা অসম্ভব নহে;) ইহার কর্মকর্তা ছিলাম আমি। আরও দাউদকে শিক্ষা দিয়াছিলাম নিপুণতার সহিত লৌহ-বর্ম তৈরী করা– যুদ্ধে তোমাদের শোকর করা আবশ্যক নয় কি? (সূরা আম্বিয়া, পারা– ১৭ রুকু– ৬)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلاً يٰجِبَالُ اَوِّبِىْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ـ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ـ اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَقَدِّرْ فِى السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ـ

আমার তরফ হইতে দাউদকে বিশেষ মর্যাদা দিয়াছিলাম– পর্বতমালা এবং পাখী দলকে আদেশ করিয়াছিলাম, দাউদের সঙ্গে মিলিয়া আমার তছবীহ– মহিমা-জপ কর। আর আমি তাঁহার হস্তে লৌহ নরম হওয়ার মো'জেযা দিয়াছিলাম। তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলাম, লৌহ-বর্ম পূর্ণাঙ্গরূপে তৈরী করিতে এবং উহার খুচরা অংশ তৈরী করিতে বিশেষ পরিমাপের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে। অতএব এই নেয়ামত স্মরণে পরিবার পরিজনসহ আমার শোকরগুজারী স্বরূপ নেক আমল করিও। আমি তোমাদের সমুদয় কার্যাবলী নিরীক্ষণ করিয়া থাকি। (পারা– ২২ রুকু– ৮)

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ ـ اِنَّهٗ اَوَّابٌ ـ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقْ ـ

আমার বিশিষ্ট বান্দা অলৌকিক ক্ষমতাধারী দাউদকে স্মরণ কর। তিনি ছিলেন আমার বিশেষ ভক্ত ও অনুরক্ত। পর্বতমালাকে তাঁহার অনুসরণকারী সাথী বানাইয়া দিয়াছিলাম; ঐগুলি তাঁহার সঙ্গীরূপে সকালে-বিকালে আমার তছবীহ-মহিমা-জপ করিত।

وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً ـ كُلٌّ لَّهٗ اَوَّابٌ ـ وَشَدَدْنَا مُلْكَهٗ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابْ ـ

এবং পাখীর দলও তাঁহার নিকট সমবেত হইতে; ঐগুলিও তাঁহার সঙ্গে যিকিরে আত্মনিয়োগ করিত। আর আমি দাউদের রাজত্বকে শক্তিশালী করিয়াছিলাম এবং তাঁহাকে বিশেষ জ্ঞান-বিদ্যা, সুস্পষ্ট বাকশক্তি বা ন্যায় বিচারের দক্ষতা দান করিয়াছিলাম। (সূরা ছাদ্, পারা– ২৩ রুকু– ১১)

হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালামের আরও একটি মো'জেযা নিম্নে বর্ণিত হাদীছে ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার উপর অবতারিত (আমাদের কোরআন শরীফের ন্যায়) আসমানী কেতাব "যবুর" যাহা সাধারণতঃ দীর্ঘ সময়ে খতম করা সম্ভব, সেই যবুর কেতাবের তেলাওয়াত তিনি অতি অল্প সময়ে খতম করিতে পারিতেন।

১৬৪৭। হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, (আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে হযরত) দাউদের পক্ষে আসমানী কেতাব যবুরের তেলাওয়াত অতি সহজ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এমনকি তিনি (চাকরকে) স্বীয় যানবাহনের উপর জিন বা গদি ও

আসন বাঁধিবার আদেশ করিয়া যবুর তেলাওয়াত আরম্ভ করিতেন; (চাকরের) জিন্ বাঁধা সমাপ্তের পূর্বেই দাউদ (আঃ) যবুর তেলাওয়াত সমাপ্ত করিতেন। আর হযরত দাউদ শুধু নিজ হস্ত-কার্যের উপার্জন দ্বারা স্বীয় ব্যয় বহন করিতেন।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ তা'আলার কুদরত অসীম, আর মানুষের জ্ঞান-বিবেক ও অনুভূতি সবই অকিঞ্চিৎকর, নেহায়েত সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। তাই অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহর কুদরতের লীলা মানুষের জ্ঞান-বিবেক ও অনুভুতির সীমারেখার অনেক উর্দ্ধে হইয়া থাকে; সেইরূপ ক্ষেত্রেই মোমেন ও ঈমানহীনের পরিচয় হয়। মোমেন ব্যক্তি অতি সহজেই ঐ শ্রেণীর বিষয়কে গ্রহণ ও স্বীকার করিয়া লইতে সক্ষম হয়, পক্ষান্তরে ঈমানহীন ব্যক্তি অস্বীকার বা সংশয়ের মধ্যেই থাকিয়া যায়। সে কূপে পতিত ব্যঙের ন্যায় তাহার অকিঞ্চিৎকর সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ জ্ঞান-বিবেক ও অনুভূতিকেই বাস্তবতার মাপমাঠি ধারণা করিয়া এই সীমার বাহিরে সব কিছুকেই অবাস্তব মনে করে। বলা বাহুল্য, ঐ ব্যঙের ধারণার কারণে যেরূপ সারা বিশ্বের বাস্তবতা উপেক্ষা করা বোকামি বৈ নহে, তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলার কুদরতের অসাধারণ ও অস্বাভাবিক লীলাকে উপেক্ষা করাও বোকামিই বটে।

আল্লাহ তা'আলার কুদরতের অসংখ্য লীলার একটি বিশেষ হইল "তাইয়্যে-আরদ" অথ্যাৎ বহু দূরে দূরে অবস্থিত দুইটি স্থানের ব্যবধান ও দূরত্বকে ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে বাস্তবেই কম করিয়া দেয়া। এইরূপ করা মানুষের শক্তির বাইরে বটে, কিন্তু উহা বুঝিবার জন্য সামান্য সঙ্গতি সম্পন্ন একটি নজির আমাদের সম্মুখে আছে–

দুরবীণের সাহায্যে আমরা দূরে দূরে অবস্থিত দুইটি স্থানের ব্যবধান ও দূরত্বকে অতি কম দেখিতে পাইয়া থাককি দূরের জিনিষকে নিকটে দেখিয়া থাকি। এ স্থলে একটি যন্ত্রের সাহায্যে যে অবস্থা আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে সৃষ্টি হয় সেই অবস্থাটাই সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার কুদরতে বাস্তবে পরিণত হওয়ার নামই হইল "তাইয়্যে-আরদ্"। যাহা আল্লাহ তা'আলা তাঁহারে বিশিষ্ট বান্দাদের পক্ষে ক্ষেত্র বিশেষে সংঘটিত করিয়া থাকেন, ফলে কোন প্রকার দ্রুতগতি ব্যতিরেকেই উভয় স্থানের দূরত্বকে অপেক্ষাকৃত অতি অল্প সময়ে অতিক্রম করিয়া যাওয়া সম্ভব হইয়া পড়ে।

ইহা হয় স্থান ও জায়গার ক্ষেত্রে; এই ধরনেরই আর একটি ব্যবস্থা হয় সময় ও কাল ব্যাপারে– উহাকে বলা হয় "তাইয়্যে-যমান"। অর্থাৎ স্বাভাবিক ও সর্বসাধারণের পরিমাপ এবং হিসাবে যাহা দীর্ঘ পরিমাণের সময়, সেই দীর্ঘ সময়কালই ব্যক্তি বিশেষের জন্য প্রকৃত প্রস্তাবে অল্প ও সামান্য পরিমাণের হইয়া যাওয়া। যেমন, স্বাভাবিক ও সর্বসাধারণের হিসাবে ১ মাস ব্যক্তি বিশেষের জন্য ১ দিন হইয়া যাওয়া, দিবারাত্র ১ দিন ব্যক্তি বিশেষের জন্য মাত্র ১০ মিনিট হইয়া যাওয়া!

ইহা পরিলক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্র এই যে– একটি কাজ যাহার সম্পাদন স্বাভাবিক স্তরে সুদীর্ঘ সময়ের; সেই কাজটি ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা এমনভাবে সম্পন্ন হওয়া যে, উহা সম্পাদনার সময়টাই সর্বসাধারণের হিসাবে অল্প পরিমাণের হয়।

অতি সামান্য সঙ্গতির একটি নজির লক্ষ্য করুন! একজন লোক স্বপ্নে এমন কার্যাবলী করে বা এমন ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করে যাহা ২/৪/১০ দিন বা মাস ও বৎসরের দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ; এই দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ কার্য বা ঘটনাটি ঐ ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ কোন দ্রুততা অবলম্বন ব্যতিরেকে অনুষ্ঠিত হয় এইরূপে যে, সেই দীর্ঘ সময়ব্যাপী কার্যাবলী ও ঘটনাটির সময় ও কাল জাগ্রত সর্বসাধারণের পক্ষে সামান্য পরিমাণের হয়– শুধু অর্থ ঘন্টা বা এক ঘন্টা মাত্র।

স্বপ্নে আমাদের জন্য যেইরূপে দীর্ঘ সময়ের ঘটনা অল্প সময়ে সম্পন্ন হয়, ঐরূপে আল্লাহর কুদরতে ব্যক্তি বিশেষের জন্য দীর্ঘ সময়ের কার্য বা ঘটনা অল্প সময়ে বাস্তবে এবং প্রকৃত প্রস্তাবেও সম্পন্ন হওয়ার ব্যবস্থাকেই "তাইয়্যে-যমান" বলা হয়।

নবীগণ ও ওলিগণ আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে এই ব্যবস্থার মাধ্যমেই দীর্ঘসময়ের কার্য ও ঘটনা অল্প সময়ে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। সঙ্কীর্ণ যুক্তিবাদী লোকগণ উহাকে উপলব্ধি না করিতে পারিয়া হয়ত অস্বীকার করিয়া বসে, না হয় "স্বপ্ন" বলিয়া আখ্যায়িত করে। কারণ স্বপ্নের মাধ্যমে ঐ ব্যবস্থা তাহাদের বিবেকে বোধগম্য হয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার কুদরতে যে এই ব্যবস্থাটি বাস্তবেও সম্পন্ন হইতে পারে তাহা অস্বীকার করিতে তাহারা দ্বিধাবোধ করে না।

এই "তাইয়্যে-যমান" ব্যবস্থার মাধ্যমেই হযরত দাউদ (আঃ) দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ "যবুর" কেতাবের খতম অতি অল্প সময়ে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইতেন, অথচ তাঁহাকে কোন প্রকার বিশেষ দ্রুততাও অবলম্বন করিতে হইত না।*

হযরত দাউদ (আঃ) এবাদত-বন্দেগীর মধ্যেই অধিক সময় মশগুল থাকিতেন। স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অধিক এবাদৎ করার জন্য হযরত দাউদের আদর্শ বিশেষ অনুসরণীয় ছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) বিভিন্ন সময়ে হযরত দাউদের আদর্শ ছাহাবীদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। নিম্নে বর্ণিত হাদীছটি ঐ শ্রেণীরই

১৬৪৮। হাদীছ ঃ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُّ الصِّيَامِ اِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوٗدَ وَكَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَاَحَبُّ الصَّلٰوةِ اِلَى اللهِ صَلٰوةُ دَاوٗدَ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهٗ وَيَنَامُ سُدُسَهٗ ـ

অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন, যেই রীতিতে দাউদ (আঃ) নফল রোযা রাখিতেন সেই রীতি আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয়। দাউদ (আঃ) সর্বদা একদিন রোযা রাখিতেন, একদিন রোযাহীন কাটাইতেন।

আর যেই নিয়মে দাউদ (আঃ) তাহাজ্জুদ নামায পড়িতেন সেই নিয়ম আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয়। দাউদ (আঃ) রাত্রের প্রথমার্ধে নিদ্রা যাইতেন, তৃতীয়াংশে তাহাজ্জুদ পড়িতেন অবশিষ্ট ষষ্ঠাংশ পুনঃ নিদ্রা যাইতেন।

হযরত দাউদের বিশেষ ঘটনা

সর্বদার জন্য স্মরণীয় একটি উপদেশ– এক হাদীছে বর্ণিত আছে, কোন বান্দা নেক কাজ করিয়া যদি বলে, হে পরওয়ারদেগার! আমি এই নেক কাজ করিয়াছি– আমি ছদ্‌কা করিয়াছি, আমি নামায পড়িয়াছি, আমি গরীব মিছকিন খাওয়াইয়াছি। তবে আল্লাহ তা'আলা (তাহার এই আমিত্বে অসন্তুষ্ট হইয়া) বলেন, আমি তোমার সাহায্য করিয়াছি, আমি তোমাকে তৌফিক এবং শক্তি ও সামর্থ দান করিয়াছি। (অর্থাৎ এইসব দানের ফলে তুমি এই সব কাজ সমাধা করিতে পারিয়াছ, এখন তুমি আমার নাম উল্লেখ কর না, শুধু নিজের কথাই বলিতেছ)।

---

* হযরত মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উম্মতের মধ্যেও অনেক অনেক ওলীর দ্বারা এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। হিজরী একাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ আলেম শেখ নুরুদ্দিন আলী ইবনে সুলতান– মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) মেশকাত শরীফের ব্যাখ্যায় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ কিতাব 'মেরক্বাত' ৫-৩৪৪ পৃষ্ঠায় মোল্লা জামীর এক কিতাবের উদ্ধৃতি প্রদান কিরয়াছেন যে, একজন বিশিষ্ট বুজুর্গ কা'বা শরীফের তাওয়াফ করাকালে হজরে আছওয়াদ ও কা'বা শরীফের দরওয়াজার মধ্যবর্তী স্থান, যাহা মিনিটের মধ্যে অতিক্রম করতে পারে– এই সামান্য স্থান অতিক্রম করিতে পূর্ণ কোরআন শরীফ খতম করিয়াছেন।

চতুর্দশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ আলেম দেওবন্দ মাদ্রাসার মুহাদ্দেস মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রঃ)-এর বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা "ফয়যুল বারী ৪-৯৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, সুফীকুলশিরমণি শেখ শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী (রঃ) একদিন এক রাত্রে ষাট বার কোরআন শরীফ খতম করিতেন এবং দিল্লীর শাহ ইসমাঈল (রঃ) আছর হইতে মাগরেব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ধীর স্থিরতার সহিত কোরআন শরীফ খতম করিতেন।

কোরআন হাদীছের অসংখ্য প্রমাণাদিতে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রসিদ্ধ মে'রাজ শরীফের ঘটনা উক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্পন্ন হইয়াছিল– বাস্তব ছিল, স্বপ্ন ছিল না।

পক্ষান্তরে যদি বান্দা নেক কাজ করিয়া বলে, হে পরওয়ারদেগার! (নেক কাজ সমাধায়) তুমি আমার সাহায্য করিয়াছ, তুমি আমাকে তৌফিক এবং শক্তি ও সামর্থ দান করিয়াছে, এই ব্যাপারে তুমি আমার বহু উপকার করিয়াছ; তবে আল্লাহ তা'আলা (তাহার উক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া) বলেন, তুমি এই নেক কাজ সম্পন্ন করিয়াছ; তুমি ইহা সমাধা করার ইচ্ছা করিয়াছ, তুমি নেকী কামাই করিয়াছ। (মাদারেজুছ ছালেকীন ১-১৯)

এই হাদীছের মর্মে বুঝা যায়, বান্দা যত নেক কাজই করুক উহার সম্বন্ধ নিজের প্রতি করাকে আল্লাহ তাআলা আদৌ পছন্দ করেন না।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা দাউদ (আঃ) বলিলেন, " হে পরওয়ারদেগার! রাত্র দিনের এক সেকেন্ডও দাউদের ঘর তোমার এবাদত হইতে খালি থাকে না।"

হযরত দাউদ নিজের পরিবারবর্গের মধ্যে একের পর এক এবাদতের জন্য এইরূপে দিন-রাতের সময় বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহার ঘরে যেন দিবারাত্র সর্বদাই আল্লাহ তাআলার এবাদত হইতে থাকে, এক মুহূর্তও যেন এবাদত হইতে তাঁহার ঘর খালি না থাকে।

এতদ্ভিন্ন হযরত দাউদ স্বীয় কার্যের রুটিন এইরূপে তৈরী করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, একদিন নির্জনে একমাত্র এবাদতে মশগুল থাকিয়া কাটাইতেন ঐদিন তাঁহার সঙ্গে কাহারও সাক্ষাত করার অনুমতি থাকিত না। বাড়ীর গেইটে পাহারাদার রাখিয়া দিতেন, যেন কেহ আসিয়া হযরত দাউদের এবাদতে বাধার সৃষ্টি করিতে না পারে। আর একদিন মামলা-মকদ্দমার রায় ও ফয়ছালা দানের জন্য, আর একদিন নিজের সাংসারিক ও পারিবারিক কাজের জন্য, আর একদিন সর্বসাধারণকে ওয়াজ-নছীহত, তবলীগ-তলকীন করার জন্য রাখিয়াছিলেন। এইরূপে চার দিনের প্রোগ্রামের উপর স্বীয়কার্যের রুটিন তৈরী করিয়া রাখিয়াছিলেন, যাহার উপর তিনি চলিতেন। (কাছাছুল কোরআন)

হযরত দাউদ (আঃ) নিজ গৃহে আল্লাহ তাআলার এবাদতের যে সুশৃংখল ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন, উহার উপর তিনি আত্মতুস্টি বাবাপন্ন হইয়া বলিলেন, " হে পরওয়ারদেগার! দিন-রাত্রের প্রতি মুহূর্তে দাউদ-পরিবারের কোন একজন অবশ্যই তোমার এবাদতে মশগুল থাকে।"

হযরত দাউদের এই আত্মতুষ্টি আল্লাহ তাআলার না-পছন্দ হইল, (যেরূপ পূর্বে বর্ণিত হাদীছেও উল্লেখ রহিয়াছে।)* আল্লাহ তাআলা বলিলেন, এসবই একমাত্র আমার সাহায্য-সহায়তায় এবং তৌফিক দানের বদৌলতে হয়। আমার সাহায্য না পাইলে তুমি কোন কিছুর উপর সক্ষম হইতে পার না। আমার মহানত্বের

---

* এই ধরনের আত্মতুষ্টি- আমিত্ব অতি সাধারণ মনে হইলেও নবীগণের পক্ষে আল্লাহ তা'আলা উহাকে ব্যর্থ না করিয়া ছাড়েন না। নবীগণের মর্তবা অনেক বড়; বড় মর্তবার লোকের ছোট ক্রুটিও বড় অপরাধের ন্যায় গণ্য হয় এবং উহাকে ব্যর্থ ও খন্ডনকারী ঘটনার সম্মুখিন করা হয়। যেন মূসা (আঃ) কোন এক উপলক্ষ্যে বলিয়াছিলেন, "সর্বাধিক বিজ্ঞ আমি" নবীর পক্ষে এই দাবী অবাস্তব ছিল না, কিন্তু এই আমিত্ব আল্লাহ তা'আলার না-পছন্দ হইয়াছিল, যদ্দরুন হযরত মূসা এক বিরাট ঘটনার সম্মুখিন হইয়াছিলেন- যাহার বিবরণ প্রথম খন্ডে খিজির (আঃ) সম্পর্কীয় হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত ছোলায়মান (আঃ) একদা জেহাদের প্রস্তুতি উপলক্ষে বলিয়াছিলেন, অদ্য আমি আমার একশত স্ত্রীর প্রত্যেকের সঙ্গে সঙ্গম করিব, প্রত্যেকে একটি সন্তান জন্ম দিবে যাহারা আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদ হইবে। কথাটা ভালই ছিল, কিন্তু নিজের উপর আস্থা রাখিয়া বলা হইয়াছিল, আল্লাহ তা'আলার উপর তোয়াক্কা করিয়া বলা হয় নাই। ফলে আল্লাহ তাআলা হযরত ছোলায়মানকে বিফল মনোরথ করিলেন, শুধুমাত্র একজন ব্যতীত কোন স্ত্রীই গর্ভধারণ করিল না এবং গর্ভধারিণী স্ত্রীও একটি অপূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করিল; যাহার একহাত এক পা ছিল না। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) সেই ঘটনা উপলক্ষে শপথ করিয়া বলিয়াছেন, যদি হযরত ছোলায়মান স্বীয় উক্তি আল্লাহ তা'আলার উপর তোয়াক্কা রাখিয়া বলিতেন, তবে নিশ্চয়ই প্রত্যেক স্ত্রী এক একজন মুজাহিদ জন্ম দান করিতেন। বিস্তারিত বিবরণ হযরত ছোলায়মানের বর্ণনায় আসিবে।

হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামেরও একটি ঘটনার প্রতি পবিত্র কোরআনেই ইঙ্গিত রহিয়অছে- একদা কাফেরগণ তাঁহাকে পরীক্ষামূলকভাবে "আছহাবে-কাহাফের" ঘটনা জিজ্ঞাসা করিল। হযরত (সঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, আগামীকল্য বলিব। হযরতের মনে এই ছিল যে, অহীর দ্বারা জ্ঞাত হইয়া পরদিন তাহাদিগকে বলিয়া দিবেন, কিন্তু কথাটি তিনি আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা না রাখিয়া শুধু নিজের উপর ভরসা রাখিয়া বলিলেন, ইহা আল্লাহ তা'আলার নিকট না পছন্দ হইল, ফলে ১৫ দিন পর্যন্ত অহী বন্ধ রহিল। হযরত (সঃ) অত্যন্ত চিলিত হইলেন। অতপর অহী নাযিল হইল এবং তাঁহাকে সর্বদার জন্য সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল যে, কখনও আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা রাখা ব্যতীত কোন কাজ করার বা কোন কিছু বলার ঘোষণা দিয়া বসিবেন না। (পবিত্র কোরআন সূরা কাহাফ দ্রষ্টব্য)

শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি তোমাকে একদিন তোমার নিজের উপর ছাড়িয়া দিব। (আমার সাহায্য হটাইয়া লইব, তখন দেখা যাইবে, তুমি তোমার শৃংখলা ও সুব্যবস্থা কতদূর ঠিক রাখিতে পার!)

হযরত দাউদের যেই দিনটি এবাদতের জন্য নির্দিষ্ট ছিল একদা সেই দিন তিনি বিশেষ পাহারা ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থার মধ্যে নির্জনে স্বীয় এবাদতে মশগুল হইলেন। বাড়ীর গেটের উপর কড়া পাহারা রহিয়াছে, কেহ যেন আসিয়া হযরত দাউদের এবাদতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে না পারে।

আজ আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদকে তাঁহার নিজের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন, স্বীয় সাহায্য-সহায়তা হটাইয়া লইয়াছেন, ফলে হযরত দাউদের বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থাবলীও কোন কাজে আসিল না। হঠাৎ দুই দল লোক বাড়ীর গেট দিয়া না আসিয়া অন্য দিক দিয়া দেয়াল টপকাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং হযরত দাউদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রথমতঃ তাহাদের আকস্মিক আগমনে হযরত দাউদ (আঃ) শঙ্কিত হইলেন, এমনিক এবাদতের একাগ্রতা হইতে বিচ্যুৎ হইয়া পড়িলেন। অতপর তাহারা তাঁহার নিকট একটি ঝগড়ার মীমাংসা চাহিয়া একপক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করিল এবং তাহারা হযরত দাউদের সঙ্গে যে কথোপকথন করিল তাহাতেও রুক্ষতা অবলম্বন করিল। তাহাদের ঝগড়াও অতি সামান্য ছিল, যাহার জন্য এত কড়া বিশৃঙ্খলাজনক কার্য বাস্তবিকই বিরক্তিজনক ও দুঃখজনক হয়। এইসব ঘটনা প্রবাহের হযরত দাউদের এবাদত পরিচালনার রুটিন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইয়া গেল, তাঁহার ঘরে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর এবাদত করার যে ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা বাতিল হইয়া গেল।

এখন হযরত দাউদের চক্ষু খুলিল; তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার উপর দিয়া আল্লাহ তা'আলার পরীক্ষা প্রবাহিত হইয়া গেল। আল্লাহ তাআলা এই পরীক্ষায় তাঁহাকে দেখাইয়া দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ব্যতিরেকে শত শত ব্যবস্থাও নিষ্ফল হয়। এই অনুভূতির সাথে সাথে হযরত দাউদ তৎক্ষণাৎ আল্লাহর দরবারে সেজদায় নত হইলেন।

আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদের ত্রুটি ক্ষমা করিলেন এবং তাঁহাকে সান্তনা দানে তাঁহার মর্তবা বাড়াইয়া দিলেন। ঘটনাটির বর্ণনা পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ–

وَهَلْ اَتٰكَ نَبَؤُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُوْا الْمِحْرَابَ ـ اِذْ دَخَلُوْا عَلٰى دَاوٗدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَاتَخَفْ خَصْمٰنِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَاَ تُشْطِطْ وَاهْدِنَا اِلٰى سَوَآءِ الصِّرَاطِ ـ

তুমি কি বিরোধমান দলদ্বয়ের ঘটনা জ্ঞাত আছ? যখন তাহারা দেয়াল টপকাইয়া এবাদত খানায় প্রবেশ করিল– যখন তাহারা দাউদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহাদের আকস্মিক আগমনে দাউদ সন্ত্রস্ত হইলেন। তাহারা বলিল, ভয় পাইবেন না, (আমরা দেও-ভুত বা শত্রু নহি)। আমরা দুইটি বিবাদমান দল; একে অপরের প্রতি অন্যায় করিয়াছি। আপনি আমাদের মধ্যে ন্যায় ফয়ছালা করিয়া দিন, অন্যায় করিবেন না এবং আমাদিগকে মীমাংসার সহজ পথ বাতলাইয়া দিন।

اِنَّ هٰذَا اَخِىْ لَهٗ تِسْعُ وَتِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَلِىَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ ـ فَقَالَ اَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِىْ فِى الْخِطَابْ ـ

একজন অপরজনের প্রতি অভিযোগ করিল, আমার এই ভাই– নিরানব্বইটি দুম্বা তাহার আছে, আমার আছে শুধু একটি দুম্বা; এতদসত্ত্বেও সে আমাকে বলেন, তোমার দুম্বাটা আমাকে দিয়া দাও এবং তর্কে সে আমার উপর জিতিয়া যায়; আমি কথায় তাহার সঙ্গে পারি না।

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖ ـ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِىْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّاهُمْ ـ

দাউদ (আঃ) উক্ত অভিযোগ সম্পর্কে এই রায় দান করিলেন যে, এই ব্যক্তির এতগুলি দুম্বা থাকা সত্ত্বেও তোমার দুম্বাটা চাওয়া তাহার জন্য তোমার প্রতি অবিচার। একত্রে বসবাসকারী লোকগণ অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর এইরূপ অন্যায়-অবিচার করিয়া থাকে। অবশ্য যাহারা খাঁটি মোমেন ও নেককার হন তাঁহারা সতর্ক হইয়া চলেন, অবিচার অন্যায় করেন না; অবশ্য এইরূপ লোকের সংখ্যা নগণ্য।

وَظَنَّ دَاوُدَ اَنَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ ـ فَغَفَرْنَا لَهُ ذٰلِكَ ـ وَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ـ

দাউদ বুঝিয়া ফেলিলেন, তিনি আমার পরীক্ষায় পড়িয়াছেন। তৎক্ষণাৎ স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হইলেন, এবং সেজদায় পড়িয়া আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হইলেন, ফলে আমি তাঁহার ত্রুটি ক্ষমা করিলাম। তাঁহার জন্য আমার নৈকট্য এবং শুভ পরিমাণ রহিয়াছে। (পারা-২৩, রুকু-১১)*

হযরত দাউদ আলাহিস্ সালামের উম্মতের বিশেষ উপদেশমূলক একটি ঐতিহাসিক ঘটনা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে। হযরত দাউদের শরীয়তে শনিবার দিনটি আমাদের শুক্রবার দিনের ন্যায় এবাদতের জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ দিন ছিল। বরং আমাদের শরীয়তে যেরূপ জুমআর আযানের পর দুনিয়ার কাজ-কর্মে লিপ্ত হওয়া নিষিদ্ধ হইয়া যায় হযরত দাউদের শরীয়তে তদপেক্ষা অধিক কড়াকড়ি ছিল যে, শনিবার পূর্ণ দিন দুনিয়ার কাজ-কর্ম ও উহার লিপ্সা হারাম ছিল। এক সময়ে দাউদ আলাইহিস সালামের উম্মতের একটি সম্প্রদায় যাহারা সমুদ্রোপকূলের বাসিন্দা ছিল- তাহারা ঐ শনিবার সম্পর্কে একটি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইল। অনেকে সেই পরীক্ষায় নিজেদের সামলাইতে না পারিয়া আল্লাহ তাআলার নিষেধাজ্ঞা লংঘন করিয়া বসিল, ফলে তাহারা আল্লাহ তা'আলার গযবে পতিত হইল। তাহাদের পরীক্ষার ও আযাবের বিবরণ এই-

তাহারা ছিল জেলে সম্প্রদায়। সমুদ্রে মাছ শিকার করাই ছিল তাহাদের কাজ ও ব্যবসা। তাহাদের শরীয়ত অনুযায়ী শনিবার দিন তাহাদের জন্য মাছ শিকার বন্ধ রাখা ফরয ছিল। সুতরাং মাছ শিকার করা ছিল হারাম। এদিকে আল্লাহর কুদরত- শনিবার দিন সমুদ্রের অসংখ্য মাছ পানির উপর ভাসিয়া কিনারায় আসিয়া যাইত; অন্য কোন দিন এই সমস্ত মাছ দেখাও যাইত না। জেলে সম্প্রদায়ের ঐ লোকেরা শনিবার দিন মাছের এই অবস্থা দৃষ্টে লোভ সামলাইতে পালি না; তাহারা এই দিনে অবৈধরূপে মাছ শিকারের নিমিত্ত ফন্দি আঁটিল-

তাহারা সমুদ্রকূলে পুকুর কাটিল এবং সমুদ্র হইতে খাল কাটিয়া ঐ পুকুর সমূহে সংযোগ করিয়া দিল। শনিবার দিন মাছগুলি সমুদ্র কিনারায় খেলা করিতে করিতে ঐ খাল পথে পুকুরে আসিয়া জমা হইত। ঐ লোকেরা যখন দেখিত, পুকুরগুলি মাছে পরিপূর্ণ হইয়াছে, তখন খাল্লের মুখ বন্ধ করিয়া দিত, ফলে মাছগুলি পুকুরে আবদ্ধ হইয়া যাইত। পরদিন রবিবার তাহারা ঐসব মাছ পুকুরসমূহ হইতে উঠাইয়া নিয়া আসিত তাহারা ভাবিত, মাছ শিকার করা শনিবারে হইল না, রবিবারে হইল, অথচ ঐ মাছ শিকারের মূল কাজটা

* পাঠকবর্গ। পবিত্র কোরআনের উল্লিখিত বিবরণ সম্পর্কীয় ঘটনা সম্বন্ধে যে বর্ণনা দান করা হইল শাইখুল-ইসলাম মাওলানা শাব্বির আহমদ (রঃ) তাঁহার প্রসিদ্ধ কোরআনের ব্যাখ্যায় ইহাই লিখিয়াছেন। বাইবেল সঙ্কলনকারী খৃষ্টানদের একটি সাধারণ স্বভাব যে, তাহারা ঈসা আলাইহিস্ সালামকে এত উর্ধ্বে উঠায় যে, তাঁহাকে প্রভুত্বের স্থান দেয়, পক্ষান্তরে অন্যান্য অনেক অনেক নবীগণের সম্পর্কে এমন এমন ভিত্তিহীন ঘটনা রচনা করে যদ্দারা তাঁহাদের মান মর্যাদা নষ্ট হয় এবং তাঁহারা হেয় প্রতিপন্ন হন। আলোচ্য বিবরণ সম্পর্কে এই খৃষ্টানগণই কোন একটি লোকের সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে হযরত দাউদের এমন একটি জঘন্য ঘটনা গড়িয়াইয়াছে যাহা একজন সাধারণ মানুষের পক্ষেও অতীব কলঙ্কময় বলিয়া গণ্য হইবে।

দুখের বিষয় কোন কোন তফসীরকার যাহাদের নীতি হইল- কোন ঘটনা সম্পর্কে ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা সব রকম বর্ণনা সমাবেশ করা; তাঁহারা সত্য-মিথ্যার বিচার করেন না। কিম্বা তাঁহারা হয় ত সত্য-মিথ্যার বিচারের সঙ্গেই বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু ইসলাম দুশমনগণ তাঁহাদের সেই সত্য-মিথ্যার বিচার বাদ দিয়া শুধু ঘটনাকে ঐ তফসীরকারদের নামে উদ্ধৃত করিয়াছে- এইরূপে খৃষ্টানদের সেই গর্হিত বিবরণ মুসলমান তফসীরকারদের নামেও প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ ধরনের বিবরণ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

শনিবারই সম্পন্ন করা হইয়াছে। অতএব উহা তাহাদের জন্য হারাম কাজে লিপ্ত হওয়াই ছিল– বরং জঘন্যরূপে তথা ফন্দি-ফেরেব আকারে। এই ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে তিনটি শ্রেণী সৃষ্টি হইল– (১) এক শ্রেণী যাহারা ঐ ফন্দি-ফেরেবে মাছ শিকারে লিপ্ত ছিল। (২) আর এক শ্রেণী যাহারা ওয়াজ-নছিহত করিয়া ঐ হারাম কাজে বাধা দিতে ছিল। (৩) আর এক দল ঐ কাজে লিপ্ত হয় নাই, কিন্তু লিপ্তদিগকে বাধাদানেও তৎপর হয় নাই, এমনকি ঐ তৎপরতাকে নিরর্থক ভাবিত।

প্রথম শ্রেণীর লোকগুলি তাহাদের অসৎ কার্য হইতে বিরত না থাকায় তাহাদের উপর আল্লাহর আযাব আসিল; তাহারা বানর হইয়া গেল এবং তিনদিন বানর থাকিয়া সবাই মরিয়া গেল। ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, ঐ আযাবে তৃতীয় শ্রেণীও ধ্বংস হইয়াছে। কারণ, অসৎ কাজে বাধাদানের ফরয তাহারা আদায় করে নাই। অবশ্য দ্বিতীয় শ্রেণী আযাব হইতে রেহাই পাইয়াছিল বলিয়া পবিত্র কোরআনেই উল্লেখ রহিয়াছে। ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনে এইরূপ–

وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاظِرَةَ الْبَحْرِ. اِذْ يَعْدُوْنَ فِى السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَايَسْبِتُوْنَ لَاتَاتِيْهِمْ كَذٰلِكَ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ -

২২০ইহুদীদেরকে জিজ্ঞাসা কর, ঐ বস্তিবাসীদের ঘটনা যাহারা সমুদ্রোপকূলবাসী ছিল। যখন তাহারা শনিবার সম্পর্কীয় নিষেধাজ্ঞার সীমা লংঘন করিতে ছিল। শনিবার দিন তাহাদের নিকট সমুদ্রের মৎস্যসমূহ পানির উপরে ভাসিয়া কিনারায় আসিয়া যাইত। শনিবার ছাড়া অন্য দিন ঐরূপে আসিত না; ইহা তাহাদের জন্য আমার পরীক্ষা ছিল। কারণ তাহারা সীমালংঘনে অভ্যস্ত ছিল।

وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا نِ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا - قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ - فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهِ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ -

আরও একটি স্মরণীয় কথা– (কিছু সংখ্যক লোক তাহাদের ঐ অসৎ কার্যে বাধা দিলে) তাহাদেরই এক শ্রেণীর লোক (বাধাদানকারীদিগকে নিরুৎসাহ করার উদ্দেশ্যে) বলিল, ঐ লোকদেরকে কেন ওয়ায-নছিহত কর যাহাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করিবেন বা কঠিন আযাব দিবেন? বাধাদানকারী দল বলিলেন, আমরা পরওয়ারদেগারের নিকট ক্ষমার্হ গণ্য হইতে চাই এবং আশা রাখি, হয়ত এই অসৎ লোকেরা অসৎ কাজ হইতে ফিরিয়া যাইবে। অতপর অসৎ লোকের দল সব ওয়ায-নছিহতকে উপেক্ষা করিল তখন আমি বাধাদানকারী দলকে রক্ষা করিলাম।

وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ - فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّانُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ -

আর অন্যায়কারী সকলকে কঠিন আযাবে পাকড়াও করিলাম তাহাদেরই সীমা লংঘনের কারণে। (যাহার বিবরণ এই যে–) যে কাজ তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল তাহারা যখন গোড়ামী করিয়া সেই কাজে লিপ্ত হইল তখন তাহাদের উপর আমার আদেশ বলবৎ হইল যে, তোমরা লাঞ্ছিত বানর হইয়া যাও।

তাহারা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে চালাকী-বজ্জাতী করার ফন্দি আঁটিয়াছিল, তাই তাহাদের সেই স্বভাবের জীবেই পরিণত করিয়া লাঞ্ছনার সহিত ধ্বংস করা হইয়ছে। বানর হইয়া তাহারা তিন দিন জীবিত ছিল; তাহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি এবং উপলব্ধি অনুভূতি সবই বিদ্যমান ছিল, কিন্তু কথা বলার শক্তি ছিল না। সবকিছু স্মরণ করিয়া একে অপরকে দেখিয়া কাঁদিয়া বেড়াইত। তিন দিন এই লাঞ্ছনা ভোগের পর সবাই মৃত্যুমুখে

পতিত হইয়াছিল। এই ঘটনা বিশ্ববাসীকে সতর্ক করার এবং উপদেশ দান করার এক বিশেষ শিক্ষা বলিয়া স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কোরআন পাকে উল্লেখ করিয়াছেন–

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ ـ فَجَعَلْنٰهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ـ

নিশ্চয়ই তোমরা অবগত আছ ঐ লোকদের পরিণতি যাহারা সীমা লংঘন করিয়াছিল শনিবার সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞার। ফলে আমি তাহাদের প্রতি আদেশ প্রয়োগ করিয়াছিলাম যে, তোমরা লাঞ্ছিত বানর হইয়া যাও। উক্ত ঘটনার শাস্তিকে আমি বানাইয়া রাখিলাম তৎকালীন ও পরবর্তী লোকদের জন্য সতর্ককারী ও আদর্শমূলক শিক্ষা এবং খোদাভক্ত ও খোদাভীরুগণের জন্য উপদেশ ও নছীহত। (পারা–১, রুকু–৮)

হযরত ছোলায়মান (আঃ)

যহরত ছোলায়মান (আঃ) হযরত দাউদের পুত্র ছিলেন। খৃস্টপূর্ব ১০ম শতাব্দীর বাদশা তালুতের স্থলাভিষিক্ত ছিলেন হযরত দাউদ। তাঁহার সময়কাল ছিল খৃস্টপূর্ব ৯ম শতাব্দী। সুতরাং হযরত দাউদের স্থলাভিষিক্ত হযরত ছোলায়মানের সময়কাল ছিল খৃস্টপূর্ব ৮ম শতাব্দী। তাঁহাদের সকলেরই কেন্দ্রীয় স্থান ছিল ফিলিস্তিন। ছোলায়মান (আঃ) হযরত দাউদের সুযোগ্য পুত্রই ছিলেন। হযরত দাউদ (আঃ) অতি সুদক্ষ ও সূক্ষ্ম ন্যায় বিচারক ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে বিশেষরূপে উহার দক্ষতা দান করিয়াছিলেন। পবিত্র কোরআনের সূরা ছাদে এ সম্পর্কেই ঘোষণা আছে– واتينه الحكمة وفصل الخطاب "আমি দাউদকে সূক্ষ্ম জ্ঞান ও ন্যায় বিচারের বিশেষ দক্ষতা দান করিয়াছিলাম।" এই গুণে ছোলায়মান (আঃ)-ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিলেন। বাল্য বয়সেই এক ঘটনায় তাঁহার রায় ও বিচার পিতা হযরত দাউদের রায় অপেক্ষা অধিক সুষ্ঠু হইয়াছিল।

ঘটনার বিবরণ এই যে, এক ব্যক্তির পশুপাল অপর ব্যক্তির ক্ষেতের ফসল নষ্ট করিয়া ফেলে। ক্ষেত্রের মালিক হযরত দাউদের নিকট নালিশ করিল। হযরত দাউদ তদন্তে জানিতে পারিলেন, পশুপালের মালিকের ত্রুটিতেই ঘটনা ঘটিয়াছে এবং ক্ষতির পরিমাণ পশুপালের মূল্যের সমান। সুতরাং হযরত দাউদ (আঃ) সেই ঘটনায় রায় দিলেন যে, শস্যহানির বিনিময়ে ক্ষেতের মালিককে পশুপালগুলি দিয়া দেওয়া হইবে– ইহা আইনগত রায় ছিল এবং নির্ভুল রায়ই ছিল।

হযরত ছোলায়মান তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি ঘটনা শুনিতেছিলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র এগার বৎসর। তিনি পিতাকে বলিলেন, আইনের ধারা অবলম্বন না করিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতার দ্বারা ঘটনার মীমাংসা অন্য পন্থায়ও হইতে পারে এবং উহা বাদী-বিবাদী উভয়ের পক্ষে উত্তম হইবে। তাহা এই– এখন পশুগুলি সাময়িকভাবে বাদীকে দেওয়া হউক, সে উহার দুগ্ধ ও পশম ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হইতে থাকুক এবং বিবাদী-বাদীর ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষেতের চাষ-বাস করিতে থাকুক। যখন ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষেত পূর্ববর্তী ভাল অবস্থার উপর আসিয়া যাইবে, তখন বিবাদী স্বীয় পশুপাল বাদীর নিকট হইতে ফেরত লইয়া লইবে। ফলে বাদীর ক্ষতিপূরণও হইয়া যাইবে এবং বিবাদীও তাহার পশুপাল হইতে বঞ্চিত হইবে না। এই রায় দাউদ (আঃ) পছন্দ করিলেন। পবিত্র কোরআনে এই ঘটনার বিবরণ–

وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ـ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ـ فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ـ وَكُلاًّ اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ـ

দাউদ ও ছোলায়মানের একটি ঘটনা শুনুন। যখন উভয়ের উপস্থিতিতে একটি (আঙ্গুর) ক্ষেতের বিষয়ে বিচার হইতেছিল– ঐ ক্ষেত্রে অপর লোকের ছাগল-পাল আসিয়া পড়িয়াছিল (এবং গাছের ক্ষতি করিয়াছিল) আমি তাহাদের রায়কে প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম। সে মতে ঘটনার উত্তম মীমাংসার বুঝ ছোলায় মানকে দান করিলাম, আমি তাঁহাদের উভয়কেই সূক্ষ্ম বিচার-শক্তি ও জ্ঞান দান করিয়াছিলাম। (সূরা আম্বিয়া, পারা–১৭, রুকু–৬)

হযরত ছোলায়মান বিচারকার্যে অতি নিপুণ, সুদক্ষ এবং সুকৌশলীও ছিলেন, যাহার একটি নজির নিম্নে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে–

১৬৪৯। হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, (হযরত দাউদ ও ছোলায়মানের কালের ঘটনা– একস্থানে) দুইজন মহিলা তাহাদের সঙ্গে তাহাদের দুইটি শিশু ছিল। হঠাৎ বাঘ আসিয়া একটি শিশু লইয়া গেল। অবশিষ্ট শিশুটি সম্পর্কে মহিলাদ্বয়ের প্রত্যেকের দাবী, এই শিশু আমার; বাঘে নিয়াছে তোমার শিশুকে। (অতি ছোট শিশুর সনাক্ত আকৃতির দ্বারা হয় না।)

অতপর তাহারা উভয়ে এই বিরোধের মীমাংসার জন্য বিচারপ্রার্থী হইল। (স্ত্রীলোকদ্বয়ের মধ্যে যে অধিক বয়স্কা ছিল শিশুটি তাহার হস্তে ছিল এবং তাহার বিরোধিনী কম বয়স্কার নিকট স্বীয় দাবীর কোন সাক্ষ্য ছিল না, তাই শরীয়তের এবং আদালতের বিধান মতে) হযরত দাউদ (আঃ) বয়স্কা স্ত্রীলোকটির পক্ষে রায় দিলেন।

মহিলাদ্বয় তথা হইতে যাওয়ার সময় হযরত ছোলায়মানের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। তাহারা তাঁহাকে ঘটনার বিবরণ শুনাইলেন। হযরত ছোলায়মান ভান করিয়া লোকদিগকে বলিলেন, একটি ছুরি নিয়া আস, আমি শিশুটিকে দ্বিখন্ডিত করিয়া তাহাদের উভয়ের মধ্যে ভাগ করিয়া দিব। এতদশ্রবণে কম বয়স্কা মহিলাটি চীৎকার করিয়া বলিল, এইরূপ করিবেন না– এইরূপ করিবেন না; আমি মানিয়া লইতেছি, শিশুটি আমার প্রতিদ্বন্দ্বিনীর। (স্নেহ-মমতা কৃত্রিম উপায়ে আসিতে পারে না, তাই বয়স্কা মহিলাটির অবস্থা তদ্রূপ হইল না, ফলে সর্বসমক্ষে ইহা প্রকাশ পাইয়া গেল যে, বস্তুতঃ কম বয়স্কা মহিলাটিই শিশুর জননী। এই অকৃত্রিম সাক্ষ্যে বিপক্ষিণী বাস্তবকে স্বীকার না করিয়া কোথায় যাইবে?) অবশেষে পুনর্বিচার হইয়া কম বয়স্কা মহিলাটিই শিশুটিকে লাভ করিল।

হযরত ছোলায়মান বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পর হযরত দাউদের ইন্তেকাল হইল। হযরত ছোলায়মান নবুয়ত ও রাজত্ব উভয় ক্ষেত্রে স্বীয় পিতা হযরত দাউদের স্থলাভিষিক্ত হইলেন এবং আল্লাহ তা'আলা হযরত ছোলায়মানকে কতিপয় বৈশিষ্ট্য দান করিলেন যাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল–

জিন, পাখী ও বায়ু-বাতাসের উপর ক্ষমতা *

আল্লাহ তা'আলা হযরত ছোলায়মানকে একটি অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই দান করিয়াছিলেন যে, তাঁহার রাজত্ব শুধু মানুষ জাতির উপরই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং দুর্ধর্ষ জিন জাতি এবং পাখী জাতিও তাঁহার করায়ত্তে ও শাসনাধীনে ছিল, বায়ু-বাতাসও তাঁহার আজ্ঞাবহ ছিল– ঐসব তাঁহার আদেশ পালনে সাধারণ মজুর ও সৈনিকের ন্যায় কাজ করিয়া যাইত। পবিত্র কোরআনে এই সম্পর্কে বর্ণনা–

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بَارَكْنَا فِيْهَا ـ وَكُنَّا بِكُلِّ شَىْءٍ عٰلِمِيْنَ ـ

আমি ছোলায়মানের জন্য বতাসকে বশীভূত করিয়া দিয়াছিলাম; বকরতপূর্ণ (দেশ– সিরিয়া হইতে কোথাও যাইতে এবং তথা হইতে ঐ) দেশের দিকে (প্রত্যাবর্তনে) বাতাস তাঁহাকে তাঁহার আদেশ মতে বহন করিয়া প্রবলবেগে চলিত। আমি ত সর্বজ্ঞ আছি; (আমার পক্ষে সবই সহজ)

* জিন, পাখি ও বাতাস এইসব হযরত ছোলায়মানের বশীভূত ছিল। উহারা তাঁহার আজ্ঞাবহ মজুর ও সৈনিকের কাজ করিয়া থাকিত। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন বর্ণনায় শুধুমাত্র এই তিনটি জাতিই উল্লেখ আছে; এই সূত্রেই একদল তফছীরকারের মত এই যে, পশু জাতির উপর হযরত ছোলায়মানের সাধারণ আধিপত্য ছিল না, নতুবা উহারও উল্লেখ কোরআনে থাকিত। তফছীরকারদের অপর দলের মত এই যে, কোরআনের উল্লিখিত তিনটি জাতিকে বশীভূত রাখার ক্ষমতা দ্বারা পশু জাতিকেও বশীভূত রাখা অধিক সহজ সাধ্য। তাঁহাদের মতে পশু-পক্ষী, জিন-পরী, বায়ু-বাতাস, মানব-দানব সকলের উপরই হযরত ছোলায়মানের আধিপত্য ছিল।

وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلاً دُوْنَ ذٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ـ

আর দেও-জ্বিনদের মধ্য হইতে অনেকগুলি তাঁহার জন্য (মণি-মুক্তা আহরণের উদ্দেশ্যে সমুদ্র গর্ভে) ডুবুরির কাজ করিত, এতদ্ভিন্ন তাহারা আরও অনেক কাজ করিত। (পারা-১৭, রুকু- ৬)

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ ـ وَاَرْسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ـ وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ـ

আমি ছোলায়মানের জন্য বাতাসকে বশীভূত করিয়াছিলাম যাহার গতি এরূপ ছিল যে, শুধু এক ভোর বেলায় এক মাসের পথ এবং শুধু এক বিকাল বেলায় এক মাসের পথ অতিক্রম করিত।* আরও আমি প্রবাহিত করিয়াছিলাম তাঁহার জন্য বিগলিত তাম্রের খনি। আর জ্বিনদিগকেও তাঁহার অধীনস্থ করিয়াছিলাম; অনেকে তাঁহার জন্য পরওয়ারদেগারের আদেশে বিভিন্ন কার্যে নিয়োজিত থাকিত। যে কেহ আমি আল্লাহর আদেশ লংঘন করিলে তাহাকে দোযখের শাস্তি ভোগাইব।

يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ـ

জ্বিনগণ ছোলায়মানের ইচ্ছা মোতাবেক বিভিন্ন জিনিস তৈরী করিত- বড় বড় দালান কোঠা তৈরী করিত, বিভিন্ন শিল্পকাজ করিত এবং প্রয়োজন মোতাবেক বিরাট বিরাট পাত্র তৈরী করিয়া বসাইয়া রাখিত।

اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ـ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ ـ

(দাউদ-পুত্র ছোলায়মানকে এইসব নেয়ামত দানের) আদেশ দিয়াছিলাম, হে দাউদ-পরিবার! (রাজত্বের মোহে আমাকে ভুলিও না;) আমার শুকর-গুজারি কার্যে মনোনিবেশ করিবে। সতর্ক থাকিও- আমার বান্দা হইয়াও আমার শোকর গুজারী কম লোকেই করে। (সূরা সাবা, পারা-২২ রুকু- ৮)

পাখীর ভাষা ও বুলি বুঝি বার শক্তি *

হযরত ছোলায়মানকে আল্লাহ তা'আলা আরও একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিলেন যে, একটি মানুষ অপর মানুষের ভাষা যেইরূপে বুঝিয়া থাকে, তদ্রূপ হযরত ছোলায়মান (আঃ) সমস্ত রকম পাখীর বুলি ও ভাষা বুঝিয়া থাকিতেন, উহাদের সঙ্গে তাঁহার কথোপকথন হইত। পবিত্র কোরআনে হইঁারও উল্লেখ রহিয়াছে-

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ـ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ـ

ছোলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হইলেন; তিনি ঘোষণা করিলেন, হে লোক সকল! আমাকে পাখীর

---

* হযরত ছোলায়মান (আঃ) এবং প্রয়োজনে তাঁহার সৈন্য-সামন্ত কোন বাহনের উপর আরোহণ করিতেন এবং বাতাস উহাকে বহন করিয়া চলিত এবং আদিষ্ট স্থানে নামাইয়া দিত।

বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যন্ত্রের সাহায্যে যেভাবে বাতাসকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া উহা দ্বারা বহন করার কাজ লওয়া হয় তদপেক্ষা অধিক উন্নতরূপে আল্লাহর আদেশক্রমে হযরত ছোলায়মান (আঃ) বাতাসের দ্বারা প্রয়োজনীয় বহন করার কাজ সমাধা করিতেন।

* পবিত্র কোরআনে শুধু পাখীর বুলি ও ভাষা বুঝিবার বিষয় উল্লেখ আছে, যেসব তফছীরকারদের মতে হযরত ছোলায়মানের আধিপত্য পশু জাতির উপরও ছিল তাহাদের মতে তিনি পাখী জাতির ন্যায় পশু জাতিরও ভাষা বুঝিয়া থাকিতেন। নিম্নে বর্ণিত পিপীলিকার ঘটনা ইহার প্রমাণ।

বুলি ও ভাষা বুঝিবার শক্তি দান করা হইয়াছে, আমার রাজত্বের প্রয়োজনীয় সব কিছু আমাকে প্রদান করা হইয়াছে। নিশ্চয় ইহা আমার প্রতি আল্লাহর একটি সুস্পষ্ট কৃপা ও দান। (পারা-১৯, রুকু- ১৭)

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হযরত ছোলায়মানের বিভিন্ন ঘটনা দ্বারাও তাঁহার উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রমাণিত হয়। নিম্নে ঐসব ঘটনার উদ্ধৃতি দেওয়া গেল।

পিপীলিকার ঘটনা

একবার হযরত ছোলায়মান কোন ভ্রমণ বা অভিযানের প্রস্তুতি করিলেন। সেমতে মানুষ, জ্বিন ও পাখী জাতির সমন্বয়ে একটি বিরাট বাহিনী গঠন করা হইল। জ্বিনদের দ্বারা ভারী কার্য সমাধা করা হইত এবং পাখীর দ্বারা সাধারণতঃ ছায়াদানের কাজ লওয়া হইত। এতদ্ভিন্ন পাখীর দ্বারা আরও বিশেষ কাজ লওয়া হইত- যেমন, কোন পার্বত্য বা মরু অঞ্চলে পানির আবশ্যক হইল, "হুদ্ হুদ্- কাঠ-ঠোকরা" নামক এক প্রকার পক্ষী আছে, ভূগর্ভে কোথায় কোন স্তরে পানির অস্তিত্ব আছে, তাহা ঐ শ্রেণীর পক্ষী নিজ অভিজ্ঞতায় অতি সহজেই সন্ধান লাভ করিতে পারে। অতএব ছোলায়মান (আঃ) ঐ পাখির দ্বারা পানির সন্ধান লইয়া জ্বিনদের দ্বারা ততায় মাটি খুঁড়িয়া পানি বাহির করিতেন।

সারকথা এই যে, বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যান্ত্রের সাহায্যে ব্যয়-বহুল কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা যে সব কার্য সামাধা করা হয় হযরত ছোলায়মান জ্বিন, পাখী ইত্যাদি দ্বারা অতি সহজে সেইরূপ আবশ্যকাদি পূরণ করিতেন।

হযরত ছোলায়মানের বিরাট বাহিনী পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। তাহারা যেই পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতেছিল সেই পথেই সম্মুখভাগে একস্থানে একদল পিপীলিকা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। ছোলায়মান বাহিনী এই পথে এ স্থলে পৌঁছিবে এবং তাহাদের পদতলে পিপীলিকাগুলি নিষ্পেষিত হইয়া যাইবে, তাই দলপতি পিপীলিকাটি ঘোষণা দিল, হে পিপীলিকাগণ! তোমরা সত্বর গুহায় প্রবেশ করিয়া যাও; ছোলায়মান বাহিনী দ্বারা যেন তোমরা পিষ্ট না হইয়া পড়।

হযরত ছোলায়মান নিকটেই পৌঁছিয়া গিয়াছিলেন, কিম্বা বাতাস তাঁহার বশীভূত থাকায় তিনি ছোট আওয়াজ অনেক দূর হইতে শুনিতে পাইতেন। পিপীলিকার সেই সতর্কবাণী সবকিছু তিনি শুনিলেন এবং উহা বুঝিতেও পারিলেন। সামান্য পিপীলিকার এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন এবং সুশৃঙ্খলতার সহিত আত্মরক্ষার ব্যবস্থায় তিনি আশ্চর্যান্বিত হইয়া হাসিয়া পড়িলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে এত প্রশস্ত জ্ঞান দান করিয়াছিলেন যে, তিনি ক্ষুদ্র পিপীলিকার কথাবার্তা বুঝিতে সক্ষম হইলেন! এবং আল্লাহ তা'আলা যে, তাঁহাকে এত বড় বিশাল রাজত্ব দান করিয়াছেন- উহার উপর আল্লাহ তা'আলার শোকরগুজারী করার তওফিক এবং অধিক নেক কাজ করার তৌফিক চাহিয়া এই উপলক্ষে ছোলায়মান (আঃ) আল্লার দরবারে আবেদন-নিবেদন করিলেন। পবিত্র কোরআনে ঘটনার বিবরণ নিম্নরূপ-

وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ - حَتّٰى اِذَا اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ لَايَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ وَهُمْ لَايَشْعُرُوْنَ -

একদা ছোলায়মানের (অভিযান প্রস্তুতি) উদ্দেশ্যে মানব, দানব ও পাখী জাতি হইতে সৈন্য সংগ্রহ করা হইল। এত বড় বাহিনী ছিল যে, উহার অগ্র ও পশ্চাতে শৃঙ্খলা রক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইত। এই বিরাট বাহিনী একটি ময়দানের নিকটে পৌঁছিল; এই ময়দানে পিপীলিকার দল বাস করিত। ছোলায়মান বাহিনীর আগমন লক্ষ্য করিয়া একটি পিপীলিকা তাহার সঙ্গীদেরকে বলিল, হে পিপীলিকাগণ! তোমরা নিজ

গুহায় চলিয়া যাও, ছোলায়মান এবং তাঁহার বাহিনী তোমাদিগকে অজ্ঞাতে যেন পিষ্ট করিয়া না ফেলে।

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ـ

ছোলায়মান সেই পিপীলিকার কথায় হাসিয়া পড়িলেন এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে বিশেষ মোনাজাত করিলেন– হে পরওয়ার দেগার! আমাকে এবং আমার মাতাপিতাকে যেসব বিশেষ নেয়ামত দান করিয়াছ উহার শোকর-গুজারী করার তৌফিক আমাকে দান কর এবং তোমার সন্তুষ্টি ভাজন নেক কাজ যেন করিতে পারি সেই তৌফিক দান কর এবং আমাকে নিজ করুণাবলে নেককার দলভুক্ত করিয়া রাখ।

(পারা–১৯, রুকু– ১৭)

শিক্ষণীয় বিষয়

শক্তি ও ক্ষমতার আধিক্য মানুষকে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট করিয়া দেয়, প্রভু পরওয়ারদেগার আল্লাহ তাআলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, মানুষকে অহঙ্কারী অত্যাচারী বানায়। ফেরাউন, শাদ্দাদ, কারূণ ও নমরূদ প্রমুখ লোকদের ইতিহাস ইহার প্রকৃষ্ট নজীর। এইসব মহা রোগের প্রতিষেধক এই যে, প্রথম হইতেই সকল শক্তি-সামর্থ ও ক্ষমতাকে আল্লাহ তা'আলার দান উপলব্ধি করতঃ আল্লাহর দিকে ঝুকিয়া থাকিবে। আম্বিয়া ও আউলিয়াগণের তরীকা সর্বদা ইহাই রহিয়াছে।

বিলকীস রাণীর ঘটনা

একদা হযরত ছোলায়মান (আঃ) তাঁহার কার্যরত বিভিন্ন জাতির সৈন্য-সামন্তদের, বিশেষতঃ পাখীদের তল্লাশি লইলেন। "হুদ্‌হুদ্– কাঠ ঠোকরা" পাখী– যাহা দ্বারা পানিহীন অঞ্চলে ভূগর্ভে পানির খোঁজ নেওয়া হইত উহাকে অনুপস্থিত দেখিলেন। এতদ্দৃষ্টে তিনি ঐ পাখির প্রতি রাগান্বিত হইলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে হুদ্‌হুদ পাখী হাজির হইল এবং নতুন খবর হযরত ছোলায়মানকে জ্ঞাত করিল যে, আপনার অজ্ঞাতে এক স্থানে "সাবা" নামক এক গোত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহাদের শাসনকর্তা হইল এক রাণী, যাহার একটি বিরাট ও অতি মূল্যবান সিংহাসন আছে এবং তাহার আরও সব রকমের সাজ-সরঞ্জাম রহিয়াছে। সেই রাণী এবং তাহার জাতি তাহারা সকলেই আল্লাহ তাআলার বন্দেগী ছাড়িয়া দিয়া সূর্য পূজায় লিপ্ত। তাহারা সূর্যের সম্মুকেই মাথা নত করিয়া থাকে। শয়তান তাহাদিগকে আরও অনেক রকম গোমরাহীতে লিপ্ত রাখিয়াছে।

হযরত ছোলায়মান বলিলেন, তোমার খবরের পরীক্ষা এখনই করিতেছি– দেখিব, তুমি সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী। এই বলিয়া তিনি সেই রাণীর প্রতি একটি পত্র লিখিয়া উহা হুদহুদের হাওয়ালা করিলেন। তাহাকে আদেশ করিলেন, পত্রটি সেই রাণীর সম্মুখে রাখিয়া দিয়া তুমি দূরে সরিয়া অপেক্ষা করিবা এবং ইহার কি প্রতিক্রিয়া হয় তাহা লক্ষ্য করিবা। হুদ্‌হুদ তাহাই করিল।

রাণীর নিকট যখন পত্র পৌছিল এবং তিনি উহা পাঠ করিলেন, তখন তিনি স্বীয় পরিষদ আহবান করিয়া পরিষদবর্গের নিকট বলিলেন, সুপ্রসিদ্ধ বিশ্ব সম্রাট ছোলায়মানের তরফ হইতে একটি পত্র আসিয়াছে যাহার মর্ম এই–

"বিছমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম" আমার মোকাবেলায় বাহাদুরী দেখাইও না, আমার পূর্ণ অনুগত হইয়া যাও" রাণী পরিষদবর্গের নিকট পরামর্শ চাহিলেন। পরিষবর্গ নিজেদের শক্তি-সামর্থের উল্লেখ করিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রাণীর উপর ন্যস্ত করিল।

রাণী বলিলেন, যুদ্ধের পরিণামে এক দেশে অপরদেশের বাদশাহ্ প্রবেশ করিলে সেই দেশের ধ্বংস অনিবার্য, সেই দেশের বড় বড় লোকগণ নিষ্পেষিত হয়– এই ধরনের বহু অঘটন ঘটিয়া থাকে, অতএব সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া যাইব। প্রথমতঃ আমি বিশ্ব-সম্রাট ছোলায়মানের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শনস্বরূপ কিছু উপঢৌকন পাঠাইব; দেখি– উহার প্রতিউত্তর কি আসে।

হযরত ছোলায়মানের দরবারে যখন ঐ উপঢৌকন বহনকারীগণ পৌছিল, তিনি তাহাদের উপঢৌকনের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেন এবং সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবার হুমকি দিলেন। তাহারা দেশে ফিরিয়া আসিয়া রাণীকে সমুদয় পরিস্থিতি বুঝাইয়া বলিল। বুদ্ধিমতি রাণী পরিস্থিতি অনুধাবন করিতে পারিয়া হযরত ছোলায়মানের প্রতি ঈমান ও আনুগত্য স্বীকার করতঃ তাঁহার দরবারে হাজির হইবার জন্য সদলবলে রওয়ানা হইলেন। হযরত ছোলায়মান সব সংবাদ অবগত হইলেন। তিনি রাণীকে প্রভাবান্বিত করার জন্য তাঁহার পৌঁছিবার পূর্বে দুইটি আশ্চর্যজনক ব্যবস্থা করিয়া রাখিলেন। একটি এই যে, রাণীর যে বিশেষ সিংহাসনটি ছিল উহাকে হযরত ছোলায়মান কোন জ্বিনের দ্বারা বা স্বীয় বিশেষ বিদ্যা দ্বারা এক পলকের মধ্যে তাঁহার দেশ হইতে নিয়া আসিলেন এবং নিজের বাড়ীতে রাখিয়া দিলেন।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা এই করিলেন যে, রাণীর থাকার জন্য এক বিশেষ ধরনের শীশমহল তৈরী করিলেন। উহার মধ্যে একটি ঘর সুসজ্জিত করিলেন। অতপর সেই ঘরের সম্মুখে বড় একটি পানির হাউজ তৈরী করিলেন। পানি ও মাছ ভর্তি করিয়া হাউজটির মুখ মজবুত কাঁচ বা আয়নার দ্বারা আবৃত করিয়া দিলেন। পানির উপর কাঁচের আবরণ! আবরণ বলিয়া মনে হয় না এবং আবরণরূপে দেখাও যায় না। ইহাতে মনে হয়, ঐ সুসজ্জিত ঘরে যাইতে পানি অতিক্রম করিতে হইবে, বস্তুতঃ তাহা নহে, বরং পানির উপর মজবুত কাঁচ রহিয়াছে যাহার উপরে শুষ্ক পথ।

রাণী হযরত ছোলায়মানের দরবারে পৌঁছিলেন। ছোলায়মান (আঃ) তথায় অবস্থিত সিংহাসনটি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার সিংহাসনটি কি এই ধরনের? রাণী বলিলেন, আমার ত ধারণা হয় ইহা সেইটিই। আমরা পূর্বেই জানি, আপনি এই ধরনের অলৌকিক শক্তি রাখেন। অতপর রাণীকে তাঁহার জন্য প্রস্তুত শীশমহলে লইয়া যাওয়া হইল এবং সুসজ্জিত ঘরে যাইবার জন্য বলা হইল। সম্মুখে বিশেষরূপে তৈরী হাউজ রহিয়াছে। রাণী সাধারণ দৃষ্টিতে ভাবিলেন, বোধ হয় আরাম উপভোগের জন্য অল্প পানির উপর দিয়া যাওয়ার পথ করা হইয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি পায়ের গোছার উপরে কাপড় টানিয়া ধরিলেন। তখন ছোলায়মান (আঃ) বলিলেন, পানির উপর কাঁচের আবরণ রহিয়াছে, পায়ে পানি লাগিবে না।

রাণী সব অবস্থা অনুধাবন করার পর স্বীকার করিলেন যে, আমি স্বীয় সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা আল্লাহ হইতে দূরে থাকিয়া নিজেই নিজের ক্ষতি সাধনে লিপ্ত ছিলাম। এখন আমি হযরত ছোলায়মানের হস্তে সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনিলাম এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলাম।* উল্লিখিত ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ–

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِىَ لآارَى الْهُدْهُدَ - اَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِيْنَ - لَاُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَاَذْبَحَنَّهُ اَوْلَيَاتِيَنِّى بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ - فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍۢ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ -

একদা ছোলায়মান হুদ্‌হুদ (কাট– ঠোকরা সদৃশ) পাখীকে অনুপস্থিত দেখিলেন। বলিলেন, হুদ্‌হুদকে দেখিতেছি না, সে কি উপস্থিত হয় নাই? তাহাকে কঠোর শাস্তি দিব কিম্বা উহাকে জবাই করিয়া ফেলিব যদি না সে সুস্পষ্ট কারণ দর্শাইতে পারে। অল্প সময়েই হুদ্‌হুদ উপস্থিত হইল এবং আরজ করিল, আমি এমন

* সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের বর্ণনা এই যে, ঐ কুমারী রাণীর অনুরোধে হযরত ছোলায়মান (আঃ) তাঁহাকে পরিণীতারূপে গ্রহণ করিয়া নিয়াছিলাম।

বিষয়ের খোঁজ নিয়া আসিয়াছি যাহার খোঁজ আপনি রাখেন না– আমি "সাবা" গোত্রের দেশ হইতে একটি বাস্তব খবর লইয়া আসিয়াছি।

اِنِّىْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ

আমি সেই দেশে দেখিয়াছি, এক রাণী সেই দেশের শাসনকর্ত্রী; তাহার সকল রকমের সাজ-সরঞ্জাম রহিয়াছে এবং অতি বড় বিশেষ একটি সিংহাসনও তাহার আছে।

وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَايَهْتَدُوْنَ ـ

সেই রাণী এবং তাহার জাতি সকলকেই দেখিয়াছি, আল্লাহকে ছাড়িয়া সূর্যের পূজা করে এবং শয়তান তাহাদের এই কার্যকেই উত্তম বুঝাইয়াছে; ফলে শয়তান তাহাদিগকে সৎপথ হইতে হটাইতে সক্ষম হইয়াছে; ফলে তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে।

اَلاَّ يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ـ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ

তাহারা ঐ মহান আল্লাহর বন্দেগী ছাড়িয়া দিয়াছে যিনি (সকলের প্রতিপালনের জন্য) আসমানের গুপ্ত জিনিস (বৃষ্টির পানি) প্রকাশ (–বর্ষণ) করেন এবং যমীনেরও গুপ্ত জিনিস (উহার উদ্ভিদ) প্রকাশ করেন (জন্মাইয়া থাকেন।) তদ্রূপ তিনি সকলের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সবকিছু জানেন; (কেয়ামতের তথা হিসাবের দিন সব প্রকাশ করিয়া দিবেন) এই আল্লাহই একমাত্র মা'বুদ ও উপাস্য-পূজনীয়; তিনি ভিন্ন আর কোন উপাস্য-পূজনীয় নাই, তিনি মহান আরশের মালিক।

قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ـ اِذْهَبْ بِّكِتٰبِىْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ـ

হযরত ছোলায়মান বলিলেন, এখনই আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিব, তুমি সত্য খবর বলিতেছ, না– মিথ্যা বলিতেছ। সেই রাণীর নিকট আমার এই পত্র লইয়া যাও এবং পত্রখানা তাহাদের সম্মুখে রাখিয়া তুমি দূরে সরিয়া লক্ষ্য কর যে, তাহারা কি কথাবার্তা বলে।

قَالَتْ يٰاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّىْ اُلْقِىَ اِلَىَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ـ اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَلاَّ تَعْلُوْا عَلَىَّ وَاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ ـ

রাণী স্বীয় পরিষদবর্গকে ডাকাইয়া বলিলেন, আমার নিকট একখানা বিশেষ মর্যাদাবান লিপি আসিয়াছে। লিপিখানা বিশ্ব-সম্রাট ছোলায়মানের তরফ হইতে আসিয়াছে। উহার মর্ম এই "বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" বিশেষ খবর এই যে, আমার মোকাবিলায় মাথা উঁচু করিও না, আমার অনুগত হও।

قَالَتْ يٰاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِىْ فِىْ اَمْرِىْ ـ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنَ ـ

রাণী পরিষদবর্গকে বলিলেন, এই বিষয়ে তোমরা আমাকে পরামর্শ দান কর, আমি ত তোমাদের উপস্থিতিতে পরামর্শ করা ছাড়া কোন বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করি না।

قَالُوْا نَحْنُ اُوْلُوْا قُوَّةٍ وَّاُوْلُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ ـ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِىْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ ـ

পরিষদবর্গ বলিল, আমাদের জনবল ও অস্ত্রবল পূর্ণ মাত্রায় রহিয়াছে, অনুমতি প্রদান আপনার হাতে, সুতরাং কি সিদ্ধান্ত করিবেন তাহা আপনিই ভাবিয়া ঠিক করুন।

قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّةً وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ وَاِنِّىْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ـ

রাণী বলিলেন, (যুদ্ধ বিগ্রহের পরিণাম ভাল নহে, কারণ) রাজ-রাজাগণ কোন দেশ দখল করিলে পর তাহারা সেই দেশের পতন ঘটাইয়া দেয়; সেই দেশের বড় বড় লোকগণকে অপদস্ত করে– এই ধরনের আরও অনেক কিছু করে। পত্রলেখকগণের প্রতি প্রথমতঃ আমি কিছু উপঢৌকন পাঠাইতেছি; দেখি, আমার লোকজনেরা ইহার উত্তরে কি খবর নিয়া আসে।

فَلَمَّا جَاۤءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ فَمَا اٰتٰنِۦَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّا اٰتٰكُمْ ـ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ـ اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ـ

উপঢৌকন বহনকারী দল যখন ছোলায়মানের দরবারে পৌঁছিল, তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা ধন-দৌলতের দ্বারা আমার সহায়তা করিতে আসিয়াছ? আমাকে ত আল্লাহ তোমাদের অপেক্ষা অনেক দিয়াছেন। মনে হয়, তোমরা এই উপঢৌকনের দ্বারা নিজেদের গৌরব দেখাইতে আসিয়াছ! তোমরা যাও; তোমাদের লোকদেরকে খবর দাও, আমরা এত বড় বাহিনী লইয়া তাহাদের উপর আক্রমণে আসিতেছি যেই বাহিনীর মোকাবিলার ক্ষমতা তাহাদের নাই; আমরা তাহাদিগকে অপদস্ত করিয়া দেশ হইতে বিতাড়িত করিব।

وَقَالَ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِىْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ ـ قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ وَاِنِّىْ عَلَيْهِ لَقَوِىٌّ اَمِيْنٌ ـ

(অবশেষে রাণী আত্মসমর্পণরূপে ছোলায়মানের প্রতি যাত্রা করিলেন) ছোলায়মান (সংবাদ অবগত হইয়া) তাঁহার সকল জ্বিন জাতীয় অধীনস্থকে ডাকিয়া বলিলেন, রাণী আমার নিকট পৌঁছিবার পূর্বে তাঁহার সিংহাসনটি আমার নিকট পৌঁছাইতে পারে কে? একটি শক্তিশালী জ্বিন বলিল, আপনি দরবার হইতে উঠিবার পূর্বেই আমি উহাকে নিয়া আসিব– ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই; এই কার্য সমাধায় আমি সক্ষম ও বিশ্বস্ত।

قَالَ الَّذِىْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ـ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّىْ ـ لِيَبْلُوَنِىْۤ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ـ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ـ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّىْ غَنِىٌّ كَرِيْمٌ ـ قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِىْۤ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ـ

যাঁহার নিকট আল্লার কেতাবের বিশেষ এল্‌ম ছিল তিনি বলিলেন, আমি (তোর চেয়ে অধিক দ্রুত–) তোর চক্ষুর পলক মারার পূর্বে উহাকে নিয়া আসিতে সক্ষম হইব। (বাস্তবে তাহাই করা হইল;) ছোলায়মান যখন সেই সিংহাসনটি পলকের মধ্যে নিজের সম্মুখে উপস্থিত দেখিলেন তখন বলিলেন, এই অসাধারণ কার্য একমাত্র আমার প্রভুর অনুগ্রহেই সম্ভব হইয়াছে; ইহার পরিণাম হইল আমার পরীক্ষা যে, আমি প্রভুর কৃতজ্ঞ

থাকি, না অকৃতজ্ঞ হই? যে প্রভু-পরওয়ারদেগারের কৃতজ্ঞ হয় প্রকৃত প্রস্তাবে সে নিজেই লাভবান হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যে অকৃতজ্ঞ (সে নিজেরই ক্ষতি করে।) নিশ্চয় আমার প্রভু অপ্রত্যাশী, সর্ব গুণাকর। ছোলায়মান (আঃ) ঐ সিংহাসনটির আংশিক রূপ পরিবর্তনের আদেশ দিলেন। বলিলেন, রাণী ইহাকে চিনিতে পারে কি-না, তাহা পরীক্ষা করিব (এবং জ্ঞানের পরিমাণ বুঝিব)।

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَاَنَّهُ هُوَ - وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ -

রাণী ছোলায়মানের রাজ-প্রাসাদে পৌঁছিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সিংহাসনটি কি এইরূপ? রাণী বলিলেন, মনে হয় যেন এইটা সেইটাই। (রাণী আরও বলিলেন,) এই আশ্চর্যজনক ঘটনার পূর্বেই আপনার নবুয়ত আমরা অবগত আছি; তখন হইতেই আমাদের আন্তরিক আনুগত্য রহিয়াছে।

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ -

(আল্লাহ্ বলেন, পূর্ণ ঈমানের পথে) ঐ রাণীর জন্য এই বাধা ছিল যে, সে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কিছুর উপাসনা করিত; সে কাফের দলভুক্ত ছিল।

قِيْلَ لَهَا ادْخُلِى الصَّرْحَ - فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا - قَالَ اِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ - قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

অতপর রাণীকে বলা হইল, আরাম কক্ষে চলুন। কক্ষের বিশেষ পথকে দেখিয়া তিনি উহাকে পানিপূর্ণ ভাবিয়া (পানি হইতে কাপড় বাঁচাইবার জন্য) পায়ের গোছা হইতে কাপড় টানিলেন, তখন ছোলায়মান (আঃ) বলিলেন, ইহা ত কাঁচের তৈরী শীশমহলের আঙ্গিনা।

অবশেষে রাণী বলিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমি তোমার হইতে দূরে থাকিয়া নিজেরই ক্ষতি করিয়াছি। এখন আমি ছোলায়মানের দলভুক্তির ঘোষণা দিতেছি এবং আমি ঈমান আনিলাম সারাজাহানের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার প্রতি। (সূরা নমল, পারা-২০, রুকু- ৪৪)

রাণীর পরিচয় ও তাঁহার জাতির শিক্ষামূলক ইতিহাস

আলোচ্য ঘটনার রাণীর নাম সম্পর্কে মতভেদ আছে সত্য, কিন্তু সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মত ইহাই যে, তাঁহার নাম ছিল "বিল্‌কীছ"। পবিত্র কোরআনেই স্পষ্ট উল্লেখ হইয়াছে যে, তিনি "ছাবা" গোত্রীয় রাজ্যাধিকারিণী ছিলেন। ছাবা গোত্রের ইতিহাসে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ রহিয়াছে, তাহারা ইয়ামান দেশের অধিবাসী ছিল। ইয়ামানের ইতিহাস প্রসিদ্ধ শহর বর্তমান ইয়ামানের রাজধানী صنعا "সানা" হইতে প্রায় ৬০ মাইল পূর্বে অবস্থিত "মারিব্" অঞ্চল তাহাদের কেন্দ্রস্থল ছিল।

হযরত ছোলায়মানের কেন্দ্রীয় রাজধানী ছিল সিরিয়ার অন্তর্গত ফিলিস্তিনে। ভূগোল প্রসিদ্ধ ১৩১০ মাইল দৈর্ঘ্য লোহিত সাগরের শেষ প্রান্তের পরে ফিলিস্তিন অঞ্চল। আর আরব সাগর হইতে লোহিত সাগর প্রবাহিত হওয়ার তথা উভয়ের সংযোগ স্থলের পর্বূ উপকূলে ইয়ামান অঞ্চল। সুতরাং হযরত ছোলায়মানের কেন্দ্রীয় স্থল হইতে বিলকীছ রাণীর দেশ কম-বেশ ১৫০০ মাইল দূরে ছিল।

ইয়ামান দেশে রাণীর গোত্র ছাবা জাতি দীর্ঘকাল হইতে বিশেষ আরাম-আয়েশে ছিল। তাহাদের দেশের উন্নতির অছিলা ও বাহ্যিক সূত্র ছিল তাহাদের বিশেষ সেচ পরিকল্পনা। (Water control & Irriagation development)

দেশের পার্বত্য অঞ্চলে সময়-অসময় বৃষ্টিপাত হইয়া বৃষ্টির পানি বিভিন্ন গিরিপথ বহিয়া একত্রিত অবস্থায় "মারেব" অঞ্চলের বিরাট উচু দুইটি পর্বতের মধ্যস্থল দিয়া আসিত। এইরূপে একত্রে অধিক পানি আসিবার কারণে দেশে প্লাবন হইত, আবার ঐ পানি কিছু অংশ মরুভূমিতে ছড়াইয়া এবং কিছু সমুদ্রে যাইয়া নিঃশেষ হইত, ফলে দ্বিতীয়বার প্লাবন না আসা পর্যন্ত পানিবিহীন অবস্থায় সারা দেশ মরুভূমি রূপ ধারণ করিয়া থাকিত। এইরূপে প্লাবন ও পানি শূন্যতার মধ্যে সারা বৎসর দেশের জায়গা-জমি উৎপাদন বিহীন থাকিত।

খৃস্টপূর্ব প্রায় ৮ম শতাব্দীতে "মারেব" অঞ্চলের উচু পাহাড়দ্বয়ের মধ্য ১৭০ ফুট দৈর্ঘ্যে, ৫০ ফুট প্রস্থ একটি বাঁধ নির্মিত হয় এবং বাঁধের মধ্যে ছোট ছোট দরওয়াজা রাখা হয়। এতদ্ভিন্ন বাঁধের অভ্যন্তরে ডান ও বাম দিকে ছোট-বড়, নদী-নালা কাটিয়া দেওয়া হয়। ঐ সব দরওয়াজা ও নদী-নালার সাহায্যে সমগ্র দেশে সারা বছর আবশ্যকানুরূপ সেচ কার্য করা হইতে থাকিত।

এই সময়ে ঐ দেশে খাঁটি দ্বীন-ধর্ম এবং ঈমানেরও প্রসার হইয়াছিল। কারণ ইতিহাসের বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে বিলকীছ রাণীর রাজত্বকাল ঐ সময়েই সাব্যস্ত হয়। যেহেতু রাণী ছিলেন, ছোলায়মান আলাইহিস্ সালামের সমসাময়িক; আর ছোলায়মান (আঃ) ছিলেন, খৃস্টপূর্ব ৮ম শতাব্দীর এবং ছাবা গোত্রের উন্নতির উৎস বাঁধটিও খৃষ্টপূর্ব ৮ম শতাব্দীতে তৈরী হইয়াছিল।

রাণী বিলকীস হযরত ছোলায়মানের সাক্ষাতে ঈমান গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রজাগণ স্বভাবতঃই রাজার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে। সুতরাং তখন ঐ দেশে খাঁটী দ্বীন-ধর্ম ও ঈমানের প্রভাব বিস্তার হওয়াই স্বাভাবিক।

অল্প দিনের মধ্যেই সারা দেশ বেহেশতরূপ বাগ-বাগিচায় পরিপূর্ণ হইল এবং শস্য-শ্যামল হইয়া গেল। দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া অর্থনৈতিক উন্নতি হইলে পর দেশবাসী বৈদেশিক বাণিজ্যের পথও প্রশস্ত করিতে থাকে। ইয়ামানের উত্তর-পশ্চিম দিক কম-বেশ ১৫০০ মাইল দূরে বিশেষ উন্নত দেশ সিরিয়া অবস্থিত এবং পূর্ব-উত্তর দিকে প্রায় ১০০০ মাইল দূরে (বর্তমান ওমান রাজ্যের) "মছকট" প্রভৃতি উন্নত অঞ্চলসমূহ ছিল। সেই সব দেশ ও অঞ্চলের সঙ্গে "ছাবা" গোত্রীয় লোকগণ ব্যবসা বাণিজ্যের সূত্র প্রতিষ্ঠা করিল এবং ঐ সব দেশে যাতায়াতের জন্য বড় বড় মনোরম সড়ক তৈরী করিয়া নিল। সড়কের উভয় পার্শ্বে ফল-ফুলের বাগ-বাগিচা লাগাইয়া দিল এবং মাঝে মাঝে আরাম-আয়েশপূর্ণ হোটেল-রেস্তোঁরা এবং ছোট ছোট বস্তি-মহল্লা প্রতিষ্ঠা করিয়া দিল। দেশবাসী এইরূপ আরাম-আয়েশের সুব্যবস্থার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারাও বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়া নিল। দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাহাদের এই আরাম-আয়েশ ও উন্নতি ঊর্ধ্বগতিতে চলিতে লাগিল এবং তাহারা বেহেশতরূপ বাগ-বাগিচাময় দেশের সুখ-শান্তি ভোগ করিয়া যাইতে লাগিল।

ভোগ-বিলাসের পরিণতি স্বভাবতঃ যাহা হইয়া থাকে দীর্ঘকাল পরে তাহাদের বেলায়ও তাহাই ঘটিল; তাহারা সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা মাবুদ বরহক্ আল্লাহ তাআলাকে ভুলিয়া তাঁহার নাফরমান হইয়া গেল, নবীগণের আদর্শের পরিপন্থী জীবন ধারায় পরিচালিত হইল। ফলে তাহাদের উপর আল্লাহ তা'আলার গযব নামিয়া আসিল।

"মারেব" স্থিত যেই বাঁধের উপর তাহাদের সমুদয় ভোগ-বিলাস ও উন্নতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল ছিল, সম্ভবতঃ ৫৪২ খৃষ্টাব্দে বড় বড় পাহাড়িয়া ইঁদুর ১৩০০ বছরের সেই প্রাচীন বাঁধে ছিদ্র করিয়া দিল। পানির প্রবল চাপে মুহূর্তের মধ্যে ছোট ছেট ছিদ্র বিরাট ফাটলে পরিণত হইল এবং বাঁধ ধ্বংস হইয়া গেল। ১৩০০ বছরের জমা পানি হঠাৎ দেশের উপর চড়াও হইয়া সমগ্র দেশকে গ্রাস করিয়া ফেলিল– কোথায় সেই সুরম্য

অট্টালিকাসমূহ আর কোথায় সেই বেহেশতরূপী বাগ-বাগিচা সমূহ? দীর্ঘ ১৩০০ বৎসর পার্বত্য অঞ্চলের আবদ্ধ পানির মধ্যে স্বভাবতঃ বা উপস্থিত আল্লাহ তা'আলার গযবের লীলাস্বরূপ সেই পানির মধ্যে এক প্রকার তেজস্ক্রিয়াও ছিল, যদ্দরুন অতি সহজেই প্লাবিত সব কিছু নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। দেশবাসীর মধ্যে যাহারা দৌড়াইয়া বা কোন আশ্রয়ে জান বাঁচাইল তাহারাও চিরতরে তাহাদের ভোগ-বিলাস হইতে বঞ্চিত হইল এবং বিভিন্ন দেশে পথের ভিখারীরূপে শরণার্থী হইয়া ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল।

অতপর পানি কমিয়া গেল, কিন্তু সেই "মারেব" অঞ্চলে বেহেশতরূপী বাগ-বাগিচার চিহ্নও আর কেহ দেখিতে পাইল না। পরিপূর্ণ চরা মরুভূমিতে পরিণত হইয়া গেল। কুল-কাঁটার ঝোপ, বাবলা কাঁটার গাছ ও বিশ্রী বিস্বাদ তিক্ত ফলধারী নানা প্রকার জংলী গাছপালা ব্যতীত অন্য সব কিছুর নাম-নিশানী তথা হইতে মুছিয়া গেল।

দীর্ঘ ১৩০০ বৎসরের প্রাচীন বাঁধটি ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে বাহ্যিক কার্য-কারণ যাহাই ঘটিয়া থাকুক না কেন, মূলতঃ উহার ধ্বংস যে আল্লাহ তাআলার গযবস্বরূপ হইয়াছিল তাহার স্পষ্ট উল্লেখ পবিত্র কোরআন রহিয়াছে।

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِىْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ جَنَّتَيْنِ عَنْ يَمِيْنٍ وَّشِمَالٍ ـ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ ـ

"ছাবা" জাতির জন্য তাহাদের আবাস ভূমিতে (আল্লাহর শোকর-গুজারীর কর্তব্য বহনের) নিদর্শন বিদ্যমান ছিল। তাহাদের সড়কসমূহের উভয়পার্শ্ব ফল-ফুলের বাগ-বাগিচাপূর্ণ ছিল। (এত এত নেয়ামতের সমাবেশ তাহাদিগকে বুঝাইতে ছিল,) স্বীয় প্রভু প্রদত্ত নেয়ামত ভোগ কর আর তাঁহার শোকর গুজারী কর। একদিকে সুখ-শান্তির দেশ (অভাব-অনটনমুক্ত,) অপর দিকে প্রভু অতি ক্ষমাশালী; (কর্তব্য আদায়ে সাধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া দিবেন)।

فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ ـ وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّاَثْلٍ وَّشَىْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ـ

তাহারা কর্তব্য পালন করিল না, ফলে আমি তাহাদের উপর বাঁধ-ভাঙ্গা প্লাবন আনিয়া দিলাম এবং দেশের উভয় পার্শ্বের বাগ-বাগিচা ধ্বংস করিয়া ইহার স্থলে উভয় পার্শ্বে বিভিন্ন বিশ্রী, বিস্বাদ জংলী ফল, বাবলা কাঁটা ও সামান্য কুল গাছের জঙ্গল সৃষ্টি করিয়া দিলাম।

ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا وَهَلْ نُجٰزِىْ اِلاَّ الْكَفُوْرَ ـ

এই প্রতিফল তাহাদেরই নাফরমানীর দরুন তাহাদের দিয়াছিলাম। এক মাত্র নাফরমান জাতিকেই আমি এইরূপ প্রতিফল দিয়া থাকি।

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ ـ سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِىَ وَاَيَّامًا اٰمِنِيْنَ ـ فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ـ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ـ

(তাহাদের সুখের আরও ব্যবস্থা ছিল-) তাহাদের দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বিশেষ উন্নত দেশ (তাহাদের বাণিজ্য স্থল "সিরিয়া" বা "মছকট") পর্যন্ত সুদীর্ঘ পথের পার্শ্ববর্তী স্থানে স্থানে বস্তি প্রতিষ্ঠা করিয়অ দিয়াছিলাম এবং পথিকদের সুযোগ-সুবিধার পরিমাপ লক্ষ্য রাখিয়া উহা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম, যেন তাহারা দিবারাত্র নির্ভয়ে শান্তির সহিত ভ্রমণ করিতে পারে। (অবস্থা দৃষ্টে মনে হইত, যেন) তাহারা বলিতেছে, প্রভু হে! আমাদের ভ্রমণকে দূরপাল্লার করিয়া দিন। (অর্থাৎ তাহারা যেন এইসব সুযোগ-সুবিধা ও সুখ-শান্তিকে

কষ্ট-ক্লেশ ও দুঃখ-যাতনায় পরিবর্তন করিয়া লইতে চায়। নতুবা এত এত নেয়ামত দানকারী প্রভুর নাফরমান তাহারা কিরূপে হইল? তাহারা আমার নাফরমান সাজিয়া) নিজেদের ক্ষতিসাধন করিল। ফলে আমি তাহাদেরকে কিচ্ছা-কাহিনীতে পরিণত করিয়া দিলাম এবং সেই দেশকে ধ্বংস করিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত ও ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলাম। নিশ্চয় এই ঘটনায় বহু উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ লোকদের জন্য। (পারা- ২২, রুকু-৮)

হযরত ছোলায়মানের দুইটি বিশেষ ঘটনা

প্রথম ঘটনা ঃ আল্লাহ তা'আলার দ্বীন প্রচার এবং দ্বীনের জন্য জেহাদের উদ্দেশ্যে ছোলায়মান (আঃ) বহু সংখ্যক ঘোড়া পুষিতেন। একদা বৈকাল বেলা তিনি ঐ ঘোড়াগুলি পরিদর্শনে গেলেন। সূর্যাস্তের পূর্বে ঐ সময়টি কোন এক ফরয এবাদতের সময় ছিল, (যেরূপ আমাদের জন্য ঐ সময়টি আছর নামাযের সময়)। ছোলায়মান (আঃ) ঘোড়া পরিদর্শনে এত অধিক মগ্ন রহিলেন যে, ঐ এবাদত আদায়ের কথা ভুলিয়া গেলেন; তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবেন– এইরূপ কেহ সাহস করিল না; এদিকে সূর্য অস্তমিত হইয়া গেল।

অতপর হঠাৎ হযরত ছোলায়মানের চৈতন্য আসিল, কিন্তু তখন সেই এবাদত আদায়ের সময় নাই। ইহাতে ছোলায়মান (আঃ) ভীষণ অনুতপ্ত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সমস্ত ঘোড়াগুলি আল্লাহর নামে জবেহ করিয়া ফকির মিছকিনদের দান করিয়া দিলেন। তাঁহার শরীয়তে ঘোড়ার গোশত হালাল ছিল। আমাদের মধ্যেও হানাফী মাযহাব ভিন্ন অন্য ইমামদের মতে ঘোড়ার গোশত হালাল।

আল্লাহ তাআলার খাঁটি পেয়ারা বান্দাদের একটি সাধারণ রীতি এই যে, দুনিয়ার যে কোন বস্তু স্বীয় মা'বুদকে ভুলাইয়া দেয় সেই বস্তুকেই মা'বুদের নামে খরচ করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ করিলে নফছ ও শয়তান সংযত হইয়া চলিতে বাধ্য হয়।

দ্বিতীয় ঘটনা ঃ বাতাস, ছিল ইত্যাদি আল্লাহ তাআলা কর্তৃক হযরত ছোলায়মানের অধীনস্থ করার পূর্বে একদা আল্লাহর দ্বীনের জন্য জেহাদের ব্যাপারে কোন প্রকার অবহেলার দরুন সোলায়মান (আঃ) স্বীয় সৈন্য-সামন্তের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। আল্লাহর দ্বীনের জন্য জিহাদের ব্যাপারে অবহেলাকে বরদাশত করিতে না পারিয়া সৈন্যগণের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশপূর্বক নিজস্ব লোকজন দ্বারা সৈন্য বাহিনী গঠনে সচেষ্ট হওয়ার কথা ঘোষণা কল্লে তিনি বলিলেন, আমি আজ আমার সত্তরজন স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করিব; যেন তাহাদের গর্ভে সত্তর জন মোজাহেদ সৈনিক জন্ম লাভ করে।

এ স্থলে হযরত ছোলায়মানের একটু ত্রুটি হইল যে, তাঁহার সঙ্গমে সত্তরটি ছেলে সন্তান লাভ করিবে কথাটি তিনি নির্ধারিতরূপে বলিলেন; অথচ ইহা নিছক আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার উপর ন্যস্ত। সুতরাং কথাটি আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করিয়া বলা উচিত ছিল, কিন্তু তিনি তাহা ভুলিয়া গেলেন, এমনকি তাঁহার সঙ্গী নেক-পরামর্শদাতা ফেরেশতা তাঁহাকে এ সম্পর্কে চৈতন্য করিলেন, কিন্তু ক্ষোভ ও ক্রোধের সময় উহার প্রতি তাঁহার লক্ষ্য হইল না। হযরত ছোলায়মানকে এই ত্রুটির ফল ভোগ করিতে হইল। সত্তর জন স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম হইল, কিন্তু তন্মধ্যে শুধুমাত্র একজন গর্ভবতী হইলেন, অধিকন্তু তাঁহার গর্ভে একটি অপূর্ণাঙ্গ শিশু জন্ম নিল। ধাত্রী ঐ সন্তানটিকে হযরত ছোলায়মানের তখতের উপর তাঁহার সম্মুখে ব্যঙ্গ-কৌতুকের ভঙ্গিমায় রাখিয়া দিল।

এতদ্দৃষ্টে হযরত ছোলায়মান পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলেন যে, আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভর করা ব্যতিরেকে কথা বলার পরিণামে আমার ভাগ্যে এই ঘটিয়াছে; তৎক্ষণাৎ হযরত ছোলায়মান (আঃ) আল্লার দ্বীন প্রতিষ্ঠা করিতে অপ্রতিহত শক্তি স্বরূপ এমন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দরখাস্ত আল্লাহর দরবারে পেশ করিলেন যাহা সর্বোপরি ও সর্বোচ্চ হয়; কোন শক্তি যেন তাঁহার উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠায় বাধা দিতে না পারে।

আল্লাহ তা'আলা তাঁহার দরখাস্ত আশাতীতরূপে মঞ্জুর করিলেন এবং বাতাস, জিন ইত্যাদি শক্তিসমূকে তাঁহার অধীনস্থ করিয়া দিলেন।

নবীগণ মনুষ জাতির অন্তর্গতই হইয়া থাকেন, সুতরাং মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব ভুল-চুক, ত্রুটি-বিচ্যুতি তাঁহাদের দ্বারাও সংঘটিত হইয়া থাকে। নবী ও নবীর পথ অবলম্বনকারী নেককারগণ ভুল-ত্রুটিতে পতিত হন বটে, কিন্তু অতি সামান্য তাম্বিহ্ ও ইঙ্গিতের দ্বারাই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা সতর্ক হইয়া যান, তাঁহাদের চক্ষু খুলিয়া যায়, তাঁহারা নিজের সংশোধন করিয়া নেন এবং নূতনভাবে পূর্ণরূপে প্রভুপানে পুনঃপ্রত্যাবর্তন করেন। পক্ষান্তরে যাহারা শয়তানের দলের সাথী তাহাদের অবস্থা হয় উহার বিপরীত, অর্থাৎ তাহারা বিনা দ্বিধায় গোনাহের ও আল্লাহদ্রোহিতার পথ বাহিয়া যাইতে থাকে, তাহারা অপর পথের দিকে তাকায়ও না। এই সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের একটি বিবরণ বিশেষ আকর্ষণীয়।

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَاهُمْ مُّبْصِرُوْنَ - وَاِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِى الْغَىِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ -

অর্থ ঃ খোদাভীরু লোকদের স্বাভাব এই যে, শয়তানের কারসাজির দরুন প্রতিক্রিয়া বা প্রভাব তাঁহাদের উপর প্রবর্তিত হইল তাঁহারা হুশিয়ার হইয়া যান– সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মধ্যে চেতনাবোধ আসিয়া যায়। পক্ষান্তরে যাহারা শয়তানের পথের পথিক, শয়তান তাহাদিগকে বিপথে পরিচালিত করিতে থাকে এবং তাহারাও বিনা দ্বিধায় সেই পথ বাহিয়াই চলিতে থাকে, ঐ পথ ত্যাগ করিতে মোটেও সচেষ্ট হয় না। (পারা–৯, রুকু– ১৪)

সারকথা এই যে, ভুল-ত্রুটি সংঘটিত হওয়া মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক বিষয়। ভাল-মন্দ উভয় দলের পক্ষেই উহা সংঘটিত হইয়া থাকে, কিন্তু ভাল মন্দের পার্থক্য হয় দ্বিতীয় ধাপে। নেককার লোকগণ সর্বদা সতর্ক থাকার দরুন প্রথমতঃ ভুলটা সহজেই ধরা পড়ে, দ্বিতীয়তঃ ভুল ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উহার সংশোধনের জন্য তাঁহারা পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। আর বদকার লোকগণ গাফলত ও অসতর্কভাবে জীবন যাপন করিয়া থাকে, সুতরাং ভুলটা তাহাদের চোখে ধরা পড়ে না; ধরা পড়িলেও অনেক বিলম্বে, তদুপরি ভুল ধরা পড়ার পরেও তাহারা দেখিয়া না দেখার ভানে অচৈতন্যরূপে ঐ ভুলের উপরই চলিয়া থাকে।

এই দ্বিতীয় অবস্থা মানুষের জন্য ধ্বংসকারী। বোখারী শরীফেরই হাদীছে বর্ণিত আছে– রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, মোমেন ব্যক্তি কোন গোনাহ্ করিলে (সে অতিশয় ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়–) সে যেন একটি পাহাড়ের নীচে আছে এবং পাহাড়টি যে কোন মুহূর্তে ধ্বসিয়া পড়ার আশঙ্কা করিতেছে পক্ষান্তরে বদকার ব্যক্তি গোনাহ্ করিয়া গোনাহ্কে অতি হালকা মনে করে, উহা যেন একটি মাছি– নাকের সম্মুখে উড়িতেছে, উহাকে সে হাতের ইশারা দিয়া খেদাইয়া দিতে সক্ষম।

গোনাহ্ করিয়া ভীত ও সন্ত্রস্ত হওয়া তথা তওবা-এস্তেগফারের সহিত প্রভুপানে প্রত্যাবর্তন পূর্বক প্রভুকে রাজি করিতে সচেষ্ট হওয়া– ইহাই হইল খাঁটি মোমেনের কাজ এবং ইহার দ্বারা অধিক নৈকট্য লাভ হয়। হাদীছ– كُلُّ بَنِىْ اٰدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ -

"মানুষ মাত্রই খাতা-কছুর, ত্রুটি-বিচ্যুতি করিয়া থাকে, যাহারা সঙ্গে সঙ্গে তওবা করতঃ প্রভুপানে প্রত্যাবর্তন করে তাহারাই হইল উত্তম।" (তিরমিযী শরীফ)

হযরত ছোলায়মান (আঃ) উল্লিখিত উভয় ঘটনার মধ্যেই এই আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পবিত্র কোরআনে ঘটনা দুইটির বিবরণ এই–

وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ - اِنَّهٗ اَوَّابٌ - اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِىِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ - فَقَالَ اِنِّىْ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّىْ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ - رُدُّوْهَا عَلَىَّ

- فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ - وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ - قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَهَبْ لِىْ مُلْكًا لَّايَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ - فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖ رُخَاۤءً حَيْثُ اَصَابَ - وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّاۤءٍ وَّغَوَّاصٍ - وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ - هٰذَا عَطَاۤؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ - وَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ -

অনুবাদ ঃ আমি দাউদের জন্য দান করিয়াছিলাম ছোলায়মানকে। তিনি আমার উত্তম বান্দা ছিলেন, প্রভুপানে সদা নিমগ্ন থাকিতেন। (তাঁহার প্রভুভক্তির নমুনা–) একদা বৈকালে তাঁহার পরিদর্শনে একদল উত্তম ঘোড়া উপস্থিত করা হইয়াছিল; (উহা পরিদর্শনে তখনকার এবাদতের কথা ভুলিয়া গেলেন।) অতপর (সচেতন হইয়া) অনুতাপ করিয়া বলিলেন, আমার প্রভুর স্মরণ হইতে সরিয়া সম্পদের মায়া-মহব্বতে মগ্ন হইলাম, এমনকি (নির্ধারিত এবাদতের সময় শেষ হইয়া) সূর্য অস্তমিত হইয়া গিয়াছে! এখনই ঐ ঘোড়াগুলি আমার নিকট পুনঃ উপস্থিত কর। সঙ্গে সঙ্গে তিনি (আল্লাহর নামে কোরবানী রূপে) ঘোড়াগুলির গলা ও পায়ের রগ কাটিতে লাগিলেন।

অপর এক ঘটনায় আমি ছোলাময়ানকে কর্মফল ভোগের সন্মুখীন করিয়াছিলাম যে, তাঁহার সিংহাসনের উপর (তাঁহার সম্মুখে) একটি অকর্মা অর্দ্ধাঙ্গ দেহ (ধাত্রীর মার্ফত) রাখিয়া দিয়াছলাম (যদ্বারা তাঁহার একটি কথা ব্যর্থ ইয়াছিল।) তারপর তিনি স্বীয় প্রভু ভক্তির কর্তব্য আদায়ে বলিয়াছিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমার ত্রুটি ক্ষমা করুন এবং (আপনার দ্বীন প্রতিষ্ঠায়) আমাকে অপ্রতিহত রাজকীয় শক্তি দান করুন, যাহা আমি ভিন্ন কাহারও লাভ না হয়; আপনি একমাত্র দাতা। ফলে আমি বাতাসকে তাঁহার অধীনস্থ করিয়া দিলাম; বাতাস তাঁহার আদেশে তাঁহাকে বহন করিয়া) আরামদায়করূপে চলিত। তাঁহার গন্তব্য স্থান পর্যন্ত। আরও– জিন জাতিকে তাঁহার অধীনস্থ করিয়া দিয়াছিলাম যাহারা সব রকম কঠিন নির্মাণ কার্য এবং (মণিমুক্তা আহরণে) ডুবুরীর কাজ করিত। কার্যে অবহেলাকারী শাস্তি ভোগে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিত। আমি (আল্লাহ) ছোলায়মানকে বলিয়াছিলাম, আমার এইসব নেয়ামত তোমার জন্য; তুমি অন্যকেও দান কর বা একা নিজেই বে-হিসাব ভোগ কর। হে বিশ্বাসী! নিশ্চয় ছোলায়মানের জন্য আমার বিশেষ নৈকট্য এবং অতি উত্তম পরিণাম নির্ধারিত রহিয়াছে। (২৩-১২)

১৬৫০। হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, হযরত দাউদের পুত্র ছোলায়মান একদা ঘোষণা করিলেন, (আল্লাহর দ্বীনের জন্য জেহাদ উদ্দেশ্যে নিজস্ব বাহিনী গঠন প্রচেষ্টায়) আমি আজ একই রাত্রে স্বীয় নব্বইজন* স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিব; যাহাতে তাহাদের প্রত্যেকের গর্ভে যেন এক একজন বীর মোজাহেদ জন্ম লাভ করিবে– যে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিবে। সঙ্গী ফেরেশতা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, (আল্লাহ তায়ালার উপর নির্ভর ও ভরসা স্থাপন বোধক বাক্য) "ইনশাআল্লাহ" বলুন। কিন্তু তখন সেদিকে তাঁহার লক্ষ্য হইল না। পরিণাম এই হইল যে, তিনি স্ত্রীগণের সহিত সঙ্গম করিলেন, কিন্তু কোন স্ত্রীই গর্ভধারণ করিল না, শুধুমাত্র একজন স্ত্রী অপূর্ণাঙ্গ একটি সন্তান গর্ভে ধারণ করিল।

অতপর নবী (সঃ) বলিলেন, ছোলায়মান (আঃ) যদি তখন "ইনশাআল্লাহ" বলিতেন, তবে অবশ্যই নব্বইজন স্ত্রীর গর্ভে নব্বইজন বীর মোজাহেদ জন্ম লাভ করিত এবং তাহারা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিতে সক্ষম হইত।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ তা'আলা বায়ু-বাতাস, দেও-জ্বিন ইত্যাদি মহাশক্তি সমূহকে তখনও হযরত ছোলায়মানের করতলগত করেন নাই– একদা তিনি আল্লাহর দ্বীনের জিহাদে সৈন্যদের মধ্যে শিথিলতা

দেখিয়া দুঃখিত ও ক্ষিপ্ত হইলেন।

প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য হইল– তাহার পরওয়ারদেগার আল্লাহ তাআলার দ্বীনকে জারি করা ও জারি রাখার জন্য সর্বপ্রথম নিজের যথাসর্বস্ব এবং সর্বাত্মক চেষ্টা তদবীর ব্যয় করা। এই হিসাবে ছোলায়মান (আঃ) সৈন্য বাহিনীর শৈথিল্য দৃষ্টে নিজ কর্তব্য পালনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রকাশপূর্বক নিজস্ব বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা ঘোষণা করিলেন। আল্লাহর দ্বীনের জন্য জেহাদ করার ব্যাপারে শৈথিল্য দৃষ্টে দুঃখে ও ক্ষোভে জর্জরিত হযরত ছোলায়মান স্বীয় ঘোষণার মধ্যে আল্লাহর উপর ভরসা স্থাপন বোধক বাক্য "ইনশাআল্লাহ" বলিতে ভুলিয়া গেলেন। ব্যাপারটা সামান্য ও স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু তিনি ছিলেন আল্লাহর রসূল; তাঁহার চুল পরিমাণ ত্রুটি আল্লাহর দরবারে পাহাড় তুল্য গণ্য হইল এবং আগামীর জন্য সতর্ককরণে আল্লাহ তাঁহাকে ভুলের মাসুল ভোগের সম্মুখীন করিলেন– তাঁহার ঘোষণাকে ব্যর্থ করিয়া দিলেন।

ছোলায়মান (আঃ) স্বীয় ঘোষণার ব্যর্থতা দৃষ্টে নিজ-ত্রুটি স্মরণ করিয়া আল্লাহর দরবারে সেজদায় পড়িলেন এবং আল্লাহর তায়ালার নিকট অপ্রতিহত রাজশক্তি লাভের দরখাস্ত করিলেন, যেন আল্লাহর দ্বীন জারী করিতে কোন বাধা থাকিতে না পারে। অন্তর্যামী আল্লাহ তায়ালা তাঁহার দ্বীন জারী করার জন্য হযরত ছোলায়মানের সাধনা, এখলাছ দৃঢ় নিয়্যত এবং সর্বসাধ্যে প্রচেষ্টা দৃষ্টে তাঁহাকে সেইরূপ শক্তি দান করিলেন– দেও, জ্বীন, বাতাস প্রভৃতি মহাশক্তিসমূকে তাঁহার করতলগত করিয়া দিলেন।

হযরত ছোলায়মানের মৃত্যুর এক আশ্চর্য ঘটনা

ছোলায়মান (আঃ) বাইতুল মোকাদ্দাছ মসজিদ পুনঃনির্মাণ করিতেছিলেন, এখনও নির্মাণ কার্য শেষ হয় নাই এমতাবস্থায় হযরত ছোলায়মানের জন্য নির্ধারিত মৃত্যু-সময় নিকটবর্তী হইল এবং তিনি তাহা অবগত হইলেন। মসজিদ নির্মাণে নিয়োজিত ছিল একদল জ্বিন, যাহারা সাধারণতঃ দুষ্ট ও দুর্ধর্ষ হয়; কোন রকম জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থা ছাড়া কাহারও আয়ত্বে থাকিয়া কাজ করিয়া যাওয়া তাহাদের পক্ষে অসহনীয়। এস্থলে হযরত ছোলায়মানের খোদা-প্রদত্ত শক্তির প্রভাব তাহাদিগকে পদানত ও কার্যে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছিল।

মসজিদ নির্মিত হওয়ার পূর্বেই যখন হযরত ছোলায়মান তাঁহার মৃত্যু নিকটবর্তী বলিয়া জানিতে পারিলেন, তখন স্বভাবতঃই তিনি আশঙ্কা করিলেন, এই অবস্থায় আমার মৃত্যু ঘটিলে সঙ্গে সঙ্গেই দুর্ধর্ষ জিনগণ কার্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে, মসজিদ নির্মাণ অসম্পূর্ণ থাকিবে। এদিকে মৃত্যুর নির্ধারিত সময় অনড় ও অটল, এক সেকেন্ড এদিক-ওদিক হইতে পারে না।

ছোলায়মান আলাইহিচ্ছলামের নীতি ছিল, তিনি নির্জন কক্ষে একাধারে দীর্ঘ দিন আল্লাহর এবাদত ও ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন, লোকদের মেলামেশা ত্যাগ করিয়া থাকিতেন, কিন্তু সকলের উপর তাঁহার যে, ভয়ানক প্রভাব ছিল উহার প্রতিক্রিয়ায় সমস্ত কাজ-কর্ম সঠিকরূপে চলিত, কোন বিঘ্নের সৃষ্টি হইত না।

হযরত ছোলায়মানের মৃত্যু অতি নিকটবর্তী আসিয়া গেলে তিনি তাঁহার পূর্ব প্রচলিত প্রথার দ্বারা কাজ নেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি তাঁহার রীতি অনুযায়ী একটি নির্জন কক্ষে এবাদত ও আল্লাহর ধ্যানে মশগুল হইলেন। এইবার যেহেতু মৃত্যুর সম্মুখীন, তাই তিনি একটি লাঠির উপ এরূপ ভর করিয়া রহিলেন যেন মৃত্যু ঘটার পরও তাঁহার দেহ মাটিতে না পড়িয়া স্থির থাকে। নিজে এই ব্যবস্থা অবলম্বনপূর্বক আল্লাহ তাআলার দরবারেও দোয়া করিলেন যে, বাইতুল মোকাদ্দাস মসজিদের নির্মাণকার্য যেন পূর্ণরূপে সমাধা হয়।

নির্ধারিত সময়ে হযরত ছোলায়মানের মৃত্যু হইয়া গেল, কিন্তু তিনি নির্জন কক্ষে এবাদতে মশগুল আছেন বলিয়াই সকলের ধারণা, তাই কেহ তাঁহার মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাত হইতে পারিল না এবং সকলেই নিজ নিজ কার্যে নিয়োজিত থাকিল।

* পূর্বে ৭০ সংখ্যার উল্লেখ হইয়াছে, কিন্তু নব্বই সংখ্যার মতামতই অগ্রগণ্য।

সমস্ত নবীগণেরই বিশেষত্ব যে, তাঁহাদের মৃত দেহের উপর কোন প্রকার বার্তন আবর্তন ঘটে না। তাই হযরত ছোলায়মানের দেহ অপরিবর্তিত অবস্থায় স্থির রহিয়া গেল। সকলেই তাঁহাকে পূর্ব প্রচলিত রীতি অনুযায়ী জীবিত এবং এবাদত ও ধ্যানে মশগুল ভাবিয়া কাজ-কর্ম চালাইয়া যাইতে লাগিল। দুর্ধর্ষ জ্বিন যাহারা মসজিদ নির্মাণে নিয়োজিত ছিল তাহারাও দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া যাইতেছিল। বাইতুল মোকাদ্দাছ মসজিদ সম্পূর্ণ হইয়া আসিল, এদিকে হযরত ছোলায়মানের লাঠি যাহার প্রতিরোধে তাঁহার মৃত দেহ স্থিতাবস্থায় ছিল সেই লাঠিতে ঘুণ-পোকা লাগিয়া উহা খাইতে আরম্ভ করিল।

আল্লাহ তায়ালার কুদরতে এক দিকে মসজিদের নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হইল, অপর দিকে ঘুণ-পোকার দরুন লাঠির প্রতিরোধ শক্তি নিঃশেষ হইয়া গেল; লাঠি ভাঙ্গিয়া হযরত ছোলায়মানের মৃত দেহ মাটিতে পড়িয়া গেল। লোকজন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল হযরত ছোলায়মানের মৃত্যু হইয়াছে এবং লাঠির উপর ঘুণ-পোকার ক্রিয়া-কার্যের অবস্থা দৃষ্টে সকলেই অনুভব করিল যে, অদ্য হইতে বহুদিন পূর্বেই হযরত ছোলায়মানের মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে, কিন্তু আলেমুল-গায়েব আল্লাহ ভিন্ন কেহ তাঁহার মৃত্যু জ্ঞাত হইতে পারে নাই।

আল্লাহ তাআলার কুদরতের এক একটা লীলার দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ের সমাধা হইয়া যায়। এখানেও এই লীলার মাধ্যমে মসজিদ নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়া ছাড়াও একটি জটিল বিষয়ের মীমাংসা হইল। জ্বিনদের সম্পর্কে সাধারণ লোকদের এবং জ্বিনদের নিজেদেরও ধারণা ছিল– তাহারা গায়েবী খবরাখবর অবগত থাকে। আলোচ্য ঘটনায় এই অমূলক ধারণার অসাড়তা প্রমাণিত হইল। জিনগণ যদি গায়েবী খবর অবগতই থাকিত, তবে তাহাদের চোখের সম্মুখে হযরত ছোলায়মানের মৃত্যুর ঘটনা অজ্ঞাত থাকিতে পারিত না এবং তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হযরত ছোলায়মানের দরুন তাহারা যে সব কঠোর পরিশ্রমে নিয়োজিত ছিল সেই সব পরিশ্রমে তাহারা নিয়োজিত থাকিত না। উল্লিখিত বিষয়াবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ পবিত্র কোরআনে এই–

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖ اِلاَّ دَآبَّةُ الْاَرْضِ تَاكُلُ مِنْسَاَتَهٗ ـ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِى الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ـ

অনুবাদ ঃ আমি নির্ধারিত সময়ে ছোলায়মানের মৃত্যু ঘটাইলাম, (এমন সুকৌশলে যে, তাঁহার মৃত্যু কাহারও অনুভূতই হইল না) একমাত্র ঘুন-পোকাই তাঁহার লাঠি খাইয়া তাহাদিগকে তাঁহার মৃত্যু অগত করিল। (ঘুণ-পোকার লাঠি খাওয়ায়) যখন তিনি পড়িয়া গেলেন তখন (কার্যে নিয়োজিত) জ্বিনগণ (তাঁহার সম্পর্কে অবগত হইল যে, তিনি ত বহুদিন পূর্বেই মারা গিয়াছেন এবং) বুঝিতে পারিল যে, যদি তাহারা গায়েবের খবর জানিত তবে এতদিন এই কষ্টদায়ক পরিশ্রমে তাহাদের আবদ্ধ থাকিতে হইত না।

(পারা– ২২, রুকু– ৮)

শিক্ষণীয় বিষয় ঃ মৃত্যু যে নির্ধারিত সময় হইতে একটুও টলে না উল্লিখিত ঘটনার মধ্যে উহারই একটি বিশেষ নজীর দেখান হইয়াছে। ছোলায়মান আলাইহিস্ সালামের ন্যায় ব্যক্তি যিনি একদিকে ছিলেন বিশিষ্ট নবী, অন্য দিকে বিশ্ব-অধিপতি যাঁহার ক্ষমতা ও শক্তি ছিল অসাধারণ। সেই ছোলায়মান (আঃ) শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুকে উহার নির্দিষ্ট সময় হইতে হটাইতে পারিলেন না। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা অটল অনড় আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন।

لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً ....

"প্রত্যেকের জন্য মৃত্যুর সময় নির্ধারিত রহিয়াছে, সেই সময় উপস্থিত হইলে একটুও আগ-পাছ করার ক্ষমতা কাহারও থাকিবে না।।" (পারা–১১, রুকু– ১০)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ হযরত ছোলায়মান আলাইহিচ্ছলামের যে অতুলনীয় ও অসাধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন রাজত্ব

হাসিল ছিল তাহার একমাত্র সূত্র ছিল সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁআলার বিশেষ দান। যহার বিবরণ পূর্বালোচিত পবিত্র কোরআনের আয়াত সমুহের অনেক স্থানে উল্লেখ রহিয়াছে।

ইহুদিদের মধ্যে এই সম্পর্কে একটা মিথ্যা ভিত্তিহীন ধারণা ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, হযরত ছোলায়মান (আঃ) যাদু-বিদ্যার সাহায্যে এই অসাধারণ শক্তি, সামর্থ ও রাজত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এই ধারণা ও বিশ্বাস ইহুদিদের মধ্যে অতি পরিপক্ক ও ব্যাপকভাবে ছড়াইয়াছিল, এমনকি ইহারই ফলে তাহারা নিজেদের ধর্মীয় কেতাব আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রেরিত আসমানী কেতাবকে পর্যন্ত ছাড়িয়া দিয়া যাদু বিদ্যা শিক্ষায় লিপ্ত হইয়াছিল।

পবিত্র কোরআনের ১ম পারা– ১২ রুকুর সুদীর্ঘ বিবরণে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা উক্ত ধারণার অসাড়তা ঘোষণা করিয়াছেন যে, যাদু– যাহা কুফুরী কাজ উহার সঙ্গে হযরত ছোলায়মানের কোনই সংশ্রব ছিল না।

দুনিয়া পরীক্ষার স্থল– ভাল এবং মন্দ, হালাল এবং হারাম, ঈমানের জিনিস, কুফরের জিনিস উভয়কেই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা এই পরীক্ষার স্থানে সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহারা ভাল তাহারা ভালকে অবলম্বন করিয়া কতৃকার্য হয়, পক্ষান্তরে যাহারা মন্দ তাহারা মন্দকে অবলম্বন করিয়া জাহান্নামের খোরাক হয়।

হক্ক ও সত্যকে বাছিয়া লইয়া উহাকে গ্রহণ ও অবলম্বন করার পরীক্ষাকল্পে আল্লাহ তা'আলা যাদু-বিদ্যা সৃষ্টি করিয়াছেন। শয়তানরা মানব জাতিকে হক্ক ও সত্য পথ হইতে বিভ্রান্ত করিবার উদ্দেশ্যে মানবকে ঐ যাদু শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করে।

হযরত ছোলায়মানের আমলে বিভ্রান্তি সৃষ্টির সুযোগ লাভের জন্য শয়তান শ্রেণীর জিনগণ ঐ যাদু-বিদ্যার বিশেষ প্রচার ও চর্চা করিতে থাকে; এমনকি শয়তানের দলবলরা বই পুস্তক আকারে যাদু-বিদ্যা প্রচার করিতে থাকে। হযরত ছোলায়মান যথারীতি এই শয়তানী কার্যেরও প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, হযরত ছোলায়মান যাদু-বিদ্যার সমস্ত বই পুস্তক বাজেয়াপ্ত করিয়া যথাসাধ্য ঐসবকে সংগ্রহ করতঃ সমস্ত বই পুস্তকগুলিকে স্বীয় কক্ষে সিংহাসনের নীচে পুঁতিয়া রাখিয়াছিলেন, যেন কেহ উহাকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতে সাহসীই না হয়। কিন্তু হযরত ছোলায়মানের মৃত্যুর পর জ্বিন-শয়তানের দলেরা ব্যাপক প্রচার চালাইল যে, হযরত ছোলায়মানের অসাধারণ রাজত্ব একমাত্র যাদু-বিদ্যার সাহায্যেই ছিল। এমনকি লুক্কায়িত বই-পুস্তকগুলির অবশিষ্টাংশও বাহির করিয়া লোকদের মধ্যে মিথ্যা প্রচারণা চালাইল যে, এই দেখ ছোলায়মানের সিংহাসনের নীচে তিলিসমতি যাদুর বই-পুস্তক রহিয়াছে, যাহার বলে তিনি জ্বিন-পরী, দেও-ভুত, পশু-পক্ষী ও বাতাস ইত্যাদি করতলগত করিয়াছিলেন।

জ্বিন ও শয়তানের এই মিথ্যা প্রচারণা এবং হারাম ও কুফরী যাদু-বিদ্যা বন্ধ করার জন্য আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে বিশেষ ব্যবস্থাও প্রেরিত হইয়াছিল, যাহা হারুত ও মারুতের ঘটনারূপে পবিত্র কোরআনে ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু দুনিয়া পরীক্ষার স্থল– এক শ্রেণীর লোক সব কিছুকে উপেক্ষা করিয়া জিন ও শয়তানের প্রচারণার উপরই বিশ্বাসী রহিল এবং যাদু-বিদ্যার পিছনে পড়িয়া রহিল। ইহাই ইহল মূল সূত্র ইহুদিদের এই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন ধারণার যে, ছোলায়মান (আঃ) যাদু জানিতেন, যাহার সাহায্যে তিনি তাঁহার সবকিছু হাসিল করিয়াছিলেন।

আল্লাহ তায়ালা এই মিথ্যা ও গর্হিত ধারণার বিরুদ্ধেই পবিত্র কোরআনের উল্লেখিত বিবৃতির মধ্যে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়াছেন–

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ـ

"কুফরী কাজ (যাদু-বিদ্যাকে) ছোলায়মান কখনও (অবলম্বন) করেন নাই, বস্তুতঃ শয়তানরাই ঐ কুফরী (যাদু-বিদ্যার) কাজ করিয়াছিল; তাহারাই লোকদিগকে যাদুবিদ্যা শিখাইতেছিল।

হযরত লোকমান

পবিত্র কোরআনে "সূরা লোকমান" নামে একটি সূরা আছে এবং সেই ছুরার মধ্যে "লোকমান" নামীয় এক ব্যক্তির স্বীয় পুত্রকে প্রদত্ত কতিপয় মহৎ সদুপদেশ বিশ্ব-মানবের জন্য বিশেষ নজির স্বরূপ উল্লেখ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সুজ্ঞানী সুপন্ডিত হিসাবে "লোকমান হাকীম" নাম সচরাচর সাধারণেও প্রসিদ্ধ রহিয়াছে এবং তিনি যে, একজন অতি মহৎ ব্যক্তি ছিলেন তাহাও সর্ববিদিত। এমনকি তাঁহার সদুপদেশাবলী সম্বলিত صد پند لقمان ছদপান্দ লোকমান" অর্থাৎ লোকমানের এক শত উপদেশ পুস্তিকাটি সাধারণের প্রচলিত আছে।

এতগুলি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নাম হিসাবে এই নামের তাহ্কীক এবং গবেষণা ও অনুসন্ধানের প্রতি সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে।

কাহারও মত এই যে, হযরত লোকমান স্বয়ং যুগের নবী বা পয়গাম্বর ছিলেন, কিন্তু এই মতামত অতি দুর্বল; ইহার উপর কোন প্রমাণ নাই। অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও আলেমের মত এই যে, "লোকমান" নবী ও পয়গাম্বর ছিলেন না; তিনি একজন খোদাভক্ত পরহেজগার বড় বুজুর্গ মহৎ ব্যক্তি ছিলেন।

লোকমান নামের অনেক লোকই ভূপৃষ্ঠে আসিয়াছে এবং তাহাদের মধ্য হইতে একাধিক ব্যক্তি এমনও হইয়াছিলেন, যাহারা পবিত্র কোরআনের অবতীর্ণ স্থল আরবে এবং বিশ্বে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দুইজন। একজন ছিলেন খৃষ্টপূর্ব এয়োদশ শতাব্দীতে হযরত হুদ আলাইহিস্ সালাম পয়গাম্বরের বংশধর আ'দ জাতির মধ্যে; তিনি ছিলেন একজন অতি মহৎ ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। দ্বিতীয় জনও অতি মহৎ সুজ্ঞানী, সুপন্ডিত ছিলেন। কিন্তু তিনি বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কাহারও মতে তিনি খৃষ্ট পূর্ব ১০ম শতাব্দীর পয়গাম্বর হযরত দাউদের যুগে কাজী তথা প্রধান বিচাপতির পদে মনোনীত ছিলেন। (কাছাছোল কোরআন ২-৩৮)

আমাদের আলোচ্য এবং পবিত্র কোরআনে উল্লিখিত "লোকমান" কে ছিলেন সে সম্পর্কে উল্লিখিত দুইজন সম্পর্কে মতভেদ আছে। কাহারও মতে দ্বিতীয় জন, কিন্তু অগ্রগণ্য মত ইহাই যে, প্রথমোক্ত লোকমানই পবিত্র কোরআনে আলোচিত লোকমান এবং তিনিই "লোকমান হাকীম" নামে সর্বপ্রসিদ্ধ ছিলেন।

পবিত্র কোরআনে উল্লিখিত লোকমান হাকীমের আলোচনা নিম্নরূপ–

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ـ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ ـ

নিশ্চয়ই আমি লোকমানকে সৎ, সূক্ষ্ম ও পরিপক্ক জ্ঞান দান করিয়াছিলাম। তাহাকে আদেশ করিলাম, (আমার এই বৃহৎ দানের কৃতজ্ঞতায় তুমি আল্লাহর শোকর আদায় কর। (ইহা বাস্তব কথা) যে কেহ আল্লাহ তা'আলার শোকর-গুজারী করিবে সে বস্তুতঃ নিজের উপকারার্থেই শোকর-গুজারী করিবে। পক্ষান্তরে যদি কেহ কুফুরী করে (তবে সে নিজেরই ক্ষতি করিবে।) নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অপ্রত্যাশী, স্বয়ং প্রশংসিত।

وَاِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ـ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ـ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ ـ وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ـ وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ

فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ

(লোকমানের পরিপক্ক জ্ঞানের পরিচয় হয়) যখন লোকমান তাঁহার পুত্রকে উপদেশ দানে বলিয়াছিলেন (১) হে বৎস! আল্লাহর সঙ্গে শরীক ঠাওরাইও না, নিশ্চয় শেরেকী কাজ বড় অন্যায়, মহাপাপ। (আল্লাহ বলেন, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর হক্কের ন্যায়) আমি মানুষকে তাহার (জন্মদাতা) মাতাপিতার হক্ক আদায় করিতেও বিশেষ তাকীদ করিয়াছি। তাহার মাতা তাহার জন্য কতই না কষ্ট করিয়াছে! মাতা তাহাকে পেটে রাখিয়া তাহার বোঝা বহন করিয়াছে– দিন দিন দুর্বলতার উপর দুর্বলতার মধ্যে। তারপর কোলে-কাঁধে রাখিয়া দুগ্ধ পান করাইয়াছে; দুগ্ধ ছাড়াইতেও দুই বৎসর কাটিয়াছে। সুতরাং আমি মানুষকে আদেশ করিয়াছি, আমার শোকর আদায় কর এবং তোমার মাতা-পিতার শোকর আদায় কর; (আদেশ লংঘন করিও না) আমার নিকট ফিরিয়া আসিতেই হইবে। অবশ্য যদি তোমার পিতা-মাতা তোমাকে বাধ্য করে আমার সঙ্গে কাহাকেও শরীক করার, যাহা প্রমাণহীন ও জ্ঞানহীনতার কথা, তবে তাহাদের কথা মানিবে না। হাঁ দুনিয়াতে তাহাদের প্রতি সহানুভূতি বজায় রাখিবে। (আখেরাতের ব্যাপারে) আমার প্রতি ধাবমান লোকেরই অনুসরণ করিবে। (দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী) অতপর তোমাদিগকে আমার প্রতি ফিরিয়া আসিতেই হইবে; তখন আমি তোমাদের কার্যকলাপের হিসাব দেখাইব এবং কর্মফল প্রদান করিব।

يٰبُنَيَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ـ

(২) হে বৎস! মানুষের সমুদয় কার্যাবলীই আল্লাহ তাআলা জ্ঞাত থাকেন, এমনকি মানুষের কোন খাছলাত যদি সরিষা পরিমাণ সূক্ষ্মও হয় এবং উহা কোন পাথরের (তথা কোন Strong Room-এর) ভিতর প্রকাশ পায়, কিম্বা সপ্ত আকাশের কোন নিভৃত কোণে বা ভূগর্ভের অন্ধকারে প্রকাশ পায় (আল্লাহর নিকট উহারও হিসাব থাকিবে, কেয়ামতের দিন হিসাবের সময়) তিনি উহা উপস্থিত করিয়া দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্ম জ্ঞানী এবং সর্বজ্ঞ।

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ـ

(৩) হে বৎস! নামাযকে পূর্ণাঙ্গ অতি উত্তমরূপে আদায় ও প্রতিষ্ঠিত করিবে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ করিবে এবং (এই পথে) যত রকমের বিপদাপদ তোমার উপর আসে উহার উপর ধৈর্যধারণ করিবে; নিশ্চয় ইহা হইতেছে প্রকৃত সাহসিকতার কাজ।

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ـ اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ

(৪-৫) গর্ব ও অহঙ্কারে মাতিয়া লোকদের হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখিবে না এবং যমিনের উপর দাপট ও দর্পের সহিত চলিবে না; (এইসব অহঙ্কারের নিশান)। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কোন অহঙ্কারী গর্বকারীকেই পছন্দ করেন না– আল্লাহ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন।

وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ـ

(৬-৭) আর পথ চলাকালে (বাচালতার পরিচায়ক ছুটাছুটি বা গর্ব ও অহঙ্কারের পরিচায়ক ক্ষীণ গতির) মধ্যবর্তী চলন অবলম্বন করিবে এবং কথা বলাকালে কোমল স্বরে কথা বলিবে; (চেঁচাইবে না) নিশ্চয়ই গাধার আওয়াজ সর্বাধিক ঘৃণিত আওয়াজ। (যেহেতু গাধা চেঁচাইয়া আওয়াজ করে।)

(সূরা লোকমান ঃ পারা–২১. রুকু– ১১)

উক্ত আয়াতে জানা গেল, মহাজ্ঞানী লেকমান হাকীমের সুচিন্তিত অভিমত ছিল যে, আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে শরীক করা অতি বড় মহাপাপ ও অন্যায়। হযরত রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার এক উক্তিতে লোকমান হাকীমের সেই অভিমতের প্রতি ছাহাবীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। হাদীছটি এই–

عن عبد الله ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال لما نزلت "اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ" شَقَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَيُّنَا لَايَظْلِمُ نَفْسَهٗ فَقَالَ لَيْسَ ذٰلِكَ اِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ اَلَمْ يَسْمَعُوْا مَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يَابُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ -

অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন কোরআনের আয়াত এই মর্মে নাজিল হইল যে, "যাহারা ঈমান গ্রহণ করিবে এইরূপে যে, ঈমানকে অন্যায়ের সঙ্গে মিশ্রিত করে নাই, একমাত্র তাহারাই (দোযখ হইতে) মুক্তি পাইবে।"

তখন ছাহাবীগণ বিচলিত হইয়া পড়িলেন; (এই ভাবিয়া যে, উক্ত আয়াতের মর্মে কোন ব্যক্তি ঈমান গ্রহণের পর যে কোন অন্যায় তথা গোনাহ করিলে সে দোযখ হইতে মুক্তি পাইবে না। কারণ, তাহা আয়াতে বলা হইয়াছে যে, অন্যায়ের সংমিশ্রণ পরিহারকারীদের মধ্যে মুক্তি সীমাবদ্ধ। এই ভীতির দরুন) তাঁহারা হযরতের দরবারে আরজ করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, অন্যায় করিয়া নিজের ক্ষতি না করে? (সম্পূর্ণরূপে অন্যায় হইতে আমাদের কেহই বাঁচিয়া থাকে না, সুতরাং উক্ত আয়াতের মর্মানুযায়ী আমাদের কেহই মুক্তি পাইবে না)।

হযরত (সঃ) তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, অন্যায়ের অর্থ যাহা তোমরা বুঝিয়াছ (যে, সব রকমের অন্যায় ত্রুটি– গোনাহ্ তাহা নহে। উক্ত আয়াতে "অন্যায়" অর্থ একমাত্র শের্‌ক। (অতএব উক্ত আয়াতের মর্ম এই যে, যে ব্যক্তি ঈমান গ্রহণ করিয়া শেরেকী কার্য করতঃ ঈমানের সঙ্গে শেরেককে মিশ্রিত করে সে মুক্তি পাইবে না)।

তোমরা কি লোকমানের উক্তি (পবিত্র কোরআন মারফত) শুন নাই। তিনি স্বীয় পুত্রকে উপদেশ দান পূর্বক বলিয়াছিলেন, "হে বৎস! তুমি আল্লাহর সঙ্গে শরীক ঠাওরাইও না, নিশ্চয় শেরেক হইতেছে মহা অন্যায়।"

ব্যাখা ঃ শেরেকী গোনাহ আল্লাহ মাফ করিবেন না বলিয়া পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট ঘোষণা রহিয়াছে। শেরেক ভিন্ন অন্য গোনাহ নেক কাজের অছিলায় বা তওবার দ্বারা মাফ হইবে; এ সম্পর্কে কোরআনের আয়াত এই–

اِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

'নিশ্চয় জানিও, আল্লাহ তাঁহার সঙ্গে শরীক করার গোনাহ মাফ করিবেন না, উহা ছাড়া অন্য গোনাহ যাহার জন্য আল্লাহ ইচ্ছা করিবেন মাফ করিবেন।"

আলোচ্য হাদীছখানার অনুবাদ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রথম খণ্ডে ২৮ নম্বরে হইয়াছে

হযরত যাকারিয়া (আঃ)

যাকারিয়া (আঃ) ঈসা আলাইহিস সালামের সংলগ্ন যমানারই ছিলেন; হযরত ঈসার মাতা "মারইয়াম"কে যাকারিয়া (আঃ)-ই প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তিনি মারইয়ামের খালু হইতেন, বাইতুল-মোকাদ্দাছের ধর্মীয় প্রধানও তিনিই ছিলেন।

হযরত যাকারিয়ার পিতার নাম সম্পর্কে এত মতভেদ রহিয়াছে যে, কোন প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত করা

কঠিন। অবশ্যই ইহা সর্বস্বীকৃত যে, তিনি বনী-ইস্রাঈলদের মধ্যে হযরত দাউদ আলাইহিচ্ছালামের বংশধর ছিলেন। যাকারিয়া (আঃ) ছুতার বা মিস্ত্রি কার্য করিয়া নিজ হস্তোপার্জিত আয়ে জীবিকা নির্বাহ করিতেন।

প্রথম জীবনে হযরত যাকারিয়া নিঃসন্তান ছিলেন, তিনি এবং স্ত্রী উভয়ে বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু কোন সন্তান হয় নাই। সন্তান লাভের আকাঙ্খায় তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি মারইয়ামকে লালন-পালন করিতেন, তিনি তাঁহাকে এক বিশেষ এবাদৎ ঘরে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। হযরত যাকারিয়া যখনই মারইয়ামের নিকট আসিতেন তখনই তাঁহার নিকট তাজা তাজা ফল-ফলাদির সমাবেশ দেখিতেন। যেই মৌসুমে যে ফল পাওয়া যায় না সেই মৌসুমে সেই ফলই তাজা, টাটকা ও সদ্য আহরিত তাঁহার নিকট দেখিতে পাইতেন।

হযরত যাকারিয়া নিজে এবং তাঁহার স্ত্রী উভয়ে বৃদ্ধ বয়সে সাধারণ নিয়ম দৃষ্টে সন্তান লাভের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন। মারইয়ামের নিকট অমৌসুমী ফল-ফলাদির সমাবেশ দেখিয়া হযরত যাকারিয়ার অন্তরে নতুন আশার সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিলেন, মারইয়ামের জন্য আল্লাহ তা'আলা মৌসুমবিহীন ফল-ফলাদির সমাবেশ করিয়া যেরূপ সর্বশক্তির বিকাশ সাধন করিয়াছেন তদ্রূপ আমাকেও বৃদ্ধ বয়সে সন্তান দান করিতে পারেন। নূতন আশায় মাতিয়া হযরত যাকারিয়া নব উদ্যমে সন্তান লাভের দোয়ায় মনোনিবেশ করিলেন।

একদা তিনি স্বীয় বিশেষ এবাদত-ঘরে নামাযে মশগুল ছিলেন, হঠাৎ একদল ফেরেশতা আসিয়া তাঁহাকে পুত্র সন্তান লাভের সুসংবাদ দান করিলেন। সুসংবাদ শ্রবণে তিনি বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার স্ত্রী আরও অধিক বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। অবশেষে হযরত যাকারিয়া আল্লাহ তা'আলার এই বিশেষ নেয়ামত সন্তান হওয়ার আলামত ও নিদর্শন দৃষ্টে তিন দিনের জন্য দুনিয়ার সকল প্রকার সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একমাত্র আল্লাহ তা'আলার এবাদতে ব্রতী হইলেন।

কাহারও প্রতি কোন সময় আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কোন নেয়ামত আসিলে সে ক্ষেত্রে তাহার পক্ষে আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশেষ অনুরক্তি প্রকাশ করা এবং তাঁহার এবাদত-বন্দেগীতে বিশেষরূপে মনোনিবেশ করাই হইল আসল কর্তব্য। হযরত যাকারিয়া (আঃ) সেই আদর্শই স্থাপন করিয়াছেন। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে উক্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ - فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ - اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ -

স্মরণ কর, যাকারিয়া নবীর ঘটনা– যখন তিনি স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট নিবেদন করিলেন, হে প্রভু! আমাকে উত্তরাধিকারবিহীন নিঃসন্তান রাখিও না, অবশ্য তুমিই সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী। (কিন্তু বাহ্যিক উত্তরাধিকারী সন্তানের অভিপ্রায়ও স্বাভাবিক।) আমি তাঁহার আবেদন পূর্ণ করিলাম এবং দান করিলাম তাঁহাকে "ইয়াহ্ইয়া" নামক পুত্র সন্তান তাঁহার আকাঙ্খা পূরণে তাঁহার (বৃদ্ধা) স্ত্রীকে সন্তানোপযোগী করিয়া দিলাম। তাঁহারা সকলেই নেক কার্যে দ্রুতগামী ছিলেন এবং ভয় ও আশার মধ্যে আমার এবাদত-গুজারী করিতেন এবং আমার সম্মুখে সর্বদা নত থাকিতেন। (সূরা আম্বিয়া, পারা–১৭, রুকু–৬)

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا - قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ - اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ -

মারইয়ামকে প্রতিপালনকালে যখনই যাকারিয়া মারইয়ামের নিকট তাহার কক্ষে যাইতেন তখনই তাহার নিকট (অমৌসুমী) ফল-ফলাদির সমাবেশ দেখিতেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মারইয়াম! এইসব

তোমার জন্য কোথা হইতে আসে? মারইয়াম বলিলেন, এইসব আল্লাহর তরফ হইতে। নিশ্চয় আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন বে-হিসাব রিযিক দান করেন। هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ

এই ক্ষেত্রে যাকারিয়া স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট আবেদনে বলিলেন, হে পরওয়ারদেগার! (বাহ্যিক দৃষ্টিতে আশা নাই) আপনি নিজ রহমত ভান্ডার হইতে আমাকে পবিত্র সন্তান দান করুন। আপনিত দোয়া শ্রবণকারী।

فَنَادَتْهُ الْمَلٰئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُّصَلِّىْ فِى الْمِحْرَابِ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ سَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ـ

অতপর তিনি এবাদত-ঘরে নামাজে দাঁড়াইলে একদল ফেরেশতা তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, আল্লাহ আপনাকে সুসংবাদ পাঠাইয়াছেন ইয়াহ্ইয়া নামক পুত্রের; যিনি আল্লাহর বিশেষ আদেশবলে জন্মলাভকারী অন্য এক নবীর (তথা ঈসা নবীর) সত্যতার সাক্ষ্য বহন করিবেন, নেতৃত্ব লাভ করিবেন, বিশেষ সংযমী হইবেন এবং বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে গণ্য হইয়া নবুওয়ত প্রাপ্ত হইবেন।

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلَامٌ وَّقَدْ بَلَغَنِىَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِىْ عَاقِرٌ ـ

তখন যাকারিয়া বলিলেন, হে প্রভু! আমার পুত্র কিরূপে হইবে অথচ আমি বৃদ্ধ বয়সে পৌছিয়াছি এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা?

قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ـ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْ اٰيَةً ـ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ـ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِىِّ وَالْاِبْكَارِ ـ

আল্লাহ বলিলেন, তোমরা যে অবস্থায় আছ সে অবস্থায়ই তোমরা পুত্র লাভ করিবে; আল্লাহ তা'আলা করিতে পারেন যাহা তিনি ইচ্ছা করেন। যাকারিয়া (আঃ) বলিলেন, পরওয়ারদেগার! ঐ নেয়ামত লাভ নিকটবর্তী হওয়ার কোন নিদর্শন আমাকে জানাইয়া দেন; (যেন বেশী শুকর-গুজারী করার সুযোগ পাই)। আল্লাহ বলিলেন, তোমার জন্য নিদর্শন এই হইবে যে, লোকদের সঙ্গে তোমার কথা বলার শক্তি তিন দিন বন্ধ থাকিবে, শুধু কেবল ইশারা দ্বারা বুঝাইতে পারিবে। এই সময় তুমি তোমার প্রভুর যিকেরে মশগুল হইবে এবং সকাল-বিকাল সর্বদা তাঁহার তছবীহ– পবিত্রতার গুণ জপায় মশগুল থাকিবে। (পারা–৩, রুকু–১২)

ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ـ اِذْ نَادٰى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ـ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا ـ وَلَمْ اَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ـ

পরওয়ারদেগার তাঁহার বিশিষ্ট বান্দা যাকারিয়াকে বিশেষ করুণা ও রহমত দান করিয়াছিলেন– সেই আলোচনা। যখন যাকারিয়া স্বীয় পরওয়ারদেগারের দরবারে চুপে চুপে আবেদন জানাইলেন, প্রভু হে! (বার্ধক্যে) আমার অস্থি পর্যন্ত দুর্বল হইয়া গিয়াছে এবং সমস্ত মাথায় সাদার আবরণ আসিয়া গিয়াছে। আর আমি কোন সময় তোমার নিকট দোয়া করিয়া অকৃতকার্য থাকি নাই।

وَاِنِّىْ خِفْتُ الْمَوَالِىَ مِنْ وَّرَاءِىْ وَكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا فَهَلْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ـ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ـ

আমার মৃত্যুর পরে আমার পরিজন সম্পর্কে আশঙ্কা হয়, (তাহারা দ্বীন হেফাযতে কোরবানী দিবে না।

অবশ্য আশা করি আমার ঔরসের সন্তান সেইরূপ হইবে না।) কিন্তু আমার স্ত্রী বন্ধ্যা (স্বাভাবিক স্তরে তাহার সন্তান হইবে না;) অতএব আপনার নিকট হইতে (অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থার বিপরীত) একজন উত্তরাধিকারী আমাকে দান করুন- যে আমার এবং ইয়াকুব-বংশের জ্ঞান-বিদ্যা ও বিশেষত্বের উত্তরাধিকারী হইতে পারে। এবং প্রভু হে! আপনি তাহাকে নিজ সন্তুষ্টি ভাজনরূপে গড়িবেন।

يٰزَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِ نِ اسْمُهٗ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ـ

(আল্লাহ বলিলেন,) হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে সুসংবাদ দান করিতেছি একটি বিশেষ পুত্র সন্তানের, যাহার নাম "ইয়াহ্ইয়া" হইবে; (বিশেষ বিশেষ গুণে) যাহার তুলনা আর হয় নাই।

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ـ قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا ـ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْ اٰيَةً قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ـ

যাকারিয়া আরজ করিলেন, প্রভু হে! কিরূপে আমার ছেলে হইবে, আমার স্ত্রী ত বন্ধ্যা এবং আমিও বার্ধক্যের শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছি? আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, উভয়ে এইরূপ থাকাবস্থায়ই সন্তান হইবে। পরওয়ারদেগার আরও বলিলেন, ইহা আমার জন্য সহজ; (লক্ষ্য কর না যে,) আমি ইতিপূর্বে তোমাকে পয়দা করিয়াছি, অথচ তোমার কোন অস্তিত্বই ছিল না। যাকারিয়া বলিলেন, প্রভু হে! (এত বড় নেয়ামতটি আগমনের একটা নিদর্শন) আমার জন্য নির্ধারিত করিয়া দিন। আল্লাহ বলিলেন, তোমার জন্য নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিন লোকদের সঙ্গে কথা বলিতে সক্ষম হইবে না, অথচ তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ থাকিবে।

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ـ

সে মতে একদা তিনি স্বীয় এবাদত ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন এবং (তখন তাঁহার কথা বন্ধ হইয়া সুসংবাদ বাস্তবায়িত হওয়া আসন্ন প্রতিপন্ন হইয়াছে। সে মতে) সকলকে ইশারা দ্বারা বলিলেন, তোমরা সকলে (শুকরগুজারি স্বরূপ) সকাল-বিকাল তছবীহ পড়। সূরা মারইয়াম ঃ পারা-১৬, রুকু-৪)

হযরত ইয়াহ্য়্যা (আঃ)

৯৮ বৎসর বয়সের বৃদ্ধা বন্ধ্যা মাতা এবং ১২০ বৎসর বয়সের বৃদ্ধ পিতার ঔরসে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ কুদরতে হযরত ইয়াহ্য়্যা জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। ইয়াহ্য়্যা (আঃ) এবং ঈসা (আঃ) উভয়ে একই যমানায় ছিলেন। এমনকি কাহারও মতে ত উভয়ের মাতৃগর্ভে স্থান লাভের সময়ও একই ছিল এবং কাহারও মতে মাত্র ছয় মাসের ব্যবধান ছিল। তাঁহাদের বয়সের ব্যবাধানও ঐ ছয় মাসই ছিল, সর্বোচ্চ সংখ্যার অভিমতেও বয়সের ব্যবধান মাত্র তিন বছরের ছিল।

মেরাজ শরীফে রসুলুল্লাহ (সঃ) তৃতীয় আসমানে হযরত ইয়াহ্য়্যা ও হযরত ঈসার সাক্ষা পাইয়াছিলেন। তাঁহারা তথায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। জিব্রাঈল (আঃ) কর্তৃক পরিচয় করাইবার পর হযরত (সঃ) তাঁহাদের উভয়কে ছালাম করিলে তাঁহারা সাদর সম্ভাষণে উত্তর দিলেন مرحبا بالاخ الصالح والنبى الصالح "মারহাবা- ধন্যবাদ উচ্চ মর্যাদাবান ভ্রাতা ও উচ্চ মর্যাদাবান নবীর প্রতি।"

উল্লিখিত মেরাজের হাদীছে হযরত ইয়াহ্য়্যা ও ঈসা সম্পর্কে একটি মন্তব্য করা হইয়াছে যে, هما ابنا خالة তাঁহারা উভয়ে খালাত ভাই ছিলেন। ইহার দুই রকম ব্যাখ্যা করা হইয়াছে- কেউ কেউ বলিয়াছেন, হযরত ঈসার নানী "হান্নাহ্"র দুই কন্যা ছিল- "মরয়্যাম" ও "য়্যাশা"। য়্যাশার গর্ভে হযরত ইয়াহ্য়্যা এবং মারয়্যামের গর্ভে হযরত ঈসা জন্ম লাভ করেন, সুতরাং ইয়াহ্য়্যা ও ঈসা সাধারণরূপেই পরস্পর খালাত ভাই

হইলেন। কিন্তু অধিকাংশ মোহাদ্দেছ এবং ঐতিহাসিকের মতে হযরত ঈসার নানী "হান্নাহ" সারা জীবন নিঃসন্তান থাকার পর বহু দোয়া-কালামের অছিলায় তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে একমাত্র কন্যা "মারইয়াম" দান করিয়াছিলেন, তাঁহার অপর কোন সন্তানই ছিল না। অবশ্য হযরত ইয়াহ্ইয়ার মাতা "য়্যাশা" হযরত ঈসার নানী হান্নাহ্র ভগ্নি ছিলেন শুধু এই সূত্রেই উভয়কে খালাত ভাইরূপে ব্যক্ত করা করা হইয়াছে।

হযরত ইয়াহ্ইয়ার গুণাবলী সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে বিশেষ একটি হইল- مصدقا بكلمة من الله অর্থাৎ তিনি আল্লাহর কলেমার সত্যবাদিতা সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতা হইবেন। এস্থলে "আল্লাহর কলেমা।" দ্বারা কেউ তৌরাত কেতাব উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করিয়াছেন- অর্থাৎ তিনি তৌরাত কেতাব অবলম্বী নবী হইবেন; তাঁহার নিকট কোন বিশেষ কেতাব আসিবে না।

কিন্তু সাধারণতঃ পবিত্র কোরআনের ভাষায় كلمة الله কালেমাতুল্লাহ- আল্লাহর কলেমা বলিয়া হযরত ঈসা (আঃ) কে উদ্দেশ্য করা হয়। এই সূত্রে অধিকাংশ তফছীরকারগণ ঐকমত্য এই যে, এস্থলেও হযরত ঈসা-ই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ হযরত ঈসার সত্যবাদিতা প্রচার করা হযরত ইয়াহ্ইয়ার একটি বিশেষ কার্য হইবে। হযরত ইয়াহ্ইয়া এই দায়িত্বকে সারা জীবন সূচারুরূপে পালন করিয়া গিয়াছেন। এমনকি পিতৃস্পর্শ ব্যতিরেকে আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরতে যখন হযরত ঈসা স্বীয় মাতার গর্ভে জন্ম লাভ করিলেন এবং সকলেই মারইয়্যামের প্রতি তিরস্কার আরম্ভ করিল, তখন হযরত যাকারিয়া ছয় মাসের বা তিন বৎসরের বালক হযরত ইয়াহ্ইয়াকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন তখনও শিশু ইয়াহ্ইয়া আল্লাহর কুদরতে প্রদত্ত বাকশক্তি বলে হযরত ঈসার নবুয়তের এবং সত্যবাদিতার সাক্ষ্য দিয়াছিলেন।

হযরত ঈসার আবির্ভাবের পর ইহুদিরা তাঁহার প্রাণঘাতী শত্রু হইল। তাঁহার এবং তাঁহার মাতা সম্পর্কে কুৎসিত অপবাদ রটাইয়া তাঁহার নবুয়ত অস্বীকার করাই নয় শুধু, বরং সর্বপ্রকারের বিরোধিতা করিতে লাগিল।

ইহুদিগণের এই বিরোধিতার বন্যার সম্মুখে হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ) সর্বদা হযরত ঈসার সত্যবাদিতাই প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন, এমনকি অবশেষে, হযরত ঈসার ভ-পৃষ্ঠে অবস্থানকালেই হযরত ইয়াহ্ইয়া স্বীয় দায়িত্ব পালনে জীবন বিসর্জন দিয়া ইহুদিদের হস্তে শাহাদত বরণ করিয়াছিলেন। হযরত ইয়াহ্ইয়ার আরও গুণাবলী উল্লেখ করতঃ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন-

وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ـ وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ـ وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ـ وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ـ

আর আমি ইয়াহ্ইয়াকে বাল্যকাল হইতেই দ্বীনের খাঁটি জ্ঞান এবং আমার তরফ হইতে বিশেষরূপে হৃদয়ের কোমলতা ও নম্রতা এবং চরিত্রের পবিত্রতা দান করিয়াছিলাম। তিনি অতি পরহেজগার এবং পিতা মাতার ভক্ত ও ফরমাবরদার ছিলেন, আত্মম্ভরী গোঁড়া নাফরমান প্রকৃতির ছিলেন না।

তাঁহার প্রতি সালাম তথা শান্তির সুসংবাদ জন্মের দিন হইতে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এবং যে দিন পুনর্জীবিত হইয়া উঠিবেন সেই দিনের জন্যও রহিল। (ছুরা মারইয়াম ঃ পারা- ১৩, রুকু-৪)

উল্লিখিত আয়াতে হযরত ইয়াহ্ইয়াকে বাল্যকাল হইতেই দ্বীনের খাঁটি জ্ঞান প্রদত্ত হওয়ার উল্লেখ করা হইয়াছে। এই আয়াতের তাৎপর্যে কোন কোন মোফাস্সির বলিয়াছেন, বাল্যকালেই হযরত ইয়াহ্ইয়াকে আনুষ্ঠানিকরূপে নবুয়ত দান করা হইয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশ মোফাসসির ও আলেমগণের মত ইহাই যে, নবুয়ত পাইয়াছিলেন পূর্ণ বয়সের সময়ই, অবশ্যই তিনি বিশেষ জ্ঞান ও প্রতিভা অলৌকিকরূপে বাল্যকার হইতেই পাইয়াছিলেন।

হযরত ইয়াহ্ইয়্যা সম্পর্কে তাঁহার হৃদয়ের কোমলতা এবং তাঁহার আত্মার পবিত্রতা ও পরহেজগারীর উল্লেখ করিয়া আলোচ্য আয়াতে যে প্রশংসা করা হইয়াছে হযরত ইয়াহ্য়্যার জীবন-ইতিহাসও উহার সাক্ষ্য দেয়।

ইবনে আছাকের নামক ইতিহাসবিশারদ ওয়াহ্াব ইবনে মোনাব্বেহ্-এর মাধ্যমে কতিপয় বিবরণ উল্লেখ করিয়াছেন। উহাতে বর্ণিত আছে, হযরত ইয়াহ্ইয়্যার উপর আল্লাহ তা'আলার ভয়-ভক্তির এত অধিক প্রভাব ছিল যে, আল্লাহর হুজুরে কাঁদিতে কাঁদিতে তঁহার চেহারার উপর অশ্রু বর্ষণের রেখা পড়িয়া গিয়াছিল। তিনি সাধারণতঃ বেহাল-বেক্করার অবস্থায় বন-জঙ্গলেই ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং রোদন-ক্রন্দনের মধ্যেই সময় কাটাইতেন। একদা তাঁহার পিতা যাকারিয়া (আঃ) তাঁহাকে নিবিড় জঙ্গলে খুঁজিয়া বাহির করিলেন এবং ঐরূপ রোদন ক্রন্দন অবস্থায় দেখিতে পাইয়া বলিলেন, ''আমরা তোমার তালাশে ব্যতিব্যস্ত আর তুমি এই নীরব জঙ্গলে বসিয়া কাঁদিতেছে?'' হযরত ইয়াহ্ইয়্যা বলিলেন, আব্বাজান! আপনি ত বলিয়াছেন, জাহান্নামকে এড়াইয়া বেহেশতে পৌঁছিতে একটি বিশাল ময়দান অতিক্রম করিতে হয়, সেই ময়দান একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ভয়-ভক্তির অশ্রু বর্ষণেই পার হওয়া সম্ভব হইবে; অন্যথায় আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিস্থল বেহেশতে পৌঁছা যাইবে না। এতদশ্রবণে পিতা হযরত যাকারিয়াও কাঁদিয়া উঠিলেন। (কাছাছোল কোরআন-১-২৯৬)

হযরত ঈসা (আঃ)

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পূর্ববর্তী নবীগণের সর্বশেষ নবী হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে মাত্র ছয় শতাব্দীর ব্যবধান ছিল।

হযরত ঈসা (আঃ) ঘর-সংসার জুড়েন নাই, তাঁহার কোন নির্দিষ্ট বাড়ী-ঘর ছিল না তিনি বনী-ইস্রাঈলদের আবাসভূমি ফিলিস্তিন ও সিরিয়ার বস্তি-বস্তি, শহর-শহর ঘুরিয়া আল্লাহর দ্বীন প্রচার করিয়া থাকিতেন।

হযরত ঈসা (আঃ) বনী-ইস্রাঈল বংশীয় ছিলেন; তিনি আল্লাহর কুদরতে পুরুষের স্পর্শ ব্যতিরেকে স্বীয় মাতা মারইয়্যামের গর্ভে জন্ম নিয়াছিলেন (বিস্তারিত বিবরণ সম্মুখে আসিতেছে)। সুতরাং তাঁহার বংশ তাঁহার মাতা সূত্রেই হইবে।

হযরত মারইয়্যামের পিতার নাম ''এমরান'', মাতার নাম ''হান্নাহ''। তাঁহারা ইভয়েই বনী-ইস্রাঈল বংশীয় নেককার পরহেজগার ছিলেন। ''এমরান''-এর পূর্বপুরুষদের নাম সম্পর্কে মতভেদ আছে, কিন্তু ইহা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, ''এমরান'' বনী-ইস্রাঈল জাতীয় হযরত ছোলায়মান পয়গাম্বরের বংশধর ছিলেন, আর তাঁহার স্ত্রী ''হান্নাহ'' দাউদ আলাইহিচ্ছালামের অন্য পুত্রের বংশধর ছিলেন।

হযরত ঈসার আবির্ভাবের পূর্বে বনী-ইস্রায়ীলগণ ''ইয়্যাহুদ'' (এক বচন ''ইয়্যাহুদী'') নামে পরিচিত হইত। এই নামের তাৎপর্য সম্পর্কে তিনটি মতামত দেখা যায়। কাহারও মতে বনী-ইস্রায়ীলদের মূল ও আদি পিতা হযরত ইয়াকুবের বড় ছেলের নাম ছিল ''ইহুদা'' সেই নাম হইতেই ''ইয়্যাহুদ'' বা ''ইয়্যাহুদী'' আখ্যার উৎপত্তি। কাহারও মতে উক্ত আখ্যাটি د و ه হা, ওয়া, দাল এই তিন অক্ষর যুক্ত আরবী শব্দ হইতে গৃহীত, যাহার ধাতুগত অর্থ তওবা ও পুনঃ প্রত্যাবর্তন করা। এই ধাতু হইতে বিশেষ্য পদ হইল ''হায়েদ''- - هائد যাহার বহুবচন হইল هود কোরআন শরীফেও কোন কোন স্থানে ইহুদিগণকে ''হুদ هود শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে, যেমন- وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا ''ইহুদিগণ বলে, একমাত্র ইহুদিগণ ব্যতীত আর কেহই বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।'' আরও আছে- وقالوا كونوا هودا ''ইহুদিগণ মুসলমানগণকে বলে, তোমরা ইয়্যাহুদী হইয়া যাও, তবেই সঠিক পথের পথিক হইবে।'' এই ধাতু হইতেই ইয়্যাহুদ বা ইয়্যাহুদী শব্দও গৃহীত। যাহার তাৎপর্য এই যে, হযরত মূসার আমলে বনী-ইস্রায়ীলগণ গো-শাবক

বা বাছুর পূজায় লিপ্ত হইয়া পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিল। অতপর হযরত মুছার চেষ্টায় তাহারা তওবা করতঃ হক্ক ও সত্যের প্রতি পুনঃ প্রত্যাবর্তন পূর্বক আল্লাহ তায়ালার দরবারে আরাধনা করিয়াছিল। পবিত্র কোরআনেও উহার উল্লেখ আছে– انا هدينا اليك "হে মা'বুদ! আমরা তোমার দিকে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করিয়াছি (তুমি আমাদিগকে গ্রহণ করিয়া লও)।" ইহা হইতেই "হুদ; ইয়্যাহুদী" আখ্যার উৎপত্তি। সে মতে ইহুদী আখ্যা মূসার আমল হইতে আরম্ভ বলিতে হইবে; সাধারণতঃ তাহাই প্রচলিত।

হযরত ঈসা আলাইহিচ্ছালামের আবির্ভাবের পর যাহারা তাঁহার পায়রবী করিল তাহারা নাছারা (একবচনে নাছরানী) নামে আখ্যায়িত হইল; যাহার তাৎপর্য সম্পর্কেও বিভিন্ন মতামত আছে। সাধারণতঃ বলা হয় যে, ঈসা (আঃ) বিরুদ্ধবাদী ও শত্রুদের শত্রুতায় অতীষ্ঠ হইয়া আহবান জানাইয়াছিলেন– যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআনে এইরূপ আছে من انصارى الى الله "কে আছে যে আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী হয়?" তখন কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার আহবানে সাড়া দিয়া বলিয়াছিল, نحن انصار الله "আমরা আল্লাহর পথে সাহায্যকারী হইয়া নিজদিগকে উৎসর্গ করিলাম।" نصر –নাছর ধাতুর অর্থ সাহায্য করা, এই ধাতু হইতেই ঈসার অনুগামীগণ নাছারা বা নাছরানী নামের আখ্যা লাভ করে।

সারকথা, হযরত ঈসার আমলে বনী-ইস্রাঈলগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইল, এক দল হযরত ঈসার বিরুদ্ধবাদী শত্রু; তাহারা ইয়্যাহুদ নামেই রহিল, আর এক দল ঈসা আলাইহিচ্ছালামের অনুগামী ও সাহায্যকারী তাহারা "নাছারা" নামে পরিচিত হইল।

ইহুদিগণ ত প্রথম হইতেই হযরত ঈসার ঘোর বিরোধী ও শত্রু ছিল, এমনকি হযরত ঈসার সমর্থনের কারণেই তাহারা হযরত ইয়াহ্য়্যাকে শহীদ করিয়াছিল এবং হযরত ঈসাকেও প্রাণে বধ করার পরিকল্পনা করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তাহারা হযরত ঈসার নবুয়তকেই শুধু অস্বীকার করিয়াছিল না, বরং তাঁহার বিরুদ্ধে নানারূপ কুৎসিত অপবাদও রটাইয়াছিল। তিনি যে আল্লাহ তা'আলার কুদরতে পুরুষের স্পর্শ ছাড়া মারইয়্যামের গর্ভে জন্ম নিয়াছিলেন– ইহার সুযোগে (নাউজুবিল্লাহ) তাঁহার প্রতি জারজ হওয়ার অপবাদ প্রচার করিয়াছিল।

অপরদিকে নাছারাগণ হযরত ঈসার বর্তমানকাল পর্যন্ত ত সঠিক পথেই থাকে, তাঁহার তিরোধানের পর তাহারা নানারকমে পথভ্রষ্ট হয়। বিশেষতঃ তাঁহার জন্ম বৃত্তান্ত এবং কতিপয় মো'জেযাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহাকে খোদার বেটা বলে। কেহ কেহ তাঁহাকে এবং তাঁহার মাতাকে তিন খোদার দুই খোদা বলে।

এতদ্দৃষ্টে পবিত্র কোরআন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রকৃত মর্যাদা সঠিকরূপে স্থির করতঃ বিভিন্ন যুক্তি তর্কে ও দলিল প্রমাণের মাধ্যমে ইহুদ-নাছারা উভয় দলের অপবাদ ও অতিরঞ্জনের প্রতিবাদ করিয়াছে। এমনকি হযরত ঈসার মাতা মারইয়্যামের জন্ম বৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া হযরত ঈসার জন্ম বৃত্তান্ত ও তাঁহার বিশিষ্ট মো'জেযা সমূহের বিবরণ, ইহুদিদের অপবাদের উত্তর দান এবং নাছারাদের অতিরঞ্জনের খন্ডনে কোরআন বহু বিবৃতি দিয়াছে। নিম্নে পবিত্র কোরআনের ঐসব বিবৃতিরই ধারাবাহিক উদ্ধৃতি প্রদান করা হইবে।

মারইয়্যামের জন্ম বৃত্তান্ত

মারইয়্যামের পিতার নাম ছিল "এমরান" এই "এমরান" হযরত মূসার পিতা "এমরান" নহে; হযরত মূসার পিতা এমরানের যুগ এই এমরানের যুগের বহু পূর্বে। তদ্রূপ পবিত্র কোরআনে ১৬ পারায় ছুরা মারয়্যামের এক আয়াতে মারয়্যামকে ياخت هارون হে হারুনের ভগ্নি" বলা হইয়াছে; এই "হারুন" হযরত মুছার ভ্রাতা পয়গাম্বর হযরত হারুন নহেন, বরং হযরত হারুনের বহু পরের হারুন নামীয় অন্য এক ব্যক্তিকে উক্ত আয়াতে মরয়্যামের ভ্রাতা বলা হইয়াছে।

প্রায় সমস্ত তফছীরকারগণের বিবরণেরই দেখা যায় যে, মারইয়্যামের মাতা "হান্নাহ্" বন্ধ্যা ছিলেন। এক মাত্র আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরত বলে তাঁহার গর্ভে মারইয়্যাম জন্ম লাভ করিয়াছিলেন, আর কোন

সন্তানই তাঁহার জন্মে নাই। অধিকাংশ তফসীরকারগণের মত এই যে, এমরানের অন্য স্ত্রীর পক্ষে এক ছেলে ছিল; তাহারই নাম ছিল "হারুন"। সে ছিল অতি মহৎ ও সৎ; মারইয়্যাম তাঁহার বৈপিতৃক ভগ্নি ছিলেন, সেই সুত্রেই মারইয়্যামকে "হারুনের ভগ্নি" বলা হইয়াছে।

এমরান বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছিয়াছিলেন, "হান্নাহ" বাঁঝা নিঃসন্তান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরে সন্তানের লালসা অত্যধিক ছিল। কথিত আছে– একদা "হান্নাহ্ নিজ ঘরের বারান্দায় পায়চারী করিতেছিলেন। নিকটবর্তী একটি বৃক্ষের উপর একটি পাখী তাহার বাচ্চাকে আদর ভরা মুখে আহার দিতেছিল এবং বাচ্চার প্রতি অন্তর ভরা স্নেহ-মমতা দেখাইতেছিল। সন্তান লালায়িত হান্নাহ্ ঐ দৃশ্য দেখিয়া আবেগপূর্ণ অন্তরে আল্লাহর দরবারে সন্তানের দোয়া করিলেন। তাঁহার দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হইয়া গেল। অনতিবিলম্বেই তিনি গর্ভবতী হইলেন। স্বামীও বৃদ্ধ নিজেও বৃদ্ধা এবং বাঁঝা; এমতাবস্থায় স্বীয় গর্ভে সন্তান জন্মিবার আভাস অনুভব করিয়া হান্নার অন্তর আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল।

সেই যুগে রীতি ছিল, দ্বীনদার লোকেরা নিজেদের দুই-এক সন্তান আল্লাহর ঘর বাইতুল-মোকাদ্দাছের খেদমতের জন্য অন্য সম্পর্ক হইতে মুক্ত করিয়া দিত এবং এই কাজের জন্য ছেলে সন্তানই উপযুক্ত বলিয়া মেয়ে সন্তান এইরূপে মুক্ত করার প্রথা ছিল না। হান্নাহ স্বীয় অন্তরে পুত্র সন্তান লাভের আশা পোষণপূর্বক আল্লাহর দরবারে মান্নত করিলেন, " যে সন্তান লাভের আশা পোষণপূর্বক " হে আল্লাহ! আমার গর্ভে যে সন্তান জন্ম নিবে সে তোমার জন্য মুক্ত হইবে– তোমার ঘরের খেদমতের জন্য তাহাকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিব বলিয়া আমি মান্নত– অঙ্গীকার করিতেছি।"

অতপর সন্তান জন্মের পূর্বেই এমরানের মৃত্যু হইয়া গেল। তারপর বিধবা হান্নাহ যখন সন্তান প্রসব করিল তখন উহাকে মেয়ে সন্তান দেখিতে পাইয়া তাঁহার সমস্ত আশা আকাঙ্খার উপর পানি পড়িয়া গেল। কারণ, মেয়ে সন্তান বাইতুল-মোকাদ্দাছের খেদমত কি করিতে পারিবে? এই জন্যই সাধারণতঃ ঐ কাজে ছেলে সন্তানকেই মনোনীত করা হইত এবং গ্রহণ করা হইত। এইসব ভাবনায় হান্নার ভাঙ্গা বুক হইতে আক্ষেপের শব্দ বাহির হইল– তিনি প্রভুর দরবারে করুণ স্বরে বলিলেন, "প্রভু হে! আমি ত মেয়ে সন্তান প্রসব করিয়াছি।"

আদি-অন্তের সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'আলা জ্ঞাত ছিলেন যে, এই মেয়ে সন্তানটি কত বড় মর্যাদাশালিনী হইবে এবং তাহার মাধ্যমে এক বিশেষ কুদরত বিকশিত হইবে। তাহার ঔরষে হযরত ঈসার ন্যায় পয়গম্বর জন্ম লাভ করিবেন– এই সব কিছুই আল্লাহ তা'আলা জ্ঞাত ছিলেন। এইসব দৃষ্টে ইহা বাস্তব কথা যে, বহু পুত্র সন্তান এই মেয়ের মর্যাদার কাছেও ভিড়িতে পারে না।

বিধবা হান্নাহ নিজেই মেয়েটির নাম রাখিলেন "মারইয়্যাম", যাহার অর্থ "আল্লাহর এবাদত বন্দেগীতে আত্মনিয়োগকারিণী।" অতপর অল্প দিনের মধ্যেই মারইয়্যাম একটু জ্ঞান বুদ্ধির বয়সে পৌঁছিলে পর হান্নাহ স্বীয় মান্নত পূর্ণ করার জন্য মেয়েকে বাইতুল-মোকাদ্দাছের খাদেম বা পুরোহিতগণের হাওয়ালা করার উদ্দেশ্যে লইয়া গেলেন। মেয়ে সন্তানকে এই কার্যে গ্রহণ করা সাধারণ রীতি ছিল না, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরতে এবং তাঁহাদের দলীয় বিশেষ পুরোহিত ও সুপ্রসিদ্ধ বুজর্গ বিশেষতঃ তাঁহাদের ইমাম এমরানের মেয়ে হিসাবে তাঁহারা মারইয়্যাকে শুধু গ্রহণই করিলেন না, বরং তাঁহার লালন-পালন সম্পর্কে তাঁহাদের মধ্যে মস্ত বড় প্রতিযোগিতা হইল। এমনকি এক বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে পুরোহিত প্রধান সেই যমানার পয়গাম্বর হযরত যাকারিয়া (আঃ) মারয়্যামের লালন-পালনের ভার গ্রহণ করিলেন, তিনি মারয়্যামের খালুও হইতেন।

হযরত যাকারিয়া তাঁহার বিশেষ তত্ত্বাবধানে মারয়্যামের লালন-পালন করিতে লাগিলেন এবং তথায় শৈশবকাল হইতেই মারয়্যামের অলৌকিক ঘটনাবলীর বিকাশ আরম্ভ হইল। মারয়্যামের জন্ম বৃত্তান্ত পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ–

اِذْ قَالَتِ امْرَاَةُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

একটি স্মরণীয় ঘটনা– এমরানের স্ত্রী বলিয়াছিল, হে পরওয়ারদেগার! আমার গর্ভে যে সন্তান জন্ম লাভ করিবে আমি তাহাকে তোমার জন্য মুক্ত করিয়া দিব। তুমি আমার এই মান্নত কবুল কর; তুমি ত সব কিছুই শুন এবং জান।

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰى ـ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ـ

অতপর যখন সে সন্তান প্রসব করিল, (এবং উহা মেয়ে হইল) তখন সে অপেক্ষা করিয়া বলিল, পরওয়ারদেগার! আমি ত মেয়ে সন্তান জন্ম দিয়াছি। (সে ঐ মেয়ের মর্যাদা অজ্ঞাত; তাই তাঁহার আক্ষেপ;) আল্লাহ ভালরূপেই জ্ঞাত ছিলেন সে কি প্রসব করিয়াছে। এবং বস্তুতঃ (সাধারণ) পুত্র সন্তান ঐ মেয়ের তুলনায় কিছুই নহে।

وَاِنِّىْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّىْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ـ

(এমরানের স্ত্রী বলিল,) আমি এই মেয়ের নাম "মারয়্যাম" রাখিলাম। আর হে প্রভু! আমি ইহাকে এবং ইহার সন্তান-সন্ততিকে শয়তান মরদুদ হইতে হেফাজতের জন্য তোমার আশ্রয়ে প্রদান করিলাম।

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ـ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ـ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ـ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۤءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ـ

পরওয়ারদেগার ঐ মেয়েকেই (বাইতুল মোকাদ্দাছের খেদমতের জন্য) সন্তুষ্টির সহিত গ্রহণ করিলেন এবং সুন্দররূপে তাহাকে গড়িয়া তুলিলেন। তাহাকে (তৎকালীণ পয়গাম্বর) যাকারিয়া ললন-পালনে রাখিলেন। যাকারিয়া যখনই মারয়্যামের কক্ষে যাইতেন তাহার নিকট খাদ্য সামগ্রী উপস্থিত পাইতেন। যাকারিয়া বলিলেন, হে মারইয়্যাম! এই খাদ্য সামগ্রী তোমার জন্য কোথা হইতে আসে? মারয়্যাম বলিল, ইহা আল্লাহর গায়বী-খাজানা হইতে আসে; নিশ্চয় আল্লাহ যাহার জন্য ইচ্ছা করেন বে-হিসাব রিযিক দান করিয়া থাকেন। (পারা–৩, রুকু–১২)

হযরত যাকারিয়া তত্ত্বাবধানে যাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা

পূর্বেই বলা হইয়াছে মারয়্যামের লালন-পালন ও তত্ত্বাবধানে রাখা সম্পর্কে বাইতুল মোকাদ্দাছের পুরোহিতগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা হইল– তাঁহারা প্রত্যেকেই মারয়্যামকে নেওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। অবশেষে স্থির করা হইল যে, পুরোহিতগণ সকলেই নিজ নিজ কলম (যাহা দ্বারা তাঁহারা তৌরাত শরীফ লিখিয়া থাকিতেন) প্রবাহমান পানিতে ফেলিবেন। যাহার কলম স্রোতের বিপরীত চলিবে তিনিই মারয়্যামের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইবেন। তাহাই করা হইল এবং সকলের মধ্যে একমাত্র যাকারিয়ার কলমই আল্লাহর বিশেষ কুদরতে স্রোতের বিপরীত দিকে চলিতে লাগিল; ফলে তিনিই মারয়্যামের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত

হইলেন।* পবিত্র কোরআনেও এই ঘটনার ইঙ্গিত রহিয়াছে–

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ـ

(আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে মুহাম্মাদ (সঃ) আপনি যে, মারয়্যামের বৃত্তান্ত সঠিকরূপে লোকদিগকে শুনসাইলেন ইহা আপনার অহী-বাহক নবী হওয়ার একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কারণ,) যখন মারইয়্যামের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে পুরোহিতগণ নিজ নিজ কলম (পানিতে) ফেলিতেছিল, তখন আপনি তাহাদের নিকট উপস্থিত ছিলেন না, ঐ ব্যাপারে যখন তাহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিল তখনও আপনি তাহাদের নিকট উপস্থিত ছিলেন না। (পারা–৩, রুকু–১৩)

মারইয়্যামের উচ্চ মর্যাদা

হযরত যাকারিয়া (আঃ) মারয়্যামের জন্য বায়তুল-মোকাদ্দাছ মসজিদ সংলগ্নে বিশেষ কক্ষ তৈরী করিয়া দিয়াছিলেন। তথায় মারইয়্যাম আল্লাহ তায়ালার এবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকিত এবং নির্ধারিত সময়ে বায়তুল-মোকাদ্দাছ মসজিদের খেদমত করিত।

এবাদত বন্দেগী, পারছায়ী-সতিত্ব ইত্যাদি সৌভাগ্যের চরিত্রে মারইয়্যাম অপরিসীম যশ লাভ করিয়াছিল। আল্লাহ তায়ালাও প্রকাশ্যে তাহার মর্যাদা বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাহার জন্য গায়েব হইতে মৌসুমবিহীন ফল-ফলাদি ও খাদ্য সামগ্রী উপস্থিত হইয়া থাকিত। সময় সময় ফেরেশতা তাঁহার সম্মুখে প্রকাশ্যে বিভিন্ন সুসংবাদ শুনাইয়া থাকিতেন, যাহার বর্ণনা পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে–

وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعَالَمِيْنَ ـ يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ ....

"এই ঘটনা স্মরণ কর, যখ ফেরেশতাদের একটি দল মারয়্যামকে এই বলিয়া সুসংবাদ দান করিয়াছিলেন যে, হে মারয়্যাম! নিশ্চিতরূপে জানিইয়া লও, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বিশিষ্ট মকবুল বান্দা বানাইয়াছেন এবং তোমাকে (অসন্তুষ্টিকর কার্যাবলী হইতে) পাক-পবিত্র থাকার ছাঁচে গঠিত করিয়াছেন। আর তোমার বৈশিষ্ট্য এই যুগের বিশ্ববাপী নারী সমাজের উপর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। হে মারয়্যাম! তুমি (এই মান-মর্যাদার শুকরিয়া স্বরূপ) চিরজীবন সর্বদা স্বীয় পরওয়ারদেগারের আনুগত্যে ও দাসত্বে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাক এবং (সেই আনুগত্যের ও দাসত্বাবলম্বনের প্রকাশ্য নিদর্শন স্বরূপ) অন্যান্য নামাযীদের ন্যায় রুকু-সেজদার আদর্শগত নামাযের পাবন্দ থাক। (পারা–৩, রুকু–১৩)

১৬৫১। হাদীছ ঃ قَالَ عَلِىٌّ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيْجَةُ ـ

অর্থ ঃ আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি শুনিয়াছি, হযরত নবী ছাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, এমরানের কন্যা মারয়্যাম তাঁহার যুগের সর্বোত্তম নারী ছিলেন এবং এই যুগের সর্বোত্তম নারী ছিলেন খাদীজা।

ব্যাখ্যা ঃ কোন মানুষের নিজ আমল যদি তাহাকে অগ্রাধিকারী করে তবে অন্য কোন কিছুই তাহাকে পশ্চাতে ফেলিতে পারে না; ইহার প্রকৃষ্ট নমুনা ছিলেন মারইয়্যাম। লোকেরা তাঁহার সম্পর্কে কত অপবাদ রটাইয়াছিল, বাহ্যিক অবস্থায় মারইয়্যামের নিকটও অপবাদের কোন উত্তর ছিল না, কিন্তু তাঁহার সতিত্ব, পবিত্রতা ও খোদা-ভক্ততা তাঁহাকে এরূপ উচ্চাসনের অধিকারী করিয়াছিল যে, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা পবিত্র

* এই ঘটনা কাহারও মতে মারয়্যামের প্রাথমিক শৈশবকাল অতিক্রম করিয়া একটু বুঝদার হওয়ার পর ঘটিয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশের মত এই যে, শৈশবের প্রারম্ভেই মারয়্যাম হযরত যাকারিয়া হস্তে গিয়াছিল।

কোরআনে সারা বিশ্বের মোমেনদের জন্য তাঁহাকে নমুনা স্বরূপ পেশ করিয়াছেন এবং উল্লিখিত হাদীছেও তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্য রহিয়াছে।

মারয়্যামের গর্ভবতী হওয়ার বৃত্তান্ত

মারইয়্যাম যখন ১৩ বা ১৫ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলেন (তফছীর রুহুল মায়ানী ১৬-৭৯) তখন একদা তিনি স্বীয় আবাসিক কক্ষ হইতে বাহিরে পূর্ব দিকে নিজ সংশ্রবীয়লোকদেরও নজরের আড়ালে পূর্ণ পর্দার ব্যবস্থা করিয়া একাকী নির্জনে গোসল করিতেছিলেন। হঠাৎ ফেরেশতা জিব্রাঈল একজন সুষ্ঠু সুশ্রী মানুষের বেশ-ভুষায় মারইয়্যামের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মারইয়্যাম তাঁহাকে একজন বেগানা পুরুষ ভাবিয়া আতঙ্কিত হইয়া আল্লাহ তা'আলার ভয়ের দোহাই দিয়া তাঁহাকে বাধা প্রদান করিলেন। তখন জিব্রাঈল (আঃ) স্বীয় সংক্ষিপ্ত পরিচয় দানে বলিলেন যে, আমি তোমারই পরওয়ারদেগারের প্রেরিত দূত। উদ্দেশ্যও ব্যক্ত করিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বিশেষ আদেশ বলে সৃষ্ট এক মহান সন্তান তোমাকে দান করিবেন– যিনি বনী ইস্রাঈলদের জন্য রসূল হইবেন এবং বহু রকমের মোযেজা দ্বারা তাঁহার প্রকাশিত হইবে। সেই মহান সন্তানেরই সুসংবাদ আল্লাহর তরফ হইতে তোমার নিকট নিয়া আসিয়াছি এবং তোমাকে সেই সন্তান অর্পণ করিতে আসিয়াছি।

মারইয়্যাম স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন, বৈধ-অবৈধ কোন প্রকারেই (সন্তান জন্মানোর সাধারণ ব্যবস্থা–) পুরুষের স্পর্শ আমার উপর হয় নাই। এমতাবস্থায় আমার ছেলে হইবে কিরূপে? জিব্রাঈল (আঃ) বলিলেন, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা এই সন্তানকে সৃষ্টি করিবেন সাধারণ ব্যবস্থা ব্যতিরেকেই; ইহাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে?

জিব্রাঈলের উক্তি বাস্তবের অনুকূলই ছিল, কারণ মূল সৃষ্টিকর্তা যিনি তিনি ত সাধারণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বা সাধারণ ব্যবস্থা ব্যতিরেকে সব রকমেরই সৃষ্টি করিতে সক্ষম, নতুবা তিনি সৃষ্টিকর্তাই নহেন। যে শুধু গঠনকারী হয় সে অবশ্য উপাদানের প্রত্যাশী হয়, কিন্তু সৃষ্টিকর্তা কোন কিছুর প্রত্যাশী নহেন, সৃষ্টিকর্তা ত কোন মূল, সত্ত্বা ও উপাদান ব্যতিরেকেই অস্তিত্ব দান করিতে পারেন, সৃষ্টির অর্থই ইহা।

এইসব কথোপকথনের পর জিব্রায়ীল ফেরেশতা মারইয়্যামের বক্ষ বরাবর ফুঁৎকার মারিলেন।* বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বর্ণনা মতে, সঙ্গে সঙ্গে মারয়্যাম গর্ভধারণ অনুভব করিলেন। অতপর কাহারও মতে অনতিবিলম্বেই প্রসবাবস্থারও সম্মুখীন হইলেন, কিন্তু অধিকাংশের মত ইহাই যে, সাধারণ রীতি অনুসারে দীর্ঘ দিন তথা ৯ বা ৮ মাস গর্ভকাল অতিবাহিত হওয়ার পরই প্রসব হইয়াছিল।

(তফসীর রুহুল মায়া'নী ১৬-৭৯)

---

*যেই ফুৎকার দ্বারা হযরত ঈসার রুহ বা আত্মা মারয়্যামের গর্ভে পৌছিয়াছিল প্রকৃত প্রস্তাবে সেই ফুৎকার আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরতের বিকাশ ছিল মাত্র। ঐ স্থলে জিব্রায়ীল ফেরেশতা শুধু কেবল সেই কুদরতের বাহক এবং সেই কুদরত বিকাশের মাধ্যম ছিলেন। জিব্রাঈল ফেরেশতার আর কোন কৃতিত্ব তথায় ছিল না, সব কিছুর কর্মকর্তা একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালাই ছিলেন।

পবিত্র কোরআন পারা–২৮, সূরা তাহরীমের সমাপ্তিতে স্পষ্টরূপে এই বিষয়টির ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। এই আয়াতে হযরত ঈসার রুহ বা আত্মাকে মরয়্যামের গর্ভে পৌছাইবার ক্রিয়াপদের কর্মকর্তা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নিজকেই ব্যক্ত করিয়াছেন।

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِىْ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُوْحِنَا .

"আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের জন্য এমরানের কন্যা মারয়্যামের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছেন– মারইয়্যাম তাহার পাক পবিত্রতাকে পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিল, আমি তাহার বক্ষে আমার সৃষ্ট রুহ ফুকিয়া দিয়াছিলাম।"

এইরূপ বিবরণের আরও একটি দৃষ্টান্ত কোরআন শরীফেই বর্ণিত আছে, কোন কোন জেহাদে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে যে; হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) ধুলা-বালূর মুষ্ঠি শত্রু সেনাদের প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহার সেই একমুষ্ঠি ধুলা-বালুর অংশ শত শত শত্রু-সেনার প্রত্যেকের চোখেই পতিত হইয়াছে– সেই ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন।

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى

"আপনি যখন ধুলা মুষ্ঠি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তখন নিক্ষেপকারী আপনি ছিলেন না– প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ তায়ালাই নিক্ষেপকারী ছিলেন।"

মারইয়্যাম স্বীয় বৃত্তান্ত হযরত যাকারিয়ার স্ত্রীর নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাই তিনি মুরুব্বির পক্ষ হইতে কোন বিপদের সম্মুখীন হইলেন না। কারণ, তাঁহারা ত পূর্ব হইতে মারইয়্যামের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাই বিনা দ্বিধায় তাঁহারা এই ঘটনাকে বাস্তবরূপে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সাধাণ্যে যখন তাঁহার গর্ভাবস্থা প্রকাশ পাইল তখন লোকদের সন্দেহ ও আনাগোনার সূত্রপাত হইল। স্থান বিশেষে মারইয়্যাম যুক্তি তর্কের কাটা-কাটিও করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ তফছীর ইবনে কাছীর তৃতীয় খন্ড ১১৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে– বাইতুল মোকাদ্দাছ মসজিদেরই আ একজন খাদেম ছিলেন তাহার নাম ছিল "ইউসুফ নাজ্জার" তিনি মারইয়্যামের আত্মীয়ও ছিলেন। মারয়্যামের যখন গর্ভ প্রকাশ পাইয়া উঠিল, তখন ইউসুফের মনে ভয়ানক সংশয়ের সৃষ্টি হইল। কারণ, একদিকে অবিবাহিতা নারীর গর্ভধারণ; অপরদিকে মারইয়্যামের পাক-পবিত্রতা, দ্বীনদারী, এবাদতগুজারী ইত্যাদি যাহা বাইতুল মোকাদ্দাছ মসজিদের প্রত্যেক খাদেমই ভালরূপ অবগত ছিলেন। ভয়ানক সংশয় ও সমস্যার মধ্যে একদা ইউসুফ মারয়্যামকে বলিলেন, হে মারয়্যাম আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব; উহার উত্তর দানে তাড়াহুড়া না করিয়া বিশেষ চিন্তা-বুদ্ধির দ্বারা উত্তর দিবেন। মারইয়্যাম জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই কথাটি কি? ইউসুফ নাজ্জার বলিলেন,

هل يكون قط شجر من غير حب وهل يكون زرع من غير بذر وهل يكون ولد من غير اب ـ

"দানা ব্যতিরেকে, বৃক্ষ, বীজ ব্যতিরেকে ফসল জন্মিতে পারে কি? পিতা ব্যতিরেকে পুত্র হইতে পারে কি?" মারইয়্যাম তাহার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া উত্তর দানে বলিলেন,

اما قولك هل يكون شجر من غير حب وزرع من غير بذر فان الله قد خلق الشجر والزرع اول ما خلقهما من غير حب ولابذر ـ وهل يكون ولد من غير اب فان الله تعالى قدخلق ادم من غير اب ولا ام ـ

"আপনার প্রশ্ন– দানা ব্যতিরেকে বৃক্ষ এবং বীজ ব্যতিরেকে ফসল জন্মিতে পারে কি? আমি বলি, আল্লাহর কুদরতে তাহা নিশ্চয়ই হইতে পারে; আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম বৃক্ষ ও ফসলের গাছ দানা ও বীজ ব্যতিরেকেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আপনার প্রশ্ন, পিতা ব্যতিরেকে পুত্র হইতে পারে কি? ইহাও নিশ্চয়ই হইতে পারেই; আল্লাহ আদমকে পিতা-মাতা ব্যতিরেকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।" فصدقها وسلم لها حالها

"ইউসুফ নাজ্জার মারয়্যামের উত্তরে পূর্ণ সন্তুষ্ট ও আস্থাবান হইলেন এবং তাঁহার সমুদয় বৃত্তান্ত মনে প্রাণে গ্রহণ করিলেন।"

মারইয়ামের উক্ত যুক্তি ও দৃষ্টান্ত, পবিত্র কোরআনেও বর্ণিত আছে–

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ـ اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ـ

"নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখ, ঈসার জন্ম লাভের (সাধারণ নীতিবিহীন) ব্যাপারটা আল্লাহ তায়ালার কুদরতের কারখানায় তদ্রূপই ছিল যেরূপ আদমের জন্ম লাভের ব্যাপার। আদমকে (সাধারণ নীতি ব্যতিরেকেই) আল্লাহ তায়ালা মাটি দ্বারা তৈরী করিয়াছিলেন; অতপর "কুন্" হইয়া যাও" বলার সঙ্গে সঙ্গে (জীবন্ত মানুষ) হইয়া গিয়াছিল। ইহা একটি বাস্তব সত্য যাহা তোমার পরওয়ারদেগারের তরফ হইতে প্রচারিত; এই সম্পর্কে কোন প্রকার সংশয় আনিও না। (পারা-৩, রুকু-১৪)

এইরূপে স্থান বিশেষে ত মারইয়্যাম সংশয় দূর করার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু সর্বসাধারণের মুখ বন্ধ করা ত সহজ নহে, সুতরাং এই সংবাদ যতই ছড়াইতে লাগিল ততই লোকদের অপবাদ মারয়্যামের প্রতি বাড়িতে লাগিল। মারয়্যাম লোকদের অপবাদে অতিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন। এদিকে প্রসবের সময় নিকটবর্তী হইল, তাই তিনি লোকদের হইতে দূরে সরিয়া নির্জনে যাওয়ার মানসে পার্বত্য এলাকায় চলিয়া গেলেন। বাইতুল মোকাদ্দাছ মসজিদ হইতে ৮ মাইল দূরে বাইতুল-লাহ্‌ম (বেথেলহাম) নামক স্থানে পৌঁছিলে প্রসব বেদনা আরম্ভ হইল। তিনি একটি খেজুর গাছের নিকটে উহাতে হেলান দিয়া বসিলেন এবং সব একিন-বিশ্বাসের সহিত উপলব্ধি করা সত্ত্বেও মানুষের অপবাদ স্মরণ পূর্বক এবং এইরূপ কঠিন সময়ে নিঃসম্বল নিঃসহায়তা দৃষ্টে অনুতপ্ত ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এমনকি, তিনি আল্লাহর দরবারে কামনা করিলেন যে, এই অবস্থার পূর্বেই আমার মৃত্যু হইয়া আমি ভূ-পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গেলে আমার জন্য ভাল হইত।

এই সময় দূরে ও আড়ালে থাকিয়া ফেরেশতা জিব্রিল মারয়্যামকে সান্ত্বনা দিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরত বলে তথায় তাঁহার পানাহারের যে ব্যবস্থা হইয়াছে উহার খোঁজ বাতাইয়া দিলেন যে, তোমার অদূরেই তোমার প্রভু নির্মল ঠান্ডা পানির নালা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। আর তোমার হেলান দেওয়ার খেজুর গাছটিতে এখনই খেজুর পয়দা করিয়া দিয়াছেন, উহাকে একটু নাড়া দিলেই পাকা পাকা খেজুর তোমার সম্মুখে পড়িবে, তুমি ইচ্ছা করিলেই তাজা তাজা সুস্বাদু খেজুর খাইতে পারিবে। সঙ্গে সঙ্গে লোকদের দ্বারা বিব্রত ও বিরক্ত না হইয়া পারা যায়– তাহার পরামর্শও মারয়্যামকে দিলেন। সেকালে রোযার নিয়ম এই ছিল যে, রোযাদার ব্যক্তি কথা বলিতে পারিবে না, তাই মারয়্যামকে বলিয়া দেওয়া হইল যে, এই ঘটনা সম্পর্কে লোকদের পক্ষ হইতে তোমার উপর যতই প্রশ্ন আসুক না কেন তুমি সকলকে ইশারা ইঙ্গিত দ্বারা বুঝাইয়া দিবে যে, তুমি রোযা থাকার নিয়ত ও মান্নত করিয়াছ।

অতপর মারইয়্যাম শিশুকে কোলে লইয়া প্রকাশ্যে নিজের লোকদের মধ্যে আসিয়া গেলেন। অপবাদ, তান-তিসনা ও তিরস্কারের ঝড় বহিতে লাগিল। মারইয়্যাম রোযার দরুন কথা বলা হইতে বিরত থাকিলেন এবং শিশুর প্রতি ইশারা করিয়া তাহার নিকট হাল-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন, লোকগণ ইহাতে আরও বিরক্তি প্রকাশ করিল, কিন্তু সদ্য প্রসূত শিশু হযরত ঈসা স্বীয় বৈশিষ্ট্যের বিবৃতি দান করিলেন এবং তিনি যে নবী হইবেন, আল্লাহ তায়ালার কেতাব প্রাপ্ত হইবেন সে সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন; যদ্দারা মারইয়্যামের প্রতি সকল অপবাদের অবসান হইয়া গেল। এই বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র কোরআনের বিবৃতিতে লক্ষ্য করুন–

اذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ـ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ـ

একটি স্মরণীয় ঘটনা– যখন ফেরেশতাগণ মারইয়্যামকে বলিলেন, আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিতেছেন তাঁহার তরফ হইতে প্রদত্ত কলেমার (দ্বারা সৃষ্ট সন্তানের) যাহার নাম হইবে "মছীহ-মারইয়্যাম-পুত্র ঈসা"। সে হইবে অতি মর্যাদাশালী দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও। এবং সে হইবে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারীদের একজন। আর সে নবজাত শিশু অবস্থায় এবং প্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় (সমভাবে পূর্ণ) কথা বলিবে এবং সে বিশিষ্ট লোকদের একজন হইবে।

قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ ـ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ـ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ـ

মারইয়্যাম (বুঝিতে পারিলেন, এইসব পরওয়ারদেগারের পক্ষ হইতেই, অতএব তাঁহার প্রতিই রুজু হইলেন–) আরজ করিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমার সন্তান কিরূপে হইবে, অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করে নাই? (ফেরেশতা) বলিলেন, এইরূপেই আল্লাহ সৃষ্টি করিয়া থাকেন যাহা ইচ্ছা করেন, (আল্লাহ নিজ কুদরত বহু ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করেন।) যখন তিনি কোন বস্তুর অস্তিত্বের ইচ্ছা করেন তখন উহা সম্পর্কে হওয়ার আদেশ করেন; তৎক্ষণাৎ উহা হইয়া যায়। (পারা–৩, রুকু–১৩)

وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ مَرْيَمْ ـ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ـ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ـ

কোরআনের মাধ্যমে মারইয়্যামের ঘটনা উল্লেখ করুন যখন মারইয়্যাম (গোসলের জন্য) স্বীয় পরিজন হইতে পৃথক হইয়া পূর্ব এলাকার এক স্থানে আসিল এবং পর্দা করিয়া তাহাদের দৃষ্টি ও নজরের আড়াল হইয়া গেল।

فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ـ قَالَتْ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ـ

এমতাবস্থায় আমি তাহার নিকট আমার দূত জিব্রাঈলকে পাঠাইলাম। সে তাহার সম্মুখে পূর্ণ মানুষের বেশ ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করিল। মারইয়্যাম তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমি দয়াময়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি তোমা হইতে; তোমার যদি খোদার ভয় থাকে তবে ইহার মর্যাদা রক্ষা কর।

قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ لاَهَبَ لَكِ غُلاَمًا زَكِيًّا ـ

জিব্রাঈল বলিলেন, আমি আপনার প্রভুর দূত; একটি পবিত্র ছেলে আপনাকে অর্পণ করার জন্য প্রেরিত হইয়াছি।

قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلاَمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا ـ قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ ـ وَلِنَجْعَلَهٗ اٰيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ اَمْرًا مَقْضِيًّا ـ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ـ فَاَجَاءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ـ قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا ـ فَنَادٰهَا مِنْ تَحْتِهَا اَلاَّ تَحْزَنِىْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ـ وَهُزِّىْ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ـ

মারইয়্যাম বলিল, আমার ছেলে হইবে কিরূপে, অথচ কোন মানুষ আমাকে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করে নাই, আর আমি বদকার মোটেও নই? জিব্রায়ীল বলিলেন, এই অবস্থায়ই (পুত্র হইবে;) আপনার পরওয়ারদেগার বলিয়াছেন, এই অবস্থাতেই সন্তান দেওয়া আমার জন্য সহজ। (এই পুত্রকে এইভাবে সৃষ্টি করায় অন্যান্য অনেক রহস্য ত আছেই) এবং এই উদ্দেশ্যও রহিয়াছে যে, আমি তাহাকে বিশ্ববাসীর সম্মুখে আমার বিশেষ কুদরতের নিদর্শন বানাইতে চাই এবং (তাহাকে নবুয়ত দানে লোকদের জন্য) আমার তরফ হইতে রহমত বানাইতে চাই। আর এইরূপে তাহার জন্ম নির্ধারিত হইয়া রহিয়াছে। সেমতে মারইয়্যাম গর্ভে ছেলে ধারণ করিল। তারপর গর্ভ লইয়া সে এক দূরের এলাকায় চলিয়া গেল। অতপর প্রসব-বেদনা তাহাকে একটি খেজুর গাছের নিকট নিয়া আসিল। মারইয়্যাম অনুতাপ করিয়া বলিল, এই ঘটনার পূর্বে মরিয়া যাওয়া এবং নাম-নেশানা মুছিয়া যাওয়াই আমার পক্ষে উত্তম ছিল। তখন মারইয়্যামের অবস্থান স্থলের পাদদেশ হইতে জিব্রাঈল ডাকিয়া বলিলেন, আপনি ঘাবরাইবেন না। আপনার প্রভু (আপনার পানাহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন–) আপনার সন্নিকটে একটি নালা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন, আর খেজুর আপনার উপর ঝরিয়া পড়িবে।

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ـ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ـ

অতএব আপনি খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করুন এবং (মহান পুত্র দর্শনে) চোখ ঠান্ডা করুন। অতপর যদি আপনি কোন মানুষকে দেখেন, (এ সম্পর্কে কিছু বলিতে চায়) তবে (ইশারায়) বলিয়া দিবেন, আমি দয়াময় আল্লাহর নামে রোযার মান্নত ও নিয়্যত করিয়াছি, আজ কোন মানুষের সঙ্গে কথা বলিবই না।

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ـ يٰأُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ـ

অতপর মারইয়্যাম ছেলেকে কোলে উঠাইয়া স্বীয় লোকজনের মধ্যে আসিয়া গেল। সকলেই তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, হে মারইয়্যাম! তুমি বড় জঘন্য কাজ করিয়াছ! হে হারুনের ভগ্নী! তোমার পিতা কোন খারাপ লোক ছিলেন না এবং তোমার মাতাও বদকার ছিলেন না, (তুমি এরূপ হইলে কিরূপে?)

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ـ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ـ

মারয়্যাম (প্রতি উত্তর না কিরিয়া) ছেলের দিকে ইশারা করিল; (তোমাদের যাহা বলিতে হয় ছেলের সঙ্গে বল।) লোকজন বলিল, কোলের শিশুর সঙ্গে আমরা কথা বলিব কিরূপে?

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ اٰتٰنِيَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ـ وَجَعَلَنِي مُبٰرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصٰنِي بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَادُمْتُ حَيًّا ـ

ঐ শিশু বলিয়া উঠিলেন, আমি আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা। তিনি আমাকে কেতাব দিবেন এবং নবী বানাইবেন এবং তিনি আমাকে লোকদের কল্যাণ ও মঙ্গলকামী বানাইয়াছেন, আমি যেখানেই থাকি লোকদের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিব। আর আমাকে নামায ও যাকাতের কঠোর আদেশ করিয়াছেন– যাবত আমি (শরীয়তের স্থান ইহজগতে) জীবিত থাকি।

وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ـ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ـ

এতদ্ভিন্ন আমার মাতার ফরমাবরদারী করারও আদেশ করিয়াছেন, আর আল্লাহ আমাকে রূঢ়, বদমেজাজী, বদনছীবরূপে সৃষ্টি করেন নাই। আর আমার প্রতি সালাম– (শান্তির প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে সর্বদার জন্য, বিশেষতঃ) জন্মের দিন, মৃত্যুর দিন এবং পুনরুত্থানের দিন। (সূরা মারইয়্যাম– পারা–১৬, রুকু–৫)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আসমানী কেতাবে অন্যান্য মৌলিক বিষয়াবলীর সঙ্গে নবীগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণও থাকে। বিশ্ব-মানবের পক্ষে শিক্ষণীয় ঘটনাবলী এবং কোন নবীর প্রতি ভ্রষ্ট লোকদের কোন অপবাদ থাকিলে খন্ডন ইত্যাদি আবশ্যকীয় বিষয়বস্তু সাধারণতঃ নবীগণের ইতিহাস বর্ণনায় গ্রহণ করা হয়। পবিত্র কোরআনেও সাধারণ নবীগণের এই ধরনের আলোচনাই রহিয়াছে।

হযরত ঈসা (আঃ) সাধারণ রীতি বিহীন– কোন পুরুষের মাধ্যম ব্যতিরেকে স্বীয় মাতার গর্ভে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন যাহা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরত ছিল, কিন্তু এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করিয়া ভ্রষ্ট ইহুদিরা হযরত ঈসা এবং তাঁহার মাতা পাক-পবিত্র মারইয়্যামের প্রতি অপবাদ ও কুৎসার ঝড় বহাইয়া দিয়াছিল।

ভ্রষ্ট ইহুদিদের অপবাদের প্রতিবাদেই পবিত্র কোরআন হযরত ঈসার উচ্চ মর্যাদার বিবরণে এবং তাঁহার মাতার পবিত্রতা ও উচ্চ মর্তবার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদানে অনেক বিবৃতি দিয়াছে। যদ্বারা অবোধ নাছারা খৃষ্টানরা সরল প্রাণ লোকদিগকে বিভ্রান্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছে যে, মুসলমানদের কোরআনেই হযরত ঈসার এত অধিক প্রশংসা বর্ণিত আছে যে, মুহাম্মাদ (সঃ) সম্পর্কে ঐরূপ বর্ণনা নাই, অধিকন্তু হযরত ঈসার মাতা মারইয়্যামেরও বহু বহু প্রশংসা কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে।

অবোধরা এতটুকু উপলব্ধি করিল না যে, হযরত ঈসা ও তাঁহার মাতা মারইয়্যামের এইরূপ প্রশংসা প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কারণ, ভ্রষ্ট ইহুদিরা হযরত ঈসা ও তাঁহার মাতার উপর জঘন্য অপবাদের কালিমা লেপন করিয়াছিল; উহারই সাফাই প্রদানে পবিত্র কোরআন এত অধিক তৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছে। ইহা বিশ্ব-হেদায়েত নামা পবিত্র কোরআনের বড় দায়িত্ব ছিল। হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এবং তাঁহার মাতা সম্পর্কে ঐরূপ সাফাই প্রদানের কোন রূপ প্রয়োজনই দেখা দেয় নাই।

হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁহার মাতা মারইয়্যাম সম্পর্কে দুই দল দুই পথে গোমরাহ হইয়াছে। ইহুদিরা গোমরা হইয়াছে তাঁহাদের প্রতি অপবাদ ও জঘন্য তোহমত লাগাইয়া, আর নাছারারা পরবর্তীকালে গোমরাহ হইয়াছে তাঁহাদের সম্পর্কে অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জন করিয়া। হযরত ঈসা (আঃ) নবী ও রসূল ছিলেন, কিন্তু ছিলেন তিনি আল্লাহর বান্দী মারইয়্যমের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী মানুষ। তদ্রূপ মারইয়্যাম পাক-পবিত্র, আল্লাহ তায়ালার নিকট বিশেষ মর্যাদাবান ছিলেন, কিন্তু ছিলেন তিনি আল্লাহ তায়ালারই সৃষ্ট বান্দা। নাছারাগণ পরবর্তীকালে এক ইহুদি মোনাফেকের ধোকায় পড়িয়া মরয়্যামকেও খোদা এবং হযরত ঈসাকেও খোদা বা খোদার পুত্র বলিয়া বিশ্বাস ও দাবী করে। যাহার ইতিহাস এই–

হযরত ঈসাকে খোদার পুত্র বানাইবার রহস্য

হযরত ঈসা (আঃ) এবং তাঁহার প্রচারিত সত্যধর্ম ও সেই ধর্মাবলম্বী নাছারাগণের সঙ্গে ইহুদিদের ঘোর শত্রুতা প্রথম ইহতেই চলিয়া আসিয়াছিল। ইহুদিগণ প্রতমতঃ স্বয়ং হযরত ঈসা (আঃ) কে প্রাণে বধ করার চেষ্টা করে, তাঁহার ভূপৃষ্ঠ পরিত্যাগ করার পর তাঁহার প্রচারিত সত্য দ্বীনকে নষ্ট করিবার তদবীরে তাহারা লাগিয়া যায়। প্রকাশ্য শক্তি ও বল প্রয়োগে তাঁহার দ্বীনকে বিকৃত করিতে না পারিয়া মোনাফেকীর সহিত মিত্রবেশে সেই সত্য দ্বীনকে বিকৃত করতঃ উহাকে মিথ্যারূপে রূপান্তরিত করিতে প্রয়াস পায়। যাহার ঘটনা এই যে, জনৈক ইহুদি মোনাফেকীভাবে স্বীয় ইহুদি ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ছদ্মবেশীরূপে ঈসায়ী বা নাছরানী হয়– খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে এবং সে লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া বহুকাল পর্যন্ত জঙ্গলে জঙ্গলে ভন্ড তপস্যা, তপ-জপ, সাধনা–ভজনা করিতে থাকে। অতপর সে হঠাৎ লোকালয়ে ফিরিয়া আসে এবং এই প্রচারণা চালায় যে, আমি স্বয়ং যীশু–খৃষ্টের দর্শন লাভ করিয়াছি। তিনি আমাকে বলিয়াছেন– "তুমি লোকদিগকে বলিয়া দাও, লোকেরা যেন আমাকে জারজ সন্তান মনে না করে, আমাকে যেন স্বয়ং খোদার পুত্র গণ্য করে এবং আমি যে, শূলি কাষ্ঠে মৃত্যুবরণ করিয়াছি উহাকে যেন অপমৃত্যু মনে না করে। আমি জগতে সমস্ত মানুষের– যাহারা আমাকে খোদার বেটা বলিয়া বিশ্বাস করিবে তাহাদের সকলের পাপ মোচনের জন্য শূলি কাষ্ঠের মৃত্যু বরণ করিয়াছি। আমি স্বয়ং খোদার বেটা হইয়া নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়া জগতের সকল মানুষের পাপ পিতার নিকট হইতে মোচন করাইয়া লইয়াছি। অতএব যে ব্যক্তি আমাকে খোদার বেটা বলিয়া বিশ্বাস করিবে কোন পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।"

এই প্রবঞ্চক ছদ্মবেশী ইহুদিকেই পরবর্তীকালে প্রবঞ্চিত খৃষ্টানগণ "সেন্টপল" নামে অভিহিত করিয়াছে এবং তাহাকে ও তাহার পবঞ্চনাময় মিথ্যা উক্তিকে শুধু গ্রহণই করে নাই, বরং উহাকেই কেন্দ্র করিয়া নিজেদের ধর্মমত গঠন করিয়াছে, আজও খৃষ্টানগণ উহারই প্রচার করিয়া থাকে।

ইহুদিরা জানিয়া বুঝিয়া প্রবঞ্চনা করতঃ হযরত ঈসা আলাইহিচ্ছালামের সত্য দ্বীনকে বিকৃত ও বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছে, তাই পবিত্র কোরআন ইহুদিগণকে مغضوب عليهم "মগযুব আলাইহিম" "আল্লাহ তায়ালার ক্রোধানলে পতিত ও অভিশপ্ত" বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে। আর খৃস্টানগণ প্রবঞ্চনা ও ধোকায় পতিত হইয়া হযরত ঈসা আলাইহিচ্ছালামের দ্বীনের নামে মিথ্যাকে অবলম্বন করিয়াছে এবং সেই মিথ্যাকে চালু রাখিয়াছে, তাই পবিত্র কোরআন তাহাদিগকে ضالين জাল্লীন "পথভ্রষ্ট" বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে।

ইসলাম বাস্তববাদী ধর্ম ইহার প্রতিটি আক্বিদা ও বিশ্বাস সুদৃঢ় বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত। অপবাদ ও অতিরঞ্জনের ঠাঁই ইসলামে নাই। এই দৃষ্টি ভঙ্গিতেই ইসলাম হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কীয় ইহুদী ও নাছারা উভয় দলের ভ্রষ্টতার খন্ডন করিয়াছে।

পবিত্র কোরআন একদিকে ইহুদিদের অপবাদ ও তোহ্মতের বিরুদ্ধে হযরত ঈসা ও মারয়্যামের প্রসংশায় বিশেষ প্রচারণা চালাইয়াছে। অপরদিকে হযরত ঈসা ও মারইয়্যাম সম্পর্কে তওহীদের পরিপন্থী ও তওহীদ ধ্বংসকারী নাছারাদের যেসব অবাস্তব, অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জন রহিয়াছে পবিত্র কোরআন সে সবের প্রতিবাদেও বিরাট প্রচারণা চালাইয়াছে এবং অনেক অনেক দলিল প্রমাণ ও যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে সে সবের খন্ডন করিয়া নাছারাদের দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। এইরূপে ইহুদী নাছারা উভয় দলের গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার ধুম্রজালকে ছিন্ন করিয়া পবিত্র কোরআন ছেরাতে-মোস্তাক্বীমের বিকাশ সাধন করিয়াছে যে–

(১) হযরত ঈসা আল্লাহ তায়ালার বিশিষ্ট পয়গাম্বর ছিলেন, আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট বান্দা ছিলেন, মারইয়্যামের পুত্র ছিলেন।

(২) মারইয়্যাম পাক-পবিত্র, খোদাভক্তা নারী ছিলেন, আল্লাহর সৃষ্ট বান্দী ছিলেন।

(৩) যেরূপ সারা বিশ্বের মা'বুদ ও প্রভু-পরওয়ারদেগার আল্লাহ তায়ালা; তদ্রূপ হযরত ঈসা ও মারয়্যামেরও মা'বুদ প্রভু-পরওয়ারদেগার ও আল্লাহ তায়ালা।

(৪) আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে অন্য কাহাকেও শরিক সাব্যস্ত করা যাইবে না, উহা অতিশয় মহাপাপ– যাহার অবধারিত ফল হইবে চিরকালের জন্য জাহান্নাম।

নাছারাবাদের অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জনের প্রতিবাদে, উল্লিখিত বাস্তব সত্যসমূহের বিকাশনে পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন উদ্ধৃতি লক্ষ্য করুন–

হযরত ঈসা ও মারইয়্যাম উভয়ই আল্লাহর বান্দা ছিলেন

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لاَ تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ وَلاَ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلاَّ الْحَقَّ ـ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ اَلْقٰهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ـ

হে কেতাবধারী নাছারাগণ! ধর্মীয় ব্যাপারে অতুক্তি ও অতিরঞ্জনের আশ্রয় লইও না এবং আল্লাহ সম্পর্কে অবাস্তব কথা বলিও না (যে ,তাঁহার ছেলে আছে বা তাঁহার শরিক আছে।) ঈসা মসীহ যিনি মারইয়্যাম পুত্র তিনি আল্লাহর রসূল ছিলেন মাত্র এবং আল্লাহর বিশেষ আদেশে সৃষ্ট ছিলেন, যেই আদেশ আল্লাহ তায়ালা মারইয়্যামের প্রতি পৌছাইয়াছিলেন এবং তিনি আল্লাহরই সৃষ্ট একটি আত্মা (তথা আত্মাবিশিষ্ট জীব; তিনি আল্লাহর পুত্র বা আল্লাহর শরীক কস্মিনকালেও নহেন– হইতে পারেন না।)

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلاَ تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ـ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ سُبْحٰنَهٗ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلاً ـ

অতএব সঠিকরূপে আল্লাহর উপর ঈমান আন (যে, তেনি একমাত্র মা'বুদ) এবং আল্লাহর রসূলদের উপর ঈমান আন (যে, তাঁহারা আল্লাহর বান্দা ও প্রতিনিধি।) এইরূপ কথা মুখেও আনিও না যে, খোদা তিনজন; এই ধরনের কথা চিরতরে পরিহার কর; তোমাদেরই মঙ্গল হইবে। বস্তুতঃ খোদা বা মাবুদ একমাত্র আল্লাহ। তিনি এক, তাহার শরিক নাই। তাঁহার সন্তান আছে এইরূপ কথা (নিছক গর্হিত; ইহা) হইতে তিনি পাক-পবিত্র। আসমান সমূহে এবং যমিনে যাহা কিছু আছে সবই তাঁহার মালিকানাভুক্ত; (একটিও তাঁহার সন্তান, সমকক্ষ বা শরীক নহে।) সব কিছু সমাধানে মহান আল্লাহ স্বয়ং সম্পূর্ণ; (অন্যের প্রত্যাশী নহেন।)

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ـ

(তোমরা মছীহকে খোদা বা খোদার পুত্র বল, অথচ) স্বয়ং মছীহ কস্মিনকালেও আল্লাহর বান্দা হওয়ায় নাক সিটকাইবেন না। উচ্চস্তরের ফেরেশতাগণও নাজ সিটকান না যে, তাঁহারা আল্লাহর বান্দা।

وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ـ

যে কেউ আল্লাহর বন্দেগী ও গোলামী অবলম্বনে নাক সিটকাইবে এবং অহঙ্কার করিবে সে যেন স্মরণ রাখে, আল্লাহ সকলকে তাঁহার নিকট (হিসাবের জন্য) উপস্থিত করিবেন।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِنْ فَضْلِهٖ ـ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ـ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيْرًا ـ

অতপর যাঁহারা প্রমাণিত হইবেন ঈমানদার নেক আমলকারী তাঁহাদিগকে আল্লাহ তাঁহাদের প্রাপ্য প্রতিদান পূর্ণরূপে প্রদান করিবেন এবং স্বীয় করুণাবলে আরও অধিক দিবেন। পক্ষান্তরে যাহারা অবাধ্য ও অহঙ্কারী প্রমাণিত হইবে, তাহাদিগকে ভীষণ কষ্টদায়ক শাস্তি দিবেন। তাহারা নিজেদের জন্য আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন বন্ধু ও সহায়ক পাইবে না। (পারা-৬, রুকু-৩)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ بْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ـ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ـ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

ঐ সমস্ত লোক কাফের যাহারা বলে, মারইয়্যাম-পুত্র মছীহ আল্লাহ্ই। (অর্থাৎ আল্লাহ মছীহ-এর রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।* (হে মুহাম্মাদ (সঃ) আপনি এই কথার অসারতা বুঝাইতে তাহাদের বলুন, আচ্ছা বলত মছীহকে এবং তাঁহার মাতা মরয়্যামকে এবং দুনিয়ার সকল মানুষকে আল্লাহ যদি মারিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহা রোধ করার শক্তি কাহারও আছে কি? (সেই শক্তি কাহারও নাই, মছীহ-এরও ছিল না।) অথচ আল্লাহ যিনি হইবেন তাঁহার ক্ষমতায় ও আয়ত্তে হইবে সকল আসমান, যমিন এবং যাহা কিছু এই দুই-এর মধ্যে আছে।

তিনি সৃষ্টি করিতে পারিবেন যাহা ইচ্ছা এবং আল্লাহ হন সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (মসীহ-ঈসার মধ্যে কি এই শ্রেণীর কোন গুণ আছে?) (সূরা মায়েদাঃ পারা- ৬, রুকু- ৭)

---

* নাসারাদের মধ্যে বহু দল আছে- এক দলের দাবী এই যে, হযরত মছীহ খোদার পুত্র। আর এক দলের দাবী এই যে, তিন খোদার মধ্যে মসীহ ও তাঁহার মাতা মারইয়্যাম হইলেন দুইজন। আর এক দলের দাবী এই যে, মছীহ-ঈসা খোদা অর্থাৎ খোদা মসীহ-এর রূপে ও আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন- ইত্যাদি ইত্যাদি।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ـ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اعْبُدُوْا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰهُ النَّارُ ـ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ـ

ঐ সমস্ত লোক কাফের যাহারা বলিয়া থাকে যে, মারইয়্যাম পুত্র মসীহ আল্লাহই। অথচ মসীহ বলিয়াছেন, হে বনী ইস্রাঈলগণ! তোমরা এক আল্লাহর এবাদত কর যিনি আমারও প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু পরওয়ারদেগার। (তিনি আরও বলিয়াছেন) তোমরা স্মরণ রাখিও, নিশ্চয় যে কোন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য বেহেশতকে চিরদিনের তরে হারাম ও নিষিদ্ধ করিয়া দিবেন এবং তাহার চিরকালীন বাসস্থান হইবে দোযখ এবং অনাচারীদের সহায়ক কেহই হইবে না।
(পারা-৬, রুকু- ১৪)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ـ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ـ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

তাহারা কাফের যাহারা বলে, আল্লাহ তিন জনের একজন, (অর্থাৎ ঈসা, মারইয়্যাম এবং আল্লাহ এই তিন জন খোদা,) অথচ মাবুদ এক জনই আছেন (তিনি হইলেন, আল্লাহ তায়ালা।) তিনি ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই। (খোদা সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদের) ভ্রষ্ট লোকগণ যদি ঐসব হইতে চিরতরে বিরত না হয় তবে অবশ্যই (আখেরাতের) কষ্টদায়ক আযাব ঐসব কাফেরকে পাকড়াও করিবে।

اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ـ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

(সেই আজাব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কুফরী ত্যাগ করতঃ) তাহারা আল্লাহ পানে প্রত্যাবর্তন করে না কেন এবং (পুর্বাবস্থার জন্য) আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায় না কেন? অথচ আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাকারী পরম দয়ালু। (পারা- ৬,রুকু- ১৪)

مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ـ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ـ

মারইয়্যাম-পুত্র মসীহ আল্লাহ রসূল- তিনি আর কিছুই নহেন। তাঁহার পূর্বে অনেক রসূলই অতীত হইয়াছেন। (কেহই খোদা বা খোদার বেটা হন নাই।

وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ـ كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ ـ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ـ

মছীহ-এর মাতা মারইয়্যাম ছিলেন (আল্লাহর প্রভুত্বে) পূর্ণ বিশ্বাসী, সত্যের প্রতীক। (তাঁহাদের কেহ খোদা হইতেই পারেন না। কেননা) তাঁহারা উভয়ে খাদ্য খাইতেন; (তাঁহাদের প্রত্যেকেই জীবন ধারনে আহারের উপর নির্ভরশীল ছিলেন।হে বিশ্বাসী! দেখ- মছীহকে যাহারা খোদারূপে বিশ্বাস করে তাহাদের (সেই ভুল নিরসনের) জন্য কিরূপ স্পষ্ট দলিল ও যুক্তি বর্ণনা করিতেছি; এতদসত্বেও তাহারা কিভাবে উল্টা পথে যাইতেছে তাহাও লক্ষ্য কর।

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ـ وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

(হে মুহাম্মাদ!) আপনি তাহাদিগকে বলুন, তোমরা কি (বোকা? যে,) এমন বস্তুর এবাদত কর যাহার মোটেই ক্ষমতা নাই তোমাদের লাভ-লোকসান করার? জানিয়া রাখিও, আল্লাহ (তোমাদের কথাবার্তা ও কার্যকলাপ) সব কিছু শুনেন ও জানেন।

قُلْ يَاهْلَ الْكِتٰبِ لَاتَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ـ

আপনি তাহাদিগকে বলুন হে কেতাবধারী নাছারাগণ! তোমরা ধর্মের ব্যাপারে অবাস্তব অতিরঞ্জনের পথ অবলম্বন করিও না এবং তোমরা তোমাদের ঐসব পূর্ব পুরুষদের অনুসারী হইও না যাহারা পূর্বেই পথভ্রষ্ট হইয়াছে এবং আরও অনেককে পথভ্রষ্ট করিয়াছে এবং সঠিক পথ হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছে।

(পারা– ৬, রুকু– ১৪)

قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتٰنِىَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا ـ وَّجَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتَ وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَادُمْتُ حَيًّا ـ

হযরত ঈসা (ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার মাতার প্রতি অপবাদ খণ্ডনে) বলিলেন, আমি আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা, আল্লাহ আমাকে কেতাব দিবেন এবং নবী বানাইবেন বলিয়া নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং আমাকে লোকদের মঙ্গলকামী বানাইয়াছেন আর আমাকে নামায ও যাকাতের আদেশ করিয়াছেন যাবত আমি (ভূপৃষ্ঠে) জীবিত থাকি। (ছুরা মারইয়্যামঃ পারা– ১৬, রুকু– ৫)

ذٰلِكَ عِيْسٰى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِىْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ـ مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ سُبْحٰنَهٗ ـ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ـ

(হযরত ঈসার জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণনা করার পর আল্লাহ বলেন,) মারইয়্যাম-পুত্র ঈসার পরিচয় এই। ইহাই সত্য বিবরণ যাহার মধ্যে ভ্রষ্ট ইহুদি-নাছারাগণ বিভিন্ন মত পোষণ করে। আল্লাহ সম্পর্কে এইরূপ কথা নিছক অবান্তর যে তিনি সন্তান রাখেন; অথচ তিনি মহান, পাক-পবিত্র। (আল্লাহ সকলের সৃষ্টিকর্তা, তাঁহার সৃষ্টি ক্ষমতা এইরূপ যে,) যখন তিনি কোন বস্তুকে অস্তিত্ব দান করার ইচ্ছা করেন, তখন উহা সম্পর্কে শুধু তাঁহার আদেশ হয়– "কুন্" হইয়া যাও; ফলে তৎক্ষণাৎ সেই বস্তু অস্তিত্ববান হইয়া যায়। (ঈসার জন্ম এই ক্ষমতার দ্বারাই। (পারা–১৬, রুকু– ৫)

আলোচ্য বিষয়ে স্বয়ং ঈসা (আঃ) কর্তৃক চূড়ান্ত বিবৃতি

কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা সর্ব সমক্ষে বিশেষতঃ ভ্রষ্ট নাছারাদের শুনাইবার জন্য ঈসা (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনি কি লোকদিগকে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহারা যেন আপনাকে এবং আপনার মাতাকে উপাস্য ও মা'বুদ বানায়?

তখন হযরত ঈসা (আঃ) বিশেষ দৃঢ়তা ও যুক্তি-প্রমাণের সহিত উহা অস্বীকার করিবেন। ভ্রষ্ট নাসারাদের অতিরঞ্জিত কথাবার্তা খণ্ডন করতঃ স্পষ্ট দাবী করিবেন যে, আমি তাহাদিগকে একমাত্র এই শিক্ষাই দিয়াছি যে– ان اعبدوا الله ربى وربكم –

হে বিশ্ববাসী! তোমরা সকলে এক আল্লাহকে মা'বুদরূপে গ্রহণ কর– এক আল্লাহর বন্দেগী, গোলামী ও এবাদত কর; যিনি আমার ও প্রভু-পরওয়ারদেগার এবং তোমাদেরও প্রভু-পরওয়ারদেগার।

তিনি ইহাও বলিবেন যে, যাবত আমি ভূপৃষ্ঠে ছিলাম তাবৎ লোকদের মধ্যে এই শিক্ষা সম্পর্কে আমি পূর্ণ তদারক এবং পর্যবেক্ষণ করিয়া চলিয়াছি; যে গলদ তাহাদের মধ্যে আসিয়াছে আমার পরে আসিয়াছে। আমি তাহাদের অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জনের প্রতি অসন্তুষ্ট– উহার সঙ্গে আমার কোনই সম্বন্ধ নাই।

উক্ত প্রশ্নোত্তরের ঘটনা কেয়ামতের দিন ঘটিবে। আল্লাহ তায়ালা নাছারাবাদের কল্পিত ও গর্হিত অত্যুক্তি খন্ডনের জন্য এবং বিশ্ববাসীকে বুঝাইবার জন্য পবিত্র কোরআনে সেই ঘটনার বর্ণনা দিয়াছেন। যাহার উদ্ধৃতি এই–

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِىْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ بِحَقٍّ ـ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ـ تَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ وَلَآ اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ ـ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ـ مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِىْ بِهٖٓ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ ـ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ـ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ـ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

স্মরণ কর (কেয়ামতের দিনের ঘটনা–) যখন আল্লাহ জিজ্ঞাস করিবেন, হে মারইয়্যাম-পুত্র ঈসা! আপনি কি লোকদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা আল্লাহ ভিন্ন আমাকে এবং আমার মাতাকেও মাবুদরূপে গ্রহণ কর? ঈসা বলিবেন, আপনি মহান, পাক-পবিত্র– যে কথা বলিবার অধিকার আমার নাই সেই কথা বলা আমার পক্ষে শোভা পায় না; আমি উহা বলি নাই। যদি আমি ঐরূপ বলিয়া থাকিতাম তবে আপনি অবশ্যই জ্ঞাত থাকিতেন, আমি আপনার সব বিষয় জানিতে পারি না, কিন্তু আপনি ত আমার অন্তরের অন্তস্থলেরও সব কিছু জ্ঞাত আছেন; আপনি অপ্রকাশ্য সব কিছুও জ্ঞাত থাকেন। আমি তাহাদিগকে এক মাত্র ঐ কথাই বলিয়াছি যাহা আপনি আমাকে আদেশ করিয়াছেন– তোমরা একমাত্র আল্লাহকে মাবুদরূপে গ্রহণ কর, যিনি আমারও পরওয়ারদেগার এবং তোমাদেরও পরওয়ারদেগার। আর আমি তাহাদের হাল-অবস্থার পর্যবেক্ষক ছিলাম যাবৎ আমি তাহাদের মধ্যে অবস্থানকারী ছিলাম। অতপর যখন আপনি আমাকে উঠাইয়া নিয়া আসিয়াছেন তখন হইতে একমাত্র আপনিই তাহাদের হাল অবস্থা প্রত্যক্ষকারী ছিলেন; আপনি ত সর্ব বিষয়েরই অবগতি রাখেন। (তাহাদের সব গোমরাহী আপনি জ্ঞাত আছেন– এখন) যদি আপনি তাহাদের শাস্তি দেন তবে সেই ক্ষমতা ও অধিকার আপনার রহিয়াছে। কারণ তাহারা হইল আপনার বান্দা; (আপনি তাহাদের প্রভু।) আর যদি তাহাদেরকে ক্ষমা করেন তবেও (কিছু বলার অধিকার কাহারও নাই কারণ;) আপনি সর্বশক্তিমান সর্বক্ষমতার অধিকারী এবং সর্বজ্ঞানী হেকমতওয়ালা। (পারা–৭, রুকু– ৬)

১৬৫২। হাদীছ ঃ ওবাদাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এইরূপ আকীদা ও বিশ্বাসের ঘোষণা দিবে যে, আল্লাহ ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই– মা'বুদ একমাত্র আল্লাহ; তিনি এক, অদ্বিতীয়; তাঁহার কোন শরীক-সাথী নাই এবং মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁহার সৃষ্ট বান্দা, তাঁহার প্রেরিত রসূল এবং ঈসা (আঃ) আল্লাহর সৃষ্ট বান্দা, তাঁহার প্রেরিত রসূল; (সৃষ্টির রীতি পুরুষের স্পর্শে নারী গর্ভে সন্তানের জন্ম– এই রীতি ব্যতিরেকে পুরুষের স্পর্শ বিহীন শুধু) আল্লাহ তাআলার আদেশ বার্তা "কুন– হইয়া যাও" দ্বারা সৃষ্ট, এই আদেশের প্রতিক্রিয়া আল্লাহ তায়ালা মারইয়ামের প্রতি পৌছাইয়াছিলেন এবং (সাধারণ রীতি তথা কোন পুরুষ-স্পর্শনের মাধ্যম ব্যতিরেকে) আল্লাহ তায়ালা সরাসরি একটি রুহ বা আত্মারূপে হযরত ঈসাকে (মাতৃগর্ভে) পৌছাইয়া দিয়াছিলেন, (তিনি আল্লাহর সন্তান বা সমকক্ষ ছিলেন না।)

আরও ঘোষণা দিবে যে, (আল্লাহ-ভক্তদের জন্য) বেহেশত বরহক্ক ও বাস্তব এবং আল্লাহদ্রোহীদের জন্য) দোযখ বরহক্ক ও বাস্তব (–এই সব গল্প-গুজব নহে।)

এইরূপ আক্বিদাহ ও বিশ্বাসের ঘোষণা দানকারী ব্যক্তিগণ বেহেশত লাভ করিতে পারিবে নিজ নিজ আমলের ভিত্তিতে। (এমন কি যদি ঐরূপ ঘোষণা দানকারীর আমল ভাল না হয় এবং স্বীয় বদ আমল আল্লাহর দরবার হইতে ক্ষমা না করাইয়া থাকে তবে শাস্তি ভোগ করার পর উক্ত বিশ্বাস তথা ঈমানের বদৌলতে অবশ্যই চিরস্থায়ী রূপে বেহেশত লাভ করিতে পারিবে।)

নাছারাবাদের তথাকথিত যুক্তি-তর্কের বিষয়বস্তু

ভূমিকা ঃ দুনিয়াতেও দেখা যায়, কোন ব্যক্তি কোন রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি (EMBASADOR) নিযুক্ত হইয়া আসিলে তিনি স্বীয় নিযুক্তিস্থলে পদার্পণ করিয়া পরিচয়পত্র পেশ করেন। তদ্রূপ রসূলগণ আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি; যত রসূল দুনিয়াতে পদার্পণ করিয়াছেন প্রত্যেকেই আল্লাহ তায়ালার বান্দাদের সম্মুখে স্বীয় পরিচয়পত্র স্বরূপ বিভিন্ন মোযেজা বা অলৌকিক ঘটনাবলী দেখাইয়াছেন যদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সম্পর্কে রহিয়াছে, তাই আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে এত বড় ক্ষমতা দান করিয়াছেন।

মো'জেযা যত বড়ই হউক না কেন উহার মূল কর্মকর্তা এবং মূল উৎস হইলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা। নবী বা রসূলের সেখানে স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন ক্ষমতা থাকে না, সুতরাং যে কোন প্রকার মো'যেজার দরুন যদি নবী বা রসুলকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার পর্যায়ে রাখা হয় তবে তাহা গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা হইবে এবং কোন নবী কখনও নিজে ঐরূপে দাবী করিতে পারেন না। শয়তানই লোকদিগকে গোমরাহ করিয়া অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জনে পতিত করে।

নবীকে বহু রকমের বহু মো'জেযাই প্রদান করা হয়, অবশ্য সাধারণতঃ দেখা গিয়াছে, যেই যুগে যেই বিষয়ে লোকদের উন্নতি অধিক ছিল সেই বিষয়েই আল্লাহ তায়ালা সেই যুগের নবীকে তাঁহার প্রধান মোজেযা দান করিয়াছেন। কারণ, সেই বিষয়ে যুগের লোকদের চরম উন্নতি লাভ থাকা সত্ত্বেও যখন নবী অন্য লোকদের ক্ষমতার ঊর্ধের ঘটনা দেখাইতে সক্ষম হন তখন ন্যায়পরায়ণ লোকগণ নবীর মর্যাদাটা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন। যেমন মূসা আলাইহিস্ সালামের যুগে যাদুবিদ্যার অত্যধিক প্রসার ছিল, তদ্দৃষ্টে আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে "আ'ছা" বা লাঠিকে সাপ বানাইবার মোজেযা দিয়াছিলেন। যদ্দুরুন শুভবুদ্ধির উদয়নে যাদু-করগণ তৎক্ষণাৎ হযরত মূসার মর্যাদা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আমাদের পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগে এবং তাঁহার জন্মদেশে আরবী সাহিত্যের অত্যধিক উন্নতি ছিল। তদ্দৃষ্টে আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে মানব ক্ষমতার উর্ধ্বের সাহিত্যিক গুণাবলী বিশিষ্ট কেতাব কোরআন মজিদ প্রধান মো'জেযারূপে দান করিয়াছিলেন।* যদ্দরুন ন্যায়পরায়ণ আরবগণ অতিসহজেই তাঁহার মর্যাদা অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন। তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ আরবী কবি "লবীদ" এবং আরও অনেক কবির ঘটনা ইতিহাসে বিদ্যমান রহিয়াছে।

যুগে যুগে নবীগণের মো'জেযা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার এই নিয়মই চলিয়া আসিয়াছে যে, যেই যুগে যে বিষয়ের অধিক উন্নতি ও প্রভাব ছিল সেই যুগের নবীকে সেই বিষয়ে প্রধান মোজেযা দেওয়া হইয়াছে- ইহা বাস্তব ও ঐতিহাসিক সত্য।

যেই যুগে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আবির্ভাব সেই যুগে চিকিৎসা বিদ্যার উন্নতি অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল। তদ্দৃষ্টে আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসাকে মো'জেযা দিয়াছিলেন যে, তিনি এমন এমন ব্যধি বা রোগকে ভাল করিতে পারিতেন যাহা সকল চিকিৎসকের নিকট দুরারোগ্য। যেমন-

(১) মৃত্যু- ইহার কোন চিকিৎসা চিকিৎসকের নিকট নাই; মরা মানুষকে কেউ জীবিত করিতে পারে না। হযরত ঈসাকে আল্লাহ তায়ালা মো'যেজা দিয়াছিলেন- তিনি কোন মৃতকে লক্ষ্য করিয়া قم باذن الله কুম বে ইজ্ নিল্লাহ "আল্লাহর আদেশে তুমি জীবিত হইয়া যাও" বলার সঙ্গে সঙ্গে ঐ মৃতদেহ জীবিত হইয়া উঠিত।

---

* পূর্ববর্তী নবীগণকে যে সব আসমানী কেতাব প্রদান করা হইয়াছিল উহার এবারত (reading) কোরআন মজিদের ন্যায় সাহিত্যিক গুণাবলীতে মানবশক্তির উর্ধ্বে ছিল না; যাহার ফলে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, কর্তন ও সংমিশ্রণের দ্বারা ঐ সবের বিকৃতি সাধন সম্ভব হইয়াছে। পক্ষান্তরে লক্ষ লক্ষ শত্রুর সক্রিয় চেষ্টা সত্ত্বেও সুদীর্ঘ চৌদ্দশত বৎসর কোরআন মজিদের একটি অক্ষরের বেশ-কম করাও সম্ভব হয় নাই, হইবেও না।

(২) মাটির তৈরী পাখির আকৃতি– কোন চিকিৎসাবিদ এইরূপ জড় জিনিসকে আত্মা দান করিয়া জীবন্ত বানাইবে তাহা সম্ভব নহে। আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসাকে মোজেযা দিয়াছিলেন– তিনি ঐরূপ মাটির তৈরী পাখীর দেহে ফুৎকার মারিলে আল্লাহ তায়ালার আদেশে উহা বাস্তবেই পাখী হইয়া উড়িয়া যাইত।

(৩) জন্মান্ধকে কোন চিকিৎসক চিকিৎসার দ্বারা তাহার দৃষ্টি শক্তি আনয়ন করিতে পারে না, তদ্রূপ কুষ্ঠ রোগের কোন চিকিৎসা চিকিৎসাশাস্ত্রে নাই। আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসাকে মো'জেযা দিয়াছিলেন– তাঁহার অছিলায় আল্লাহ তায়ালা জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করিতেন এবং কুষ্ঠ রোগ দূর হইয়া যাইত।

(৪) এতদ্ভিন্ন হযরত ঈসার এই মো'জেযা এও ছিল যে, বাড়ীতে যে যাহা খাইয়াছে এবং যাহা সঞ্চিত রাখিয়াছে, ঈসা (আঃ) নিজে নিজেই সেই সবের বিবরণ বলিয়া দিতে পারিতেন।

এইসব বিষয়াবলী অলৌকিক ও অসাধারণ ছিল বটে, কিন্তু পয়গাম্বরগণের পক্ষে তাহাদের মো'জেযা স্বরূপ এই ধরনের ঘটনাবলী যুগে যুগেই চলিয়া আসিয়াছে। পবিত্র কোরআনে হযরত মূসার ঘটনা উল্লেখ আছে– এক নিহত ব্যক্তির হত্যাকারীর সন্ধান দেওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসার জন্য নিহত ব্যক্তিকে জীবিত করার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আরও একটি ঘটনা উল্লেখ আছে– হযরত মূসা সত্তর জন লোকের একটি প্রতিনিধি দল লইয়া তূর পর্বতে গিয়াছিলেন, তথায় যাইয়া তাহারা আল্লাহ তায়ালাকে স্বচক্ষে দেখিবার জন্য হঠকারিত করিলে সকলেই আল্লাহর গজবে ধ্বংস হইয়াছিল। অতপর হযরত মূসাার দোয়ার বদৌলতে সত্তর জনের সকলেই জীবিত হইয়াছিল। তদ্রূপ একটি নির্জীব কাষ্ঠখন্ড বা লাঠি হযরত মূসার পক্ষে বিরাট অজগরে পরিণত হইয়া যাইত, যাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনেই রহিয়াছে।

আমাদের পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামেরও এই ধরনের বহু বহু মো'জেযা হাদীছের কেতাব সমূহে বর্ণিত আছে।

(১) একটি নারী তাহার ছেলেসহ ইসলাম গ্রহণ করতঃ হিজরত করিয়া মদিনায় উপস্থিত হইলে পর অল্প দিনের মধ্যেই তাহার ছেলেটি মারা যায়। নিঃসহায় নারীটি ছেলের মৃত্যুর সংবাদ অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইল; তাহার ছেলের লাশ হযরতের সম্মুখে রক্ষিত ছিল। নারীটি হযরতের পায়ের নিকট বসিয়া অতি কাতর স্বরে দো'আ করিতে লাগিল, অল্পক্ষণের মধ্যেই মৃত ছেলেটি হাত-পা নাড়া দিয়া আবরণের চাদরটি মুখের উপর হইতে সরাইয়া দিল এবং জীবিত হইয়া উঠিল, এমনকি তাহার মৃত্যু হইয়া যাওয়ার পরও অনেক দিন সে বাঁচিয়া ছিল। আরও একটি ঘটনা– আবদুল্লাহ (রাঃ) ছাহাবির পুত্র জাবের (রাঃ) ছাহাবীর ঘরে একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) দাওয়াত খাইতে আসিলেন। তথায় তাঁহার জন্য একটি ছাগল জবেহ করা হইয়াছিল। আবদুল্লাহ (রাঃ) ওহদের যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিলেন এবং একমাত্র পুত্র জাবের (রাঃ)-কে নিঃসহায় ও নিঃসম্বল অবস্থায় বিরাট সংসারের ব্যয় বহন ও ঋণের চাপে রাখিয়া গিয়াছিলেন। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) সকলকে বলিয়া দিলেন সকলেই গোশত খাইবে, কিন্তু হাড্ডি চিবাইবে না। অতপর হযরত (সঃ) ছাগলের গোশতের হাড়গুলি একত্রিত করিলেন এবং ঐগুলির উপর হাত রাখিয়া কিছু দোয়া পড়িলেন, হঠাৎ ছাগলটি পূর্ণ শরীরে জীবিত হইয়া শরীর ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইয়া গেল। এই শ্রেণীর আরও অনেক ঘটনার বিবরণ হাদীছে বিদ্যমান রহিয়াছে।

(২) হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে এই ধরনের মো'জেযা আরও অনেক বর্ণিত আছে– একটি নির্জীব শুষ্ক কাষ্ঠ, খেজুর বৃক্ষের কান্ড– মসজিদের খুঁটি জীবন্ত মনুষের ন্যায় হযরতের বিচ্ছেদে কাঁদিতেছিল। অতপর হযরত (সঃ) উহাকে হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দিলে শান্ত হইয়াছিল– এই ঘটনা "উসতুয়ানায়ে-হান্নানাহ্"-এর ঘটনা নামে প্রসিদ্ধ। বদরের যুদ্ধে ওকাশা ইবনে মেহছান (রাঃ) এবং ছালামাহ ইবনে আছলাম (রাঃ) ছাহাবীদ্বয়ের তরবারী ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁহাদিগকে এক এক খানা গাছের ডালা দিয়াছিলেন যাহা লৌহ তরবারীতে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল।

(৩) এই শ্রেণীরও বহু ঘটনা বর্ণিত আছে যে, একটি নারী তাহার ছেলেকে লইয়া হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল। ছেলেটি যৌবন বয়সে পৌঁছিয়াছিল, কিন্তু সে ছিল জন্ম-বোবা, কথা বলিতে পারিত না। হযরত (সঃ) ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বল ত আমি কে? তৎক্ষণাৎ ছেলেটি বাক শক্তি লাভ করিয়া বলিল, انت رسول الله আপনি আল্লাহর রসূল। আরও একটি ঘটনা– এক লোকের পা সাপের ডিমের উপর পড়িয়াছিল তাহাতে তাহার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাহার পিতা তাহাকে লইয়া রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাহি অসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হইল। হযরত (সঃ) ঘটনা শুনিয়া তাহার চোখে থু থু দিলেন তৎক্ষণাৎ তাহার দৃষ্টিশক্তি বহাল হইয়া গেল, সে ৮০ বৎসর বয়সেও সূঁচের ছিদ্রে সুতা দিতে সক্ষম ছিল। এতদ্ভিন্ন বদরের যুদ্ধে ক্বাতাদাহ ইবনে নোমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর চক্ষু ভীষণ আঘাতে খসিয়া পড়িয়াছিল, হযরত (সঃ) হাতে ধরিয়া চক্ষু বসাইয়া দিলেন, তৎক্ষণাৎ চক্ষু ভাল হইয়া গেল যেন উহার মধ্যে কখনও কোন যাতনা অনুভবই করেন নাই। খায়বরের যুদ্ধকালে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর চক্ষুদ্বয়ের ভীষণ যাতনা ছিল, হযরতের থুথুতে তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ হইয়াছিল।

(৪) অজ্ঞাত বিষয়ের খবর বলিয়া দেওয়ার ঘটনা ত ইতিহাসে অসংখ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যমানায় রোম সম্রাট পারস্য সম্রাটের আক্রমণে ভীষণরূপে পরাজিত হইয়াছিল এতদসত্ত্বেও রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছিলেন, অচিরেই রোমীয়গণ পার্সী গণের উপর জয়লাভ করিবে। এই সম্পর্কে কাফেরদের সঙ্গে আবুবকর রাজিয়াল্লাহু আনহু বাজিও রাখিয়াছিলেন। অবশেষে রসূলুল্লাহু ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উক্তিই সত্য হইয়াছে। রোম সম্রাট পারস্য সম্রাটের উপর বিরাট জয়লাভ করিয়াছে। ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনে ২১ পারায় সূরা রোমের আরম্ভেই উল্লেখ আছে।

আবু হোরায়রা (রাঃ) রাত্রে চোর ধরিয়া গোপনে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, ভোরে হযরত (সঃ) তাহা বলিয়া দিয়াছিলেন এবং তিন দিন এইরূপ ঘটনা হইয়াছে।

মক্কা অভিযানের গোপন খবরের এক পত্র লইয়া এক নারী মদীনা হইতে মক্কা যাইতেছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) আলী (রাঃ) এবং অপর একজনকে পাঠাইয়া দিলেন সেই পত্র হস্তগত করার জন্য এবং নির্দিষ্টরূপে বলিয়া দিলেন, তোমরা তাহাকে "রওজা-কাখ" নামক স্থানে পাইবে; বাস্তবে তাহাই হইল।

এই ধরনের হাজার হাজার মো'জেযা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের রহিয়াছে, যাহার সাক্ষ্য প্রমাণ-যুক্ত বিবরণ "আল-খাছায়েছুল কোবরা" "দালায়েলুন-নবুওয়াহ্ লে-আবিন্ নুয়াঈম" এবং "দালায়েলুন্ নবুওয়াহ লেল-বায়হাক্বী" ইত্যাদি কিতাবে বিদ্যমান আছে। এত মোজেযা থাকা সত্ত্বেও মুহাম্মাদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উম্মত মুসলমানগণ বা তাহাদের কোন দল হযরত মুহাম্মাদ (দঃ) কে খোদা বা খোদার শরীক বলিয়া উক্তি করে নাই বরং প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে তাহার ঈমানকে প্রমাণিত করার জন্য এই ঘোষণা দান বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে যে–

اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله -

"আমি আমার আকীদা ও বিশ্বাসের ঘোষণা দিতেছি যে, একমাত্র আল্লাহই মা'বুদ– আর কোন মা'বুদ নাই; তিনি এক, তাঁহার কোন শরীক নাই এবং আমি এই ঘোষণাও দিতেছি যে, মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর সৃষ্ট বান্দা ও তাঁহার রসূল।"

এমনকি কোন সময়ও যেন মুসলমানদের মধ্যে এই আকীদা ও বিশ্বাস বিস্মৃতির ধুম্রজালে ঢাকিয়া যাইতে না পারে সেই জন্য মুসলমানদের প্রতিটি ভাষণ ও অনুষ্ঠানাদির উদ্বোধনের প্রারম্ভে সর্বসমক্ষে এই ঘোষণা ও স্বীকৃতি প্রদানের রীতিও ইসলামে আবহমান কাল হইতে প্রবর্তিত রহিয়াছে।

স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামও স্বীয় উম্মতের প্রতি এই ব্যাপারে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন।

১৬৫৩। হাদীছ ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি খলীফাতুল-মোছলেমীন ওমর (রাঃ)-কে সর্বসমক্ষে মসজিদের মিম্বারে দাঁড়াইয়া এই হাদীছ বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি– তিনি বলিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতে শুনিয়াছি– তিনি স্বীয় উম্মতকে সতর্ককরণ পূর্বক বলিয়াছেন, খবরদার! আমার প্রশংসা করিতে এবং মর্যাদা বাড়াইতে অতিরঞ্জিত উক্তি করিবে না– যেরূপ নাছারাগণ মারইয়্যাম-পুত্র ঈসা সম্পর্কে করিয়াছে।

আমি আল্লাহ সৃষ্ট বান্দা বৈ নহি; (আমাকে আল্লাহ তায়ালার সমতুল্যকারী কোন উক্তি দ্বারা আখ্যায়িত করিও না) হাঁ– আমার সম্পর্কে বল, "আল্লহর বান্দা ও রসূল"।

অর্থাৎ তোমরা আমার সম্পর্কে নাছারাদের ভূমিকা গ্রহণ করিও না– নাছারা বা খৃষ্টানগণ ঈসা আলাইহিস সালামের অলৌকিক জন্ম-বৃত্তান্ত এবং তাঁহার মো'জেযা সমূহকে কেন্দ্র করিয়া অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জনে লিপ্ত হইয়া গিয়াছে। একদল বলে, ঈসা-মসীহ খোদার বেটা বা ছেলে। আর একদল বলে, ঈসা-মছীহ ও তাহার মাতা তিন খোদার দুই খোদা। আর একদল বলে, ঈসা-মছীহ-ই খোদা।

এমনকি ঐতিহাসিক "অফদে-নাজরান"– নাজরানের গির্জা হইতে আগত নাছারাবাদের বড় বড় পাদ্রীগণের একটি বিশেষ প্রতিনিধি দল মদিনায় স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দরবারে ঐসব অলৌকিক ঘটনার দলীল প্রমাণ লইয়াই উপস্থিত হইয়াছিল, যাহার প্রতি উত্তরে পবিত্র কোরআনের সূরা আলে-ইমরানের প্রাথমিক আয়াতসমূহ নাযিল হয়; বিস্তারিত বিবরণ এই–

অফদে নাজরান পাদ্রীদের বিশেষ প্রতিনিধি দল

ইয়ামানের অন্তর্গত "নাজরান" একটি প্রসিদ্ধ শহর ছিল, ঐ শহরেই রোমের অধীনে এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ চার্চ বা গির্জা ছিল তৎকালীন খৃস্টান ধর্মীয়দের।

হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) সপ্তম হিজরী সনে দুনিয়ার বড় বড় রাষ্ট্রপ্রধান, গোত্রপ্রধান ও ধর্মপ্রধানদের নিকট ইসলামের দাওয়াত-নামা বা আহবান-পত্র বিশেষ বিশেষ দূত মারফত প্রেরণ করিয়াছিলেন। খৃস্টানদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় কেন্দ্র এই নাজরানেও দাওয়াতনামা পাঠাইয়াছিলেন। এই নাজরান গির্জার অধীনে সত্তরের অধিক নগর বা গ্রাম ছিল এবং লক্ষাধিক স্বেচ্ছাসেবক যুবক নাগরিক সিপাই ছিল। এতদসত্ত্বেও নাজরানের পাদ্রিগণ ইহুদিদের ভয়ে ভীত ছিল। ইহুদিরা খৃস্টানদিগকে এক কথায় লা-জওয়াব করিয়া দিত যে, "তোমরা যাহাকে তোমাদের ধর্মের প্রধান বল তাহার ত বাপের ঠিক নাই– সে ত জারজ সন্তান, তাহার মৃত্যুই হইয়াছে অপমৃত্যু তথা শূলিতে; শূলিতে মৃত্যু ঘটে অভিশপ্তদের।"

ইহুদীদের এই আক্রমণের প্রতিরোধেই খৃস্টানগণ তাহাদের ছদ্মবেশী গুরু বৈপিতা সেন্টপলের প্রবঞ্চনাময় মন্ত্র গাহিয়া বেড়াইত যে, আমাদের ধর্মপ্রধানের বাপ হইলেন স্বয়ং আল্লাহ এবং শূলিতে তাঁহার মৃত্যু হইয়া থাকিলেও সেই মৃত্যু অপমৃত্যু ছিল না, বরং তিনি স্বয়ং শূলিবিদ্ধ হইয়া পিতার নিকট হইতে সকলের পাপ মোচন করাইয়া গিয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এইসব দাবী নিছক মিথ্যা ভিত্তিহীন, এই সবের মূলে কোন যুক্তি প্রমাণ মোটেই নাই।

পূর্বেও বলা হয়েছে, ইসলাম হইল বাস্তব ও সত্যের প্রতীক ধর্ম। ইসলাম মিথ্যার আশ্রয় মোটেই লয় না এবং সত্যের প্রচার এবং প্রকাশ্যেও বিন্দুমাত্র দুর্বলতা দেখায় না, তাই ইসলামের পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এবং ইসলামের কেতাব পবিত্র কোরআন হযরত ঈসা আলাইহিচ্ছালামের গুণগান ও প্রশংসা করিল। তাঁহার ও তাঁহার মাতার মহত্ব ও পবিত্রতা বর্ণনা করিয়া অনেক অনেক বিবৃতি দান করিল এবং ঈসার জন্ম-বৃত্তান্তের বিস্তারিত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া এবং সে সম্পর্কে বাস্তব ও সত্য ঘটনার উদঘাটন করিয়া ইহুদিদের মিথ্যা ও ভ্রষ্ট অপবাদের দাঁত-ভাঙ্গা উত্তর প্রদান করিল। পবিত্র কোরআন স্পষ্ট ঘোষণা দিল যে,

হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ তায়ালার পাক-পবিত্র বিশিষ্ট নবী ছিলেন; তাঁহার সম্পর্কে অপবাদকারীগণ আল্লাহর নিকট অভিশপ্ত।

এইসব বিবৃতি ও ঘোষণায় ইসলামের তরফ হইতে ইহুদিদের মোকাবিলায় নাছারাদের পক্ষ সমর্থন ছিল; কাজেই নাছারাগণ খুব সন্তুষ্ট হইল এবং তাহাদের উৎসাহ বাড়িয়া গেল। নবম হিজরী সনের প্রারম্ভে তাহাদের প্রধানতম কেন্দ্র নাজরানের পাদ্রিগণ বিশেষ শান-শওকতের সহিত– চৌদ্দ গোত্রের প্রধান প্রধান পাদ্রীগণ, তৎসঙ্গে তিনজন সর্বোচ্চ নেতাসহ মোট ষাটজন সদস্যের এক প্রতিনিধি দল মদিনায় আসিল এবং হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল।

তাহাদের সর্বপ্রধান নেতা ছিল "আব্দুল মসীহ ওরফে আকেব" প্রধান ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ লাটপাদ্রী ছিল "আবু হারেছা" এবং তাহাদের রাহবর বা পথ-পরিচালক নেতা ছিল "আইহাম ওরফে ছাইয়্যেদ"।

প্রতিনিধি দল মদিনায় উপস্থিত হইয়া তাহাদের দুই প্রধান– আবদুল মছীহ এবং আইহামকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামের সঙ্গে কথা বলার জন্য মনোনীত করিল। নেতাদ্বয় হযরতের নিকট উপস্থিত হইলে হযরত (সঃ) তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাইলেন। তাহারা বলিল, আমরা ত পূর্ব হইতেই মুসলমান (তথা আল্লাহ তায়ালাকে স্বীকার করিয়া থাকি)। হযরত (সঃ) বলিলেন, আপনাদের ইসলামের দাবী মিথ্যা দাবী; আপনারা ত ইসলামের পরিপন্থী আকীদা ও কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন। আপনারা (হযরত ঈসাকে) আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করেন, ক্রুশকে পূজনীয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং শূকর খাইয়া থাকেন (যাহা কোন নবীর ধর্মেই হালাল নয়)।

নেতাদ্বয় তদুত্তরে বলিল, হযরত ঈসা যদি আল্লাহর পুত্র না হন তবে পিতা কে? এই যুক্তির উপরই তাহারা অধিক জোর দিল যে, কোন মানুষ হযরত ঈসার পিতা ছিল না, সুতরাং আল্লাহ তায়ালাই তাঁহার পিতা, নতুবা তাঁহাকে জারজ বলিতে হয়, অথচ কোরআন ও ইসলাম এই কথা ঘোর প্রতিবাদকারী।

এতদ্ভিন্ন নাছারাগণ হযরত ঈসা খোদা হওয়ার এই দলিলও বয়ান করিত যে, তিনি মৃতকে জীবিত করিতে পারেন, অন্ধকে চক্ষু দান করিতে পারেন, মানুষ নিজ ঘরে কি খাইয়াছে কি করিয়াছে এইরূপ গায়েবের খবর বলিতে পারেন।

এই নাজরান প্রতিনিধি দলের বিতর্ক উপলক্ষ্যেই নাছারাদের বক্তব্যাদি খন্ডন পূর্বক সূরা আলে এমরানের প্রথম ৮৪টি আয়াত নাযিল হইয়াছিল। উহাতে নাছারাগণকে লক্ষ্য করিয়া চারটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হইয়াছে।

প্রথমত ঃ অতি সংক্ষেপে আল্লাহ তায়ালার দুই তিনটি এমন গুণ বা ছেফতের উল্লেখ করা হইয়াছে যদ্বারা সহজেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে যে, অন্য কেহই তাঁহার শরীক, সাথী বা সমকক্ষ মা'বুদ; উপাস্য করা যাইতে পারে না। সূরাটির প্রারম্ভেই ঘোষণা করা হইয়াছে, আল্লাহ যিনি তিনি হইলেন الحى। "চিরজীবন্ত, অনাদি অন্তত" এবং القيوم। "সারা বিশ্বের ধারকও রক্ষক;" সারা বিশ্বকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনিই উহার ধারণকারী ও অস্তিত্ব রক্ষাকারী। সেই আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহই মা'বুদ উপাস্য ও পূজনীয় হওয়ার যোগ্য নহে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহর আরও একটি গুণ বিশেষরূপে উল্লেখ হইয়াছে।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاۤءِ ـ

"নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখিও, আল্লাহ এমন যে, তাঁহার সম্মুখে আসমান-জমিনের কোথাও একবিন্দু বস্তুও গোপন অজ্ঞাত অজানা থাকিতে পারে না।"

পক্ষান্তরে যে কোন নবী মো'জেজা স্বরূপ গায়েবের কোন বিষয় বলিয়া দিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহা হয় নেহাত সীমাবদ্ধ। যেমন, ঈসা (আঃ) এই সম্পর্কে গোপন খবর বলিতে পারিতেন যে, একজন লোক সে আজ কি খাইয়াছে এবং বাড়ীতে কি কি বস্তু সঞ্চিত রাখিয়াছে। এই সীমার বাহিরে অন্য কোন গায়েবের

খবর তিনি বলিতে পারিতেন না।

দ্বিতীয়তঃ ঈসা (আঃ) এবং তাঁহার মাতার জন্ম-বৃত্তান্ত এমনভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যদ্দারা অতি সহজে উপলব্ধি করা যায় যে, তাঁহারা উভয়েই আল্লাহ তায়ালার মখলুক বা সৃষ্ট মানুষ ছিলেন। অবশ্য হযরত ঈসার সৃষ্টি ও তাঁহার জন্মলাভ আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরতে হইয়াছিল। সেই কুদরত কি ধরনের ছিল তাহাও স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে–

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمْ - خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ -

"নিশ্চয় ঈসার (বিনা-বাপে জন্মের) আশ্চর্যজনক বৃত্তান্ত আল্লাহ তায়ালার পক্ষে (মোটেই আশ্চর্যজনক নহে। তাঁহার জন্মের ব্যবস্থাটা) আদমের (জন্ম) বৃত্তান্তের ন্যায়ই। আদমকে আল্লাহ তায়ালা মাটি দ্বারা তৈরী করিয়া আদেশ করিয়াছিলেন, "কুন্– হইয়া যাও" সঙ্গে সঙ্গে আদম (জীবন্ত) হইয়া গিয়াছিলেন।"

হযরত আদম যেরূপ মাতা-পিতা ব্যতিরেকে আল্লাহর কুদরত শুধু আল্লাহর আদেশ দ্বারা জন্মলাভ করিয়াছেন, হযরত ঈসাও তদ্রূপ কোন পিতার স্পর্শন ব্যতিরেকে আল্লাহ তায়ালার কুদরতে শুধু আল্লাহর অদশ দ্বারা মাতৃগর্ভে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। অতপর আল্লাহ তায়ালা এই তথ্য সম্পর্কে বলিয়াছেন–

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلاَ تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ -

"এই সত্যটি তোমার মহা প্রভু-পরওয়ারদেগার হইতেই প্রচারিত; এই সম্পর্কে কোন সংশয়ে পড়িও না।" এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালার একটি বিশেষ গুণও উল্লেখ হইয়াছে যে,

هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاۤءُ -

"মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা যেভাবে ইচ্ছা করেন তোমাদিগকে মাতৃগর্ভে তৈরী ও গঠন করিতে পারেন।" যেমন– মাতৃ বীর্যের সঙ্গে পিতৃবীর্যের সংযোজনেও গঠন করিতে পারেন, যেরূপ সাধারণতঃ হয়; বিনা সংযোজনেও গঠন করিতে পারেন।

তৃতীয়তঃ কেতাবধারী বিশেষতঃ নাছারাগণকে খাঁটী তৌহিদ ও একত্ববাদের প্রতি আহবান জানানো হইয়াছে, যদ্দারা নাছারাগণ উপলব্ধি করিতে পারে যে, তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে একত্ববাদী নহে, বরং মোশরেক।

নাছারাগণ হযরত ঈসাকে খোদার বেটা বলা সত্বেও, অধিকন্তু হযরত ঈসা এবং তাহার মাতাকে তিন খোদার দুই খোদা বলা সত্বেও, মুয়াহ্‌হেদ বা একত্ববাদী হওয়ার দাবী করিয়া থাকে। এস্থলে তাহাদের সেই দাবীকে অসার ও অবাস্তব সাব্যস্ত করতঃ আহবান জানান হইয়াছে যে, তোমরা মুখে মুখে যে একত্ববাদের দাবী কর কার্যস্থলে উহা প্রতীয়মান করার সৎ সাহস লইয়া অগ্রসর হও।

قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاۤءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ -

"হে কেতাবধারীগণ! যে বিষয়টি আমাদের ও তোমাদের মধ্যে ঐক্যমতপূর্ণ যে, আমরা এক আল্লাহ বিভিন্ন অন্য কাহারও এবাদত-উপাসনা করিব না, কোন জিনিসকে তাঁহার শরীক-সাথী সাব্যস্ত করিব না এবং মানুষ মানুষকে "রব" প্রভু বা রক্ষাকর্তা ত্রাণকর্তা, বিধানকর্তারূপে গ্রহণ করিব না (অর্থাৎ তৌহীদ ও একত্ববাদ, যে সম্পর্কে আমাদের ত স্থির সিদ্ধান্ত আছেই এবং তোমরাও উহার দাবী করিয়া থাক)– কার্যস্থলে বাস্তব ক্ষেত্রে এই সত্যকে প্রতীয়মান করিতে অগ্রসর হও।"

চতুর্থতঃ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মৃত্যুর দাবী করিয়াও বিপরীতমুখী ইহুদি-নাছারাগণ নানারূপ মিথ্যা ও আজগুবী উক্তি করিয়া থাকে, সেই সম্পর্কেও এই সূরায় মূল ঘটনার বর্ণনা আছে, যাহার বিস্তারিত বিবরণ সম্মুখে আসিবে।

উল্লিখিত আয়াত সমূহ নাযিল হইলে রসূলুল্লাহ (দঃ) প্রতিনিধি দলের নেতৃবৃন্দের সম্মুখে ঐসব দলীল-প্রমাণ ও বিষয়বস্তু ব্যক্ত করিলেন। তাহারা সম্পূর্ণরূপে নিরূত্তর হইল, তবুও ইসলাম গ্রহণে অগ্রসর হইল না। তখন রসুলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহ তায়ালার আদেশ মোতাবেক সর্বশেষ পন্থা অবলম্বন করতঃ তাহাদিগকে "মোবাহালাহ"-এর প্রতি আহবান জানাইলেন। "মোবাহালাহ" অর্থ কোন বিতর্কে অংশগ্রহণকারী উভয় পক্ষ এই রূপে দোয়া করিবে যে, হে আল্লাহ! আমাদের উভয় পক্ষের মধ্যে যে পক্ষ স্বীয় দাবীতে মিথ্যাবাদী সেই পক্ষের উপর তোমার অভিশাপ ও গজব পতিত হউক, সে পক্ষ তোমার গজবে ধ্বংস হইয়া যাউক।

উভয় পক্ষের মনোবল ও দৃঢ়তা যাচাই-এর উদ্দেশ্যে বিষয়টিকে অধিক জোরদার করার জন্য উভয় পক্ষের নিজ নিজ পরিবার পরিজনকেও এই বদ-দোয়ায় শামিল করা যাইতে পারে। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) নাজরান প্রতিনিধি দলকে এইরূপ চূড়ান্ত মুবাহালার প্রতিই আহবান করিয়াছিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার স্পষ্ট নির্দেশেই ঐরূপ করিয়াছিলেন– যাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে এই–

فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآئَنَا وَاَبْنَآئَكُمْ وَنِسَآئَنَا وَنِسَآئَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ـ

অর্থঃ (মারইয়্যাম-পুত্র ঈসা সম্পর্কে যে বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হইল– তাঁহার সম্পর্কে) ইহাই হইল বাস্তব তথ্য– প্রভু-পরওয়ারদেগারের বর্ণিত; অতএব এই সম্পর্কে দ্বিধাবোধের অবকাশ রাখিবেন না। অতপর ঈসা সম্পর্কে (এই সত্যের বিপরীত) যে কেহ আপনার সঙ্গে হঠকারিতা ও বৃথা তর্ক করে তাহাকে "বলুন, আস! আমরা (উভয়ে) আমাদের সন্তান-সন্তুতি, পরিবারবর্গকে নিজ নিজ সঙ্গে লইয়া একত্রিত হই এবং আল্লার দরবারে কায়মনোবাক্যে এই রূপ দোয়া করি যে, আল্লাহর লা'নত-অভিশাপ ও গজব হউক হকের বিরোধী মির্থ্যাবাদী পক্ষের উপর।"

মুসলিম শরীফের হাদীছে বর্ণিত আছে, এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম স্বীয় কলিজার টুকরা কন্যা ফাতেমাকে এবং তাঁহার স্বামী ও জামাতা আলী (রাঃ)-কে এবং পৌত্র হাছান ও হোছাইনকে (সহজ সুলভরূপে) ডাকিয়া একত্র করিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার দরবারে পেশ করতঃ বলিলেন, হে আল্লাহ! ইহারা আমার পরিজন। (অর্থাৎ মোবাহালাহ করার জন্য আমি ইহাদিগকে সঙ্গে রাখিব।)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (সঃ) ফাতেমা, আলী এবং হাছান ও হোছাইনকে সঙ্গে লইয়া মোবাহালাহ করার উদ্দেশ্যে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, আমি দোয়া করা আরম্ভ করিলে তোমরা আমীন বলিতে থাকিও। (রুহুল মায়ানী ২–১৮৮)

এইরূপে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) অগ্রগামী হইয়া মোবাহালার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা সম্পন্ন করা পূর্বক বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং প্রতিনিধি দলের প্রধানগণকে মোবাহালার জন্য অগ্রসর হইতে বলিলেন।

পবিত্র কোরআনের বর্ণনা সত্য। আল্লাহ বলিয়াছেন–

يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَ هُمْ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ ....

"কিতাবধারী আলেমগণ মুহাম্মাদ (সঃ) কে আল্লাহর রসূলরূপে সন্দেহাতীতরূপে চিনিয়া থাকে– যেরূপ তাহারা স্বীয় সন্তান-সন্ততিকে নিজ সন্তানরূপে চিনে, তবুও তাহাদের এক শ্রেণীর লোক জানিয়া শুনিয়া স ত্য গোপনে লিপ্ত আছে।" (পারা– ২, রুকু– ১)

নাজরান প্রতিনিধি দলের প্রধানগণও এই শ্রেণীরই ছিল, সুতরাং তাহারা আল্লাহর রসূলের বদ দোয়ার তলে আসিতে সাহসী হইল না। তাহারা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সমীপে আবেদন

করিল যে, আমরা এই সম্পর্কে চিন্তা ও পরামর্শ করিব এবং তিন দিনের অবকাশ চাহিয়া নিল। তাহাদের পরামর্শে ইহাই সাব্যস্ত হইল যে, মোবাহালায় অবতীর্ণ হইলে তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য, সুতরাং যে কোন বিনিময়েই হউক সন্ধি করিতেই হইবে।

অতপর তাহারা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া এই আবেদন করিল যে, আমরা মোবাহালায় অবতীর্ণ হইব না। আমরা আমাদের সমগ্র দেশসহ আপনার বাধ্যগত অধীনস্থ করদাতা রূপে থাকিব। হযরত (সঃ) তাহাদের আবেদন গ্রহণ করিলেন এবং রাষ্ট্রীয় কর হিসাবে বাৎসরিক ২০০০০ জোড়া কাপড়, ৩৩টি লৌহ বর্ম, ৩৩টি উট এবং ৩৪টি ঘোড়া তাহাদের উপর ধার্য করিয়া দিলেন (তফছীর রুহুল মায়ানী ২-৮৮)। এতদ্ভিন্ন ২০০০ "উকিয়া" তথা ৮০০০০ দেরহাম (প্রায় ২০০০০ টাকা) নগদও ধার্য করিয়াছিলেন (ফতহুল বারী ৮-৭৭)। হযরত (সঃ) তাহাদিগকে একটি নিরাপত্তা দান-পত্রও লিখিয়া দিয়াছিলেন, যাহার নকল সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস ভান্ডার ''তবকাতে-ইবনে ছা'য়াদ'' নামক কিতাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। (১-২৮৭।)

তাহারা হযরতের নিকট এই আবেদনও করিল যে, একজন বিশ্বস্ত লোক আমাদের উপর নিযোগ করিয়া দেন; যিনি আমাদের হইতে কর আনিবেন। হযরত (সঃ) আবু ওবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ (রাঃ)-কে মনোনীত করিলেন। বোখারী শরীফে নাজরান প্রতিনিধি দলের বিবরণ সম্পর্কে ২৬৯ পৃষ্ঠায় একটি পরিচ্ছেদ আছে তথায় এ সম্পর্কে নিম্নে বর্ণিত হাদীছটি আছে–

১৬৫৪। হাদীছ ঃ হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (আবদুল মছীহ ওরফে) আ'কেব এবং (আইহাম ওরফে) ছাইয়্যেদ নাজরানের এই প্রধানদ্বয় (সঙ্গীগণসহ) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইল।

(ঘটনা প্রবাহের মধ্যে তাহারা মোবাহালার সম্মুখীন হইয়া প্রথম অবস্থায় এইরূপ ভাব দেখাইল যেন) তাহারা হযরতের সঙ্গে মোবাহালাহ করিতে প্রস্তুত আছে। অতপর তাহাদের একজন অপরজনকে বলিল, খবরদার! এই ব্যক্তির সঙ্গে মোবাহালায় অবতীর্ণ হইও না। তিনি যদি সত্যই হইয়া থাকেন (যেরূপ আমাদের ধারণা) এবং আমরা তাহার সঙ্গে মোবাহালায় অবতীর্ণ হই তবে (নিশ্চয় আমাদের উপর তাঁহার অভিশাপ পতিত হইবে, ফলে) আমরা রেহাই পাইব না, এমনকি আমাদের বংশধরগণ পর্যন্ত রেহাই পাইবে না।

অবশেষে (মোবাহালায় অবতীর্ণ না হওয়া সাব্যস্ত করিয়া) তাহারা হযরতের নিকট এই আবেদন জানাইল যে, (আমরা মোবাহালাহ করিব না, আমরা আপনার আনুগত্য স্বীকার করিয়া নিলাম। সেমতে রাষ্ট্রীয় কর হিসাবে) আপনি আমাদের উপর যাহা ধার্য করিবেন আমরা তাহাই পরিশোধ করিব। আর আপনি আমাদের জন্য আপনার পক্ষ হইতে একজন বিশ্বস্ত লোক মনোনীত করিয়া দিন– বিশ্বস্ত নয় এমন লোক পাঠাইবেন না। হযরত ফরমাইলেন, নিশ্চয়ই বিশ্বস্ত লোকই পাঠাইব– পূর্ণ বিশ্বস্ত। (আল্লাহর রসূলের নিকট পূর্ণ বিশ্বস্তরূপে পরিচয় লাভের) এই সুযোগের প্রতি ছাহাবীগণ প্রত্যেকে তাকাইয়া রহিলেন। অতপর হযরত (সঃ) আবু ওবায়দা (রাঃ) কে এই পদে মনোনীত করিলেন। তিনি যখন যাত্রা করিবেন তখন হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁহার প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন, এই ব্যক্তি আমার উম্মতের মধ্যে বিশ্বস্ততায় বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

নাজরান প্রতিনিধি দলের সর্বশেষ খবর এই যে, তাহারা ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়া নিয়াছিল এবং ধার্যকৃত রাষ্ট্রীয় কর বরণ করতঃ হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতিনিধি ও তাঁহার নিরাপত্তাদানপত্র লইয়া দেশে চলিয়া গিয়াছিল। অল্পদিন পরেই প্রতিনিধি প্রধান– আবদুল মছীহ ওরফে আ'কেব এবং আইহাম ওরফে সাইয়েদ তাঁহারা পুনরায় হযরতের দরবারে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(ফতহুল বারী ৮–৭৭)

মো'জেযা পয়গাম্বরের জন্য আল্লারই দান

পূর্বেও বলা হইয়াছে যে, মো'জেযা কখনও নবীর নিজ ক্ষমতা বলে প্রদর্শিত হয় না, আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতেই নবীকে মো'জেযা দান করা হইয়া থাকে। নবীর নবুয়তকে সর্বসমক্ষে প্রমাণিত করার জন্য। সুতরাং মোজেযা যত বড়ই হউক না কেন উহার দ্বারা খোদার সমকক্ষ হওয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

এই সত্যটি যেন লোকদের খেয়াল হইতে মুহূর্তের জন্যও লুকায়িত না থাকে এবং এই ব্যাপারে যেন শয়তান লোকদিগকে প্রবঞ্চনায় ফেলিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে স্বয়ং হযরত ঈসা (আঃ) বিভিন্ন মো'জেযা প্রদর্শনের প্রতিমুহূর্তে এবং দমে দমে প্রত্যেকটি মো'জেযার ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে নুতনভাবে এই ঘোষণা দিতে রহিয়াছেন যে, এই অলৌকিক কার্যটি আমার হস্তে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার আদেশে এবং তাহার কুদরত বলেই সমাধা হইতেছে। হযরত ঈসা (আঃ) বার বার এটা ঘোষণার মারফত ঐ সত্যকেই উপলীব্ধ করাইয়াছেন যে, এই মো'জেযার মধ্যে আমার এমন কোন কৃতিত্ব নাই যদ্দারা আমার পক্ষে খোদার ন্যায় শক্তিমত্তা ও তাঁহার সমকক্ষতা প্রমাণিত হইতে পারি।

দুঃখের বিষয় নাছারা বা খৃস্টানগণ সেন্টপলের ন্যায় ইহুদী-জাত ছদ্মবেশী মোনাফেকের প্রবঞ্চনায় পতিত হইয়াছে, অথচ স্বয়ং ঈসা আলাইহিচ্ছালামের প্রচার ও ঘোষণাদি অতি সুস্পষ্ট ছিল। হযরত ঈসা আলাইহিচ্ছালামের ঐসব প্রচার ও ঘোষণা সমূহ আজও অকাট্য কোরআন মজিদের মারফৎ সারা বিশ্বের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে। বিভিন্ন মোজেযা সম্পর্কে হযরত ঈসার ঘোষণা কতই না সুস্পষ্ট ছিল।

اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ اَنِّىْ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِى الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ـ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِىْ بُيُوْتِكُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

আমি তোমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের পক্ষ হইতে (রসূল হওয়ার) দলিল প্রমাণ নিয়া আসিয়াছি– (১) আমি তোমাদের সম্মুখে কর্দম দ্বারা পাখীর আকৃতি বানাইয়া অতপর উহার মধ্যে ফুঁৎকার মারিব, ফলে উহা আল্লাহর আদেশে বাস্তবেই পাখী হইয়া যাইবে। (২) আর আমি জন্ম-অন্ধকে ভাল করিতে পারি। (৩) (দুরারোগ্য) কুষ্ঠরোগ ভাল করিতে পারি। (৪) এবং মৃতকে জীবিত করিতে পারি। এইসব আল্লাহর আদেশেই হইবে। (৫) আরও আমি বলিয়া দিতে পারি তোমরা নিজ নিজ বাড়ীতে যাহা খাইয়াছ এবং যাহা কিছু সঞ্চিত রাখিয়াছ। নিশ্চয়ই এই সবের মধ্যে (আমার রসূল হওয়ার) স্পষ্ট প্রমাণ তোমাদের জন্য রহিয়াছে যদি তোমরা ঈমান গ্রহণে ইচ্ছুক হও।* (পারা– ৩, রুকু– ১৩)

এতদ্ভিন্ন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাও এই ভ্রষ্ট নছারাহগণকেই শুনাইবার জন্য কেয়ামতের দিন হযরত ঈসা (আঃ)-কে ডাকিয়া যখন স্বীয় প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ স্মরণ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনি লোকদের মধ্যে

---

* হযরত ঈসার উল্লিখিত মো'জেযাসমূহ পবিত্র কোরআনে উল্লেখ হওয়ায় প্রবৃত্তির ধ্বজাধারী, নবীদের মো'জেযা অস্বীকারকারী পূর্ব সমালোচিত পন্ডিত সাহেব তথাকথিত তফছীরুল কোরআনে উল্লেখিত আয়াতসমূহে ভাঙ্গা-গড়া ও নানারূপে মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার সমাবেশপূর্বক গোজামিল দানের যে অভিনয় করিয়াছেন তাহা হইতে রক্ষা পাইবার দুইটি উপায় আছে। একটি হইল কোরআন-হাদীছের প্রগাঢ় জ্ঞান, আর একটি অকাট্য ঈমান।

হযরত ঈসার জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কেও উক্ত পন্ডিত স্বভাব ও প্রকৃতির লেজ ধরিয়া রহিয়াছেন এবং মারইয়্যামের সঙ্গে নাজ্জার নামক এক ব্যক্তির বিবাহ পড়াইয়া দিয়া তদ্দারা স্বাভাবিক রীতির মাধ্যমে হযরত ঈসার জন্ম কাহিনী গাথিয়াছেন। এক কথায় তিনি আল্লাহ তায়ালাকেও স্বাভাবিক নিয়মের বাহিরে যাইতে দিতে রাজী নহেন।

এই ব্যাপারে তিনি খৃস্টানী বাইবেলের কিছু তথ্য গ্রহণ করিয়া পরে বাইবেলকেও মাত করিয়া দিয়াছেন। বাইবেলে যোশেফের (ইউসুফ) সঙ্গে মরয়্যামের বিবাহ কাহিনী আছে, কিন্তু মরয়্যাম গর্ভে হযরত ঈসার জন্ম যোশেফ বা কোন পুরুষের স্পর্শনে হইয়াছে– এইরূপ ধারণাকে বাইবেলও খন্ডন করিয়াছে। (মথি ২য় পৃষ্ঠা–প্রভু যিশুর জন্ম বিবরণ দ্রষ্টব্য)

পন্ডিত সাহেবের ঈমান ও ইসলাম বিরোধী মতামতের বিতর্কে সময় অপচয়ে উৎসাহ হয় না; অতি ছোট একটি উজ্জল যুক্তির উপরই এই আলোচনা ক্ষান্ত করিতে চাই।

(অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

খোদায়ী দাবীর প্রচার করিয়াছিলেন কি? (এই প্রশ্নোত্তরের পূর্ব বিবরণ পারা- ৭, রুকু- ৬ -এর আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) তখনও আল্লাহ তায়ালা প্রথমে স্বয়ং ঈসা (আঃ)-কে সম্বোধনপূর্বক বলিবেন যে, আপনি এই, এই মো'জেযা দেখাইয়াছিলেন- এইসব একমাত্র আমারই আদেশে সংঘটিত হইয়াছিল। সুতরাং এইসব মো'জেযার দ্বারা আপনার খোদায়ী কিরূপে প্রমাণিত হইতে পারে? বিশ্ববাসীর অবগতির জন্য কেয়ামতের দিনের সেই বিবরণীর বর্ণনাও পবিত্র কোরআনে প্রদত্ত হইয়াছে।

اذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِىْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ - اذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ - تُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلاً - وَاذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ - وَاذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِىْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا -

কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা রসূলগণকে তাহাদের উম্মতের ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন। সেই দিনের একটি স্মরণীয় ঘটনা- আল্লাহ বলিবেন, হে মারইয়্যাম-পুত্র ঈসা! স্মরণ কর, আমি যেসব নেয়ামত দান করিয়াছিলাম তোমাকে এবং তোমার মাতাকে- যখন তোমার সাহায্য করিয়াছিলাম জিব্রাঈল ফেরেশতা দ্বারা। তুমি (আমার কুদরতে) নবজাত শিশু এবং বয়স্ক উভয় অবস্থায় একই ধরনের কথা বলিতে সক্ষম ছিলে এবং আমি তোমাকে আসমানী কেতাবের ও সূক্ষ্ম বিষয়াবলীর বিশেষতঃ তৌরাত ও ইঞ্জিলের জ্ঞান দান করিয়াছিলাম এবং তুমি কর্দম দ্বারা পাখীর আকৃতি তৈরী করিতে আমার আদেশে; তারপর ঐ মাটির (তৈরী আকৃতিতে শুধু) ফুৎকার মারিতে,

فَتَكُوْنَ طَيْرًا بِاِذْنِىْ - وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِىْ - وَاذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِىْ -

ফলে উহা হইয়া যাইত বাস্তব পাখী আমার আদেশে। এবং তুমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে ভাল করিতে সক্ষম হইতে আমার হুকুমে এবং মৃতকে (জীবিত করিয়া কবর হইতে) তুমি বাহির করিতে আমারই হুকুমে।

(পারা- ৭, রুকু- ৫)

আসমান হইতে খাদ্য লাভের মো'জেযা

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের একটি বিশেষ মো'জেযা- একদা তাঁহার বিশেষ অনুগত "হাওয়ারী" নামে আখ্যায়িত একদল লোক তাঁহার নিকট আগ্রহ প্রকাশ করিল যে, আল্লাহ তায়ালা আপনার জন্য প্রকাশ্য মো'জেযা স্বরূপ যদি আসমান হইতে আমাদের জন্য তৈরী খানা পাঠাইয়া দিতেন।

মো'জেযার জন্য নবীকে ফরমাইশ করার পরিণাম ভাল হয় না বলিয়া হযরত ঈসা (আঃ) তাহাদিগকে সতর্ক করিলেন। তাহারা আরজ করিল, আমাদের উদ্দেশ্য শুধু এতটুকু যে, ঐরূপ খানা খাইয়া আমরা বরকত হাসিল করিব এবং এইরূপ প্রত্যক্ষ মো'জেযা দৃষ্টে আমাদের ঈমানের মজবুতী বাড়িয়া যাইবে এবং আমরা লোকদিগকে বলিতে পারিব যে, এইরূপ স্পষ্ট মো'জেযা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

বস্তুতঃই যদি ইউসফের সঙ্গে মরয়্যামের বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়া যথারীতি তাহার স্পর্শনে হযরত ঈসার জন্ম হইয়া থাকিত তবে ইহুদীদের অপবাদ ও নাছারাদের অতিরঞ্জনের খন্ডনে পবিত্র কোরআন যেসব দীর্ঘ ইতিহাস আলোচনার এবং আল্লাহ তায়ালার সর্বশক্তিমত্তা স্মরণ করাইবার এবং আদমের সৃষ্টি বৃত্তান্তের তুলনা উল্লেখের যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে সেই ভূমিকা গ্রহণ শুধু নিরর্থকই নয় বরং অহেতুক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সব কিছুর প্রতিবাদে শুধু এতটুকু প্রকাশ করিয়া দেওয়াই যথেষ্ট ছিল যে, বৈধ সম্পর্কীয় পিতা-মাতা ইউসুফ ও মরয়্যামের ওরসে ঈসা জন্মলাভ করিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় হযরত ঈসা ও মারইয়্যাম সম্পর্কে এত এত দীর্ঘ বিবৃতি কোরআনে ব্যক্ত হইল; কিন্তু বিশ্বজোড়া বিতর্কের মূলোচ্ছেদকারী ইউসুফের সঙ্গে মারইয়্যামের শুভ-পরিণয়ের খবরটা কোথাও করা হইল না! আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কোরআনের প্রায় শত শত স্থানে عيسى بن مريم মায়্যাম-পুত্র ঈসা, মারয়্যাম-পুত্র ঈসা বলা হইল; কোন এক স্থানেও ইউসুফ-পুত্র ঈসা বলা হইল না। عيسى بن مريم

তদুপুরি ঐতিহাসিক নাজরান প্রতিনিধি দলের প্রশ্ন, যে হযরত ঈসা খোদার বেটা না হইয়া থাকিলে তাঁহার পিতা কে? এই প্রশ্নের উত্তরে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) নানারূপে দীর্ঘ বিষয়াবলী, এমনকি সর্বশেষ চূড়ান্ত পন্থারূপে মোবাহালার পথ অবলম্বন করিলেন, (বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে) একবারও উক্ত প্রশ্নের সহজ উত্তরটা মুখেও আনিলেন না যে, তাঁহার পিতা ছিলেন ইউসুফ নাজ্জার। এইসব তথ্য দৃষ্টে হযরত ঈসা ইউসুফের পুত্র হওয়া সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সুধি পাঠকবর্গের উপরই ন্যস্ত রহিল।

হযরত ঈসা (আঃ) যখন তাহাদের উদ্দেশ্য খারাপ নয় দেখিলেন; তখন তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করিলেন। আল্লাহ তায়ালা দোআ কবুল করিলেন এবং তাহাদিগকে সতর্কবাণীও শুনাইলেন যে, অতপর যদি তোমাদের কেহ এই মো'জেযার পূর্ণ হক আদায় না করিয়া বিপথগামী হয় তবে আমি তাহাকে ভীষণ শাস্তি প্রদান করিব।

মোফাচ্ছেরগণ লিখিয়াছেন, আল্লাহর কুদরতে ফেরেশতাগণ মারফত আসমান হইতে তৈরী রুটি ও গোশত ভর্তি খাঞ্চা তাহাদের সম্মুখে অবতীর্ণ হইল।

তিরমিযী শরীফে একখানা হাদীছ বর্ণিত আছে, আসমান হইতে তাহাদের জন্য তৈরী খানা– রুটি গোশত অবতীর্ণ হইল এবং তাহাদের প্রতি এই নির্দেশও আসিল যে, ইহা হইতে তৃপ্তিপূর্ণ পরিমাণ খাইতে পারিবে, কিন্তু আগামী দিনের জন্য রাখিয়া দিবে না। তাহাদের অনেকে এই আদেশ লঙ্ঘন করিয়া আল্লাহর গযবে পতিত হইল; আকৃতি মছ্খ্ হইয়া তাহারা বাঁদর ও শূকরের আকৃতিতে পরিণত হইয়া গেল। ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ–

اِذْ قَالَتِ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ـ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

একটি স্মরণীয় ঘটনা– যখন হাওয়ারিগণ বলিয়াছিল, হে মারইয়্যাম পুত্র ঈসা পয়গম্বর! ইহা কি সম্ভব যে, প্রভু পরওয়ারদেগার আপনার অছিলায় আমাদের প্রতি আসমান হইতে তৈরী খানা পাঠাইয়া দেন? ঈসা (আঃ) বলিলেন, (মোজেযার ফরমাইশ করিও না) আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা খাঁটি মোমেন হইয়া থাক।

قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ـ

হাওয়ারিগণ আরজ করিল, আমাদের উদ্দেশ্য শুধু এতটুকু যে, (বরকতের জন্য) আমরা ঐরূপ খানা খাইব এবং আপনার প্রতি যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি উহা আরও দৃঢ় হইবে এবং প্রকাশ্য ঘটনায় দেখিয়া নিব, আপনি (নবী হওয়ার দাবীতে) সম্পূর্ণ সত্য এবং (অন্যদের জন্য) আমরা আপনার সত্যতার প্রমাণ স্বচক্ষে অবলোকনকারী সাক্ষী হইব।

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ـ

ঈসা (আঃ) দোয়া করিলেন, হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রভু! আমাদের প্রতি আসমান হইতে তৈরী খানার খাঞ্চা অবতীর্ণ করুন যাহা আমাদের বর্তমান ও পরবর্তী সকলের জন্যই বিশেষ আনন্দের কারণ হইবে এবং আপনার পক্ষ হইতে আমার সত্যতার বিশেষ নিদর্শন হইবে। এবং আপনার পক্ষ হইতে আমাদের জন্য বিশেষ রিজিক স্বরূপও উহা দান করুন; আপনি ত সর্বোত্তম দাতা।

قَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّيْ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّآ اُعَذِّبُهٗ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ـ

আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, আমি উহা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করিব, কিন্তু অতপর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিআমার আনুগত্যহীনতার পরিচয় দিবে তাহাকে আমি এমন কঠোর শাস্তি প্রদান করিব, যাহা (সাধারণতঃ) জগতের কাহাকেও প্রদান করি না। (পারা–৫, রুকু–৭)

হযরত ঈসা কর্তৃক মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সুসংবাদ প্রচার

হযরত ঈসা (আঃ) তাঁহার পরবর্তী সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা আহমদ মোজতবা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সম্পর্কে শুধু সুসংবাদই দান করিয়াছিলেন না, বরং তিনি তাঁহার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ও সুসংবাদ বহনকে স্বীয় নবুয়তের একটি বিশেষ দায়িত্বরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে স্বয়ং হযরত ঈসার ঘোষণা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত রহিয়াছে।

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِ اسْمُهٗ اَحْمَدُ ـ

তখনকার ঘটনা স্মরণ কর, যখন মারইয়্যাম-পুত্র ঈসা বলিয়াছিলেন, হে বনী-ইস্রাঈলগণ! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার রসূল ও আমার পূর্ববতী তওরাত কিতাবের সমর্থনকারী এবং আমার পরে "আহমাদ" নামীয় এক রসূল আসিবেন তাঁহার সুসংবাদ বহনকারী হইয়া আসিয়াছি। (সূর ছফ, পারা-২৮ পাঃ)

১৬৪৬। হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রসূল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাহি অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি- তিনি বলিয়াছেন, আমি (নবীগণের মধ্যে) সর্বাধিক নিকটবর্তী হইলাম মারয়্যাম-পুত্র ঈসার- দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও; আমাদের উভয়ের মধ্যে অন্য নবীর আবির্ভাব হয় নাই। নবীগণের পরস্পর সম্পর্ক ঐ ভ্রাতৃবৃন্দের সম্পর্কের ন্যায় যাহাদের পিতা একজন এবং মাতা ভিন্ন ভিন্ন। (সকল নবীগণের প্রচারিত দ্বীন ও ধর্মের মূল একই; বিভিন্নতা শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির মধ্যে।)

ব্যাখ্যা ঃ আমাদের পয়গম্বর হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) ইহকালে হযরত ঈসার সর্বাধিক নিকটবর্তী ছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কধারীও ছিলেন। নিকটবর্তীতা তো সুস্পষ্ট, কারণ তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কোন নবী আসেন নাই। বিশেষ সম্পর্ক এই সূত্রে যে, ঈসা (আঃ) যে নবীর আগমনের সুসংবাদ বিশ্ববাসীকে শুনাইয়াছিলেন সেই নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-ই ছিলেন। পরকালেও তাঁহাদের উভয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হইবে। বিশ্ববাসী সকলে যখন কেয়ামতের মাঠে ভীষণ কষ্ট-যাতনা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শাফায়াতের উদ্দেশ্যে আদম (আঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন নবীগণের শরণাপন্ন হইবে এবং এক এক নবী নিজের অক্ষমতা প্রকাশ পূর্বক অন্য নবীর নাম পেশ করিবেন তখন সর্বশেষে ঈসা (আঃ) হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নাম প্রস্তাব করিবেন। হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) কোন ওজর আপত্তি না করিয়া শাফায়া'তের জন্য অগ্রসর হইবেন।

হযরত ঈসার জাগতিক জীবনের শেষ বৃত্তান্ত

হযরত ঈসার জন্ম বৃত্তান্তকে কেন্দ্র করিয়া যেরূপ ইহুদীরা অপবাদের ঝড় তুলিয়াছিল এবং নাছারারা অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জনের আশ্রয় লইয়াছিল, তদ্রূপ হযরত ঈসার ইহজগত ত্যাগের বিষয়টি লইয়াও ইহুদীরা নানারূপ অপবাদ গাড়িয়াছে যে, তাহারা হযরত ঈসাকে বন্দী করিয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছিল এবং ভীষণ লাঞ্ছিত ও অপমানিতরূপে শূলিবিদ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছিল, সুতরাং তাঁহার মৃত্যু অপমৃত্যু ছিল। নাছারারা মূল বিষয় হইতে অজ্ঞ ও দুর্বলচেতারূপে ইহুদীদের সমস্ত অপবাদ নতশিরে বরণ করতঃ এই বলিয়া মুখ রক্ষার চেষ্টা করিয়াছে যে, হযরত ঈসা ঐ দুঃখ-যাতনায় মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি স্বীয় পিতার নিকট হইতে লোকদের পাপ ক্ষমা করাইবার উদ্দেশ্যে ঐরূপ মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার মৃত্যু অপমৃত্যু ছিল না।

এস্থলেও ইসলাম ইহুদ-নাছারাদের মিথ্যা প্রচারণাকে পণ্ড করিয়াছে এবং বাস্তব ঘটনা প্রকাশ পূর্বক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বাস্তব ঘটনা এই যে, কস্মিনকালেও হযরত ঈসা (আঃ) ইহুদীদের হস্তে শূলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন নাই।

ঈসা (আঃ) ইহুদীদের হস্তে শূলিবিদ্ধরূপে নিহত না হইয়া তাঁহার সর্বশেষ অবস্থা কি হইয়াছিল, সে সম্পর্কে সরাসরি পবিত্র কোরআনের ঘোষণা লক্ষ্য করুন।

وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ـ مَالَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعُ الظَّنِّ ـ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ـ بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ـ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ـ

(ইহুদীরা যেসব কারণে অভিশপ্ত ও গজবে পতিত হইয়াছিল ঐ সবের মধ্যে একটি অন্যতম কারণ ইহাও ছিল যে,) তাহারা মিথ্যা দাবী করিত– আমরা মারইয়্যাম-পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করিয়াছি; যিনি ছিলেন আল্লাহর রসূল। অথচ তাহারা তাঁহাকে (কোন প্রকারে) হত্যা করিতেও পারে নাই এবং শূলিবিদ্ধও করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ তাহারা এই ব্যাপার গোলক-ধাঁধায় পতিত ছিল। নিশ্চয় যাহারা এই ব্যাপারে ভিন্ন মত (তথা হত্যা বা শূলিবিদ্ধ করার মত) পোষণকারী হইয়াছে তাহারা এই ব্যাপারে শুধু একটা সন্দেহের মধ্যে আছে– শুধুমাত্র ধারণা ও অনুমানের উপর চলিয়াছে; এই ব্যাপারে তাহাদের নিকট সত্য এবং বাস্তবের কোন জ্ঞান মোটেই নাই। অকাট্য ও নির্ভুল খবর ইহাই যে, তাহারা ঈসাকে হত্যা করিতে পারে নাই, বরং আল্লাহ তাঁহাকে নিজের প্রতি* উঠাইয়া নিয়াছিলেন। আল্লাহ ত সর্বশক্তিমান অতিশয় হেকমতওয়ালা সুকৌশলী।
(পারা– ৬, রুকু– ২)

উল্লিখিত বিবৃতির বিবরণে একদল ঐতিহাসিক তফছীরকারের মত এই যে, ইহুদীরা হযরত ঈসার বিরুদ্ধে তৌরাতকে লংঘন করা এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করার অভিযোগ আনয়ন করিল। এইরূপে ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় উভয় অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার প্রাণদন্ডের আদেশ রাজশক্তির তরফ হইতে জারি করাইল এবং তথাকার তৎকালীন রীতি অনুযায়ী শূলিবিদ্ধ করিয়া প্রাণদন্ড দানের জন্য ইহুদীরা হযরত ঈসাকে গ্রেফতার ও বন্দী করিয়া শূলে চড়াইবার মনস্ত করিল। ইতিমধ্যে আল্লাহ তাঁহাকে বাঁচাইয়া নিলেন, শত্রুরা অপর একটি লোককে ঈসা মনে করিয়া তাহাকে শূলিবিদ্ধ করিয়া মারিল।

অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও তফছীরকারগণের মতে ঘটনা এই যে, ঈসা (আঃ) যখন ইহুদীদের শত্রুতা ও ষড়যন্ত্রে স্বীয় জীবন সম্পর্কে নিরাশ হইয়া পড়িলেন– তখন তিনি তাঁহার বিশেষ ছাহাবী বা শিষ্য– হাওয়ারীগণকে আবদ্ধ ঘরে একত্রিত করিয়া তাঁহার পরেও আল্লাহর দ্বীনকে জারি রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালাইয়া যাইতে বিশেষরূপে উদ্বুদ্ধ করিলেন, যাহার ইঙ্গিত পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে।–

فَلَمَّا اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْ اِلَى اللّٰهِ .... ـ

ঈসা (আঃ) যখন ইহুদীদের তরফ হইতে পূর্ণ বিদোহীতা অনুভব করিলেসন, এমনকি স্বীয় জীবন হইতেও নিরাশ হইয়া পড়িলেন) তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে আমার সাহায্যকারী কে আছে?

* আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসাকে নিজের প্রতি উঠাইয়া নিয়াছেন; "আল্লাহর প্রতি" বলিতে "উর্ধ্ব জগত বা আসমান" উদ্দেশ্য। প্রত্যেক ভাষায়ই এই ধরনের ব্যবহার আছে। মক্কা শহরে কা'বা ঘরে আল্লাহ তায়ালা অবস্থান করেন না, কিন্তু মক্কা নগরীকে بلد الله আল্লাহর শহর; কা'বাকে بيت الله আল্লার ঘর" বলা হয়। যেহেতু ঐ ঘরটি এবং উহার মাধ্যমে ঐ শহরটির বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে।

তদ্রূপ উর্ধ্ব জগতেই আল্লাহ তায়ালার সেরা সৃষ্টি এবং বিশাল কুদরতের করখানা সমূহের সমাবেশ। সেখানেই মহান আরশ, কুরছী, লাওহে-মাহফুজ, ছেদরাতুল-মোন্‌তাহা বিদ্যমান। সেখানেই আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট জগতের পরিচালক বাহিনী ফেরেশতা জাতির অবস্থান; তথা হইতেই বিশ্ব জগতের পরিচালন কার্যবিধি সরবরাহ করা হয়– এই সূত্রেই কা'বাকে আল্লাহর ঘর বলার ন্যায় ঊর্ধ্ব জগতের দিকে আল্লাহর দিক বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে।

হাওয়ারীগণ উত্তর করিল, "আমরা সকলেই আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারীরূপে প্রস্তুত হইয়া রহিলাম।"

ঈসা (আঃ) আবদ্ধ ঘরে শিষ্যগণকে লইয়া কথোপকথনে রত ছিলেন এই সুযোগে তাঁহার প্রাণঘাতীরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া আনিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইল এবং ঘরটিকে ঘেরাও করিয়া তাহাদের একজন প্রথম ঐ ঘরে প্রবেশ করিল। তখন আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কুদরত বলে হযরত ঈসাকে তথা হইতে সরাইয়া নিলেন এবং ঐ ঘরে প্রবেশকারী লোকটির উপর বা অন্য কোন একজনের উপর হযরত ঈসার আকৃতির ছায়া পড়িয়া গেল। যে ব্যক্তির উপর হযরত ঈসার রূপ পড়িয়াছিল শত্রুরা তাহাকেই ঈসা মনে করিয়া শূলদন্ড দিল।

ইহুদীরা হযরত ঈসাকে গ্রেফতার ও বন্দী করিতে পারিয়াছিল এই মতবাদ পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট পরিপন্থী। পবিত্র কোরআনের বিবৃতি এই–

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ـ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ـ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ـ

শত্রুদল ঈসাকে মারিয়া ফেলার গোপন ব্যবস্থা আঁটিল, আল্লাহ তাঁহাকে রক্ষা করার গোপন ব্যবস্থা করিলেন এবং আল্লাহ হইলেন সর্বোত্তম ব্যবস্থাপক। আল্লাহ (ঈসা (আঃ) কে শত্রুদের হইতে অভয় দানে) বলিয়াছিলেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে পুরাপুরি (অর্থাৎ তোমার আত্মা ও দেহের সমষ্টি ভূপৃষ্ঠ হইতে) লইয়া যাইব * এবং আমার প্রতি উঠাইয়া নিব এবং তোমাকে পাক-পবিত্র রাখিব তোমার অমান্যকারীদের হাত হইতে। (পারা–৩, রুকু– ১৪)

উক্ত বিবরণের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, শত্রুদলের নাপাক হাত হযরত ঈসাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। এতদ্ভিন্ন আল্লাহ তায়ালার গোপন ব্যবস্থার এবং তাঁহার সর্বোত্তম ব্যবস্থাপক হওয়ার স্বার্থকতা ও এই দাবী করে যে, ইহুদী শত্রুদলের স্পর্শন হইতে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত ছিলেন।

ইতিহাস ভান্ডারে নজর করিলে অনেক অনেক ঘটনাই এইরূপ পাওয়া যায় যাহার বিস্তারিত তফছীল বর্ণনায় ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন মত থাকে। সেই মতভেদ দেখিয়া মূল ঘটনাকে অস্বীকার করা বোকামী বৈ কি হইতে পারে?

আলোচ্য বিষয়টিও তদ্রূপ; উহার বিস্তারিত তফছীল রূপায়নের ঐতিহাসিক ও তফছীরকারগণের বিভিন্ন মত আছে; সেই বিভিন্নতার ছুতা ধরিয়া মূল ঘটনাকে অস্বীকার করা যায় না যাহা পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা যে وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم "ইহুদীরা ঈসাকে হত্যা করিতে পারে নাই, শূলিবিদ্ধও করিতে পারে নাই, বস্তুতঃ তাহারা গোলক-ধাঁধায় পড়িয়াছিল।"

* متوفيك শব্দের তফছীর কেহ কেহ এইরূপও করিয়াছেন যে, আমি তোমাকে মৃত্যু দান করিব, অর্থাৎ শত্রুদল তোমাকে হত্যা করিতে চাহিতেছে, কিন্তু তাহারা তা করিতে সক্ষম হইবে না। কারণ, নির্ধারিত সময়ে স্বাভাবিকরূপে তোমার মৃত্যু ঘটাইব আমি; শত্রুদল সেই সময়ের পূর্বেই তোমাকে হত্যা করিতে চাহিতেছে, কিন্তু সেই প্রয়াস তাহারা পাইবে না। হযরত ঈসার স্বাভাবিক মৃত্যুর নির্ধারিত সময় হইল কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ভূপৃষ্ঠে তাঁহার অবতরণের দীর্ঘকাল পর– যাহার বিস্তারিত বিবরণ অনেক অনেক হাদীছে বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা متوفيك শব্দের যে তফছীর করিলাম তাহার বিস্তারিত বিবরণ ও দলিল প্রমাণ সম্মুখে "প্রশ্ন ও উত্তর" আলোচনায় দেখিতে পাইবেন।

ইসলাম হযরত ঈসার মর্যাদাকে কত নির্মলরূপে প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছে! পক্ষান্তরে খৃষ্টান জাতি হযরত ঈসাকে একদিকে খোদা বা খোদার বেটা পর্যন্ত পৌঁছাইয়াছে, অপরদিকে এতদূর নিম্নস্তরে ফেলিয়াছে যে, তাহারা বলে, ইহুদীরা তাঁহাকে বন্দী করিয়াছিল, তাঁহার গায়ে থু থু দিয়াছিল, তাঁহাকে মারপিট করিয়াছিল, তাঁহাকে উলঙ্গ করিয়াছিল,তাঁহার মাথায় কাঁটার টোপ পরাইয়া তাঁহাকে শূলে চড়াইয়াছিল এবং তিনি চিৎকার করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। ভ্রষ্ট খৃষ্টানদের এই সব আকীদা সম্পর্কে তাহাদের গর্হিত বাইবেলের উদ্ধৃতি লক্ষ্য করুন– "আর যে লোকেরা যীশুকে ধরিয়াছিল তাহারা তাঁহাকে বিদ্রূপ ও প্রহার করিতে লাগিল" (বাইবেল– লুক ১৫১)। "যীশুকে ক্রুশে দিবার পর সেনারা তাঁহার বস্ত্র সকল লইয়া চারি অংশ করিয়া প্রত্যেক সেনাকে এক এক অংশ দিল।" (বাইবেল– যোহন ১৯৯) "এবং কাটার মুকুট গাথিয়া তাঁহার মাথায় দিল, আর তাঁহার মস্তকে নল দ্বারা আঘাত করিল, তাঁহার গায়ে থু থু দিল" (বাইবেল-মার্ক ৯২) "আর নয় ঘটিকার সময়ে যীশু উচ্চঃস্বরে চীকার করিয়া ডাকিয়া কহিলেন, "এলী লামা শবক্তানী" অর্থাৎ ঈশ্বর আমার! তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ?" (বাইবেল– মথি ৫৬)।

আল্লাহ তায়ালা হযরত ইসাকে ইহুদীদের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন; কি ব্যবস্থায় রক্ষা করিয়াছিলেন সে সম্পর্কে এবং হযরত ঈসার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে ইসলামের সোনালী যুগ ইহতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী প্রত্যেক যুগের কোরআন-হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের সিদ্ধান্ত ও আকীদা এই যে, আল্লাহ তায়ালা স্বয় কুদরত বলে হযরত ঈসাকে সশরীরে, জীবতাবস্থায় ভূপৃষ্ঠ হইতে আসমানে উঠাইয়া নিয়াছিলেন এবং তিনি তথায় অবস্থান রত আছেন। কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে তিনি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শরীয়তের অওতাভুক্তরূপে আসমান হইতে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করিবেন এবং সুদীর্ঘ কাল ভূপৃষ্ঠে অবস্থানের পর তাঁহার সাধারণ ও স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিবে এবং তিনি সাধারণ রীতি অনুসারে পবিত্র মদিনার ভূমিতে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের রওজা সংলগ্ন স্থানে সমাহিত হইবেন। এই মতবাদ ও আকীদার প্রতিটি অংশের দলিল প্রমাণ লক্ষ্য করুন–

হযরত ঈসাকে আসমানে উঠাইয়া লওয়া প্রসঙ্গ

পূর্বেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে, হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) হইতে সরাসরি শিক্ষা লাভকারী ছাহাবীগণের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক যুগের ইমাম-মোজতাহেদ, কোরআন-হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের আকীদা ইহাই যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসা (আঃ) কে সশরীরে জীবতাবস্থায় আসমানে উঠাইয়া নিয়াছেন।* এই বিষয়ে সকলের একমত হওয়াকেই তফছীরকারগণ হযরত ঈসাকে আসমানে উঠাইয়া নেওয়ার দলিল স্বরূপ "ছলফে-ছালেহীনের এজ্‌মা" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। "ছলফে-ছালেহীন" অর্থ পূর্ববর্তী সৎ সাধু নির্ভরযোগ্য ওলামা-মাশায়েখ ইসলাম বিশেষজ্ঞগণ, আর "এজ্‌মা" অর্থ ঐক্যমতপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

এতদ্ভিন্ন এই বিষয়ের আর একটি দলিল হইল পূর্বালোচিত পারা– ৬, রুকু– ১ সূরা নেছার আয়াত। ঐ আয়াতের একটি বাক্য বিশেষ লক্ষ্যণীয়–وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه "ইহা একটি বাস্তব, অকাট্য ও নির্ভুল তথ্য যে, ইহুদীগণ হযরত ঈসাকে হত্যা করিতে সমর্থ হয় নাই, বরং আল্লাহ ঈসাকে নিজের

---

* বহু সমালোচিত পন্ডিত তফছীরকার যিনি কোন নবীর পক্ষে মো'জেযা তথা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা স্বীকার করিতে রাজী ছিলেন না, এস্থলে দেখা যায় তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার পক্ষেও কোন অস্বাভাবিক ঘটনা স্বীকার করিয়া নিতে রাজি নহেন।

এস্থলে পন্ডিত মিয়া হযরত ঈসাকে জীবন্ত আসমানে উঠাইয়া নেওয়ার ঘটনাকে অস্বীকার করতঃ ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে, হযরত ঈসার স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু ঘটিয়াছিল। এ সম্পর্কে পাঠকবর্গের সম্মুখে একটি বিষয় না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। হযরত ঈসার যুগ হইল ইতিহাসের যুগ, এখন হইতে মাত্র দুই হাজার বৎসরেরও কম অতীতের যুগ। যেখানে দেড় হাজার বৎসর পূর্বের নবী হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সমাধিস্থল এবং উহার শহর পবিত্র মদীনা এত জাকজমকপূর্ণরূপে বিদ্যমান সেখানে দুই হাজার বৎসর পূর্বের নবী হযরত ঈসা আলাইহিচ্ছালামের সমাধিস্থলের কোন খোঁজ ইতিহাসে পাওয়া না যাওয়া আশ্চর্যজনক নয় কি? বিশেষতঃ হযরত ঈসার উম্মত হওয়ার দাবীদার বর্তমান বৃহৎ ও উন্নত জাতি খৃষ্টানগণের সকল রকম সুযোগ ও সামর্থ থাকা সত্বেও তাহাদের নবীর সমাধি স্থলের কোন নাম-নিশানা বাস্তবে বা ইতিহাসে বিদ্যমান না থাকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ নয় কি?

চতুর পন্ডিত সাহেব যিনি নিজকে ইতিহাস ও ভূগোলের বড় একজন অভিজ্ঞ মনে করিয়া থাকেন তিনি মাত্র দুই হাজার বৎসর পূর্বের একজন মহা মানবের এত বড় একটা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া নিলেন, অথচ ভৌগলিক বা ঐতিহাসিক কোন প্রমাণ পেশ করিলেন না– ইহা তাহার পক্ষে কলঙ্কের বিষয় হওয়া সত্বেও সেই দিকে তিনি অগ্রসর হন নাই। কারণ, ভূগোল ও ইতিহাস ক্ষেত্রে কোন মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করা হইলে তাহা সহজেই লোক চোখে ধরা পড়িয়া যাইবে, তাই এ ধরনের বিষয়ের সহজ ও সরল প্রমাণ ইতিহাস ও ভূগোলকে বাদ দিয়া তিনি বলিয়াছেন, পাঠকগণকে অতি সংক্ষেপে এইটুকু জানাইয়া রাখিতেছি যে, বিভিন্ন বিশিষ্ট আলেম ও ইমামের সমর্থন আমার পক্ষে আছে।" অতপর পন্ডিত সাহেব চার জনের মতামতের উদ্ধৃতি প্রদান করিয়াছেন। তন্মোধ্যে তিন জনের বক্তব্যই পন্ডিত সাহেবের মূল দাবীর সহিত সঙ্গতিবিহীন। সেই তিন জন হইলেন (১) ইবনে হাজম, (২) ছাহাবী ইবনে আব্বাছ, (৩) শাহ অলিউল্লাহ। স্বয়ং পন্ডিত সাহেব এই তিন জনের বক্তব্যের যে উদ্ধৃতি দিয়াছেন তাহাতেই দেখা যায় যে; তাঁহারা আলোচ্য বিষয় তথা হযরত ঈসার মৃত্যু ঘটিয়া গিয়াছে কিনা সে সম্পর্কে কিছু বলেন নাই, বরং পবিত্র কোরআনে হযরত ঈসার ঘটনায় এক স্থানে انى متوفيك এবং আর এক স্থানে কেয়ামতের দিনে হযরত ঈসার একটি উক্তির বিবরণ দানে توفيتنى শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। উক্ত শব্দদ্বয়ের তফছীর সম্পর্কে তফছীরকারদের বিভিন্ন মত আছে; একদল তফছীরকার (অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রতি উঠাইয়া নিয়াছিলেন" হযরত ঈসাকে হত্যা করার দাবীর প্রতিকূলে আল্লাহ কর্তৃক উঠাইয়া নেওয়ার ঘোষণা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

এই সম্পর্কে তৃতীয় দলিল হইল কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হযরত ঈসার ভূপৃষ্ঠে অবতরণ। সে সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) একটি বিশেষ পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন, সম্মুখে উহার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হইবে। এ স্থলে একটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, ভূপৃষ্ঠে হযরত ঈসার অবতরণ সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত আছে এবং হাদীছের মধ্যেই ينزل শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে যাহা نزول শব্দ হইতে গৃহীত এবং উহার একমাত্র অর্থ অবতরণ করা, সুতরাং যদি বলা হয় যে, হযরত ঈসার মৃত্যু হইয়া গিয়াছে তাঁহাকে ইহজগতে পুনঃ জীবিত করিয়া উঠান হইবে; ইহাও উক্ত হাদীছ সমূহের পরিপন্থী হইবে। কারণ, মৃতকে জীবিত করিয়া উঠান হইলে সে ক্ষেত্রে "অবতরণ করিবেন" বলা যায় না।

এতদ্ভিন্ন হযরত ঈসার আসমান হইতে অবতরণের যে বিবরণ হাদীছে বর্ণিত আছে উহা যাহা সম্মুখে আসিতেছে– দৃষ্টে পুনর্জীবিত হইয়া আসার সম্ভাব্যতার কোন অবকাশ নাই।

এই বিষয়ের চতুর্থ দলীল একটি সুস্পষ্ট হাদীছ। (১) তফসীর ইবনে কাছীর। (২) তফছীর রুহুল মায়ানী (৩) তফছীর ইবনে জরীর কেতাবে উহা উল্লেখ আছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ لِلْيَهُوْدِ اِنَّ عِيْسٰى لَمْ يَمُتْ وَاِنَّهُ رَاجِعٌ اِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ـ

অর্থ ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) একদা ইহুদীদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, নিশ্চয় জানিও, ঈসার মৃত্যু হয় নাই এবং তিনি কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে তোমাদের মাঝে ফিরিয়া আসিবেন।

যাঁহাদের মধ্যে উল্লেখিত তিনজনও আছেন তাঁহাদের মত এই যে, প্রথম শব্দটির মর্ম এই যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসাকে খবর দিয়াছিলেন যে, "আপনাকে মৃত্যু দান করিব আমি" এবং দ্বিতীয় শব্দটির মর্ম এই যে, হযরত ঈসা তাঁহার কেয়ামতের দিনের বক্তব্যে বলিবেন, "হে পরওয়ারদেগার আপনি যখন আমাকে মৃত্যু দান করিয়াছিলেন।"

পবিত্র কোরআনের উল্লিখিত স্থানদ্বয়ের তফছীর সম্পর্কে বিভিন্ন মত আছে। তন্মধ্যে সিদ্ধ ও সঠিক পরিগণিত তফছীরের বিস্তারিত বিবরণ সম্মুখে "প্রশ্ন ও উত্তর" আলোচনায় আসিবে, কিন্তু উপরোল্লিখিত তফছীরকার দলের মত অনুসারেও হযরত ঈসার আবির্ভাব কালেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়া গিয়াছে এই সিদ্ধান্ত উক্ত আয়াতদ্বয়ের তাৎপর্য্য কিছুতেই নহে– ইহা অবধারিত।

কিয়ামত নিকটবর্তীকালে হযরত ঈসা আসমান হইতে প্রকাশ্যে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করিবেন এবং সুদীর্ঘকাল ভূপৃষ্ঠে ঘর-সংসারির সহিত অতিবাহিত করিয়া স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করিবেন, যাহা পূর্বাপর সমস্ত মুসলমানদের ঐক্যমতপূর্ণ আকীদা ও বিশ্বাস। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের তফছীরে যাহাদের মতে মৃত্যু উদ্দেশ্য করা হইয়া থাকে উহা হযরত ঈসার এই কেয়ামত নিকটবর্তীকালীন স্বাভাবিক মৃত্যুই, অন্যকোন মৃত্যু নহে। এই দাবীর সমর্থনে সংক্ষেপে কতিপয় তথ্য পেশ করিতেছি–

متوفيك ورافعك يعنى رافعك ثم متوفيك فى اخر الزمان ـ

"ইবনে আব্বাসের মতে متوفيك ورافعك আয়াতের অর্থ এই যে, আপনাকে মৃত্যু দান করিব আমি। এখন আপনাকে উঠাইয়া নিব এবং পরে পৃথিবীর সর্বশেষ যুগে আমি আপনার মৃত্যু ঘটাইব।" (তফছীর দোর্‌রে মনছুরঃ ২–৩৬)। এতদ্ভিন্ন ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত ঈসাকে আসমানে উঠাইয়া নেওয়া সম্পর্কে স্বীয় আকীদা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে–

ليقتلوه فادخله جبرئيل عليه السلام بيتا ورفعه الى السماء ولم يشعروا بذلك

"ইহুদীগণ সর্বসম্মতিক্রমে হযরত ঈসাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল, সেমতে তাহারা তাঁহাকে হত্যা করার পরিকল্পনা লইয়া রওয়ানা হইল। জিব্রাইল (আঃ) হযরত ঈসাকে একটি ঘরে প্রবেশ করাইলেন এবং তথা হইতে তাঁহাকে আসমানে উঠাইয়া নিলেন, ইহুদীরা এই সম্পর্কে টেরও পাইল না (রুহুল মায়ানী ৬–১০) অন্য এক স্থানে আরও আছে–

رفعه من غير وفاة ولا نوم وهو الرواية الصحيحة عن ابن عباس ـ

"আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসাকে মৃত্যু বা নিদ্রা ব্যতিরেকে উঠাইয়া নিয়াছিলেন– ইহাই ছাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে ছহীহ রেওয়ায়াতে প্রমাণিত রহিয়াছে" (রুহুল মায়ামী ৩–১৭৯)।

শাহ অলীউল্লাহর متوفيك শব্দের তফসীরে ইবনে আব্বাসের মতই অবলম্বন করিয়াছেন।

পন্ডিত সাহেব তাহার একজন সমর্থক বানাইয়াছেন ইমাম ইবনে হজমকে। আমরা ঐ ইমাম ইবনে হাজম হইতে তাঁহার ঐ কেতাব হইতেই যে কিতাবের নাম পন্ডিত সহেব উল্লেখ করিয়াছেন, একটি উদ্ধৃতি পেশ করিতেছি। ইবনে হাজম নবীগণ সম্পর্কে মুসলমানদের জন্য প্রয়োজনীয় ঈমান ও আকীদার বিবরণ দিতে যাইয়া বলেন–

ان عيسى سينزل ... برهان ذلك ما حدثنا عبد الله .... قال جابر سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول لاتزال طائفة من امتى يقاتلون على الحق فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيقول اميرهم ـ

সাধারণ প্রশ্ন ও উহার উত্তর

বিজ্ঞান মতে মহাশূন্য বা ঊর্ধ্ব জগতের যে অবস্থা ও স্তরসমূহ আবিষ্কার হইয়াছে উহা দৃষ্টে রক্ত-মাংসে গঠিত দেহবিশিষ্ট জীবের ঊর্ধ্বে যাওয়া সম্ভবই নহে।

বিজ্ঞানই এই প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ করিয়া দিয়াছে। বর্তমানে বিজ্ঞান কলা কৌশলের মাধ্যমে ঊর্ধ্ব জগতের দিকে– যেমন, চন্দ্র ও অন্যান্য নক্ষত্রের দিকে মানুষ প্রেরণে সক্ষম হইয়াছে। সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা আদি হইতেই বিশেষ কলা-কৌশলের মাধ্যমে বা উহা ব্যতিরেকেও উক্ত কার্য সমাধা করিতে সক্ষম– ইহাতে দ্বিধাবোধের কারণ কি থাকিতে পারে?

আরও একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, মানব-দেহবিশিষ্ট হযরত ঈসা যদি আসমানে সাধারণ জীবনে জীবিত থাকেন তবে তথায় তাঁহার পানাহার ইত্যাদির অনেক অনেক আবশ্যকাদি পূরণের সমস্যারই বা সমাধান কি?

এই প্রশ্নের উত্তরও সহজ। প্রাণী যে স্থানে অবস্থান করে তথাকার উপযোগী অবস্থাই তাহার সম্মুখে আসে এবং মহান প্রভু-পরওয়ারদেগার আল্লাহ তায়ালা তথায়ই তাহার সকল সমস্যার সমাধান যোগাইয়া থাকেন। ভূ-পৃষ্ঠের সমস্যাদি ভিন্ন। ভূগর্ভের সমস্যাদি ভিন্ন, সমুদ্র তলের সমস্যাদি ভিন্ন, চন্দ্রলোকে জীবের অস্তিত্ব থাকিলে উহার সমস্যাদি ভিন্ন, ইসলামী আকীদা মতে আকাশ জগতে ফেরেশতাদের অবস্থান রহিয়াছে। ঈসা (আঃ) তথায় পৌঁছিয়া ফেরেশতাদের অবস্থায় রূপান্তরিত হইয়া গিয়া থাকিলে তাহাতে বৈচিত্রের কি আছে!

"নিশ্চয় মারইয়্যাম-পুত্র ঈসা (আঃ) অচিরেই অবতরণ করিবেন; ইহার প্রমাণ ঐ হাদীছ যে, হাদীছখানা ছাহাবী জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলিয়াছেন, আমি শুনিয়াছি– নবী (সঃ) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের একটি দল কেয়ামতের নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত প্রাবল্যের সহিত হক্ব ও সত্যের জন্য সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে। নবী (সঃ) বলেন, অতপর মারইয়্যাম-পুত্র ঈসা (আঃ) অবতরণ করিবেন, তখন মুসলমানদের উপস্থিত নেতা হযরত ঈসাকে (নামাযের) ইমামতি করিতে বলিবেন। হযরত ঈসা অসম্মতি জ্ঞাপনে বলিবেন, এই উম্মত তথা উম্মতে মুহাম্মদীর বিশেষ সম্মান এই যে, আপনারা নিজেই নিজেদের ইমামতী করিবেন।" (মোহাল্লা ১-৯)

পাঠকবর্গ! উক্ত উদ্ধৃতি দৃষ্টে ইহা কি বলা সম্ভব যে, ইমাম ইবনে হাজমের মতে হযরত ঈসার মৃত্যু ঘটিয়া গিয়াছে? তা' হইলে ينزل অবতরণ করিবেন" এবং তাঁহাকে ইমামতির জন্য আহবান করা হইবে– এই সবের তাৎপর্য ও সঙ্গতি কি হইবে?

ইমাম মালেকও সকলের সঙ্গে একমত যে, হযরত ঈসা কেয়ামতের নিকটবর্তী কালে ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণ করিবেন। মোসলেম শরীফের শরাহ– একমালু-একমালেল মোলেম নামক কেতাবে উল্লেখ আছে

قال مالك بينا الناس قيام يستمعون لاقامة الصلوة فتغشاهم غمامة فاذا عيسى قد نزل .

"ইমাম মালেক বলিয়াছেন, লোকগণ নামাযের একামত শ্রবণে দাঁড়ানো থাকা মুহূর্তে তাহাদের উপর এক খন্ড মেঘমালা আসিবে এবং তাহারা দেখিবে, ঈসা (আঃ) অবতরণ করিয়াছেন" (১–২২৬)।

পণ্ডিত মিয়া ইমাম মালেক হইতে হযরত ঈসার মৃত্যু হইয়া যাওয়ার পক্ষে একটি উদ্বৃতি দিয়াছেন যে, ইমাম মালেক হযরত ঈসা সম্পর্কীয় একটি আয়াতের তফছীরে مات শব্দ বলিয়াছেন।

পাঠকবৃন্দ ইহা জানিয়া আশ্চর্যান্বিত হইবেন যে, পণ্ডিত সাহেব যেই কিতাব হইতে ইমাম মালেকের অভিমতটি আমদানী করিয়াছেন সেই কিতাবেই উক্ত অভিমতের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি বাক্য রহিয়াছে, যাহা পন্ডিত সাহেব দেখিয়াও দেখেন নাই। স্বয়ং পন্ডিত সাহেব উক্ত অভিমতটি যাঁহার নিকট হইতে লাভ করিয়াছেন– 'হাদীছের বিখ্যাত অভিধানকার মোল্লা মুহাম্মদ তাহের'' তিনিই উক্ত অভিমত ব্যক্ত করার সাথে উল্লিখিত তথ্যের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে

ولعله اراد رفعه الى السماء .... لتواتر خبر النزول .

অর্থ ঃ হযরত ঈসার ভূপৃষ্ঠে অবতরণ বিষয়টি যেহেতু অকাট্যরূপে অনেক হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত, তাই মনে হয় ইমাম মালেক مات শব্দ বলিয়া হযরত ঈসাকে আসমানে উঠাইয়া নেওয়াই উদ্দেশ্য করিয়াছেন। (মাজমাউল বেহার ১–২৮৬)

ইমাম মালেকের অভিমতের এই ব্যাখ্যাই সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা, কারণ ইহজগৎ ত্যাগ করাকে مات বলা হয়; হযরত ঈসা যখন আসমানে চলিয়া গিয়াছেন তখন তিনি অবশ্যই ইহজগত ত্যাগ করিয়াছেন। পন্ডিত সাহেবের উদ্ধৃতি মারফৎই ইমাম মালেকের উক্তির বিবরণ লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, তিনি স্বীয় উক্তিতে ঘটনার সময় হযরত ঈসার বয়সের পরিমাণটা নির্ধারিত করার উদ্দেশ্যটাই বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিয়াছেন যে, তখন তাঁহার বয়স ৩৩ বৎসর ছিল। মৃত্যুর সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করা তাঁহার উদ্দেশ্য নয়। ইমাম মালেকের অভিমতের সঙ্গতি রাক্ষার্থে এই ব্যাক্যারও উল্লেখ হইয়াছে যে, তাঁহার মতে হয়ত ঈসা কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে পুনর্জীবিত হইবেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যার দ্বারা সমস্যার সমাধান হয় না, কারণ ইহা ينزل ইয়ানযিল'' শব্দের পরিপন্থী; ينزل অর্থ অবতরণ করিবেন। এতদ্ভিন্ন অবতরণ সম্পর্কে ইমাম মালেক স্বয়ং যে বিবৃতি দান করিয়াছেন উহারও পরিপন্থী।

বিজ্ঞান ও যুক্তি ইত্যাদির হাতড়ানিতে যত প্রশ্নেই উঁদয় হউক, পবিত্র কোরআন ঘটনা বর্ণনার সমাপ্তিতে এমন একটি বাক্য উল্লেখ করিয়াছে যদ্দ্বারা সকল প্রশ্নেরই অবসান হইয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন–

بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ـ

"আল্লাহ তায়ালা ঈসা (আঃ)-কে নিজের কাছে উঠাইয়া নিয়াছেন; আল্লাহ ত সর্বশক্তিমান, হেকমতওয়ালা সুকৌশলী আছেনই।"

এস্থলে ঈসা (আঃ)-কে আসমানে উঠাইয়া নেওয়ার ক্রিয়াপদের কর্তাপদ আল্লাহ তায়ালা নিজকে ব্যক্ত করিয়া عزيز (আজীজ) "সর্বশক্তিমান", حكيم (হাকীম) "হেকমত ওয়ালা সুকৌশলী" –আল্লাহতায়ালার এই দুইটি ছেফত বা গুণকে সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ করিয়া দেওয়া বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

* হযরত ইসার মৃত্যু হয় নাই, আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে আসমানে জীবন্ত উঠাইয়া নিয়াছিলেন, এই প্রসঙ্গে কুচক্রিরা পবিত্র কোরআনের দুইটি শব্দের দ্বারা প্রবঞ্চনার প্রয়াস পায়। একটি متوفيك যাহার পূর্ণ আয়াতটি হইল–

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهِ ـ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ـ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ـ

متوفى শব্দটি توفى হইতে গৃহীত। যাহা মৃত্যু দান করা অর্থে স্থান বিশেষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সূত্রেই বিভ্রান্তকারীগণ বলে যে, হযরত ঈসার মৃত্যু ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহাদের জানা উচিত যে, توفى "তাওয়াফ্‌ফি" শব্দটি শুধুমাত্র উপ-অর্থ হিসাবে স্থান বিশেষে মৃত্যু দান অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে কিন্তু এই শব্দটির আসল অর্থ হইল, "কোন বস্তুকে পুরাপুরি নিয়া নেওয়া।" যেমন এই ধাতু হইতেই গৃহীত ايفاء শব্দের অর্থ "পুরাপুরি দিয়ে দেওয়া"।

আরবী শব্দের আসল অর্থ ও উপ-অর্থের পৃথককারী অভিধান اساس البلاغة "আছাছুল বালাগাহ্‌" হইতে একটি উদ্ধৃতি পাঠক সমক্ষে পেশ করিতেছি––

استوفاه وتوفاه ـ استكمله .... ومن المجاز توفاه الله ـ

অর্থাৎ "তাওফ্‌ফা" অর্থ কোন বস্তুকে পুরোপুরি নিয়ে নেওয়া, আর উপ-অর্থ হিসাবে "আল্লাহ মৃত্যু দান করিয়াছেন" অর্থেও ব্যবহৃত হয়। (৫০৫ পৃঃ)

উল্লিখিত আয়াতে "তাওফ্‌ফা" হইতে গৃহীত "মৃতাওয়াফ্‌ফী" শব্দের আসল অর্থ ছাড়িয়া উপ-অর্থ লওয়ার প্রয়োজন মোটেই নাই। সুতরাং আসল অর্থই লইতে হইবে এবং এই সূত্রে আয়াতটি মুসলমানদের সর্বসম্মত আকীদারই প্রতিধ্বনি। আয়াতের অর্থ এই–

ইহুদিরা (হযরত ঈসাকে হত্যা করার) গোপন ব্যবস্থা করিয়াছিল; পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালা (তাঁহাকে রক্ষা করার) গোপন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আর আল্লাহ হইলেন সর্বাধিক উত্তম ব্যবস্থাকারী। স্মরণ কর, যখন আল্লাহ (ঈসাকে সান্ত্বনা দানে) বলিয়াছিলেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে পুরাপুরি (তোমার দেহ ও আত্মার সমষ্টি) নিয়া নিব– তোমাকে আমার প্রতি উঠাইয়া নিব এবং (ইহুদীদের নাপাক হাত হইতে) তোমাকে সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র রাখিব।"

আলাচ্য আয়াতের উক্ত তফছীরের যথার্থতা প্রমাণে কতিপয় তথ্য–

(১) এই তফসীর উক্ত আয়াতের পূর্বাপর বিবরণী ও বিন্যস্ততায় শুধু সামঞ্জস্যপূর্ণই নয়, উহার রক্ষা-কবচও বটে। কারণ বিষয়বস্তুর বিবরণীর আরম্ভে বলা হইয়াছে "ইহুদীরা ঈসাকে মারিবার গোপন ব্যবস্থা করিয়াছিল এবং আল্লাহও তঁহাকে রক্ষা করিবার গোপন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, আর আল্লাহ হইলেন সর্বোত্তম ব্যবস্থাপক"– এই ভূমিকার পরেই বলা হইয়াছে, আল্লাহ ঈসাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিয়াছিলেন যে, انى متوفيك ورافعك الى এখন এই বাক্যের মর্ম যদি এই হয় যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসাকে বলিলেনঃ

"রহস্যজনকরূপে অস্বাভাবিকভাবে আমি আপনাকে পুরাপুরি তথা আপনার দেহ ও আত্মার সমষ্টি জগৎবাসীর নিকট হইতে লইয়া যাইব এবং আমার প্রতি উঠাইয়া লইব," তবেই মহাশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার গোপন ব্যবস্থার একটা ভাল নজীর রূপায়িত হয় এবং আল্লাহ তায়ালার যে সর্বোত্তম ব্যবস্থাপক উহারও একটা উপযুক্ত নিদর্শন স্থাপিত হয়। পক্ষান্তরে যদি উক্ত বাক্যের মর্ম এই হয় যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসাকে বলিলেন, "আমি আপনাকে মৃত্যু দিব এবং আপনার মর্যাদা বাড়াইব, তবে মহাশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার গোপন ব্যবস্থার কোন যথার্থতা দেখা যায় না এবং "আল্লাহ সর্বোত্তম ব্যবস্থাপক" বাক্যটি প্রহসনে পরিণত হয়, কারণ ইহুদীরা হযরত ঈসাকে মারিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল এবং উহার জন্য কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল। তখন যদি হযরত ঈসার মৃত্যু হইয়া গিয়া থাকে, তবে আল্লাহ তায়ালার কৌশল ও গোপান ব্যবস্থার সাফল্য কি হইবে? এবং আল্লাহ তায়ালা সুকৌশলী তথা সর্বোত্তম ব্যবস্থাপক হওয়ার যথার্থতা কি হইবে? সুতরাং এখানে 'মৃত্যু দান" অর্থ মোটেই হইতে পারে না।

(২) এই তফছীরে متوفيك এবং رافعك উভয় শব্দের আসল অর্থ "পুরাপুরি নিয়া নেওয়া এবং উঠাইয়া নেওয়া" ধরা হইয়াছে। মৃত্যুদন্ড ও মর্যাদা বাড়ান অর্থ হইলে উপঅর্থের ছড়াছড়ি হইবে যাহা সুসাহিত্যিকতার পরিপন্থী।

(৩) আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসার সর্বশেষ খবর সম্পর্কে যে চূড়ান্ত ও সুস্পষ্ট ঘোষণা (সূরা নেছা,পারা-৬, রুকু-২ তে) প্রদান করিয়াছেন- وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه "নির্ভূল বাস্তব একিনী খবর এই যে, ইহুদীরা ঈসাকে হত্যা করিতে পারে নাই, বরং আল্লাহ তাঁহাকে নিজের প্রতি উঠাইয়া নিয়াছেন।" আমাদের তফছীর অনুযায়ী আলোচ্য আয়াতের মর্ম উক্ত ঘোষণার পূর্ণ মোতাবেক হয়। পক্ষান্তরে متوفيك অর্থ "মৃত্যুদান" ধরা হইলে আয়াতের মর্ম উক্ত ঘোষণাটির পরিপন্থী হইয়া পড়ে।

উক্ত আয়াতে رفع "রাফাআ" শব্দের অর্থ "উঠাইয়া নেওয়া" লইয়া "মর্যাদা বাড়াইয়া দেওয়া" ধরা হইলে শব্দের আসল অর্থ গ্রহণের সরল পথ পরিত্যাগ ও উপ অর্থের বিড়ম্বনা ছাড়া بل বরং" প্রতিকূল বোধক শব্দটির তাৎপর্য পঙ্গু হইয়া যাইবে। 'হত্য করিতে পার নাই, বরং উঠাইয়া নিয়াছেন' এই 'বরং' শব্দের তাৎপর্যে হেরফের করিলে তাহা অহেতুক হইবে।

(৪) সুপ্রসিদ্ধ তফছীরকার আবু জাফর ইবনে জরির তাবারী (রঃ) স্বীয় তফছীরে আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে সর্বশেষ সিদ্ধান্তরূপে বলেন-

واولى هذه الاقوال بالصحة عندنا قول من قال معنى ذلك انى قابضك الى ـ

"বিভিন্ন তফছীরের মধ্যে সিদ্ধ ও সঠিক তফসীর আমাদের মতে এই- আমি আপনাকে ভূপৃষ্ঠ হইতে লইয়া যাইব এবং উঠাইয়া নিব" (তফসীর ইবনে জারীর ৩-১৮৪)

মূল বিষয়ে বিতর্কমূলক দ্বিতীয় শব্দটি توفيتنى এই শব্দটি সম্পর্কে বক্তব্য উহাই যাহা প্রথম শব্দটি সম্পর্কে ছিল, উভয় শব্দ একই ধাতু হইতে গৃহীত। পূর্ণ আয়াতটি হইল এই

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِى كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ـ

আয়াতের সিদ্ধ ও সঠিক অর্থ "(হযরত ঈসা হাশরের ময়দানে বলিবেন, হে আল্লাহ!) যখন আপনি আমাকে ভূপৃষ্ঠ হইতে পুরাপুরি (আত্মা ও দেহের সমষ্টি) লইয়া আসিয়াছিলেন তখন হইতে আপনিই লোকদের অবস্থার পর্যবেক্ষণকারী ছিলেন। আয়াতটির ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

আসমান হইতে হযরত ঈসার অবতরণ

ইমাম বোখারী (রঃ) এই বিষয়বস্তুটিকে মূল পরিচ্ছেদরূপে উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি বিশেষ গুরুত্বের সহিত এই পরিচ্ছেদে উহাই প্রমাণিত করিতেছেন যাহা পূর্বাপর বিশ্ব মুসলিমের সর্বসম্মত আকীদাহ্ যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ঈসা (আঃ) প্রকাশ্যে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করিবেন। মূল বিষয়টির প্রমাণে التصريح بما تواتر فى نزول المسيح নামক পুস্তিকায় ৭৩টি হাদীছের সমাবেশ করা হইয়াছে। এই

কারণে উক্ত আকীদা ও বিশ্বাসকে ইসলামের একটি বিশেষ অঙ্গরূপে গণ্য করা হইয়াছে এবং এই আকীদার পরিপন্থী মতকে ইসলাম বিরোধী, এমনকি কুফরী নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

কোন কোন হাদীছে হযরত ঈসার অবতরণ প্রসঙ্গটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নে কতিপয় বিবরণের উদ্বৃতি প্রদান করা হইল–

فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ اِذْ بَعَثَ اللّٰهُ الْمَسِيْحَ بْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيِّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْزُوْدَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلٰى اَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ اِذَا طَأطَأ رَاْسَهٗ قَطَرَ وَاِذَا رَفَعَهٗ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ ....

দজ্জাল-আন্দোলনের ঘোরতর অবস্থা বর্ণনায় রসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইতেছেন– দজ্জাল চতুর্দিকে ভীষণ উৎপাত ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিবে, "এমতাবস্থায় অকস্মাৎ আল্লাহ তায়ালা মারয়্যাম-পুত্র মছীহ (আঃ)-কে পাঠাইয়া দিবেন। তিনি অবতরণ করিবেন দামেশক শহরের পূর্বাংশে অবস্থিত (মসজিদের) "মিনারা-বায়জা"– শ্বেত বর্ণের মিনারার উপর। তাঁহার পরণে এক জোড়া রঙ্গিন চাদর থাকিবে। অবতরণকালে তাঁহার হস্তদ্বয় দুইজন ফেরেশতার উপর ভর করিয়া থাকিবে। ক্লান্তির দরুন তাঁহার ঘাম বাহির হইতে থাকিবে– মাথাকে নিচু করিলে ঘামের ফোঁটা টপকিয়ে পড়িবে, আর মাথা সোজা করিলে ঘামের ফোটা মতির দানার ন্যায় বহিয়া পড়িবে।" (মুসলিম শরীফ ২–৪০১)

فَبَيْنَمَا اِمَامُهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ يُصَلِّىْ بِهِمُ الصُّبْحَ اِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ الصُّبْحَ فَرَجَعَ ذٰلِكَ الْاِمَامُ يَنْكُصُ يَمْشِىْ الْقَهْقَرٰى لِيُقَدِّمَ عِيْسٰى يُصَلِّىْ فَيَضَعُ عِيْسٰى يَدَهٗ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ تَقَدَّمْ ....

"মোসলমানের তৎকালীন নেতা একদা ফজরের নামায পড়াইবার জন্য অগ্রসর হইবেন, এমতাবস্থায় অকস্মাৎ মারয়্যাম-পুত্র ঈসা ঐ ফজরের সময় অবতরণ করিবেন।* তখন ঐ নেতা যিনি নামায পড়াইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন তিনি পেছনের দিকে চলিয়া আসিবেন; যেন হযরত ঈসা আগে বাড়িয়া নামায পড়ান। কিন্তু হযরত ঈসা ঐ নেতার পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া বলিবেন, নামায আপনি পড়াইবেন; এই নামায আপনার ইমামতীতেই দাঁড়াইয়াছে। সেমতে ঐ নেতাই নামায পড়াইবেন।" (ইবনে মাজা শরীফ)

এইরূপে হযরত ঈসা ভূপৃষ্ঠে অতরণ করিয়া বহু প্রতিক্ষিত দজ্জালকে বধ করিবেন এবং তিনি দীর্ঘ দিন ভূপৃষ্ঠে অবস্থান করিবেন। তখন তিনি বিবাহও করিবেন, অতপর তিনি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু বরণ করিবেন এবং পবিত্র মদিনায় রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের রওজা সংলগ্ন স্থানে সমাহিত হইবেন– এই সম্পর্কেও হাদীছ বিদ্যমান আছে। ইমাম বোখারী (রঃ) تاريخ ইতিহাস বিষয়ে একখানা কেতাব লিখিয়াছেন, সেই কেতাবে উল্লেখ আছে–

عن عبد الله بن سلام قال يدفن عيسى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فيكون قبره رابعا ـ

"ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ছালাম (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, ঈসা (আঃ) হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের রওজা সংলগ্ন স্থানে সমাহিত হইবেন, ফলে রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং আবু বকর ও ওমরের তিনটি কবরের সঙ্গে চতুর্থ কবর হযরত ঈসার হইবে।"

(তাছরীহ বে-মা তাওয়াতারা ফি নুযুলিল মসীহ ৩৮)

---

* ঈসা (আঃ) আছরের নামাযের সময়ে অবতরণ করিবেন বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং অনেকে লিখিয়াছেন। কিন্তু আলোচ্য হাদীছ দৃষ্টে ফজরের নামায সাব্যস্ত হয়। বোখারী শরীফের শরাহ ফয়জুল বারী চুতর্থ খন্ড ৪৬ পৃষ্ঠায় আছে– আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রঃ) বলিয়াছেন, আলোচ্য হাদীছ মজবুত।

হযরত ঈসা (আঃ) ঐ সময় এক রাজত্বে অন্য রাজার পরিভ্রমণে আসার ন্যায় বিশিষ্ট মেহমানের মর্যাদায় আসিবেন বটে, কিন্তু তাঁহার তৎকালীন অবস্থানকালে নানা রকমের শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইবে, এতদ্ভিন্ন তিনি অনেক রকমের সংস্কার সাধনও করিবেন। বিশেষতঃ তাঁহার উম্মৎ হওয়ার দাবিদার খৃষ্টানরা শূকর খাওয়ার ও ক্রুশ ধারণ করার যে অবৈধ রীতি-নীতি অবলম্বন করিয়াছে ঐ সবের সংস্কারে তিনি বিশেষ দৃষ্টি দিবেন। নিম্নের হাদীছে উহারই উল্লেখ রহিয়াছে–

১৬৫৭। হাদীছঃ عن سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريرة قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَيُوْشِكَنَّ اَنْ يَّنْزِلَ فِيْكُمْ اِبْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلاً فَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْحَرْبَ وَيَفِيْضُ الْمَالُ حَتّٰى لاَيَقْبَلُهُ اَحَدٌ حَتّٰى تَكُوْنَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاقْرَءُ وْا اِنْ شِئْتُمْ وَاِنْ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلاَّ لَيُؤْمِنُنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا

অর্থঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম শপথ করিয়া বলিয়াছেন, একদিন মারইয়্যামের পুত্র তোমাদের মধ্যে অবতরণ করিবেন নেতৃত্ব দানকারী ও সুবিচারক ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী রূপে। সেমতে তিনি (খৃষ্টানদের কুসংস্কার মুছিবার জন্য) ক্রুশ ভাঙ্গিবার অভিযান চালাইবেন এবং (খৃষ্টানগণ শূকরকে খাদ্য ও গৃহপালিত পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছে, তিনি ঐ কুসংস্কার উচ্ছেদে) শূকর নিধন অভিযান চালাইবেন। যুদ্ধ-লড়াই-এর পরিসমাপ্তি ঘটাইবেন। ঐ সময় ধন-দৌলতের আধিক্য হইবে, এমনকি উহা গ্রহণকারী পাওয়া যাইবে না, ফলে (সামান্য এবাদত– যথা) একটি মাত্র সেজদা সারা দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ-সামগ্রী হইতে উত্তম গণ্য হইবে।

হাদীছ বর্ণনান্তে আবু হোরায়রা (রাঃ) উপস্থিত লোকজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা এই প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের এই আয়াতখানা পাঠ করিতে পার–

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلاَّ لَيُؤْمِنُنَّ به قَبْلَ مَوْته ـ

ব্যখ্যা ঃ حكما عدلا নেতৃত্ব দানকারী ও সুবিচারক ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী'' অর্থাৎ হযরত ঈসার তৎকালীন আগমন ভিন্ন নবী ও ভিন্ন শরিয়তের বাহকরূপে হইবে না, বরং তিনি ব্যক্তিগতবাবে নবী থাকিবেন বটে, কিন্তু তখন তিনি হযরত মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শরীয়ত মোতাবেক ফয়সালাকারী এবং সকল প্রকার অন্যায়-অত্যাচার দূর করিয়া ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারীরূপে আগমন করিবেন।

এ সম্পর্কে হাদীছও বর্ণিত আছে যে ينزل عيسى بن مريم مصدقا بمحمد على ملته ''মারইয়্যাম-পুত্র ঈসা অবতরণ করিবেন মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতিষ্ঠিত দ্বীন-ধর্ম সমর্থনকারী, তাহারই শরীয়তের পাবন্দরূপে।'' (ফতহুল বারী ৬–৩৮৩)

"فيكسر الصليب" ক্রুশ ভাঙ্গিবার অভিযান চালাইবেন।'' অর্থাৎ খৃষ্টানগণ হযরত ঈসা সম্বন্ধে মিথ্যা ঘটনা গড়িয়া নিয়া সেই অবাস্তব ঘটনা সূত্রে ক্রুশ ধারণের রীতি অবলম্বন করিয়াছে, ক্রুশের ভক্তি প্রণাম অবলম্বন করিয়াছে, উহাকে পূজনীয়রূপে গ্রহণ করিয়াছে। হযরত ঈসা স্বয়ং এই শেরেকী কুসংস্কারের উচ্ছেদ সাধন করিবেন, ক্রুশের প্রভাব সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিবেন। এমনকি বাহ্যিক রূপেও ক্রুশ চূর্ণ-বিচূর্ণ করতঃ ভূপৃষ্ঠ হইতে উহাকে মুছিয়া ফেলার অভিযান চালাইবেন।

"ويقتل الخنزير" শূকর নিধনের অভিযান চালাইবেন''। কোন নবীর শরীয়তেই শূকর হালাল ছিল না। হযরত ঈসার শরীয়তেও মুকর হারাম ছিল, কিন্তু খৃষ্টানরা তাহাদের শরীয়ত বিকৃত করিয়া মুকর খাওয়া অবলম্বন করিয়াছে, এমনকি গরু-ছাগলের ন্যায় শূকরের লালন-পালন, কেনা-বেচা অবলম্বন করিয়াছে। ঈসা

(আঃ) শূকর নিধনের মাধ্যমে উক্ত কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করিবেন।

"ويضع الحرب" যুদ্ধ-বিগ্রহের পরিসমাপ্তি ঘটাইবেন"। ইহা এইরূপে হইবে যে, সেই সময় হযরত ঈসার বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টায় ভূপৃষ্ঠে ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য সকল ধর্ম বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এই বিষয়টি হাদীছে স্পষ্টরূপে উল্লেখ রহিয়াছে–

ويهلك الله فى زمانه الملل كلها الا الاسلام ـ

"হযরত ঈসার অবতরণ সময়ে আল্লাহ তায়ালা ইসলাম ভিন্ন সব ধর্মের উচ্ছেদ সাধন করিয়া দিবেন" (আবু দাউদ শরীফ)

وتملا الارض من المسلم كما يملا الانا ء من الما ء وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد الا الله تعالى ـ

"ভূপৃষ্ঠের আবাসিক অংশ মুসলিম জাতিতে পূর্ণ থাকিবে (উহাতে অন্য কাহারও স্থানই থাকিবে না) যেরূপ কানায় কানায় পানি ভরা পাত্রের অবস্থা হয়।" তখন সারা বিশ্ববাসীর একই কলেমা হইবে, ভূপৃষ্ঠে এক আল্লাহ ছাড়া আর কিছুর এবাদত হইবে না। (ঐ)

মোসলেম শরীফে আছে, ولتذهبن الشحنا ء والتباغض والتحاسد "হযরত ঈসার অবতরণ কালে আল্লাহর কুদরতের একটি লীলা এই প্রকাশ পাইবে যে, সারা বিশ্ববাসীর মধ্যে সদ্ভাবের সৃষ্টি হইয়া সকল প্রকার বিভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা মুছিয়া যাইবে।" ফলে যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান স্বাভাবিকরূপেই হইয়া যাইবে।

"ويفيض المال" মালের আধিক্য হইবে" মালের আধিক্যের একটা সাধারণ সূত্র এই হইবে যে, জুলুম-অন্যায়, অত্যাচার দূরীভূত হইয়া ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দরুন সকল প্রকার বরকত ও রহমত অবতীর্ণ হইবে, এতদ্ভিন্ন ভূ-গর্ভস্থ খনিজ পদার্থ স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদি ভূ-পৃষ্ঠে চালিয়া আসিবে। (ফতহুল বারী ৬-৩৮৩)

"حتى لا يقبل احد" মাল গ্রহণকারী পাওয়া যাইবে না' ইহার এক কারণ ত সাধারণ্যে মালের আধিক্য; এতদ্ভিন্ন সব রকম নিদর্শন দৃষ্টে সকলের অন্তরেই কিয়ামতের ভাবনা জন্মিবে, ফলে ধন-লিপ্সা থাকিবে না। (ফতহুল বারী ৬-৩৮৩)

"حتي تكون السجدة الواحد خير ...." তখন এক একটি সেজদা সারা দুনিয়া ও উহার সম্পদ হইতে উত্তম গণ্য হইবে। কেয়ামতের নিকটবর্তীতা বোধে মানুষের অন্তরে দুনিয়ার প্রতি বৈরীভাব সৃষ্টি হইয়া আখেরাতের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হইবে; ফলে মানুষ এবাদতের প্রতি অধিক আগ্রহশীল হইয়া উঠিবে। কিন্তু ধন-দৌলত গ্রহণকারীর অভাবে দান-খয়রাতের দ্বারা আখেরাতের লাভ হাসিল করার পথ বন্ধ হইয়া যাইবে, তাই শারীরিক এবাদতের প্রতিটি সুযোগ মানুষের নিকট সর্বাধিক মূল্যবান পরিগণিত হইবে। (ঐ)

ثم يقول ابو هريرة واقرءوا ان شئتم ....

আলোচ্য হাদীছ বর্ণনান্তে আবু হোরায়রা (রাঃ) এই আয়াতখানা তেলাওয়াত করিলেন–

وَاِنۡ مِّنۡ اَهۡلِ الۡكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤۡمِنَنَّ بِهٖ قَبۡلَ مَوۡتِهٖ ـ ....

(হযরত ঈসার অবতরণের পর স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইবে যে, ইহুদীগণ যে সব অপবাদ রটাইয়াছিল, নাছারাগণ যে– তাঁহাকে খোদার বেটা বানাইয়াছিল এবং তাহারা উভয়ে তাঁহার শূলীবিদ্ধ হওয়ার যে কল্পিত কাহিনী গড়াইয়াছিল– সবই ছিল মিথ্যা। ঐ সময় স্বয়ং হযরত ঈসার মাধ্যমে তাহারা তাহাদের সমুদয় গর্হিত মতবাদের অসারতা এবং এ সম্বন্ধে ইসলামের সমুদয় বিবৃতির প্রামাণিকতা প্রত্যক্ষ করিয়া সমবেতভাবে ইসলামের ছায়াতলে আসিয়া যাইবে। এইভাবে কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হযরত ঈসার (ভূপৃষ্ঠে অবতরণের পর, তাঁহার স্বাভাবিক) মৃত্যুর পূর্বেই (তাঁহার সম্পর্কীয় সকল প্রকার মিথ্যা কল্পনার অবসান

ঘটিয়া, কল্পনা প্রণয়নকারী) ইহুদী-নাসারা দলের (তৎকালীন) প্রতিটি লোকই তাঁহার সম্পর্কে খাঁটি তথ্য-জ্ঞান ও বিশ্বাস লাভের সুযোগ পাইবে।

আর কেয়ামতের দিন ত স্বয়ং হযরত ঈসা আল্লাহর দরবারে ঐ কেতাবধারী ইহুদী-নাসারাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট সাক্ষ দিবেনই। (ইহুদীগণ যাহারা তাঁহাকে অস্বীকার করিয়াছিল তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ত স্বাভাবিকই; সকল নবীই কেয়ামতের দিন অস্বীকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিবেন। এতদ্ভিন্ন হযরত ঈসা তাঁহার দলভুক্ত হওয়ার দাবীদার নাছারা খৃষ্টানদের বিরুদ্ধেও সাক্ষ্য দিবেন; যাহা পূর্বে ছুরা মায়েদার আয়াতে উল্লেখ হইয়াছে।)

আবু হোরায়রা (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের উল্লেখ করিয়া মূল হাদীছের বিষয়বস্তুর প্রামাণিকতাই দেখাইয়াছেন যে, হযরত ঈসার মৃত্যু ঘটে নাই, তিনি পুনঃ অবতরণ করিবেন এবং তখন তাঁহার মৃত্যু হইবে। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁহার সম্পর্কে প্রধান কুসংস্কার ক্রুশের কাহিনীর মূলোচ্ছেদ করিবেন; তখন সকলে ঐ সব মিথ্যা ত্যাগ করতঃ খাঁটিভাবে মুসলমান হইয়া তাঁহার সম্পর্কে সত্যের প্রমাণ স্থাপন করিবেন। সকলে খাঁটি ঈমানদার হইলে দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা আখেরাতের জন্য এবাদতের প্রতি অধিক আকর্ষণ সৃষ্টি হইবে।

১৬৫৮। হাদীছ ঃ ان ابا هريرة رضى الله تعالى عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَاِمَامُكُمْ مِنْكُمْ ـ

অর্থ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, কতই না সুন্দর হইবে তোমাদের অবস্থা তখন, যখন তোমাদের মধ্যে অবতরণ করিবেন মরয়্যামের পুত্র ঈসা (আঃ) এবং তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য হইতে হইবেন।

ব্যখ্যা ঃ হযরত ঈসা আলাইহিচ্ছালামের অবতরণের পর বিশ্বের অবস্থা সব দিক দিয়াই ভাল হইয়া যাইবে– দ্বীনের দিক দিয়া, একমাত্র ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হইয়া সব রকম বে-দ্বীনী মুছিয়া যাইবে। শান্তির দিক দিয়া, সারা বিশ্ব এক বিশ্ব ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হইয়া যাইবে; বিবাদ-বিসম্বাদ, হিংসা-বিদ্বেষ মুছিয়া যাইবে। ধন-সম্পদের দিক দিয়া সকলেই ধনী হইয়া যাইবে, এমনকি দান-খয়রাত গ্রহণকারী লোক পাওয়া যাইবে না। খাদ্য দ্রব্যের দিক দিয়া, জমিন তাহার উৎপাদনশক্তি সম্পূর্ণ প্রকাশ করায় সব রকম খাদ্য-দ্রব্যের প্রাচুর্য দেখা দিবে।

হযরত ঈসা (আঃ) ঐ সময় দুনিয়াতে দীর্ঘকাল অবস্থান করিবেন। প্রাথমিক অবস্থায় দাজ্জাল-আন্দোলনের এবং ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইবেন। অল্প দিনেই ঐসব ধ্বংস হইয়া সঙ্কট কাটিয়া উঠিবে, অতপর অনতিবিলম্বেই ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হইবে; তখন অল্প দিনের জন্য সংকটপূর্ণ বনবাসের জীবন কাটাইতে হইবে; তার পরেই আসিবে পূর্বোল্লিখিত শান্তি-শৃঙ্খলা ও প্রাচুর্যতার যুগ।

"وامامكم منكم" এই বাক্যটির ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মতামত আছে। অগ্রগণ্য মত এই যে, এই বাক্যটি হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কীয় বর্ণনা যে, তিনি অবতরণ করিয়া মুসলমানদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন এবং নামাযের ইমামতিও তিনি করিবেন। অবশ্য তিনি ব্যক্তিগতবাবে নবী থাকিলেও তাঁহার তৎকালীন জীবন শরীয়তে-মুহাম্মাদীর অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

কোন কোন হাদীছে স্পষ্টরূপে উল্লেখ দেখা যায় যে, তিনি ইমাম হইতে অস্বীকার করতঃ ঐ সময় তাঁহার পূর্বে মুসলমানদের নেতা যিনি থাকিবেন তাঁহাকেই নামাযের ইমামতীর জন্য আগে বাড়াইয়া দিবেন। অত্র হাদীছের সামঞ্জস্য উপরোল্লিখিত বর্ণনার সহিত এইরূপে করা হয় যে, এই হাদীছটির মর্ম শুধু এতটুকু যে, উপস্থিত যেই নামাযের জামাত দাঁড়ানকালে হযরত ঈসার অবতরণ হইবে সেই জামাতের ইমামতী তিনি করিবেন না, বরং উপস্থিত নেতার ইমামতীতে ঐ নামায আদায় করা হইবে।

ঈসা (আঃ) অবতরণ করিয়া তাঁহার সর্বপ্রথম বিশেষ কাজ হইবে দাজ্জালকে ধ্বংস করতঃ তাহার বিপর্যয় হইতে লোকদিগকে রক্ষা করা। এইসব তথ্য এবং দজ্জালের বিস্তারিত বিবরণ ইনশা-আল্লাহ তায়ালা সপ্তম খন্ডে বর্ণিত হইবে।

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّارْزُقْنَا اتِّبَاعَهٗ وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلاً وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهٗ ـ

—সমাপ্ত—